[ প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় খণ্ড ]

প্রবোধকুমার
সান্যাল

বনস্পতির বৈঠক

১ম পর্ব, ২য় খণ্ড

প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৭১

দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৮১

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন : শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে
এস. এম. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা ৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

অতনু ও শান্তনুকে

॥ প্রবোধকুমার সান্যালের অন্যান্য বই ॥

বিবাগী ভ্রমর
মনে রেখো
দেবতাত্মা হিমালয় ( ১ম ও ২য় )
রাশিয়ার ডায়েরী
মহাপ্রস্থানের পথে
কাঁচ-কাটা হীরে
নিত্য পথের পথী
গঙ্গাপথে গঙ্গোত্রী
বেলোয়ারী
তুচ্ছ
আগ্নেয়গিরি
উত্তরকাল

এক চামচ গঙ্গা
জনম জনম হম
দেশদেশান্তর
জলকল্লোল
হাস্নুবাহু
বনহংসী
আঁকাবাঁকা
দুই পাখী
অগ্নিসাক্ষী
উত্তর হিমালয় চরিত
নগরে অনেক রাত
তিন কন্যার বর

# পূর্বভাষণ

১৯৭৩ সালের প্রথম থেকে 'বনস্পতির বৈঠক' প্রথম পর্ব, ধারাবাহিকভাবে যখন 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে, আমি তখন আমার পুরনো অভ্যাস-মতো যখন তখন এখানে ওখানে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি, এবং অবশেষে সুদীর্ঘকালের জন্য উত্তরপূর্ব ভারতের অরুণাচলে, নাগাভূমিতে, মনিপুরে ও ভূটানের পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘোরাফেরা করি। কিন্তু এই কালের মধ্যে 'বনস্পতির বৈঠক' নিয়ে বহু চিঠিপত্র 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে—যাদের অধিকাংশ আমার চোখে পড়েনি। ১৯৭৪-এর প্রারম্ভে ফিরে এসে অনেকগুলি চিঠি দেখি। কতকগুলি কিছু মূল্যবান, কয়েকখানি সুলিখিত, অনেকগুলিতে অসঙ্গতি ও বিদ্বেষভাব, বাকিগুলি অনর্থক। লক্ষ্য করলুম 'দেশ' পত্রিকার উদার আতিথেয়তার সুযোগ নিয়ে অনেক অজ্ঞাতজন প্রাধান্যলাভ করতে চেয়েছেন।

যাঁদের চিঠি আমার কিছু কাজে লেগেছে তাঁদের মধ্যে যোগানন্দ দাস, তারাপদ লাহিড়ি, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ চৌধুরী, গোপাললাল সান্যাল, নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রকুমার নাগ, নলিনীকুমার ভদ্র, চঞ্চল-কুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজন। স্মৃতিশক্তি অনেক সময় প্রতারিত করে, কখনো কখনো wishful thinking-এর ফাঁদে পা বাড়ায়। যাঁরা ভুল-ত্রুটির উল্লেখ করেছেন তাঁরা ধন্যবাদের পাত্র।

রাজনীতিজ্ঞ যাঁরা পত্রাদি লিখেছেন, তাঁদের উদ্দেশে জানাই, আমি রাজনীতিক নই এবং ওটা আমার পেশাও নয়। তবে আমি বরাবরই ও ব্যাপারের একজন নিরাসক্ত পর্যবেক্ষক মাত্র। ঝুনো রাজনীতিকরা সকল সময়ে সন, তারিখ, লগ্ন—সবই মনে রাখেন। আমি ওটা অনেক সময় পারিনে।

শ্রীমতী কল্পনা ভট্টাচার্য তাঁদের 'পুণ্যাশ্রম' সম্পর্কে আমার আলোচনার কিছু কিছু অংশকে 'ভিত্তিহীন' বলেছেন, এবং প্রকারান্তরে জানিয়েছেন আমার সঙ্গে তাঁদের ওই মহিলা-আশ্রমের যোগসূত্র ছিল না। তাঁর অবগতির জন্য এখানে শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্যের (প্রাক্তন দাস) একখানি চিঠির বিশেষ অংশটুকু উদ্ধৃত করছি:

"সবিনয় নিবেদন, আশা করি ভাল আছেন। অনেকদিন কোনও খবর পাইনা। পুণ্যাশ্রমের সঙ্গে আপনি খুব জড়িত। আমার সেই বোনটি (সাধনা?) অনেকদিন ওখানে ছিল। একবার 'বিসর্জন' অভিনয়ও করেছিল, আপনার মনে আছে কি? আবার সেই পুণ্যাশ্রমের সাহায্যার্থ 'ভীষ্ম' অভিনয়

করাচ্ছি। 'অনুগ্রহ করে এইটি কাগজে···ভাল করে ছাপিয়ে দেবেন—আপনার কাছে অনুরোধ···'মন্দিরা' পাচ্ছেন ত ?···

নিঃ কল্যাণী দেবী"

অজিতকুমার নাগের চিঠির উত্তরে এইটুকু বলি, বিজয়কুমার নাগ মহাশয়ের শেষ জীবনের ইতিবৃত্ত তাঁরই দোকানের কর্মচারী শশাঙ্ক চৌধুরীর মুখে শোনা। তৎকালে শশাঙ্ক আমার অবিশ্বাসের পাত্র ছিল না। আমার লেখায় নাগ মহাশয়ের স্বজনরা যে ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হয়েছেন সেজন্য আমি বিশেষভাবে অনুতপ্ত। যেটুকু আমি চোখে দেখেছি, সেইটুকুতেই আমার দরকার। অন্যান্য মন্তব্য আমি বিনাশর্তে প্রত্যাহার করছি।

আমার লেখায় রবীন্দ্রনাথের নানা কবিতার ছোট ছোট টুকরো ব্যবহার করেছি। সেগুলি সকল সময় সম্পূর্ণ নির্ভুল হয়েছে এমন বলিনে। কিন্তু কবি নিজেই নিজের কবিতার এখানে-ওখানে শব্দের অদল-বদল করে দিতেন। ফলে, একই কবিতা পর-পর সংস্করণে কোন-কোনও স্থলে অন্য অর্থ নিত। যাঁরা রবীন্দ্র সাহিত্যের গবেষক, তাঁরা এটি জানেন।

কবিকন্যা ও বিদুষী শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষ তাঁর এক চিঠিতে আমার স্মৃতি-কথার কঠোর সমালোচনা করেছেন।

শ্রীমতী লতিকার সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৩০-এ, যখন তিনি লতিকা বসু নামে খ্যাত। 'বিজলী'র কাজে কিছুদিন তাঁর বাসস্থানে যাতায়াত করতে হয়েছিল। তিনি তখন বাঙ্গলা পড়তেন না, বা লিখতেন না। তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে বহুবার এবং বহু অবস্থায় আমার দেখাশোনা হয়। সভা-সমিতিতে, জন-সমাবেশে, শ্রীঅরবিন্দের জন্মতিথি উৎসবে, হাওড়া টাউন হলে, সরোজিনী কলেজে, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে, এবং আরও অনেক স্থলে তাঁর পাশাপাশি বসে আমি কাজ করেছি। বারীনদার মৃত্যুর দিনে তিনিই আমাকে গাড়ি করে শ্মশানে নিয়ে যান। তিনি আমার বাসস্থানে এসেছেন একাধিকবার। গত ১৯৭৩-এর ফেব্রুয়ারিতে আমি তাঁর বাসস্থানে গিয়ে ৪।৫ ঘণ্টা বসে তাঁর নিজের মুখে বহু গল্প শুনি। তাঁর সম্বন্ধে লিখব—এইটি শুনে তিনি অনর্গল ও অকুণ্ঠভাবে আলাপ করতে থাকেন। তিনি নিজ মুখে না বললে তাঁর সম্বন্ধে এত খুঁটিনাটি আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। আমি এখন দুঃখিত যে, আমার সঙ্গে একটি টেপ-রেকর্ডার ছিল না। তিনি এক বৃহৎ পরিবারের কন্যা। কিন্তু সেই পরিবারের থেকে একপ্রকার বিচ্ছিন্নভাবে

প্রায় একক জীবন তিনি যাপন করে এসেছেন। ফলে, পরিবারের কোনও ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি খবর তিনি পেতেন না। কা'র কি নাম তাও অনেকটা তাঁর কাছে অস্পষ্ট ছিল। বারীনদার রাঙ্গামা, বুলারাণী, অথবা বিনয় ঘোষ মহাশয়ের পরিবারের সঙ্গে তাঁর কতটুকু যোগ ছিল, এটি ভেবে দেখতে হয়। তাঁর পিসি সরোজিনী দেবীর যৌবনকালের ইতিবৃত্ত ভাইঝি সুবাদে তাঁর পক্ষে সবটা জানার কথা নয়। 'বারীন্দ্রের আত্মজীবনী' অথবা বারীন্দ্রকুমারের 'আমার আত্মকথা'—এ দু'খানি বাঙ্গলা বই তিনি—যতদূর জানি—পড়েননি। আমাকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করার আগে তাঁর পক্ষে স্মরণ করা উচিত ছিল যে, আমি ঘোষ পরিবারের সঙ্গে দেড় বছর ধরে একত্র বাস করেছি, এবং ১৯৩০ থেকে আরম্ভ করে সরোজিনী দেবী ও বারীন ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁদের খোঁজখবর রাখতুম। অভাব-অভিযোগের মধ্যে সরোজিনীর মৃত্যু ঘটে।

আমার সঙ্গে শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষ তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা অস্বীকার করেছেন এবং আমিও সেটি অস্বীকার করি। কিন্তু মহিলারা তাঁদের প্রয়োজনের ক্ষেত্র উপস্থিত হলে যে ঈষৎ অকুণ্ঠ ঘনিষ্ঠতার কথা তোলেন, তারই সামান্য পরিচয় এই চিঠিতে পাওয়া যেতে পারে:

"Dear Mr Sanyal,

I am in urgent need of seeing you for a personal business. I should be very grateful if you would appoint some time on Sunday which will suit you when I could go and meet you at your home. You must give me at least half an hour's time. If Sunday is impossible, please make it any evening before Sunday.

yours sincerely,
Lotika Ghose
26. 6. 52

( অনুবাদ )

"প্রিয় মিঃ সান্যাল,

আমার ব্যক্তিগত জরুরি প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে দেখা করা দরকার। আমি খুবই কৃতজ্ঞ হবো যদি আপনি রবিবারে আপনার সুবিধামতো একটা সময় ঠিক

করে দেন্ যখন আপনার বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে পারি। আপনি নিশ্চয়ই অন্তত আধঘণ্টা সময় আমাকে দেবেন।

যদি রবিবার অসম্ভব হয়, অনুগ্রহ করে রবিবারের আগে যে-কোনও সন্ধ্যা স্থির করে দেবেন।"

প্রেমেন্দ্রর কয়েকখানি অনাবশ্যক ও অহেতুক চিঠি আমি খুঁটিয়ে পড়েছি। তাঁর আদিনাম নাকি প্রেমেন্দ্রহরি, এটি যখন শুনি ( ১৯২৫-২৬ ), তখন তাঁকে চোখেও দেখিনি। তাঁর কাশীবাসী এক ভাই ছিলেন, তাঁর নাম ছিল সম্ভবত সহায়হরি। এটি কাশীবাসী আমাদের উভয়েরই বন্ধু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের মুখেই শোনা। সহায়হরি শুনে প্রেমেন্দ্রহরি হতে পারে ধরে নিয়েছিলুম। যাই হোক, প্রেমেন্দ্র তাঁর শৈশবের ও বাল্যকালের নামের মধ্যপদটি প্রকাশ করতে কেন কুণ্ঠিত হন্ আমি জানিনে।

তাঁর অনেকগুলি চিঠি যেন জিদের বশে লেখা। মনে হয় সত্য ঘটনার কথা শুনে তিনি যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছেন! তাঁর বর্তমান প্রতিষ্ঠার কথা ভেবে তিনি বোধ করি 'রিভিসনিস্ট' হতে ভয় পান্। তিনি দাবী করেছেন, 'স্বদেশ' থেকে একেকটি কবিতার জন্য তিনি কুড়ি টাকা পেতেন! তাঁর এই অলস কল্পনা একালের পাঠক-পাঠিকাকে স্তোকবাক্য শোনাবার মতো। ১৯৩১-এর কালে এক রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ছাড়া তৎকালীন কোনও প্রতিষ্ঠাবান প্রবীণ বা নবীন কবি তাঁদের কবিতার জন্য কানাকড়িও পারিশ্রমিক পাননি। তৎকালে তরুণ কবি প্রেমেন্দ্র সবেমাত্র খ্যাতি কুড়োতে আরম্ভ করেছেন। তখন তাঁর এবং অন্যদের কবিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রিকাগুলিতে পাদপূরণের কাজে লাগত—বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র প্রভৃতি তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। 'প্রবাসী'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎকালে রবীন্দ্রনাথের এক একটি কবিতার জন্য দশটাকা মাত্র দক্ষিণা দিতেন, এটি আমাদের শোনা ছিল। সেই যুগে বুদ্ধদেব ও প্রেমেন্দ্র তাঁদের কবিজীবনে প্রথম একেকটি কবিতার জন্য পাঁচটি ক'রে টাকা স্বদেশ থেকে পারিশ্রমিক হিসাবে পান্। প্রেমেন্দ্রর আত্মশ্লাঘা এ ব্যাপারে অশোভন। যাই হোক, অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এখানে বুদ্ধদেবের একটি চিঠির বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করছি :

> "ভাই প্রবোধ,...আমার আর দুটো গল্পের দাম কুড়ি আর কবিতার বাবদ পাঁচ—সবসুদ্ধ পঁচিশ টাকা পাওনা আছে। তুমি দয়া করে immediately আমাকে এই পঁচিশ টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করবে।

আমি তোমার ওপর নির্ভর করছি…

ইতি বুদ্ধদেব

৪৭, পুরানা পল্টন, রমনা, ঢাকা।

১১. ৯. ৩১

প্রেমেন্দ্র তর্ক তুলেছেন, আমি তাঁকে পূর্বোক্ত পাঁচ টাকার রসিদ দেখাতে পারলে তবেই তিনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন। তেতাল্লিশ বছর পরে তাঁর এই হাস্যকর দাবির কথা তুলে তাঁকে আর হাস্যাস্পদ্ করব না। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই জানেন, বেতনভোগী সম্পাদকরা লেখকদেরকে পারিশ্রমিক পাইয়ে দেন মাত্র, রসিদ থাকে মালিকের আপিসে! আমি 'স্বদেশে'র সম্পাদক ছিলুম, মালিক ছিলেন জনৈক বৈদ্যনাথ বিশ্বাস। প্রেমেন্দ্রর জানা উচিত, স্মৃতিবিভ্রম আর মতিভ্রম এক বস্তু নয়, কিন্তু ও দুটো একই সঙ্গে ঘটলে সাধারণতঃ মস্তিষ্ক বিকারের কথা ওঠে।

আমার স্মৃতিকথার কোনও একস্থলে শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র হঠাৎ অহেতুক একটি নোংরা 'ইঙ্গিত' আবিষ্কার করেছিলেন, এবং ওঁদের চিঠি পড়ে সেই পুরনো ইংরেজি প্রবাদটি মনে এসেছিল, 'the lady protests too much.' ওঁরা দুজন প্রায় একই ভাষায়, একই সময়ে এবং একই চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাকে অযথা আক্রমণ করেন। ওঁদের একজনের চিঠিতে 'জঘন্য' শব্দটির অপব্যবহার ছিল। মনে হয় শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে ওঁরা অবহিত ছিলেন না। 'জঘন' শব্দটির থেকে জঘন্যের উৎপত্তি।

প্রেমেন্দ্র আরেক চিঠিতে লিখেছেন, তিনি ইস্কুলে কোন্ কোন্ বিষয়ে কি-কি নম্বর পেয়ে ভালভাবে পাস করেছিলেন। তাঁর এ-চিঠি পড়ে পাঠক-পাঠিকারা হয়ত হেসেছিলেন। কিন্তু তিনি নিশ্চয় জানেন, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের জবাবে মুখস্থ বিদ্যা গড়গড়িয়ে লেখা এবং পরবর্তীকালে গদ্য বা পদ্য রচনা পদ্ধতি,—দুটো এক জিনিস নয়। অপর এক চিঠিতে তিনি আমার মনস্তত্ত্বের আলোচনা তুলেছেন। কিন্তু ওসব আলোচনা পণ্ডিত সমাজের,—তাঁর পক্ষে বেমানান। ওই চিঠিতেই বন্ধুবর একস্থলে বলেছেন, আমি নাকি তাঁর সঙ্গে 'অন্তরঙ্গতার ভাব' দেখিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু স্বার্থের ও সুযোগবাদের প্রয়োজনে তিনিও যে অন্তরঙ্গতার ভাব দেখাতে তিল মাত্র কুণ্ঠিত হন্ না, নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁর একখানি 'নিরীহ' চিঠি প্রমাণস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত করছি:

"প্রিয়বরেষু,

প্রবোধ, এতদিনে তোকে আমার একটা উপকার করবার সুযোগ দিচ্ছি…আমার সিনেমার গল্প 'প্রতিশোধ' শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী উপন্যাসাকারে বার করেছেন। বইটির একটু ভাল সমালোচনা করে দিবি।…বইটির যাতে বিজ্ঞাপনের কাজ হয় ও বিক্রি হয় এমন একটু নিজে লিখে দিবি। লেখা বড় না হলেও চলবে। আজ`কাল বইয়ের বিক্রির বাজারে তুই ত অপ্রতিদ্বন্দী ( sic ), সুতরাং এটুকু বন্ধুকৃত্য তুই বেশ খুশী মনেই করতে পারিস। কেমন আছিস? কোথায় যাচ্ছিস? একদিন আসিস।

তোর আপাততঃ অভিন্ন হৃদয়—

প্রেমেন্দ্র মিত্র"

প্রেমেন্দ্রর অন্য এক পত্র হাস্যোদ্দীপক। এই গ্রন্থের সর্বাশ্লেষী বিশালতা ও ব্যাপ্তি সম্ভবত তাঁর বোধগম্য হয়নি। না হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁর বন্ধু মাত্রই জানেন, তাঁর জীবনের গণ্ডী ক্ষুদ্রতর হয়েছে কালীঘাট থেকে টালিগঞ্জের মধ্যে! সুতরাং অজ্ঞতাবশত তিনি তাঁর চিঠিতে এই স্মৃতিচারণের প্রতি ব্যঙ্গ-কটাক্ষ করেছেন। তা করুন। কিন্তু হিমালয়ের কঠিন পাথরে পিন্ ফোটাতে গেলে নিজের আঙুলই কাটে, এটুকু কেউ তাঁকে বুঝিয়ে দিলে আশা করি তিনি উপকৃত হবেন।

শৈলজানন্দ তাঁর অসংযত চিঠিগুলি কষ্ট করে লিখেছেন, সহজেই বুঝতে পারা যায়। তিনি এখন অসুস্থ, বার্ধক্যে জীর্ণ, এবং তাঁর স্মৃতিশক্তি লুপ্তপ্রায়। তাঁর অনুরাগপূর্ণ বহু চিঠি আমি সযত্নে অদ্যাবধি রক্ষা করি। সেইগুলি স্মরণ করে তাঁর এই আক্রমণাত্মক পত্রাদির আলোচনা করতে আমি বিরত হচ্ছি। কামনা করি তিনি সুস্থ হন, এবং লুপ্ত স্বাস্থ্য ও স্মৃতিশক্তি ফিরে পান।

গ্রন্থকার

# বনস্পতির বৈঠক

[ প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় খণ্ড ]

সন্ধ্যার পর পা টিপে-টিপে বাঙ্গালীটোলার গলির ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। সোনারপুরার গলিপথ দিয়ে বেরিয়ে, মান-সরোবরের গলিটা ছাড়িয়ে বাঁ দিকে পাঁড়ে-হাউলি। সুবিধা ছিল, গলিঘুঁজির মধ্যে তখনও ইলেকট্রিক হয়নি। রাজ-রাজেশ্বরীর গলিটাও অন্ধকার। ওটা এড়িয়ে উত্তরে চলে যাচ্ছিলুম। আমি অলক্ষ্য এক সরীসৃপের মতো গুটিগুটি অগ্রসর হচ্ছিলুম।

ভাবছিলুম অন্ধকারে পথ যেন তাড়াতাড়ি না ফুরোয়! বেশ কড়া ঠাণ্ডা পড়েছে—যেটি আমার পক্ষে সুবিধাজনক। মোটা গরম র‍্যাপারখানায় সর্বাঙ্গ ঢেকেছি। মাথাটাও ঢেকে নিয়েছি—যা কখনও ঢাকিনে। আমাকে কেউ চিনতে না পারে, কেউ দেখতে না পায়! পাপ আছে নিজের মনে, সেই মন যদি পরিচিত কারও কাছে হঠাৎ ধরা পড়ে? কে জানে, আচমকা হয়ত অভয় লাহিড়ীমশায় হাতী-ফটকা থেকে হাঁক দিয়ে ডাকবেন! হয়ত পাঁচু স্যাকরা গলা বাড়িয়ে বলবে, ছোড়দা যে? মুড়ি দিয়ে চললেন কোথা? হয়ত মোতি-ঝি মাসিমার জন্য মালাই-রাবড়ি নিয়ে ফিরছে। কে জানে হয়ত বা কিশোরদাদারই মুখোমুখি!

না, দরকার নেই। কাপড়ের দোকানের গায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে খালিসপুরার মধ্যে ঢুকে পড়ে বাঁচলুম। আমি একটা যে ঘোরতর নৈতিক অপরাধ করতে এগিয়ে যাচ্ছি, কেউ লক্ষ্য করছে কি আমাকে? কেউ কি সন্দেহ করছে না, আমি যাচ্ছি এক শুচিশুদ্ধা নিষ্ঠাবতী ব্রহ্মচারিণীর অপরিণামদর্শী মায়াজালের ফাঁদে ধরা দিতে? আমি পুরুষ,—অজ্ঞান অবলাকে সর্ববিধ আপদ থেকে রক্ষা করার সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব আমার। আমি শ্লথপ্রাণ নই, আপন চিত্তদৌর্বল্যকে সংবরণ করার যথেষ্ট শক্তি আমার থাকা দরকার। কিন্তু আজ আমি সম্মোহিত, মহামায়ার মায়ায় আমি আচ্ছন্ন।

এ-গলির ঘন অন্ধকারে কালভৈরবের প্রেতচ্ছায়ার মতো অনির্দেশ্যভাবে কিছুক্ষণ ঘুরে গণেশমহল্লা দিয়ে অন্য পথ ধরলুম। আমার বিবেচনাশক্তি কম, এ আমি স্বীকার করিনে, কিন্তু আজ আমি যেন নিরুপায়! এ যেন অপমৃত্যুর একটা অচ্ছেদ্য টান—এ টানে যেন আমাকে যেতেই হবে। এ শুধু মায়াজাল নয়, মহা-মায়ার ইন্দ্রজাল! কেউ কোথাও থেকে আমাকে দেখছে না, কিন্তু নিজকে আমি দেখছিলুম! আমারই এই বুকের বৃন্দাবনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলুম, আমারই

পঙ্করাশি ভেদ করে শ্রীরাধিকা যেন চলেছেন অভিসারে—পিছনে রয়েছে তাঁর সমাজ, গুরুজন, নিন্দুক, পথে-পথে তাঁর গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা, চারিদিকে শত্রুভয়,—রাত্রি ঘন অন্ধকার!

উল্টোপথে নেমে এলুম ভূতেশ্বরের গলিতে। গলির মুখে এলে সামনে কালী-তলার মন্দির, তার পাশে মস্ত ফুলের দোকান। গলির এই কোণে সেই মিষ্টপ্রকৃতি হিন্দুস্থানী বউটার মালাই-রাবড়ির দোকান কালীমন্দিরের মুখোমুখি।

ঘন বেগুনী একখানা পশমের চাদর গায়ে জড়িয়ে শীলা বোধ হয় ফুল কিন-ছিল। দু'একবার সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। হঠাৎ পিছন দিকে চেয়ে সে আমাকে দেখল। দুই চোখ তার ওই মন্দিরের আলোয় যেন জ্বলে উঠল।—আমি সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে তোমার জন্যে! ও কি, মাথায় মুড়ি দিলে কেন? এখন ত তেমন শীত পড়েনি!

তার নিঃসঙ্কোচ সহজ কণ্ঠ যেন আমাকে চাবুক মারল। তৎক্ষণাৎ আমি মাথা থেকে র্যাপার সরিয়ে নিলুম। বললুম, অত ফুল কিনলে যে?

—বারে, খালি হাতে যাব শয়নারতি দেখতে?—শীলা গলগলিয়ে উঠল, বিশ্বনাথ রাজবেশ ধারণ করবেন, আর আমার এই সামান্য গাঁদার মালা তিনি নেবেন না? এদিকে এস—

কয়েক পা সরে এসে মন্দিরের মুখে দাঁড়িয়ে শীলা ভিতরের দিকে চেয়ে বলল, ঠাকুরমশাই, এই দেখুন,—ইনিও একজন ঠাকুর, জপতপ পূজো আহ্নিক সব করেন। ওঁর কপালে একটু রক্তচন্দন মাখিয়ে দিন্ তো? আমারও হাতে একটু দিন্—

প্রবীণ ভট্‌চার্যি মশায় আমার কপাল জুড়ে শ্বেত ও রক্তচন্দন লেপন করে দিলেন। সেই চন্দনের পাত্র থেকে শীলা খানিকটা নিজের হাতে নিল এবং প্রণামী-স্বরূপ দুটি বড় রক্তজবা ও দু আনা পয়সা নিবেদন করে প্রণাম করল হেঁট হয়ে। আমি মন্দিরের মধ্যে দেখছিলুম করালী মহাকালীর দুই উজ্জ্বল চক্ষুর নিচে আরক্তিম লোল জিহ্বা লকলক করছে যেন রক্তের ক্ষুধায়!

ওখান থেকে আমরা সড়কে গিয়ে দাঁড়ালুম। শীলা তার হাতের ছোট পুঁটলিটি চাদরের মধ্যে নিয়ে এক হাতের চন্দন দু হাতে মেখে নিল।

এখান থেকে বিশ্বনাথের গলি দিয়ে মন্দিরে পৌছতে মিনিট দশেক লাগবে বইকি। তবু আমি বললুম, শয়নারতির এখনও অনেক দেরি। এখনই যাবে?

হেসে উঠল শীলা—কে যাচ্ছে শয়নারতি দেখতে? তুমিও যেমন!

অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললুম, এ কি বলছ? যাবে না তুমি?

শীলা আমাকে তিরস্কার করল,—বড্ড সরল তুমি, তোমাকে সব কথা বোঝানো যায় না। তিন বছর শিবপুজো করে যাকে কাছে টেনে এনেছি, তাকে ফেলে যাব পাথরের নুড়ির কাছে? কেন, কোন্ দুঃখে? আজ আমার ছুটি, বুঝেছ?

এদিক ওদিক আমি তাকাচ্ছিলুম। তখনও আমার আড়ষ্টতা ঘোচেনি। আমি বললুম, কিসের ছুটি তোমার?

—চল বলছি—শীলা ঘাটের দিকে পা বাড়াল। এখন শীতের সন্ধ্যারাত্রে ঘাটের দিকটা ফাঁকা। শীলার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটের সিঁড়ির কাছাকাছি এসে বড় গাছটার তলায় দাঁড়ালুম। গঙ্গার ওপারে পূর্ব দিগন্তে কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠছিল। সে প্রায় পূর্ণিমারই মতো। দুই কলা ক্ষয় হয়েছে।

শীলা বলল, ছুটি কিসের শুনবে? সকল কাজকর্ম থেকে ছুটি, সমস্ত শাসন থেকে ছুটি। বেদ-উপনিষদের সব ভাষ্য আজ শিকেয় তুলে এসেছি। আজ আমাকে তুমি একটু বেড়িয়ে আনবে চল।

—রাত্রে কোথায় বেড়াবে কাশী শহরে?—একটু অনুযোগ জানিয়ে বললুম, একায় তোমাকে নিয়ে ওঠা যাবে না, আর টাঙ্গায় চড়ে কতদূরেই বা যাওয়া সম্ভব? এত রাত্রে সারনাথের দিকেও যাওয়া চলবে না। তাছাড়া আরেক কথা। লোকেই বা বলবে কি?

শীলা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, লোকে কি বলবে এই ভয় পাও? লোক ত তোমার মনের ভূত! যত পাপ মনে, ন্যায় অন্যায় সবই মনে। তাহলে থাক্, কোথাও যেয়ো না! বরং তার চেয়ে এক কাজ কর। আমাকে একটু নৌকোয় চড়াও না কেন? আমার বড্ড সাধ একটু নৌকোয় চড়ি!

—এই রাত্তিরে?

—হোক না রাত্তির! ওই ত চাঁদ উঠছে একটু একটু! চল—

দুজনে নেমে এলুম প্রয়াগ ঘাটের নিচে। মাঝিরা বোধ হয় ওৎ পেতে ছিল কয়েকজন ছুটে এল, এবং তাদের মধ্যেই একজন বুড়ো কাছে এসে বলল, আরে দাদা, কব আয়ে হুয়ে?

আমি বললুম, এই যে রামলোচন, তোমাকেই খুঁজছি। এই কদিন হল এসেছি। যাও তোমার নৌকো নিয়ে এস, এই আমরা দুজন। আমাদের যেন তাড়া দিয়ো না, যতক্ষণ খুশি থাকব। ঘণ্টা হিসাবে কত নেবে?

—আরে দাদা, যো মর্জি দেনা—

রামলোচন জলের ধারে নেমে নৌকো প্রস্তুত করতে গেল। শীলা বলল, আমার কাছে গোটা চারেক টাকা আছে বলে রাখলুম। এ আমার নৈবেদ্যর খরচ।

নৌকায় উঠলুম দুজনে। রাত প্রায় আটটা। ঠাণ্ডা নেমেছে গঙ্গায়। গলা বাড়িয়ে রামলোচনকে বলে দিলুম, আদিকেশবের দিকে চল—

রামলোচন হালটা ধরে নৌকার ডগায় বসে খইনি টিপতে লাগল। তার এক সহচর দাঁড় ঠেলে নৌকা ছেড়ে দিল। গঙ্গা উত্তরবাহিনী। আমরা উত্তরে চললুম।

ছইয়ের নিচে ছোটখাটো ঘরটি অন্ধকার। মেঝের উপর চাটাই বিছানো। সেখানে বেশ গুছিয়ে বসল শীলা, এবং আমাকে তার গায়ে-গায়ে বসাল। বসলুম বটে কিন্তু আমরা পরস্পরের থেকে অনেক দূর। কতটুকু পরিচয় হয়েছে আমাদের কতটুকু সময়ের মধ্যে? গতকাল ধর ঘণ্টা দুয়েকের অন্তরঙ্গতা? তার আগের রাত্রে শীলা আচমকা আমার হাতখানা ধরে আঁচিয়ে দিয়েছিল, তার চেয়ে বেশি কিছু নয় ত? এইটুকুতেই যদি কেউ বলে প্রণয় প্রসঙ্গ বা প্রেমের কাহিনী, তা হলে আমি মানব না। মন জানাজানি হল প্রণয়ের সূত্র। কিন্তু এখন পর্যন্ত কে কাকে কতটুকু জানি? আমরা দুজনেই ত দুজনের অজানা! আমার মধ্যে অনেক অযোগ্যতা, অনেক অক্ষমতা, অনেক ফাঁকি আর মেকি রয়েছে। কিন্তু এটি নিশ্চয়-নিশ্চয় জানি আমি প্রেমিক পুরুষ নই, আমার ভিতরে কোনও প্রণয়ীর চিহ্নমাত্র নেই! আমি যেন সেই চিরকালের নিষ্ঠুর ও নিরাসক্ত পর্যবেক্ষক, যারা চিরন্তনকালের শিল্পী বংশপরম্পরার দয়াহীন উত্তরাধিকারী—আমি তাদেরই বংশের এক অতি ক্ষুদ্র মানবক মাত্র। আমি সেই অনাদি-অনন্ত কালের রাজ-সম্রাট নীরো—যার সামনে শুধু রোমনগরী নয়, সমগ্র দ্যুলোক-ভূলোক যদি দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকে তবু সে আপন বাঁশীটি বাজিয়ে যাবে রসবোধের নিগূঢ় তন্ময়তায়!

—কি বলো শীলা, এ কি সত্যি নয়?

শীলা ফিরে তাকালো আমার দিকে। আমার একখানা হাত সে ধরেছিল। তার কালো পল্লব ঢাকা দুই টুকরো অন্ধকার চোখ আমার চোখের উপরে রেখে শুধু বলল, সত্যি! তুমি যা ভাবছ সব সত্যি। আমার কিন্তু চমৎকার লাগছে।

অন্ধকার গঙ্গায় ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছিলুম দুজনে। বাইরে উদার দিগন্তের সকল দ্বার খোলা। গগনে-গগনে যোগ-তপস্বিনী রাত্রি যেন কান পেতে শুনছিল দুই পথভ্রষ্ট নীতিভ্রষ্ট স্খলিতপদ তরুণ-তরুণীর মৃদুগুঞ্জন।

শান্ত ও স্থির হয়ে শীলা যেন এক নিবিড় রসে তন্ময় হয়ে বসে ছিল। কিন্তু আমি ঈষৎ চাঞ্চল্যবোধ করছিলুম। এক সময় বললুম, শীলা, একটু খোলাখুলি-ভাবে যদি দু'একটা কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করি, তুমি কি শুনবে?

—নিশ্চয় শুনব—শীলা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল।

—শোনো, এসব ব্যাপারে আমার আজ পর্যন্ত কোনও অভিজ্ঞতা নেই। আচ্ছা, তোমার-আমার এটা কি ভালবাসা? সত্যি বলব, আমি মেয়েদের মন জানিনে। আচ্ছা, তুমি বলতে পারো, এরই নাম কি প্রণয়চর্চা? এই সবই কি প্রেম ইত্যাদির পূর্বাভাস?

—না, তাও না।—অকপটে শীলা স্বীকারোক্তি করল।

—তবে? তবে কি? মনে রেখো শীলা, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা,—কাশীর গঙ্গার বুকের ওপরে তুমি বসে আছ! তোমার আসনের নিচে জাহ্নবীর গভীর ধারায় হাজার হাজার বছরের ভারতীয় সংস্কৃতি জপের মন্ত্র পাঠ করে চলেছে! আমাকে স্পষ্ট করে বলো—এটা কি তবে আমাদের স্থূল যৌনসম্ভোগের তাড়না?

শীলার চোখের প্রশান্ত সহজ চাহনি এতটুকু চঞ্চল হল না। সে আমাকে দেখছিল। বোধ হয় আর কোনও মেয়ে আর কোনদিন এমন করে আমার দিকে চেয়ে থাকেনি! একসময়ে সে মিহি মৃদুহাসি হাসল। শুধু বলল, তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা—কিচ্ছু হয়নি! তোমার চোখ খোলেনি, নিজের মন চেনোনি! একদম কাঁচা তুমি। তুমি যা বলছ তার মানেও জানো না, স্বাদও জানো না।

আমি চুপ করে গেলুম। তৎকালে আমার বইপড়া বিদ্যা, লোকের মুখে ঝাল-খাওয়া। আমি তখন হুজুগের ক্রীড়নক, ফ্যাশনের ক্রীতদাস, রবি ঠাকুরের রোমান্টিক কাব্যরূপকের সেই অর্বাচীন কচি ও কাঁচা! আমার মুখে চল্‌তি কালের কয়েকটা ধারকরা বুলি, সময়-অসময়ে মদের পাত্রে দুটো চুমুক, দু'চারবার নোংরা বস্তির আনাচে-কানাচে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ানো এবং সাহিত্যের বিচারসভায় আদর্শহীন বুদ্ধিবৃত্তির বহিঃপ্রকাশের ভয়ে কুঁকড়িয়ে একপাশে বসে থাকা—আর আমাদের চারিদিকে "মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে ওঠে কথায় কথায়—"। আজ যখন সাধারণ মেয়ে সহজ প্রশ্নের জবাব চাইছে, তখন আমার মুখ ফুটছে না।

শীলা বলল, জেঠামশায়ের কাছে অনুগত শিষ্যের মতন যখন-তখন তুমি যাতায়াত করে এসেছ। আমার পায়ের শব্দ শুনেছ, আনাগোনা জেনেছ। কিন্তু একবারও কি তোমার মনে হয়নি যে, তিন-চার বছর ধরে আমি শুধু তোমাকেই নিয়ে আছি? এ কি জেনেছ একবারও যে, তোমার মধ্যে আমিই বাস করছিলুম? এ কখনো ভেবেছ, আমার ঘরকন্নায় তুমি ছাড়া অন্য কেউ ছিল না? তাই তুমি শুধু মনে রেখেছ হাতখানা ধরা আর ঘণ্টাদুয়েকের বাকবিতণ্ডা? বাঃ, ধন্যি তুমি!

এবার আমি প্রতিবাদ জানালুম, তোমার কথা এক বর্ণও বুঝতে পারছিনে, শীলা। তুমি যে এতদিন ধরে আমার খবর রেখে এসেছ—

—খবর?—শীলা যেন গর্জিয়ে উঠল, পুতুলের মতন তোমায় নিয়ে খেলেছি, সে কি জানো? অশুদ্ধ ছিল দেহ-মন, তাই দীক্ষা নিয়েছি—তোমারই জন্যে। তোমার কৌমার্য আজও কেউ হরণ করেনি, সে যে আমারই শিবপুজোর ফল! কে তোমাকে নিরাপদে সেই মিলিটারি দেশ থেকে ফিরিয়ে আনল,—সে কি আমি নই? শুধু যৌন-সম্ভোগের তাড়নার কথা শিখে রেখেছ, কিন্তু তার উপলক্ষ্য যে মেয়ে,—সেই মেয়ের নিগূঢ় চৈতন্যের পাকে-পাকে জীবন-দেবতার যে আসন, তার খোঁজ কি একবারও পাওনি?

আমি চুপ করে গেলুম। এ যেন বাতুলের প্রলাপ। শীলার আগাগোড়া কথাবার্তায় আমি কোনও অর্থসঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছিলুম না। আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধ সংস্কার থেকে তার কি এই দৈব বিশ্বাসের জন্ম? তার কথাগুলো একে একে শুনে আমি যেন হতবুদ্ধির মতো বসে রইলুম।

শীলা নিঃশব্দে আমার দ্বিতীয় হাতখানা টেনে নিয়ে তার নিজের দুখানা হাতের শুকনো রাঙা চন্দন আমার দু'হাতে ঘষে দিতে লাগল। তারপর মিষ্ট নম্রকণ্ঠে বলল, তুমি দেখে নিয়ো আমার শিবপুজো মিথ্যে হবে না। কোনও দিন তোমার পায়ে একটি কাঁটাও ফুটবে না, কোনও বিপদে কখনো তুমি ভেঙে পড়বে না। পাপ তোমাকে কখনও ছোঁবে না। তুমি শিবকল্প, শিবময় তুমি!

শীলার হাতখানা যেন উত্তেজনায় আমার হাতের মধ্যে কাঁপছিল। এবার আমি তামাশাচ্ছলে বললুম, সবই বলছ বটে শীলা, কিন্তু আমার দুষ্প্রবৃত্তির রাশ যে বড় আল্‌গা! তোমার শিবকে জানিয়ে আমার একটু সংযম আনিয়ে দাও! আমি কলকাতায় বাস করি, চারদিক থেকে লোভের হাতছানি—সুতরাং সংযম আমার যখন-তখন দরকার।

—তোমার ত এতটুকু অসংযম নেই।

—আছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, শীলা। সাংঘাতিক অসংযম আমার মনে।

শীলা বলল, তবু ওই মন তোমার চিরদিন নির্মল থাকবে, দেখে নিয়ো।—এই বলে সে বাইরের দিকে যেমন নিমেষনিহত চক্ষে চেয়ে বসে ছিল, তেমনিই রইল।

পূর্ব দিগন্তে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষতচন্দ্র উঠে দাঁড়াচ্ছিল। ওপারে ধুধু করছিল মরুবেলার জনশূন্য প্রান্তর। শীলার মুখে জ্যোৎস্নার আভা পড়ে যেন ঝলমল করছিল। তাই দেখে অত্যন্ত নাবালকের মত বলে ফেললুম, শীলা, তোমার অঙ্গে অঙ্গে গঙ্গার শোভা, সর্বাঙ্গে তোমার চন্দনের গন্ধ! তুমি বেদবতী, বড় সুন্দর তুমি!

কণ্বমুনির তপোবনে দাঁড়িয়ে শকুন্তলা যেমন বাঁকা নয়নে তাকিয়েছিল নবাগত দুষ্মন্তের প্রতি, তেমনি করে আমার দিকে চেয়ে শীলা বলল, আমি সুন্দর, কেমন করে জানলে? দেখেছ কখনো আমাকে?

—দেখছিই ত শীলা—

শীলা হাসল। বলল, ও দেখা কতটুকু সত্যি? চল না, একবারটি ওপারে, দেখব দুজনে দুজনকে? ওপারটা কেমন, কখনো দেখিনি। যাবে?

বললুম, আমিও কখনো যাইনি ওপারে। এত রাতে যেতে ভয় করে ওই শূন্যে!

—তোমাকে না বলেছি এ জীবনে কোনদিন তোমার পায়ে একটি কাঁটাও ফুটবে না! আমার শিবকে তুমি মিথ্যে করতে চাও? চলো যাই একবারটি—

শীলা একপ্রকার হুকুম করল।

রাত নটা বেজে গেছে। আমি রামলোচনকে ছইয়ের দরজার কাছে ডাকলুম। ডেকে বুঝিয়ে বললুম, ওপারে বালুতে আমরা কখনও পা রাখিনি। দূরের থেকেই এতকাল দেখে এসেছি দীর্ঘ বিস্তীর্ণ বালুচড়া, কাছে যাইনি কোনদিন। এবার তুমি মাঝনদীতে নৌকো ঘুরিয়ে নাও রামলোচন।

রামলোচন বলল, সর্দি বহুৎ হোগি, দাদা—

—হোক না, আমাদের বেশ গরম চাদর আছে সঙ্গে।

রামলোচন আর তার দাঁড়ি—দুজনে মাথায় পাগড়ি পাকিয়ে নিল।

প্রাণীশূন্য শব্দশূন্য যেন এক বিচ্ছিন্ন আদিম ভূখণ্ড। এ যেন বিশ্বপৃথিবীর অতীত কোন্ এক পরপার ধূসর ঊষর চন্দ্রলোকের মতো।

ঘাট নেই কোথাও। ওরই মধ্যে এক আঘাটায় নৌকা এসে ভিড়ল। আগে আমি নামলুম নরম মাটির পাঁতায়, তারপর শীলার একখানা হাত ধরে নামিয়ে নিলুম। রামলোচন সতর্ক করে দিল, বেশিদূর যেয়ো না দাদা, রাস্তার ঠিক পাবে না।

কিন্তু আমরা ত জানিনে আমরা কতটুকু দূরে কোথায় যাব, অথবা আমাদের লক্ষ্য কি? শীলা বলল, তা হোক, তবু চলো। যতটা যাবো, ততটাই ত জানব?

—বেশ চলো।—আমার মনে রোমান্টিক কাব্য এসে পড়ল—আমাদের পায়ের চিহ্ন রেখে যাবো বালুবেলায়,—ধূসর অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার আগে মৃত্যু যেমন রেখে যায় তার শেষ পদচিহ্ন! এ যেন মানুষের প্রথম পায়ের দাগ আমরা বালির উপরে বসিয়ে বসিয়ে যাচ্ছি। যাচ্ছিলুম অনেক দূর চন্দ্রমণ্ডলের দিকে!

মনে হচ্ছে চারিদিকে সৃষ্টির প্রারম্ভকাল। আমরা এসেছি প্রথম মানব-মানবী 'অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে'।

বালুর বড় বড় ঢিবি। কোথাও অনেক উঁচু, কোথাও বা তলিয়েছে কতকটা নিচে। চারিদিকে বালুর পাড়, মাঝখানে বড় বড় এক-একটা গহ্বর। সব মিলিয়ে যেন এক মায়াচ্ছন্নলোক। আমরা জীবসৃষ্টির প্রথম পর্বে উত্তীর্ণ।

আমাকে ধরে-ধরে আসছিল শীলা। এই মলিন ছায়াময় জ্যোৎস্নায় সে যেন আমার চোখে হয়ে উঠল এক অপার্থিব দেবকন্যা—বিশ্বপ্রকৃতির প্রতীক্। কেউ নেই এ ত্রিভুবনে—শুধু আমরা দুটি ছোট্ট জীব-চেতনা!

শীলা একটি অগভীর গহ্বরে নেমে তার গায়ের চাদরখানা পাতলো। তারপর আমাকে ডাকল, এখানে এসো।

আমি সজাগ হলুম,—আমি পুরুষ! ভাববিহ্বলতা আমাকে পেয়ে না বসে। কিন্তু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওখান থেকেই দেখলুম, শীলা যেন একরাশি ললিতলাবণ্য! দেখতে লাগলুম মরুপ্রান্তরের এই চন্দ্রশোভায় বেদবতী মহাশ্বেতা যেন তপস্বিনী উমায় রূপান্তরিত। নিবিড় রসে আমার মুগ্ধ দৃষ্টি নিমীলিত হয়ে এলো।

—কই এস?

—সাহস হচ্ছে না, শীলা—

শীলা কয়েক পা উঠে এল। আমার মুখের কাছে মুখ তুলে সে বলল, সাহস আমি দেবো শক্তিও দেবো। কিন্তু আগে কথা দাও, আমি যাই করি, তুমি নিজের হাত দিয়ে আমাকে স্পর্শ করবে না?

—কথা দিচ্ছি—

—এস তবে।—শীলা আমার হাত ধরে চাদরখানার উপরে এনে আগে নিজে বসল, পরে বলল, নাও বস চুপটি করে। আমি যা বলব তার অবাধ্য হবে না। আমার তিন বছরের বড় সাধ, আমার হাতে তোমার শয়নারতি হবে!

আমার শয়নারতি! অদ্ভুত বটে। এ মেয়ে ছিটবায়ুগ্রস্ত কিনা আমাকে আবার ভেবে দেখতে হচ্ছে। চন্দ্রীয় অর্থে 'লুনার', উন্মাদনার অপর নাম 'লুনাসি'। শীলাকে নিশ্চয় 'চাঁদে' পেয়েছে! তার যা কিছু বাসনা, যা কিছু অবরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা —সমস্তটা যেন এই অপ্রাকৃত জ্যোৎস্নার মত গলগলিয়ে আমাকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। তার আচরণে দেখতে পাচ্ছি, আমি এক পুতুল ছাড়া তার কাছে আর কিছু না। আমার মধ্যে যে ষড়রিপুর দল রয়েছে, আগ্নেয়গিরির প্রবল বিস্ফোরণ যে আমার মধ্যে ঘটতে পারে, আমি যে দানবের মত দাঁড়িয়ে উঠে ছারখার করে দিতে পারি আমার এই শয়নারতির কুসুমসজ্জা—এ সম্বন্ধে তার তিলমাত্র উৎকণ্ঠা দেখা যাচ্ছে

না। সে শান্ত, তার মুখে প্রসন্ন স্মিতহাস্য যেন পটে আঁকা।

—আঃ, নড়ো না বলছি—

আবার স্থির হলুম। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার শুকনো চুল উড়ছিল। তার মাথার এলো খোঁপা ভেঙে পড়েছে তার কাঁধে ও কোলে। এবার সে তার ছোট পুঁটলিটি এলিয়ে ফুল-বেলপাতা-তুলসীর সঙ্গে যে জলকণাগুলি ধরা থাকে, তাই দিয়ে সে আমার কপালের শুকনো রাঙা চন্দনকে নরম করে বেলপাতার কাঠি দিয়ে বরচন্দন আঁকল। জ্যোৎস্নায় দুজনেই আমরা উদ্ভাসিত হচ্ছিলুম।

—এটা কি খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে না, শীলা?

—আঃ, কথা বলো না! পাথরের নুড়ি কথা বললে সাজানো যায় না!

—আমি পাথর?

—পাথর না হলে তোমার সঙ্গে নৌকোয় উঠত কে?—শীলা স্বচ্ছকণ্ঠে বলল, তুমি শিব না হলে কোন্ মেয়ের সাধ্য এমন আদর করে কোলের কাছে টেনে আনে?

উত্তেজিত হয়ে বললুম, শীলা, তুমি আমাকে যা ভাবছ আমি তা নই। আমার চরিত্র মোটেই সৎ আর সাধু নয়। আমি অনেক ঘাটের জল খেয়ে বেড়িয়েছি—

—আবার কথা বলছ? একটু চুপ করে থাকতে পারো না? অনেক ঘাটের জল খেয়েছ, বেশ করেছ। গঙ্গার কাদা গঙ্গাজলেই ধুয়ে যাবে!

শীলা তার পুঁটলি থেকে বেল ও তুলসীপাতা গুছিয়ে তার সঙ্গে গোলাপ, কুন্দ ও জবা মিলিয়ে পুঁটলির ফালি দিয়ে আমার মাথা সাজাল। পরে গাঁদার মালাটা পরালো আমার গলায়। তার নিজের গলার রুদ্রাক্ষের মালাটা খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিল।

চোখ পাকিয়ে বললুম, জবা আর রক্তচন্দন শিবের পূজোয় লাগে না তা জানো?

শীলা হাসিমুখে বলল, আবার সেই অজ্ঞানের কথা! শিবের সঙ্গে শক্তি নইলে আমার পাশে তুমি কেন? তুমি যে প্রকাশ পাচ্ছ আমার মধ্যে? তখন যে আমাকে সুন্দর বলছিলে, সে তো তোমারই দীপ্তি। তোমারই আভা পড়েছে আমার ওপর। শিবপূজো আমার সার্থক।

—তোমার শিব কি রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা দিয়ে গড়া?

—হ্যাঁ, আমি তাই দিয়েই গড়েছি তোমাকে,—বছরের পর বছর দিয়ে গড়েছি! আজ সম্পূর্ণ নিখুঁত আকারে তাকে পেলুম। তুমি আমারই সৃষ্টি!

আমার কণ্ঠে আবার উত্তেজনা এল। বললুম, এগুলো আলগা এলোমেলো

কথা। শুনতে এগুলো ভালই লাগে। কিন্তু এর কোনও শাঁস নেই। আচ্ছা, বল তো শীলা, এসব ভাল ভাল কথা তুমি পেলে কোত্থেকে?

শীলা বলল, কেউ শেখায়নি, কিন্তু জীবন দিয়ে শেখা! আট বছর ধরে জেঠামশাই পিদিমের আলোর সামনে আমাকে বসিয়ে বেদ-উপনিষদ-গীতার ভাষ্য বলে যাচ্ছেন! একদিনও কি তিনি জেনেছেন যে, তাঁর ছাত্রী তাঁর একটি ব্যাখ্যাও মন দিয়ে শোনেনি?

—তাহলে?

—সেই ছাত্রীর উপবাসী মন পৃথিবীর সবখানে হাহাকার করে শুধু ঘুরেছে। শুধু কেঁদে কেঁদে ফিরেছে! জেঠামশাই কি জানতেন আমার সেই আমিকে? যে-আমি ছড়িয়ে আছি সৃষ্টি-স্থিতি-রসাতলে?—থাক্ জানতে চেয়ো না কিছু। সেই আমি যে আজ দানা বেঁধেছি তোমার মধ্যে! তুমি আমারই পুতুল গো। একই শক্তি, দুটো আধার!

—এবার আমাকে উঠতে দাও শীলা।

শীলা আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বলল, না, আরেকটু থাক। কোল জুড়ে, দেহ জুড়ে, মন জুড়ে আরেকটু থাক! কখনও যদি তোমাকে কাছে ডাকি সে-ডাক তোমার কানে উঠবে না, যদি কখনও ভাবতে বসি, তুমি জানবে না! আমাকে তাই কাঁদতে দাও একবারটি—বুক ভরে আমাকে শুধু কাঁদতে দাও!

শীলা সর্বশরীর দিয়ে আমার উপর ঝুঁকে পড়ে সত্যি সত্যি এবার ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ওরই মধ্যে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, না, না গো না—তুমি প্রিয় নয়, তুমি পূজ্য। তুমি আমার পূজোয় ধরা দিয়েছ! আমি পাথরের ডেলাকে বুকের মধ্যে ধরতে চাই, রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা চাইনে! তুমি থাক দূরে, অনেক দূরে। আমার জপের মধ্যে পাব তোমাকে, তোমাকে পাব আমার একেকটি রুদ্রাক্ষের দানায়! না, ধরো না আমাকে, ছুঁয়ো না—নিজকে অপবিত্র করো না—আমি নরকের দ্বার—তুমি কথা দিয়েছিলে—

—কিন্তু এদিকে তোমার শিবের যে দমবন্ধ হয়ে এলো!

শীলা মাথা তুলল। এবার আমি তেড়েফুঁড়ে উঠে দাঁড়ালুম। কিন্তু শীলা শান্ত, অবিচল। সে মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। ঘন জ্যোৎস্নার আলোয় দেখলুম, তার চোখের জল নেমেছে। আমার দিকে নিমীলিত চক্ষে তাকিয়ে সে ভাঙা-ভাঙা কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগল, "বেদাহমেতম্ পুরুষম্ মহান্তমাদিত্যবর্ণম্ তমসো পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাভিমৃত্যুমেতি নান্যপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়—"

আমার হাত ধরে শীলা এবার উঠে দাঁড়াল। অতঃপর আর বাধা নেই।

শয়নারতি শেষ হয়েছে। আমি তার গরম চাদরখানা তুলে ঝেড়ে তার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললুম, চলো—

চন্দ্রবরণা রাত্রি সেদিন সাঁ সাঁ করছিল। এগারোটা বেজে গেছে। সেই রাত্রে ফিরতি নৌকা যখন আমাদেরকে দশাশ্বমেধের ঘাটে এসে নামিয়ে দিল এবং আমাকে প্রবলভাবে বাধা দিয়ে শীলা তার আঁচল থেকে চারটি টাকা রামলোচনের হাতে দিল, তখন দেখলুম ওই জনশূন্য ঘাটের সিঁড়িপথে শীলার আচরণে ও আলাপে আমার জন্য আরেক বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল।

আমি আবার বলছি আমি এক অপদার্থ পুরুষ, তবু আমার মধ্যে কিছু অতৃপ্তি ছিল বইকি। শীলা যখন বলছিল, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা,—তখন আমিও ত অমৃতের পুত্র! কিন্তু অমৃতের এক পাত্র যদি মুখের সামনে এসেও দূরে সরে যায় তবে মন ক্ষুব্ধ হয় বইকি। অমৃতের পুত্র তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার কেনই বা হারাবে?

কালীতলার পাশ দিয়ে বাঙ্গালীটোলার নিশুতি গলিপথে হাঁটতে-হাঁটতে আমি বললুম, শীলা, মাত্র একদিনে আমার মন উঠল না। আবার কবে দেখা হচ্ছে বলো! কাল? পরশু? পরের দিন?

শীলা থমকিয়ে দাঁড়িয়ে সস্নেহে আমার হাত ধরল। বলল, না।

তার দিকে তাকালুম।

শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে শীলা বলল, কাল না, পরশু না—কোনদিনই না—

—তবে?

—এ জীবনেও না!

—সেকি?—আমি বললুম, এসব কি বলছ? তবে কি এসব মিথ্যে? কই, আমার পাওনা তো আমি এখনও পাইনি?

শীলা অন্ধকারে হাসল। বলল, তোমার পাওনা হল পূজো, সেই পূজো তুমি পেয়েছ! আমার পাওনা বুকভরা আনন্দ, সে আমি পেয়ে গেলুম। দেহের টান? ওটা ভয়ানক মিথ্যে! মিথ্যের পেছনে ছুটো না।—আচ্ছা, তোমাকে আর আসতে হবে না। আমি এবার একাই চলে যেতে পারব।

শীলা আমার হাত ছেড়ে চলে গেল, একবারও পিছন ফিরল না। দেবনাথ-পুরার অন্ধকার গলির বাঁকে রহস্যময়ী অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার মাথাটা পরিষ্কার হতে দিন তিনেক লেগেছিল।—

দেখতে দেখতে নবেম্বর শেষ হতে চলল, এবার ফিরতে হয় কলকাতায়।

পূজোর ঠিক আগে পর্যন্ত সাহিত্যে একপ্রকার ফসল ফলে, সেটা পূজোর পর অনেকদিন পর্যন্ত পূজা-সাহিত্য নামে চলে। মাসিক প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, সাপ্তাহিক নবশক্তি, সোনার বাংলা, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা,—এরা তো আছেই! এরা ছাড়া কাশীর 'উত্তরা', চট্টগ্রামের 'স্বাধীনতা', এখানকার 'গল্পলহরী', 'কুন্তলীন পুরস্কার ও নিরুপমা' পুরস্কারের বিশেষ দুটি সংখ্যা—এবং এদিক-ওদিক আরও কয়েকটি। এই সবগুলি বিশেষ পূজা-সংখ্যার মধ্যে 'আনন্দবাজার' ছিল সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও লোভনীয়। প্রবাসী, নবশক্তি ও আনন্দবাজার—এ তিনটিতে লেখা প্রকাশিত হওয়ার অর্থ সাহিত্যক্ষেত্রে স্বীকৃতিলাভ।

'কল্লোল-কালিকলমে'র লেখকরা অল্পকালের মধ্যেই সেই স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

যাই হোক, 'পূজাসাহিত্য' থেকে যে ফসল তুলে পকেটে পুরেছিলুম, সে প্রায় নিঃশেষ হতে চলল। এবার ডিসেম্বরে সেই লেখাগুলো একত্র করে পুস্তকাকারে ছাপাবার চেষ্টা হবে। কিন্তু ছাপছে কোন্ প্রকাশক? সমস্যা হল সেইখানে। গল্প ছাপা হয় সম্পাদকের অনুরোধে, সেখানে সকলের লেখা মিলিয়ে একখানা বিশেষ সংখ্যা সম্পূর্ণ হয়। সেখানে বহুজাতের লেখককে একই কালে পাবার একটা আকর্ষণ থাকে। থাকে কৌতুক, রঙ্গ-রস, থাকে হাসিকান্না, থাকে মজাদার সব আনন্দের খোরাক। এদের সঙ্গে থাকে ঝাল, টক, নোনতা, অম্ল, মিষ্ট, তিক্ত ও কসায়, বীর ও করুণ রস। সব মিলিয়ে একটা ওজন। পূজা-সংখ্যা অনেক সময় ওজনে কাটে।

কিন্তু ছোট গল্পের নিজস্ব ওজন কোথায়? সে যখন একক, তখন সে মূল্যহীন। সে যদি করুণ রসের হয়, তবে সে কাঁদে একান্তে—কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না! পূজোর সময় রঙ্গীন মলাটের ঘাগরা পরিয়ে সম্পাদকরা তাকে নাচের আসরে নামিয়েছিল, তার বর্ণচ্ছটায় হয়ত কিছু কিছু হাততালিও কুড়িয়েছিল। কিন্তু তারপর দর্শকরা যে যার পথে চলে গেছে। এখন সে আবার সেই ঘুঁটে-কুড়োনিতে পরিণত। আর কবিতা? কবিতা ছাপিয়ে কোন্ সম্পাদক কাগজের পৃষ্ঠা নষ্ট করবে? কবিতা মানেই ত সেই পুরনো হা-হুতাশ? তবে হ্যাঁ, ওর মধ্যে কোথাও কোথাও চিকচিক করে হয়ত জীবনানন্দ, হয়ত প্রেমেন্দ্র, হয়ত বা বুদ্ধদেবও। কিন্তু বুদ্ধদেব তখন ত জাতিচ্যুত! সে তখন একঘরে।

উপন্যাসের বাজারে শরৎচন্দ্রকে বাদ দিলে তখন 'ভারতী গোষ্ঠী'র লেখকদেরই প্রতিষ্ঠা। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র রায়, সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নারায়ণ ভট্টাচার্য, দীনেন্দ্র রায়, সুরেন ভট্টাচার্য, ফণীন্দ্র ও

যতীন্দ্র পাল। মেয়েদের মধ্যে রয়েছেন অনুরূপা, ইন্দিরা, নিরুপমা, সীতা ও শান্তা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া। সুতরাং এঁদেরকে বাদ দিয়ে উপন্যাসের বাজারে নতুন লেখকদের বাজারমূল্য কম। আমাদের মধ্যে তখন শৈলজানন্দর উপন্যাস 'ঝড়ো হাওয়া' ছাপা হয়েছে।

এই সব কথা নিয়ে যখন তোলাপাড়া করছি, কলকাতার খবর তখন ভাল ঠেকছে না। লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি জওয়াহরলালের হুঙ্কার, বিশাল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

পূর্ণ স্বাধীনতা ব্রিটিশ শাসকের হাত থেকে? সে আবার কি বস্তু? কেমন তার চেহারা? ইংরেজ থাকবে না ভারতে, সে-ভারত কি প্রকার? নেহরুর পিছনে আসল 'ডাইনামো' হলেন গান্ধীজী। তিনি সুস্থ আছেন ত? যাই হোক, এই সাংঘাতিক সিদ্ধান্তের ফলে লাহোর তাকাচ্ছে মাদ্রাজের দিকে, কলকাতা লক্ষ্য করছে বোম্বাইকে, করাচির চোখ দিল্লীর দিকে,—এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ বর্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর ও সিংহল—এরা ভাবছে নিজেদের ভবিষ্যৎ। নেপালের মনে উদ্বেগ নেই। তার প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধ শমসের জঙ বাহাদুর রাণা হলেন মহারাজা—তিনি ব্রিটেনের বশম্বদ। তাঁর হারেমে সাড়ে তিনশ 'কেটী' বা বাঁদী—যেমন আমাদের ভারতে উদয়পুর, জয়পুর ইত্যাদি মহারাজাদের হারেমের বাঁদীরা! নেপালের যিনি প্রকৃত রাজা—হিজ্ ম্যাজেস্টি—সেই ত্রিভুবনবিক্রমসিংদেব থাকেন লোকচক্ষের অন্তরালে। তাঁর নিজস্ব পূজা-পার্বণ, জপ-তপ ও হারেম!

দিল্লীতে বড়লাটের বদল হয়েছে। এখন লর্ড রেডিংয়ের বদলে লর্ড আরউইন। তিনি এসেছেন নতুন ছদ্মবেশে, তাঁর স্বভাব নাকি মৃদু, তিনি নাকি গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অর্থাৎ অধিকতর কূটনীতিজ্ঞ।

লাহোরের প্রস্তাব, কিন্তু কলকাতা চঞ্চল। কলকাতার নাড়িতে-নাড়িতে যদি রনরনি ওঠে, তবে ভারতবর্ষ স্থির থাকে না। কাশীতে বসেই কানাকানি শুনলুম, বাঙ্গলার দুটি গুপ্ত বিপ্লবী দল—যুগান্তর আর অনুশীলন—ভিতরে ভিতরে কর্মতৎপর হয়ে উঠেছে। যুক্তপ্রদেশে যারা হিন্দুস্থান রিপাবলিকান্ বিপ্লবী দল—কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার যারা আসামী—শচীন সান্যাল, যোগেশ চাটুয্যে, মন্মথ গুপ্ত, যশপাল,—এরা জেলে। আমাদের এখানকার জিতেনদার ছোট ভাই রাজেন লাহিড়ীর ফাঁসী হয়ে গেছে। বন্ধুবর শচীন বক্সি পলাতক। প্রতুল গাঙ্গুলীর খোঁজ পাইনি। ওদিকে পাঞ্জাবে সুভাষচন্দ্র হিন্দুস্থান সেবাদলকে নতুন করে গড়ে তুলেছেন।

এখানে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা যোগজীবন ঘোষ মহাশয় তাঁর বন্ধু সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে কিছুকাল থেকে আসা-যাওয়া ও গল্পগুজব করছিলেন। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে তিনি গঙ্গার ঘাটে-ঘাটে সূর্য-নিরীক্ষণ করে ফিরছেন! দেখতে দেখতে তিনি তথাকথিত ভদ্রবেশ পরিত্যাগ করলেন। গায়ের জামা, পায়ের জুতো—একে একে ছাড়লেন। তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি জঙ্গল হয়ে উঠল। সূর্যের মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তিনি উন্মাদের মতো একখানা ছোট ময়লা ছেঁড়া কাপড়ে যেখানে সেখানে ফিরছিলেন। অবশেষে একদিন দেখা গেল, বিশ্বনাথের গলির সামনে দশাশ্বমেধ রোডের কোণের এক উঁচু রোয়াকে তিনি বসে আছেন এক জটাধারী নগ্নকান্ত বিশালকায় মৌনী সাধুর পাশে। উভয়েই মৌন, উভয়েই পড়ে থাকেন ওই রোয়াকে। পরবর্তী-কালে ওই মৌনী সাধু হয়ে ওঠেন 'খিচুড়িবাবা' এবং তাঁর দেহত্যাগের পর সেখানে একটি খিচুড়িবাবার ছোট্ট মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সে মন্দির এখন সবাই দেখে যায়।

কিন্তু যোগজীবনের কথা আবার যখন তুললুম, তখন তাঁর প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করি। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। বর্মার পতন ঘটেছে। ইংরেজ পালাচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ছেড়ে জাপানের ভয়ে। রেঙ্গুন, মালয়, সিঙ্গাপুর ডুবেছে। জাপানী আতঙ্কে কলকাতা ছেড়ে প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক পালিয়েছে। কলকাতার রাজপথগুলি প্রায় শ্মশান। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বাণী পাঠিয়ে বলেছেন কোথাও পালিয়ো না, পালিয়ে গিয়ে বাঁচবে না! ঈশ্বরই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। ওদিকে গান্ধীজীর ব্রিটিশ বিরোধী 'ভারত ছাড়' আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। প্রায় পাঁচশ' পুলিসের থানা ধ্বংস করেছে হিংস্র জনসাধারণ। ইংরেজ সম্প্রদায় সাহেবটোলার ওদিকে 'নেটিভ'দের দ্বারা কথায়-কথায় লাঞ্ছিত হচ্ছে—যখন-তখন চড়চাপড় খাচ্ছে। সমস্ত ভারতে সেদিন অরাজকতা ও হানাহানি চলছে। সেটি ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ। সন্ধ্যা থেকে ব্ল্যাক-আউটের ফলে সমগ্র বাঙ্গলা দেশ, পূর্ব ভারত ও মহানগরী কলকাতা ঘোর অন্ধকার।

ওই অন্ধকারের মধ্যেই গিয়েছিলুম ঝাড়গ্রামে দিন তিনেকের জন্য। ফিরবার পথে আমার এক বন্ধু তাঁর মোটরে আমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলেন খড়্গপুর স্টেশনে। রাত তখনও একটা বাজেনি। আমার অন্ত্রেতন্ত্রে ও মস্তিষ্কে কিছু বিকার ছিল।

খড়্গপুরের সুদীর্ঘ স্টেশন ও ওয়েটিং রুম অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কলকাতার গাড়ি আসবে ঘণ্টা দুই পরে। বন্ধুবর আমাকে ওয়েটিং রুমের একখানা চেয়ারে

বসিয়ে রেখে আবার ঝাড়গ্রামে ফিরে গেল।

আমার চোখ দুটো জড়িয়ে যাচ্ছে আবিল তন্দ্রায়—মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গিয়েও আবার উঠে আসছিলুম। ভয় ছিল পাছে বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, পাছে সেই ঘুমের মধ্যে গাড়িখানা বেরিয়ে যায়। হলের এক কোণে টিমটিম করে কেরোসিনের সেজবাতি জ্বলছে।

ঠিক এমনি অবস্থায় এক প্রেতচ্ছায়ার নিঃশব্দ পদসঞ্চার ঘটল আমার ঠিক সামনে। এক কৃষ্ণকায় ছিন্নভিন্নবস্ত্র সর্বহারা ভিখারী, মাথায় ঝাঁকড়া জটাজুট। মুখখানা ঠিক দেখতে পাচ্ছিনে, কিন্তু বীভৎস ও বিকৃত। তা'র ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে দুটো শাদা চোখের তারা। লোকটা এক-এক পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে শীর্ণ একখানা হাত বাড়িয়ে ধরল।

আমি প্রায় আঁতকিয়ে উঠেছিলুম তার হাত বাড়ানো দেখে। কিন্তু তখনই আমি উঠে দাঁড়ালুম।—কে? কী চাও?

অত্যন্ত চাপা ও ভগ্ন মৃদু কণ্ঠে লোকটা বলল, চুপ—!

হঠাৎ সেই মুহূর্তে আমি যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলুম, একি যোগজীবনদা, আপনি? আপনি কোত্থেকে?

চুপ!—প্রেতকায় যোগজীবনদা বললেন, ভিক্ষে দে, চাঁদা দে!

আমি ছট্‌ফট ক'রে উঠেছিলুম প্রবল উত্তেজনায়। কিন্তু তখনই সংযত করলুম নিজকে।

রেলের টিকিটখানা রেখে পকেটে যা কিছু ছিল, যোগজীবনদাকে দিয়ে দিলুম, তিনি তেমনি নিঃশব্দে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মেদিনীপুরে তখন অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় 'সরকার' প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা বৃটিশ পুলিসের গুলীর সামনে বুক পেতে দিয়েছেন।

১৯২৯ সালের কথা বলছিলুম।—

গান্ধীজী তাঁর কম্বুকণ্ঠে ডাক দিচ্ছিলেন দেশের মেয়েমহলকে। ভারতের জনসংখ্যার আধাআধি হল মেয়ে। মেয়ে সমাজের ভিতরে ভিতরে এসে গেছে চাঞ্চল্য, এবারে তার দেশব্যাপী বিস্ফোরণ ঘটুক। সামাজিক উৎপীড়নে, শাসনের শৃঙ্খলে, কুসংস্কারের অন্ধতায়, অজ্ঞানের অশিক্ষায় এবং সতীত্ব-সংস্কারের বেড়াজালে মেয়েরা বন্দিনী। রাজনীতিক সংগ্রামকে উপলক্ষ্য করে মেয়েরা বাইরে এসে সমাজ বিপ্লবকে ডাক দিক। গান্ধীজী সংগ্রাম ও বিপ্লবকে একই সঙ্গে ধারণ করেছেন।

তাঁরই আহ্বানে দেশের বৃহত্তর নারীসমাজ তাদের গার্হস্থ্য জীবনের পঙ্গুতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এর আগে মূল মন্ত্র পাঠ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মেয়েরা তাদের 'দুর্বল লজ্জার আচ্ছাদন' ফেলে দিচ্ছিল।

বাঙ্গলায় তখন সৌম্যদর্শন ও সুভদ্রচিত্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের 'রাজত্বকাল'। দেশবন্ধুর মৃত্যুর বছর থেকেই তিনি বার বার কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদে অভিষিক্ত হচ্ছেন। দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্য দলের অবিসম্বাদী নেতা তিনি এবং তিনি বাঙ্গলার কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক। সুভাষচন্দ্র অপেক্ষা তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ এবং তিনি একান্তভাবে গান্ধীপন্থী। সকল বিষয়ে তাঁর নেতৃত্ব সর্বজনস্বীকৃত। ইংরেজ-কন্যা শ্রীমতী নেলী গ্রেকে তিনি বিবাহ করেন। সেই মহিলা স্বামীর দেশকর্মের সকল আদর্শে অনুপ্রাণিত হন্। যতীন্দ্রমোহনের ব্যক্তিত্বের প্রতি জাতির অবিচলিত সম্মানবোধ তখন যে কোনও নেতার পক্ষেই দুর্লভ ছিল। তিনি কৌটিল্যের রাজনীতি অপেক্ষা আন্তরিকতা এবং আত্মোৎসর্গে অধিকতর বিশ্বাসী ছিলেন। কৌটিল্যের প্রতীক্ ছিলেন বিদগ্ধচিত্ত ও সুরসিক কিরণশঙ্কর রায় মহাশয়।

কিন্তু এসব প্রসঙ্গ অপেক্ষা আমার কাছে তখন কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলার আকর্ষণটা কিছু বেশি ছিল। এখানে বরদা এজেন্সির দোকানে ছিল 'কালি কলম'-এর আপিস। 'কালি কলম' বন্ধ হয়ে গেছে প্রাণরসের অভাবে, এবং মুরলীধর বসু পালিয়ে বেঁচেছেন। 'বরদা এজেন্সির' গায়ে রয়েছে 'আর্য পাবলিশিং হাউস' এবং তার ম্যানেজার শশাঙ্ক চৌধুরী। 'আর্য পাবলিশিং' হল শ্রীঅরবিন্দের প্রায় সকল গ্রন্থের প্রকাশক এবং এ-দোকানের মালিক হলেন নাগবংশীয়রা।

রতিকান্ত নাগ মহাশয় তাঁর সৌজন্য ও সদ্ব্যবহারের জন্য আমাদের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধেয় ছিলেন। ম্যানেজার শশাঙ্ক সময়ে-অসময়ে কবিতা লিখত, সারা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দোকান দেখত এবং বিকাল তিনটের সময় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে চলে যেত 'বাঙ্গলার কথা' ও পরবর্তী 'বঙ্গবাণী' আপিসে। সে ওই কাগজের অন্যতম সহ-সম্পাদক। শশাঙ্ক বইয়ের দোকানেই রাত কাটাতো এবং মাস-দুই বাদ-বাদ নদীয়া জেলার মেহেরপুর সাবডিভিসনের এক গ্রামে দু'চারদিন বিশ্রাম নিয়ে ফিরে আসত। তার গ্রামের বাড়িতে পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র ইত্যাদি সবাই ছিল। শশাঙ্ক আমার বয়োজ্যেষ্ঠ। আমি নিজে জনৈক তরুণ লেখক, এবং মধ্যে মাঝে একটু-আধটু অশ্লীল ও দুর্নীতিমূলক লেখা লিখে ফেলি—সেজন্য শশাঙ্ক আমাকে প্রথম-প্রথম দু'চক্ষে দেখতে পারত না। কিন্তু কালক্রমিক ঘনিষ্ঠতার ফলে আমি ছাড়া অপর কারও সঙ্গে তার আর অন্তরঙ্গতা রইল না। আমি একপ্রকার তার সকল সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে গেলুম। তখন বুঝতে পারিনি সে আমাকে চাট্‌নি হিসাবে ব্যবহার করে মাত্র, তার অনেক দুঃসময়েও সে আমাকে ডাকে, কিন্তু তার মানস-ভোজ্য প্রস্তুত হয় অন্যত্র।

শশাঙ্কর আরেক আকর্ষণ ছিল। সংবাদপত্রে চাকরি করার ফলে কতকগুলি বিষয়ে সাংবাদিকদের 'মোহভঙ্গ' হয়। রাজনীতিতে ও সমাজ জীবনে যাঁরা প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান, যাঁদের নাম বড় বড় অক্ষরে দৈনিক কাগজে ছাপা হয়, তাঁদের চারিত্রিক, পারিবারিক, নৈতিক ও সামাজিক বহু ক্রটির সংবাদ কোনও কাগজে প্রকাশিত হয় না। কিন্তু শশাঙ্কর স্মৃতিশক্তি সেগুলিকে সযত্নে সংগ্রহ করে রাখে। কর্পোরেশনের ভিতরকার কেচ্ছা, 'বিগ-ফাইভ' ও কংগ্রেসের ভিতর মহলের কানাকানি, বিশ্ববিদ্যালয় বার-লাইব্রেরী ব্যারিস্টার মহল এবং নামজাদা নেতাদের বিভিন্ন গোপনীয় সংবাদ—শশাঙ্কর কাছেই পাওয়া যেত। আমরা বলতুম 'আসল' খবরের মালিক হল শশাঙ্ক।

বৃহস্পতিবারে থাকত শশাঙ্কর ছুটি। ওর ওই ছুটিকে কেন্দ্র করে দুপুর ও বিকালের দিক থেকে 'আর্য পাবলিশিং হাউসে' ঢালাও আড্ডা বসে যেত। সেই আড্ডায় আসতেন প্রমথ চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, নলিনীকান্ত সরকার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক মহেন্দ্র সরকার, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। নবীন কালের প্রায় সবাই। নজরুল, শৈলজা, অচিন্ত্য, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, পবিত্র গাঙ্গুলি, বিবেকানন্দ মুখুজ্যে, 'উত্তরা' মাসিক পত্রের সুরেশ চক্রবর্তী, বঙ্গবাণীর গিরিজা, কবি জসীমউদ্দীন, আবদুল কাদের, সরোজ রায় চৌধুরী, বিনয়েন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ সেন, বিজয় দাশগুপ্ত, বিজন সেনগুপ্ত, জানকীজীবন ঘোষ, সত্যেন বসু,

নীহাররঞ্জন রায় এবং আরও অনেকে। হাসি আর গল্পের হাট বসত। যত কেচ্ছা, যত অবাস্তব কাহিনী, যত রকমের তামাসা-পরিহাস, যত উড়ো গল্প, যেখানে যত আছে গোপনীয় চারিত্রিক সংবাদ—কোনটাই বাদ পড়ত না। ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন রূপক, শরৎ চাটুয্যের নৈতিক চরিত্র, নজরুল ও নৃপেনের সর্বশেষ রোমান্স অভিযান, শিশির ভাদুড়ির মদ্যপান, দিলীপ রায়ের সন্ন্যাস সজ্জা এবং তার ফলে মহিলা সমাজের উচাটন, সুভাষচন্দ্রের গাম্ভীর্য ও ব্রহ্মচর্য, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মারকুট্টেপনা—সবগুলো চলত একসঙ্গে। ওর মধ্যে ফোড়ন ছিল তরুণ সাহিত্যের। কে কি লিখল, কার কোথায় গল্প বা কবিতা বেরোল, 'শনিবারের চিঠি'র 'মণিমুক্তা'য় কার কার লেখার অশ্লীল টুকরো তুলে ধরা হল, কার কি বই এখন ছাপা হচ্ছে, এসবও আলোচ্য বিষয় ছিল। প্রমথ চৌধুরী মশায় এলে আমরা চুপ হয়ে যেতুম। তিনি ল' কলেজে অধ্যাপনা সেরে আর্য পাবলিশিংয়ে ঘণ্টা-দুই কাটিয়ে বাড়ি ফিরতেন। সুরেশ মজুমদার মশায় আসতেন আনন্দবাজার পত্রিকায় আর্য পাবলিশিংয়ের বিজ্ঞাপন ছাপার ব্যাপারে টাকা সংগ্রহ করতে। কপালের ঘাম মুছে গল্পগুজব করে একটু ধূমপান সেরে নিয়ে তিনি উঠে পড়তেন। তখন তাঁর আপিস ছিল মির্জাপুর স্ট্রীটে। তাঁর সঙ্গে তখন থেকে আমার আলাপ।

হঠাৎ একদা ছেদ পড়ল আমাদের আড্ডাবাজিতে। আর্য পাবলিশিংয়ে এসে উঠলেন এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীবিজয় নাগ, রতিকান্ত নাগের কনিষ্ঠ সহোদর। সৌম্যদর্শন পুরুষ, গম্ভীর, সামান্য একটু দাড়ি আছে, গায়ে খাটো জামার উপরে উত্তরীয়, রাশভারি মানুষ। তিনি এই দোকানেরই ভিতর দিকে এক কোণে বসবাস করবেন এইটি স্থির হয়ে গেছে। এ-ব্যক্তি একদা মুরারিপুকুর বোমা তৈরির আড্ডায় বারীন ঘোষের সঙ্গে পুলিসে ধরা পড়েন। অতঃপর শ্রীঅরবিন্দ যখন ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা ত্যাগ করে পণ্ডিচেরী চলে যান তখন তাঁর সঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন এই বিজয় নাগ মহাশয়। কিন্তু ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যখন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আশ্রম ভবনের মধ্যেই নিঃসঙ্গ বাস শুরু করেন, তখন থেকেই কারও কারও মনে বিক্ষোভ দেখা দেয়। সম্ভবত সেই বিক্ষোভেই বিজয়-বাবু পণ্ডিচেরী ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। যিনি প্রকৃত ধ্যানী তাঁর কাছে পণ্ডিচেরীর আশ্রম আর কোলাহলমুখর কলেজ স্ট্রীট মার্কেট একই কথা। নাগ মহাশয় তাঁর তপস্যার জন্য দোকানঘরের পশ্চিম অংশের নিভৃত কোণ বেছে নিলেন, এবং এই দোকানের ভিতরে কোনও বাজে গল্প, আড্ডা, বিশ্রম্ভালাপ বা চা-খাওয়াখাওয়ি না হয়—তার জন্য একটির পর একটি অনুশাসন লিখিতভাবে প্রবর্তন করলেন। বইয়ের ওই দোকানকে তিনি ধূপ, ধুনো, ফুলচন্দন ও পূজার

আয়োজনে সাজিয়ে একপ্রকার মন্দির বানিয়ে তুললেন। আমরা অবাক বিস্ময়ে তাকালুম।

গ্রাজুয়েট শশাঙ্ক তাঁর বেতনভোগী কর্মচারী। বিজয়বাবুর সম্পর্কে সকল সংবাদ শশাঙ্কই বলে। সেই শশাঙ্কর বন্ধুবান্ধব আমরা, অর্থাৎ আমরা তাঁর কর্মচারীর সঙ্গী। কতটুকু দাম আমাদের? কী বা আমাদের পরিচয়? তাঁর অনুশাসনগুলি ছিল এইরূপ: ভিতরে বসিয়া ধূমপান বা চা-পান করিবেন না। বাজে গল্প বা অনাবশ্যক আলাপচারিতে বিরত থাকিবেন। নিঃশব্দে আসিয়া কাজ সারিয়া চলিয়া যাইবেন। গলার আওয়াজ করিবেন না।

একদিন সন্ধ্যায় তিনি প্রমথ চৌধুরী মশায়ের মুখের ওপরেই বললেন, দয়া করে আপনি বারান্দায় বসে সিগারেট খান গে!

ভদ্রলোকের এই প্রকার নির্দেশে সমগ্র বন্ধু সমাজ সেদিন বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু বেশি দিন নয়, বোধ হয় কয়েক মাস মাত্র। শশাঙ্কই খবর দিল, বিজয় নাগ মশায়ের মৃত্যু ঘটেছে।

শ্রীঅরবিন্দের যৌগিক পরিবেশ বোধ করি কারও কারও ধাতে সয় না। বিশেষ বিশেষ পাত্রে যদি তাঁর দৈবজীবনের স্পর্শসঞ্চার ঘটে, তবে সেই পাত্র সম্ভবত বিস্ফোরণের হাত থেকে রক্ষা পায় না! অতঃপর আর্য পাবলিশিং হাউসের ঘরে দ্বিতীয় বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। কিছু দিন পরে যেদিন ওই দোকানে গিয়ে দাঁড়ালুম, দেখি এক কৃশকায় প্রবীণ ব্যক্তি। চোখে চশমা, তামাটে গায়ের রং, মেয়েদের মতো বড় বড় চুল পিছন দিকে পিঠ পর্যন্ত আঁচড়িয়ে ঝোলানো, গায়ে মটকার পাঞ্জাবি, মুখে মোটা গোঁফ ও দাড়ি কামানো, পায়ে একজোড়া খড়ম। শশাঙ্ক আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। চেয়ে দেখি আমার সামনে বসে রয়েছেন আমার আবাল্যের স্বপ্ন, বিপ্লবী যুগের অগ্নিঋষি বারীন ঘোষ!

আমি স্তব্ধ, নিমেষনিহত, হতবুদ্ধি!

কিন্তু আমার আচ্ছন্ন অবস্থাটা কেটে গেল হাস্যালাপী বারীন ঘোষেরই সাদর ও সস্নেহ অভ্যর্থনায়। আমার কিছু কিছু রচনার সঙ্গে তিনি পরিচিত। আমি সাহিত্য ছাড়া অন্য কাজ কি করি, কোথায় থাকি, সাংসারিক দায়ধাক্কা কতটা—এগুলি সব অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো তিনি জেনে নিচ্ছিলেন। প্রথম লক্ষ্য করলুম তিনি নিরভিমান, তাঁর কথাবার্তার পরিবেশের মধ্যে তাঁর প্রাচীন কীর্তি-কলাপের দরুন তিলমাত্র আত্মাভিমান প্রকাশ পাচ্ছে না। মুরারিপুকুরের বোমার আড্ডা, ক্ষুদিরামের ফাঁসি, প্রফুল্ল চাকীর আত্মনাশ, দেওঘরের নিকট

দিঘেরিয়া পাহাড়ের বনমধ্যে বোমা তৈরির কারখানা, মোজাফরপুরের ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার ষড়যন্ত্র, আলীপুর বোমার মামলা, ফাঁসির আসামী বারীন ঘোষ, বিলাতের পার্লামেণ্টের বিতর্কিত বারীন ঘোষ, আন্দামান সেলুলর জেলের দ্বীপান্তরিত বারীন ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্করের অন্তরঙ্গ বারীন ঘোষ, ভারতের হিংস্র বিপ্লববাদের মন্ত্রগুরু বারীন ঘোষ, ঝড়ঝঞ্ঝাময় ইংলিশ চ্যানেল সমুদ্রে জাহাজের ক্যাবিনে জীবন-মৃত্যুর দোলার মধ্যে উন্মাদিনী স্বর্ণলতার প্রসব বেদনা ওঠে যাঁর জন্মকালে, সেই বারীন ঘোষ—এবং যিনি পৃথিবীর অধ্যাত্ম ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোগীপুরুষ, সেই শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর বারীন ঘোষ! আমি জানিনে সেদিন অদৃশ্য কোন্ ভাগ্যনিয়ন্তার ইশারায় আমার সঙ্গে বারীনদার আত্মিক বন্ধনীতে গ্রন্থির পর গ্রন্থি যুক্ত হয়ে গেল! আধ-ঘণ্টাখানেক আলাপ করার পর এই বিশ্বাস নিয়ে সেদিন ফিরে গেলুম যে, আমার বর্তমান জীবনে বারীনদা ছাড়া অপর কোনও শুভানুধ্যায়ীই নেই! অর্থাৎ আমার মরণলোভী নৌকা কূলে আর ভিড়ল না, এবার থেকে আবার সেই নৌকা অকূলের দিকেই ভেসে চলল।

অগ্নির স্পর্শে ছাইও যেমন রাঙ্গা হয়ে ওঠে তেমনি আমিও রাঙ্গা হয়ে উঠলুম দিন দিন। বারীনদা আমার আপাদমস্তক তাকিয়ে বললেন, তুমি ডাকাত দলের সর্দার হলে মানিয়ে যেত। তুমি লেখক হলে কেমন করে? তোমাকে দেখলে ভয় করে।

আমিও হাসলুম, বারীনদা, আপনার মতন 'তালপাত সিংকে' মাথায় তুলে নাচব, তাই আমার এই ডাকাবুকো চেহারা! ১৯০৫-এ আপনার অগ্নিবিপ্লব কালেই আমার জন্ম। বিপ্লব আমি সঙ্গেই এনেছি!

আত্মায়-আত্মায় আমাদের মিল ঘটেছিল।

কিন্তু আমার প্রকৃতিগত নিত্য অস্থিরতা আমার মধ্যে কথায় কথায় আনত আত্মতাড়না। তখন বন্ধুবান্ধব, সাহিত্যকর্ম, কলকাতার পরিবেশ, ব্যক্তিগত অভাব-অনটন, পারিপার্শ্বিক কর্তব্যচিন্তা—সব তুচ্ছ। তখন আমি একক, তখন নিজের উপর আমার প্রভুত্ব। আমি তখন সম্রাট। তখন আমার টান বৃহত্তর দেশের দিকে। বিভিন্ন প্রদেশ, বিভিন্ন সমাজ, বিভিন্ন ভাষাভাষী ও সম্প্রদায়, এরা আমাকে টানত। তখন আমার জুড়ি কেউ নেই, একজন লেখকও না—কেননা তাদের কারো কারো দৌড় কাশী পর্যন্তই। তারা বাঙ্গালী হয়ে বাইরে যায়, বাঙ্গালীর মধ্যে ঘোরে, বাঙ্গালী হয়ে ফিরে আসে। আমি দৈবাৎ বাঙ্গালী, কিন্তু আমি সর্বভারতীয়। আমার ভিতর থেকে তখন প্রায় সকল প্রদেশের স্মৃতি

উচ্ছ্বসিত হতে থাকে একে একে। রাজস্থানে, গুর্জরে, পাঞ্জাব সীমান্তে, কাশ্মীরে, মহারাষ্ট্রে, মহীশূরে, তামিলে আর ওড়িশায়। উত্তরপ্রদেশের সবখানে, শহরে ও গ্রামে, আমার মন ঘুরে বেড়ায়।

আমার সকল কর্মনাশা কৌতূহল এবারও আমাকে স্থির থাকতে দিল না। এলাহাবাদের ত্রিবেণীসঙ্গমে মহাকুম্ভের মেলা বসছে ছত্রিশ বছর পরে। সেদিন বাড়ি ফিরে মাকে বললুম, মা চলো, তোমার সঙ্গে মহাকুম্ভমেলা দেখে আসি।

মায়ের সঙ্গে বোম্বাই মেলের থার্ড ক্লাসে উঠেছিলুম—

কুম্ভমেলার যাত্রী এবার অনেক। ভিড় হয়েছিল ট্রেনে। মাকে যা হোক করে বসিয়েছি, আমি জায়গা পাচ্ছিলুম না। এমন সময় চোখ পড়ল একটি যুবকের প্রতি। শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী ভাল, আমার চেয়ে কিছু বড়ই হবে। সে পান খাচ্ছিল। আমাকে সে হাতছানি দিয়ে ডাকল। দু'খানা বেঞ্চি পেরিয়ে আমি তার কাছে গেলুম। সে তার পাশে আমার বসবার জায়গা করে দিয়ে বলল, 'ভাইব্রেশন!'

—ভাইব্রেশন? সে আবার কি?

উনি বললেন, বুঝলেন না? একই কাঁপন দু'জনের মধ্যে! একজনের দরকার আরেকজনকে! বন্ধুত্বের ভাইব্রেশন।

সুতরাং বন্ধুত্ব হতে দেরি লাগেনি। বন্ধুর নাম শঙ্কর দত্ত, সে জুয়েলারি বিক্রি করে। হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে তার পাশে আমাকে বসিয়ে শঙ্কর প্রথম 'আপনি' বলে সম্ভাষণ করেছিল, মধ্যরাত্রে গয়া স্টেশনে 'তুমি', মোগলসরাইতে প্রত্যূষে চা-খাবার সময় বলল 'তুই' এবং সকাল আটটার পর এলাহাবাদ স্টেশনে গাড়ি এসে থামতেই সে আমার মাথায় চাঁটা দিয়ে বলল, তুই আগে নাম···মা আছেন সঙ্গে।

শঙ্কর মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, আমার মা নেই, প্রয়াগে এসে মাকে ফিরে পেলুম!

মা হাসিমুখে শঙ্করকে আশীর্বাদ করলেন।

আমি তখন পর্যন্ত আমার জীবনে এ ধরনের বিশাল জনসমারোহ দেখিনি। সেটি মাঘী অমাবস্যা তিথি। ১৯৩০ সালের জানুয়ারী। শুনেছিলুম সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে নব্বই লক্ষ নরনারী যোগ দিয়েছিল সেদিন এই মেলায়। তাদের মধ্যে ষাট হাজার ছিল সন্ন্যাসী। নাগা সন্ন্যাসী ছিল পনেরো হাজার এবং নগ্নকায়া ভস্ম-মাখা মেয়ে-নাগা ছিল কম-বেশি দু' হাজার। এরা এসেছিল

হাতীতে, উটের পিঠে, ঘোড়ায় ও সুসজ্জিত বৃষবাহনে। সেদিন সেই জটাজূট-ধারিণী বিভূতিভূষণা শত শত উলঙ্গ রমণী যখন মহাসমারোহে ত্রিবেণীসঙ্গমের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন সম্ভবত স্বর্গবাসিনী অপ্সরাদের কপোল পর্যন্ত ঈর্ষা ও লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল।

সেদিন ওই ত্রিবেণীর ক্রোড়ভূমিতে নব্বই লক্ষ জনতার ঠিক মাথার উপর পাঁচ বর্গমাইলব্যাপী একটি ধূলাবালির চন্দ্রাতপ আকাশকে ঢেকে বর্ষার মেঘের মতো স্থির হয়েছিল। কিন্তু এবারের এই কুম্ভমেলার কাহিনী আমি বহুকাল আগে লিখেছি। এখানে তার পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।

পুণ্যপ্রয়াগে স্নান সেরে মাকে নিয়ে শহরের এক বাঙ্গালী হোটেল-বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলুম। ঘরের পাশে ছিল একটি ছোট শিবমন্দির। মন্দিরের ঠিক দরজার সামনে একটি ক্ষুদ্রাকার 'নন্দী'। এই দেখে মা এখানে হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করতে রাজি হলেন। আমরা তার যোগাড় করে দিয়ে একটু গায়ে হাওয়া লাগাবার জন্য স্টেশনের দিকে পায়ে পায়ে এসে পড়লুম।

হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে নরনারী—সব সমাজের, সব প্রদেশের। ওই ভিড়ের মধ্যেই এক স্থলে দেখতে পেলুম চেঁচামেচি আর কান্নাকাটি। একটি বাঙ্গালী দলের সমস্ত মালপত্র মাথায় নিয়ে জনতিনেক কুলি কোথায় অদৃশ্য হয়েছে, তাদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। একজন বৃদ্ধ ও তাঁর স্ত্রী, দুইজন প্রবীণা সধবা, একজন বর্ষীয়সী বিধবা এবং—সর্বপ্রথম যাঁর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল তিনি গেরুয়াবসন পরিহিতা সুশ্রী এক তরুণী। সন্দেহ নেই, উনি যৌবনেই যোগিনী। আমাদের কাছে ওই ছয় জনের দলটি করুণ আবেদন জানিয়ে সাহায্য ভিক্ষা চাইল। তাঁরা এখানে ঘণ্টা-তিনেক ধরে নিরুপায় অবস্থায় বসে রয়েছেন। তাঁদের টাকাকড়ি, কাপড়চোপড়, বিছানা কম্বল, বাসনপত্র—সমস্ত নিয়ে কুলিরা গা ঢাকা দিয়েছে। তাঁরা এখন সর্বস্বান্ত।

ওঁদের মধ্যে প্রবীণা বিধবা যিনি, তাঁর নাম হেমন্ত-মা, তিনিই উদ্যোগী হয়ে কথাবার্তা বলছিলেন। তরুণী সন্ন্যাসিনী কিছু কৃশকায়, ছিপছিপে। তাঁর মাথার চুলের রাশি পিছন দিকে বব-করা, গলায় রুদ্রাক্ষ ও তুলসীর মালা, চোখদুটি ভাবপ্রসন্ন। হেমন্ত-মা বললেন, উনি হলেন চিন্ময়ী ব্রহ্মচারিণী! দু' বছর ধরে হিমালয়ে যোগসাধনা করে ফিরে এসে উনি জামতাড়ায় আশ্রম নির্মাণ করেছেন। আমরা সকলে ওঁরই শিষ্যসেবক, বাবা।

শঙ্কর অনুপ্রাণিত হয়েছিল। সে বলল, আমাদেরও মা আছেন সঙ্গে।

আপনারা চলুন সেখানে। আমরা যা হয় কিছু করব।

ওই দলটিকে নিয়ে সেদিন মায়ের কাছে এনেছিলুম। ভিতর মহলের দর-দালানে ওঁরা আশ্রয় নিলেন। শঙ্কর হল ধনবান, তাকে কিছু বলার আগেই সে বাজারের দিকে ছুটল এবং ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে সে বিছানাপত্র, কাপড়চোপড়, শতরঞ্চি, বালিশ ও প্রচুর কাঁচা ও পাকা খাদ্যসামগ্রী এনে একেবারে ভাসিয়ে দিল। ওঁরা কোনও পথঘাট চেনেন না। সুতরাং আমাকে সঙ্গে নিয়ে ওঁরা চললেন সঙ্গম স্নানে। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি সর্বস্ব খুইয়ে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি এবং অপর এক সধবা মহিলা আমার মায়ের কাছাকাছি রইলেন। আমি ওঁদের নিয়ে সঙ্গমের দিকে চললুম।

হাজার হাজার নৌকার ভিড়ের ভিতরে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মিল ঘটেছে কোথায় সেটি জানা দুঃসাধ্য। সুতরাং মাঝিমাল্লার সাহায্যে প্রতিবার নৌকা ফাঁক করে কোনমতে ডুব দিয়ে উঠে আসা। হেমন্ত-মা চিন্ময়ীর সম্পর্কে সতর্ক। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন ব্রহ্মচারিণীকে স্নান করিয়ে আনতে।

সন্ন্যাসিনীর কোনও ওজন নেই, কিন্তু প্রাণভয় রয়েছে সম্পূর্ণ। দুই নৌকার মাঝখানে কত জল, কেউই জানিনে। সুতরাং আমি তাঁর দুখানা হাত ধরে ঝুলিয়ে জলের মধ্যে চুবিয়ে দিলুম। তিনি একখানা হাত ছাড়িয়ে নিলেন, নইলে লজ্জা নিবারণ করা যায় না। পর-পর তিনটে ডুব দিয়ে তিনি থামলেন। আবার তাঁকে দু হাত ধ'রে তুলে নিয়ে আমি নৌকার উপরে দাঁড় করিয়ে দিলুম। পলকের মধ্যে চোখে পড়ল, যেন মাসিক বসুমতীতে ছাপা হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের তিনরঙা সিক্ত-বস্ত্রার ছবি !

সকলকে নিয়ে আবার ফিরে এলুম বাসায়। জহুরী শঙ্কর বহু টাকাকড়ি খরচ করেছিল ওঁদের জন্য। ত্রিরাত্রি বাসের পর বিদায় নেবার কালে শঙ্কর ওদের সকল প্রকার খরচপত্র বহন করেছিল।

কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। হেমন্ত-মা তাঁদের আশ্রমের প্রচারকার্যের জন্য বহুদিন অবধি আমার বাসস্থানে আনাগোনা করেছিলেন। তাঁর সবিশেষ অনুরোধে আমি জামতাড়ায় গিয়ে পশ্চিমের প্রান্তর পেরিয়ে একদা চিন্ময়ী ব্রহ্মচারিণীর আশ্রমে পৌছেছিলুম। সেখানে দেখেছিলুম এক-এক ঘরে মৃৎ-প্রতিমার পূজা চলছে। আশ্রমিক গৃহস্থরা রয়েছে আশেপাশে দু'চারটি ঘরে। হেমন্ত-মা ছিলেন সকল কর্মে। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় দিন দুই ধরে এই তপস্বিনীকে পর্যবেক্ষণ করেছিলুম। বলা বাহুল্য, তরুণী ব্রহ্মচারিণীর আতিথেয়তা ও পরিচর্যা আমার পক্ষে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

এর পর 'উত্তরা' মাসিকপত্রের পরিচালক এবং আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুরেশ চক্রবর্তীর ফরমাস আমাকে খাটতেই হবে, কথা দিয়ে রেখেছি। 'উত্তরা' হল প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও প্রবাসী বাঙ্গালীদের মুখপত্র। তখন কবি ও ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় 'উত্তরা'র সম্পাদক, সুরেশ তা'র কর্মকর্তা,—সর্বপ্রকার দায়িত্বই সুরেশের। কিন্তু তৎকালীন সকল খ্যাতিমান লেখকই সুরেশের হাতধরা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়—এবং কে নয়? আমরা তখন কতটুকু সুরেশের কাছে? কেউ আমরা তার বিচারে তখনও পাকাপাকি লেখক হয়ে উঠিনি। কাশী শহরে সে সর্বদা ব্যস্ত, কর্মচঞ্চল। সেইজন্য বন্ধুসমাজে 'চটপটি' নামে সে পরিচিত। সে নিজের হাতে বাজার করে, শ্রেষ্ঠ সামগ্রীসহ মধ্যাহ্নভোজনে বসে, তাঁর বাড়িতে এক রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী এবং অতুলপ্রসাদ ছাড়া লেখকমাত্রই আতিথ্য নেয়। সম্প্রতি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী কাশী আসছেন, সুরেশের ওখানেই উঠবেন। সুরেশ টাকা আনতে যায় উত্তর-পশ্চিম লক্ষ্ণৌতে গিয়ে এবং বিজ্ঞাপন ইত্যাদি আনতে যায় দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতায়। ওই সঙ্গেই নিয়ে আসে রবীন্দ্রনাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে দু'একটি কবিতা। অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ 'উত্তরা'র জন্য ছবি এঁকে দেন। সুরেশ অনেক উচ্চ চূড়ায় বাস করে। সে সুনাম-দুর্নামের অতীত। তাকে নিয়ে হাসি-পরিহাস করো, সেও তা'তে যোগ দেবে। সুরেশকে নিয়ে আরেকখানা অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত লেখা চলে।

সুরেশ আমাকে 'উত্তরা'র ক্যানভাসার নিযুক্ত করল। কথা রইল আমি উত্তর-বিহারে সব অঞ্চল ঘুরে 'উত্তরা'র বার্ষিক গ্রাহক সংগ্রহ করব। 'উত্তরা'র বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা। প্রতি সাড়ে তিন টাকায় আমি পাব চৌদ্দ আনা। ট্রেন ভাড়া ও ভাতা দেবে সুরেশ। আমার পক্ষে 'ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে।'

শ্রমের মর্যাদা হল আমার মন্ত্র। নিজের জুতো সেলাইতে অনেকটা আমি রপ্ত। রান্নাবান্না জানি। ঝাড়ুদারের কাজ আনন্দদায়ক। নৌকা চালনায় আমি বেশ পটু। ধোপার ইস্তিরি সবাই জানে। ইণ্ডিয়ান প্রেসের কল্যাণে ছাপাখানায় হরফ বেশ সাজাতে পারি। সাপ্তাহিক কাগজ 'বিচিত্রা' একদা নিজেই ফিরি ক'রে বেড়িয়েছি। সুতরাং 'উত্তরা'র ক্যান্‌ভাসার হতে আমার তিলমাত্র সঙ্কোচ নেই।

ছোট রেলপথে কাশী থেকে বেরিয়ে পড়েছিলুম। ছাপরা টাউন থেকে

আরম্ভ। আমি রথ দেখছি এবং কলা বেচছি। আমার কাজ শিক্ষিত বাঙ্গালী মহলকে এক-এক স্থলে খুঁজে বার করা এবং সাড়ে তিনটি টাকা বাগিয়ে নেওয়া! একে-একে মোজাফরপুর, সমস্তিপুর, বরৌনি, লাহেরিয়া সরাই, দ্বারভাঙ্গা, সহর্ষ,—আমার শ্রান্তি-ক্লান্তি নেই। আমার আনন্দ ভ্রমণের। ধরেছিলুম সেই সারণ আর চম্পারণ দুই জেলা থেকে, শেষ করলুম পূর্ণিয়া কাটিহার ও কিষণগঞ্জ হয়ে ভাগলপুর। লাভের মধ্যে হয়েছিল এই, পূর্ণিয়াতে গিয়ে দাদামশায় ওরফে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে আতিথ্য নিয়েছিলুম। পরিহাস-সাহিত্যে তখন দাদামশায়ের খুব নাম। ভারতবর্ষ ও বসুমতী মাসিকপত্রে তাঁর ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হচ্ছিল। তিনি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র।

ভাগলপুরে উঠেছিলুম আমার পিসিমার বাড়িতে। তিনি জজের স্ত্রী। জজ মারা গেছেন। শূন্য অক্ষরটার বাঁ দিকে "১" থাকলে তবে দশ হয়। ওই "১"টি সরে গেলে থাকে শুধু শূন্য। সুতরাং এ বাড়ির সব পরিচয় হারিয়ে গেছে। কেবল পিসতুতো দাদা এখন মুন্সেফ মাত্র। যাই হোক পিসিমার ওখানে দিন তিনেক কাটিয়ে প্রায় মাসখানেক পরে যখন কাশীতে এসে নামলুম, সুরেশ আমার কাছ থেকে কাজের তালিকা ও অর্থাদির নির্ভুল হিসাব পেয়ে অভিনন্দন জানালো। আমি 'উত্তরা'র কমবেশি আড়াইশ গ্রাহক সংগ্রহ করেছিলুম। যাই হোক, সে যাত্রায় পিসিমা যেন আমাকে দেখার জন্যই বেঁচেছিলেন। এর পর মাস-দুয়েকের মধ্যেই তিনি মারা যান।

কলকাতায় ফিরে শুনলুম বারীনদা আমার খোঁজ করছেন। তিনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পণ্ডিচেরীর আশ্রম ত্যাগ করে কলকাতায় এসেছেন। অজ্ঞাত-বাসের কালে ক্ষত্রিয়ের বাহু অনেককাল অবধি নিষ্ক্রিয় ছিল, এবার তিনি পুনরায় রাজনীতিতে নামবেন। পুরনো বিপ্লবীদের সঙ্গে একে একে তাঁর দেখা হচ্ছিল। হেম ঘোষ, মধু ঘোষ, উপেন বাঁড়ুয্যে, অমর চাটুয্যে, উল্লাসকর দত্ত, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি অনেকের সঙ্গেই তাঁর দেখাশুনো হচ্ছে। শরৎ বসু, বিধান রায়, সুভাষ বসু—এদের সঙ্গে বারীনদার প্রায়ই কথাবার্তা চলছে। এর মধ্যে মেয়র ও বাঙ্গালা কংগ্রেসের অধিনায়ক যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। বারীন ঘোষ সর্বত্র শ্রদ্ধেয় এবং সম্মানিত। পরম্পরায় শুনলুম বাঙ্গলার গভর্নর ও চীফ সেক্রেটারি তাঁর গতিবিধি এবং ক্রিয়াকলাপের খবর রাখছেন। এর কারণ ছিল। বাঙ্গলার বিপ্লবীদের বিভিন্ন গোপন

কর্মতৎপরতার খবর বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যখন সংগ্রহ করছিলেন, ঠিক সেই সময় অগ্নিযুগের নেতা বারীন ঘোষ হঠাৎ কলকাতায় আবির্ভূত হয়েছেন, এটি কর্তৃপক্ষ ভাল চোখে দেখেননি, এবং সেজন্য তাঁরা গোয়েন্দা বিভাগকে সচেতন ক'রে দিয়েছেন। তৎকালে নলিনী মজুমদার ছিলেন গোয়েন্দা বিভাগের অধিকর্তা। তাঁর প্রধান দপ্তর ইলিসিয়ম রো-তে। তাঁর নামে বাঘে গরুতে একসঙ্গে জল খেত। তখন কলকাতা নগরীর "রাজচক্রবর্তী" ছিলেন পুলিস কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট। বালাসোরে বুড়ি-বালমের তীরে বাঘা যতীন মুখার্জি ও তাঁর দলবলের সঙ্গে টেগার্টের পুলিস দলের যে ঐতিহাসিক সংঘর্ষ হয়, তার থেকেই টেগার্টের খ্যাতি রটে। টেগার্ট ছিলেন দুর্ধর্ষ ও অপরাজেয়।

বারীনদার সঙ্গে আমি দেখা করলুম। এই নিরভিমান দেশবরেণ্য ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গেলে ছাড়পত্র লাগে না, সুপারিশের প্রয়োজন হয় না, তিনি সর্বাপেক্ষা সহজলভ্য। আমাকে দেখেই তিনি উল্লসিত হাসি হাসলেন—উপোস করতে পারবে?

বললুম, উপোস করাই ত লেখকদের নিয়তি। বলুন, কি করতে হবে!

কাগজ বার করছি, এবার কোমর বাঁধো।

আমি হাসলুম। বললুম, কী কাগজ? কী নাম হচ্ছে?

বারীনদা বললেন, সেই আগেকার নাম, সাপ্তাহিক 'বিজলী'।

আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলুম।

অতঃপর 'বিজলী'র প্রস্তুতিপর্ব আরম্ভ হয়ে গেল। ১৯২০ সালের সেই 'বিজলী'র মৃত্যুর পর বছর পাঁচেকের মধ্যে দ্বিতীয় বার 'বিজলী' বেরোয় প্রধানত সাহিত্যপত্র হিসাবে। তার যৌথ সম্পাদক ছিলেন সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও সুবোধ রায়। সেই কাগজে আমি 'মাধুরী দেবী'—এই ছদ্মনামে প্রবন্ধ লিখতুম। এবার তৃতীয় পর্যায়ের 'বিজলী' আবার বেরোচ্ছে ১৯৩০ সালে। দশ বছর আগে গান্ধীর অহিংসাবাদ দেশে দানা বাঁধেনি, তাই সেই প্রথম 'বিজলী'র মারফৎ আন্দামান প্রত্যাগত বিপ্লবী দলের নেতাদের মুখে গান্ধী-বিরোধী বক্রোক্তি ও পরিহাস পাঠক সমাজ ও দেশবাসী উপভোগ করেছিল। কিন্তু আজ ১৯৩০-এ? পুরনো দিনের অহিংস আন্দোলন ফেল্ মেরেছে! স্বরাজ্য পার্টির শেষ পরিণাম জুৎসই হচ্ছে না! দেশবন্ধু পরলোকগত, মোতিলাল নেহরু অসুস্থ, গান্ধীজী সাস্থন্ হাসপাতালে চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে 'হরিজন' সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি স্বীকারোক্তি করেছেন, তাঁর হিমালয়ান্ ব্লাণ্ডার! ভারতবাসীর মনে তাঁর সম্বন্ধে নূতনতর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়েছে।

এমন সময় হুম্ ক'রে একটা আওয়াজ হল ডালহাউসী স্কোয়ারে! মোটরবিহারী টেগার্টকে বোমার আঘাতে মারতে গিয়েছিল দীনেশ মজুমদার। চারদিকে হইচই, ধোঁয়ায় সব অন্ধকার। ছুটোছুটি প'ড়ে গেল লালদীঘির সর্বত্র। কিন্তু সেখান থেকে অদৃশ্য হল দু'জন—টেগার্ট সাহেব ও দীনেশ। দীনেশের সহকারী অনুজা সেন ওইখানেই আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

আরেকবার প্রচণ্ড আওয়াজ হল চৌরঙ্গীতে। টেগার্ট বলে যাকে মনে হয়েছিল সেই ব্যক্তির নাম আর্নেস্ট ডে। টেগার্টের কপালে অপমৃত্যু নেই। ধরা পড়ে গেল গোপীনাথ সাহা। অল্পকালের মধ্যে তার ফাঁসি হয়ে গেল। ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের মতো বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কলকাতায় ধরপাকড় আরম্ভ ক'রে দিল এবং অসংখ্য ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে ইলিসিয়ম্ রো-র কক্ষে কক্ষে তাদের দেহের উপর নরখাদকের মতো উৎপীড়ন চালাতে লাগল।

এই নতুন কালের রক্তবিপ্লববাদীদের সঙ্গে বারীনদার পরিচয় নেই। তাঁর আজীবনের স্বপ্ন রূপায়িত হচ্ছে কিনা তিনি প্রহর গণনা করছিলেন। আমি ভক্ত হনুমানের মতো প্রায় করজোড়ে বসে তাঁকে নিরীক্ষণ করছিলুম। বারুদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বাঙ্গলার প্রায় সর্বত্র। দেশের জন্য ছেলেদের একে একে প্রাণ বিসর্জনের সংবাদ—বারীনদাকে চঞ্চল করে না। তিনি এতে অভ্যস্ত। ছেলেরা যাচ্ছে পুলিস লক-আপে, তারা উৎপীড়ন আর প্রহারে জর্জরিত হচ্ছে, জেলে ঢুকছে, দ্বীপান্তর যাচ্ছে, ফাঁসির মঞ্চ থেকে তাদের মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ছে,— বারীনদা শান্ত, অবিচল! তিনি তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে দেখছেন স্বাধীন সার্বভৌম ভারত! ষড়ৈশ্বর্যশালিনী রাজরাজেশ্বরী জননী ভারতমাতা! বারীনদা প্রতি প্রত্যূষে উঠে স্নানাদি সেরে ধ্যানে বসেন। পরে চা, টোস্ট, অমলেট্ খেয়ে সংবাদপত্র ও প্রবন্ধ রচনা নিয়ে বসে যান।

শ্যামবাজারে মোহনলাল স্ট্রীটের দক্ষিণ ফুটপাথে বারীনদা একখানা তিনতলা বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন দেড়শ' টাকায়। সে-বাড়িতে তিন-তিরিক্কে নয়খানা শোবার ঘর। পূব-দক্ষিণে বেশ বড় উঠোন। সেই বাড়ির তিনতলায় দক্ষিণমুখী ঘরে থাকেন বারীনদা, পাশের ঘরে তাঁর দিদি চিরকুমারী সরোজিনী ঘোষ, তৃতীয় ঘরখানা হরিঘোষের গোয়াল। দোতলায় বারীনদার ঠিক নিচের ঘরখানায় এসে উঠেছেন এক প্রবীণা বিধবা তাঁর সাবালক ছেলেকে নিয়ে। মাঝে মাঝে তাঁর ঘরে এসে ঢোকে একটি বয়স্থা ও সুদেহা কুমারী, নাম ভক্তি। মেয়েটি কোথায় যেন চাকরি করে এবং মধ্যে মাঝে ওই ঘরটিতেই রাত কাটিয়ে যায়। ছেলেটিও যেন কাজ করে কোথায়। প্রথমটায় অনুমান করা গিয়েছিল ওরা

দুটি ভাই বোন। পরে জানা গেল কিছু অন্যরকম।

আমার বাসস্থান এখান থেকে প্রায় মিনিট দশেকের পথ। আর-জি-কর হাসপাতাল তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। আমার বাসস্থান তারই পাশের রাস্তা নীলমনি মিত্র রো-তে ২৮।১ নম্বর বাড়ির ভিতরের অংশে। কিন্তু আমি সম্প্রতি সেখানে বেমানান। কেননা আমার ছোড়দার চাকরি হাইকোর্টে। তিনি বললেন, বারীন ঘোষের দলে ও ভিড়েছে। ওর পেছনে গোয়েন্দা পুলিস ঘুরছে। ওর সঙ্গে এক-বাড়িতে থাকলে আমাদের দুই ভাইয়েরই চাকরি যাবে। বাড়ি সুদ্ধ না খেয়ে মরবে।

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। মা চোখের জল মুছে বললেন, ভয় কি তোর? পায়ে তোর একটি কাঁটাও কোনদিন ফুটবে না। আমি আছি তোর সঙ্গে সঙ্গে।

সেইদিনই গৃহত্যাগ করে বারীনদার ওখানে গিয়ে উঠলুম। সঙ্গে ভাঙ্গা টিনের সুটকেস আর বিছানার পুটলি। কিছু ভাবিনে, সেই চিরদিনের মা আমার সঙ্গে সঙ্গে!

অনন্তহরি মিত্র পুরীতে পলাতক অবস্থায় ধরা পড়ল। তার ফাঁসি হয়ে গেল। বাঙ্গলাদেশে বারুদের গন্ধ উঠেছে শুধু কলকাতায় নয়। ঢাকায়, কুমিল্লায়, চট্টগ্রামে, মেদিনীপুরে, খুলনায়, রাজশাহীতে এবং নানা জেলায়। পাঞ্জাবে ভগৎ সিংয়ের ফাঁসী হবে—তার জন্য তোলপাড় হচ্ছে উত্তর ভারত। ওদিকে বোম্বাই থেকে গান্ধীজী তাঁর রণঘোষণা পাঠ করছেন—সেই উদাত্ত কণ্ঠ ছুটে চলেছে দিক্‌বিদিকে। এবারে তাঁর মরণপণ সংগ্রাম। আইন অমান্য আন্দোলন। এবার জাতির সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সামগ্রী যে লবণ, তার উপর থেকে নির্ধারিত ট্যাক্স অপসারণের জন্য এই আইন অমান্য আন্দোলন। একশ্রেণীর দেশবাসী ভাবল, সামান্য এই লবণকর নিয়ে গান্ধীজীর এই অভিযান, এ যে শিশুসুলভ। গান্ধীজী ঘোষণা করলেন, তাঁর বাছা-বাছা স্বেচ্ছাসেবকরা এই অভিযান-পথে তালগাছ কাটতে কাটতে যাবে। কেননা তালের তাড়ি প্রস্তুত ও তার ওপর ধার্য কর আদায় বন্ধ হবে, এবং আমার অহিংস স্বেচ্ছাসেবকেরা আপন-আপন ইচ্ছায় সমুদ্রের জল নিয়ে লবণ প্রস্তুত করবে।

আগাগোড়া হাস্যকর! নেংটিপরা লোকটা নিছক বাতুল! লোকটার ষাট বছর পেরোতেই বাহাত্তুরে ধরেছে! ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে নিয়ে এই ছেলেখেলার পর ওই বাতুলই আবার বলে বেড়াবে, 'হিমালয়ান্ ব্লাণ্ডার'!

বারীনদা খুব হাসছিলেন। বললেন, বুঝেছ? ওই গান্ধী আর অহিংসার ভূতকে দেশ থেকে তাড়াতে হবে, নইলে মুক্তি নেই। সমস্ত দেশটাকে ও লোকটা

আফিং খাইয়ে বুঁদ ক'রে রেখেছে। আমাদের কাজ ও-লোকটার মুখোশ খুলে দেওয়া!

'বিজলী' যথাসময়ে বেরোবে স্থির হয়েছে। বারীনদা টাকাকড়ি যোগাড়ে সিদ্ধহস্ত। সম্পাদক হবেন মোট পাঁচজন। বারীনদা প্রধান হবেন। সঙ্গে থাকবেন নলিনীকান্ত সরকার, বারীনদার ভ্রাতুষ্পুত্রী ও নবীনা মহিলা নেত্রী লতিকা বসু, থাকবে শশাঙ্কমোহন চৌধুরী এবং ওদের সঙ্গে থাকবে এই অপরিণামদর্শী নির্বোধ—যে ঘর ছেড়েছে, স্নেহের আশ্রয় ও পরিচিত সমাজ ত্যাগ করেছে, জীবনের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা একদম বিসর্জন দিয়েছে,—এই 'প্রভুপদ রক্ষিত'কে এবার কাজে লাগাও! বারীনদা আমার দিকে ফিরে সহাস্যে বললেন, দুবেলা দুটি শুক্‌নো ভাত শুধু খেয়ো। কুড়িটি করে টাকা মাসে-মাসে নিয়ো। 'বিজলী' চালাবার ভার তোমার হাতে দিলুম। ক্ষীরোদের হাতে রইল বিজ্ঞাপন আর বিজনেস্। কিন্তু ক্ষীরোদ সম্বন্ধে একটু সাবধানে থেকো। ও একটু বিপজ্জনক।

কেন, বারীনদা?

ও যে আমার মতন শেষ রাত্রে উঠে যোগে বসে!

ঘর সুদ্ধ সবাই হেসে উঠল। উপেন বাঁড়ুয্যে, অমর চাটুয্যে, বন্ধুবর কাজী নজরুল, নলিনী সরকার, সরোজিনী, লতিকা ও তাঁর স্বরূপা ভগ্নী মৃণালিনী, রতিকান্ত পালিত, মেটকাফ প্রেসের রমেশ বসু, অনিল ভট্টাচার্য এবং আর যাঁরা উপস্থিত ছিল সেদিন।

এটা স্থির হয়ে গেল কেবলমাত্র সম্পাদকীয় লিখবেন বারীনদা, নলিনীদা লিখবে চাটিম-চাটিম, নজরুল নিয়মিত লিখবে কবিতা, উপেনদা ও লতিকা লিখবেন প্রবন্ধ, শশাঙ্ক কি লিখবে জানিনে, আমি লিখব যা খুশি! এইটি আরেকবার স্থির করা হল, লতিকা ইংরেজিতে তাঁর ইচ্ছামতো লিখবেন, আমি সেগুলি অনুবাদ ক'রে নেবো। কুড়ি টাকায় আমি চব্বিশ ঘণ্টার ক্রীতদাস হয়ে রইলুম! এর ওপর মাসে দুটো, নিদেনপক্ষে একটা ছোট গল্প ঈষৎ গরম মসলা মিশানো—অন্তত পনেরো টাকা। বছরে একখানা ছোট গল্পের বই এবং একখানা দেড় টাকা দামের উপন্যাস,—দুই মিলিয়ে কমপক্ষে তিনশ'। বারো পঁচিশং তিনশ'। অর্থাৎ ছোট গল্প, 'বিজলী' ও উপন্যাস। পনেরো, কুড়ি আর পঁচিশ—এই ষাট টাকা মাসিক উপার্জন। আবার আমি টাকায় ভাসবো।

আমি সেইদিনই আমার অসময়ের বন্ধু ও প্রতিবেশী সুধীন নিয়োগীর কাছে দশটি টাকা ধার করে একজোড়া শ্রেষ্ঠ ঢাকেশ্বরী ধুতি, একজোড়া আদ্দির পাঞ্জাবি, দুটো গেঞ্জি ও একজোড়া স্যাণ্ডাল কিনে ফেললুম। গৌরী ভাণ্ডার

থেকে এক ডজন সাদা রুমাল কিনে নিলুম বারো আনায়। আমি বরাবরই ফিটবাবু, চকচকে ধোপদস্ত পোশাকপত্র ছাড়া আমার চলে না। নিজের চেহারা আমি কখনও মলিন হতে দিই না।

মোহনলাল স্ট্রীট ও রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের মোড়ের বাড়িটায় যে গোয়েন্দা পুলিসের একটা বড় আড্ডা এই প্রথম জানলুম। আমাদের এ বাড়ি থেকে ওটা বোধ হয় একশ' গজেরও কম। আমি আপিস বসালুম নিচের তলায় সদর দরজার ঘরে। রাত্রে এই ঘরেই পড়ে থাকব একখানা কাঠের তক্তায়। বারীনদা আনিয়ে দিলেন একখানা টেবিল আর খান দুই চেয়ার। এই ঘরেই আসছে যখন-তখন উটকো অচেনা লোক। তারা বারীনদার সম্বন্ধে অনর্গল শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে নানা প্রশ্ন ফেঁদে বসে। এরা যে গোয়েন্দা পুলিসের ইন্‌ফরমার, এটি অনুমান করতে আমার দেরি হয় না। আমার সম্বন্ধে ওদের অসীম কৌতূহল মাঝে মাঝে আমাকে বিরক্ত করে তোলে।

'বিজলী' লাল মলাটে ছাপা হবে। ডবল ডিমাই চার পেজী সাইজে চব্বিশ পৃষ্ঠা এবং চার পেজ মলাট। মোট আটাশ পৃষ্ঠার কাগজ। নগদ মূল্য এক আনা। বারীন ঘোষের 'বিজলী' নব কলেবরে এতকাল পরে আবার দেখা দিচ্ছে, এটি মস্ত সংবাদ। সুতরাং কোন-কোনও সংবাদপত্রে এ খবরটি ছাপা হল।

গান্ধীজীর আসন্ন ডাণ্ডি অভিযান, লবণ সত্যাগ্রহ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের ঘোষণায় ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশ তখন উদ্দীপ্ত ও আলোড়িত হয়ে উঠেছে। আগামী ১২ মার্চ তিনি এই সত্যাগ্রহের পুরোধা হয়ে এক ঐতিহাসিক অভিযান করবেন। তাঁর সঙ্গে থাকবে মোট উনআশীজন স্বেচ্ছাসেবক। তারা হবে ভয়হীন, বন্ধনহীন, মনে-প্রাণে অহিংস, স্বার্থলেশশূন্য এবং দেশকর্মে আত্মনিবেদিতপ্রাণ। তারা আরব সমুদ্রতীরের পথে-পথে লবণ তৈরি করবে ও তালগাছ কাটতে কাটতে যাবে। কাশী থেকে খবর পেলুম ভারতব্যাপী এই আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে থাকছে আমাদের তরুণ বেপরোয়া বন্ধু প্রফুল্ল-কুমার চক্রবর্তী। সে ইতিমধ্যেই বোম্বাই রওনা হয়ে গেছে। যারবেদার কারাগার তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল!

গান্ধীজী তাঁর বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "হম যব যাত্রা শুরু করেঙ্গে, সারে হিন্দুস্থান উথল যায়েগা।"

বারীনদা বললেন, 'বিজলী'র প্রথম সংখ্যা বার করে দাও ১২ মার্চ।

তথাস্তু। মেটকাফ প্রেসের রমেশবাবুকে নিয়ে আমি কোমর বেঁধে কাজে নামলুম। বারীনদা সম্পাদকীয় রচনা নিয়ে বসলেন। এদিকে আমার হাতে

নজরুল ত আছেই। এ ছাড়া ডাকলুম অচিন্ত্য ও শৈলজানন্দকে, বুদ্ধদেব ও মহেন্দ্র রায়কে, জীবনানন্দ সুবোধ রায় জসীমকে। খবর পাঠালুম ছাত্রদলের তরুণ নেতা বন্ধুবর গিরিজা মুখোপাধ্যায়কে। ডাকলুম জগদীশ গুপ্তকে। ওদেরই সঙ্গে ডাকলুম আমার সহপাঠী গিরিজা সেনের দিদি জ্যোতির্ময়ী দেবীকে।

গান্ধীজীর বাক্য মিথ্যা হয়নি। ১২ মার্চ তারিখে আরব সাগরের সঙ্গে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গভঙ্গে উত্তাল ও উদ্দাম হয়ে উঠল। ভারতের পুরুষের সঙ্গে নারীসমাজ বেরিয়ে এলো পথে-পথে।

'বিজলী'ও সেদিন প্রকাশিত হল। তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল, 'তালকাটা আন্দোলন'। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেল।

প্রতি প্রত্যূষে খড়মের শব্দে আমার ঘুম ভাঙে। বারীন ঘোষ এক পেয়ালা গরম চা হাতে নিয়ে তেতলা থেকে নেমে আসছেন। আমি নিচের ঘরে ন্যাড়া তক্তাখানার উপর সারারাত পড়ে থাকি। এটা আমার আপিস-ঘর। দরজাটা খুললেই মোহনলাল স্ট্রীট।

চায়ের পেয়ালা হাতে দিয়ে বারীনদা পরিহাস করেন, রাত জেগে কোন্ উর্বশী-মেনকার কথা ভাবছিলে?

ভোরবেলা হাসির ঝড় তুলে বারীনদা আবার ওপরে উঠে যান। এরই মধ্যে তাঁর স্নান, যোগধ্যান ইত্যাদি সবই সারা হয়ে গেছে। বারীনদার দিদি সরোজিনীরও তাই। তিনিই রান্নাবান্না করেন, বারীনদাও প্রায়ই নিজের হাতে টোস্ট, অমলেট ও চা প্রস্তুত করে নেন। প্রাতরাশের পর বারীনদা সংবাদপত্র ও পড়াশুনো নিয়ে বসেন। বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে তাঁদের আহারাদি শেষ হয়ে যায়। বেলা বারোটা পর্যন্ত বারীনদার বিশ্রাম। তারপর লেখাপড়া নিয়ে আবার বসে যাওয়া। তখন আবার চা।

এখন 'বিজলী'র চাকাটা কিছু ঘুরেছে। পাঁচজন সম্পাদকের মধ্যে দুজন উদাসীন, শুধু নলিনী সরকার লেখেন একটা ফীচার, নাম—'চাটিম-চাটিম'। সেইটুকু লিখেই তিনি খালাস। আমি মরেছি! সমস্ত কাগজখানাই আমার হাতে,—আমি যা করি। বারীনদা ছোট ছোট পুস্তিকা ও 'আত্মকথা' লেখা নিয়ে ব্যস্ত, মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় লেখাও লিখতে সময় পান না। ফলে একাধারে আমি হয়ে উঠলুম 'বিজলী'র সম্পাদক, প্রুফ রীডার, পত্রলেখক, কেরানী—সবই। লোকে জানছিল বারীনদা যোগতপস্বী এবং রাজনীতিক নেতা, আর আমি হলুম 'বিজলী'র সর্বেসর্বা! সব চিঠি, সব লেখা, সকল দর্শনার্থী, সকলের সলা-পরামর্শ শুধু আমাকেই ঘিরে। আমার মাসিক বেতন কুড়ি টাকা, চার সপ্তাহে নাকি এক মাস, সুতরাং ক্ষীরোদবাবু প্রতি সপ্তাহে শনিবারে আমার হাতে পাঁচটি করে টাকা দেন।

আমি শ্যামবাজারের ভিতর মহলে এক পাইস্-হোটেলে মধ্যাহ্ন-ভোজন সারি। এক আউন্স কাগজমোড়া খাঁটি মাখন এক আনা, এবং দশ পয়সার মধ্যে ভাত,

ডাল, ভাজা, ছ্যাঁচড়া, মাছের ঝোল, দাগা মাছের বা ডিমের কালিয়া। পাতি লেবু ও চাটনি ফাউ। আমার বাঁধা বাজেট চৌদ্দ পয়সা। আমার সঙ্গে বসতো বাজারের ফড়ে, আলুওলা, মনোহারী দোকানের চাকর, বাস ও ট্রামের ড্রাইভার ও কনডাকটর, পুরনো কাগজ বিক্রির লোক, পান-বিড়িওলা, আর জি কর হাসপাতালের মজুর, মদের দোকানের বিক্রেতা, জেলে দু-চারজন, উল্টোডিঙ্গির নৌকার মাঝি-মাল্লা ইত্যাদি নানা লোক। ভোজের আসর নানা গল্পে মশগুল হয়ে উঠত। ওরই মধ্যে এক-আধ দিন আমার ঘাড় ভেঙ্গে খেতে বসে যেত নজরুল আর শৈলজানন্দ আর ভবানী মুখুজ্যে এবং আমার সহবাসী রতিকান্ত আর অনিল ভট্‌চায। সেদিন আমার সর্বনাশ! আমার বাজেট মেলাতে প্রাণান্ত।

'বিজলী'তে তখন নিয়মিত বেরোচ্ছিল নজরুলের রাজনীতিক ও সামাজিক হাসির কবিতা। পরে এই কবিতাগুলি একত্র করে 'চন্দ্রবিন্দু' নামে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া বেরোচ্ছিল অচিন্ত্যর 'বিবাহের চেয়ে বড়', শৈলজানন্দর 'সেবাদাসী', বুদ্ধদেবের কবিতা ও নাটিকা একটির পর একটি।

অচিন্ত্য তার বিয়ের আগেই উপরোক্ত ধারাবাহিক উপন্যাসটির নাম দিয়েছিল 'বিবাহের চেয়ে বড়'। সে এনেছিল 'কল্লোল-সাহিত্যে' নতুন ঢং। নতুন এবং মৌলিক ছাড়া তার অন্য চিন্তা নেই। সে পুরনো সাহিত্যের নবতন ঐতিহ্যবাহী নয়, সে আনকোরা নতুন। শব্দচয়নে, বাকভঙ্গিতে, বিশুদ্ধ ব্যাকরণিক ভাষা প্রয়োগে, অভিনব প্রকাশভঙ্গিতে—সে আগাগোড়া মৌলিক। 'বিবাহের চেয়ে বড়' রসিক পাঠকসমাজে খুবই সমাদৃত হচ্ছিল।

'বিজলী'র বাড়ির নিচের তলায় আমার আপিসের পাশের ঘরে থাকেন বারীনদার রাঙ্গা-মা। ইনি অপরিসীম রূপলাবণ্যময়ী এক বৃদ্ধা। মুখে দু পাটি দাঁতই নেই, চোখে মোটা আতস কাঁচের চশমা। বারীনদা ও সরোজিনী যখন তাঁদের পাগলিনী জননী স্বর্ণলতার উৎপীড়নে প্রায় আধমরা—তখন বারীনদার বয়স বছর দশেক এবং দুটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে স্বর্ণলতা যখন দেওঘরের 'রোহিণী' অঞ্চলে বায়ুগ্রস্ত অবস্থায় প্রায় নির্জনবাস করছেন, সেই সময় খুলনার এক তালুকদার চিন্তামণি ভঞ্জ চৌধুরী রোহিণীতে গিয়ে কয়েকজন স্থানীয় গুণ্ডার সহায়তায় বালক বারীনদাকে হিঁচড়িয়ে টানতে টানতে এক আমবাগানে নিয়ে আসেন, এবং পূর্বব্যবস্থা মতো এক পালকিতে চড়িয়ে ও পরে ট্রেনযোগে কলকাতায় এনে যে তরুণী বালবিধবার কাছে গচ্ছিত করেন, তিনিই এই রাঙ্গা-মা! রোহিণীতে বারীনদাকে অপহরণের কালে স্বর্ণলতাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য

এক গোছা ফুল উপহার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই পুত্র অপহরণের দৃশ্য দেখে উন্মত্ত হয়ে তিনি ঘরের ভিতর থেকে মস্ত ছোরা নিয়ে গুণ্ডার দলকে তাড়া করে ছোটেন। সেটা বোধ করি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ।

যাই হোক, সমস্ত ব্যবস্থাটা ছিল পূর্বকল্পিত। তৎকালে বিলাতফেরত এম-ডি পাস করা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন খুলনার সিভিল সার্জেন। তিনি ছিলেন খাস সাহেব। বিলাতের বহু ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাঁর তিনটি ছেলে—বিনয়ভূষণ, মনোমোহন ও অরবিন্দ তখন বিলাতে পড়াশুনো করে। কৃষ্ণধন ঘোষের স্ত্রী স্বর্ণলতা সন্তান প্রসবের প্রাক্কাল থেকেই মস্তিষ্ক-বিকারে প্রায়ই ভুগতে থাকেন। সেই অবস্থাতেই এককেটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সর্বশেষ সন্তান বারীন ঘোষের জন্মকালে লণ্ডনের পথে ইংলিশ চ্যানেলে প্রবল ঝড়ের সময় জাহাজের মধ্যে উন্মাদিনী স্বর্ণলতার প্রসববেদনা দেখা দেয়, সেই কারণে নবজাত সন্তানের নাম রাখা হয় বারীন্দ্রকুমার। বারীনদা ভূমিষ্ঠ হন লণ্ডনের উপকণ্ঠে নরউডে। অতঃপর স্বর্ণলতা আপন খেয়াল অনুযায়ী ক্রয়ডনের বার্থ রেজিস্ট্রেশন আপিসে বারীনদার নতুন নামকরণ মুদ্রিত করেন—'ইম্যানুয়েল ম্যাথিউ ঘোষ!'

সেই দেশবিশ্রুত সিভিল সার্জেন ডাঃ কে ডি ঘোষের উপপত্নী হলেন এই বালবিধবা রাঙ্গা-মা। দশ বছর বয়সে বারীনদাকে এই রাঙ্গা-মার কাছে এনে দেন পূর্বোক্ত চিন্তামণি ভঞ্জ, আড়াল থেকে সহায়তা করেন পিতা কে ডি ঘোষ। এই রাঙ্গা-মার সম্বন্ধে বারীনদা তাঁর 'আত্মকথা' গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন, "নিচে ছুটে এসে আমায় কোলে তুলে নিলেন এতক্ষণের রহস্যঘেরা রাঙ্গামা …দীর্ঘছন্দ সবল বলিষ্ঠ দেহ, অপূর্ব রূপ সারা যৌবনসুঠাম অঙ্গ বেয়ে ঝরে পড়ছে। বয়স আন্দাজ আঠারো-উনিশ…কলকাতায় বাবা থাকার সময়ে তাঁর সঙ্গে আমরা যেতুম গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে খোলা ফিটনে বসে। আমার বাবা টিপ-টপ সাহেব। তাঁর পাশে রাঙ্গা-মা বসতেন বুক-খোলা গাউন পরে নানা ফুল-ফলে ভরা লেডিজ হ্যাট মাথায় দিয়ে রুমাল হাতে…রূপসী মা ইডেন গার্ডেন আলো করে চলতেন তাঁর সম্রাজ্ঞীর বাড়া লাবণ্যে ও শ্রী-গরিমায়…এই মা আমার বাবার শূন্য জীবন সুখের প্লাবনে ভরে দিয়ে তাঁর ভাঙ্গা সংসার আবার গড়ে তুলেছিলেন—"

রাঙ্গা-মাকে কোথা থেকে যেন বারীনদা এনে তুলেছেন এই ঘরে। আমি তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি মেঝে থেকে প্রায় কড়িকাঠ পর্যন্ত পুরনো বই আর কাগজপত্রে ঠাসা—এমনই ঠাসা যে ওই বৃদ্ধার পক্ষে বাকি জায়গাটুকুতে রান্না করা ও রাত্রি-বাস একপ্রকার অসম্ভব। উনি সমস্ত দিনমান ও মধ্যরাত্রি পর্যন্ত একমনে বাঙ্গলা,

সংস্কৃত ও ইংরেজি বই, কাগজ ও সাময়িক পত্রাদি তন্ময়তার সঙ্গে পাঠ করেন। শুনলুম, বিগত দেড়শ' বছরে যত মূল্যবান বাংলা বই ও কাগজ বেরিয়েছে ওঁর ভাঁড়ারে সব মজুত।

আমি দিনে দু-তিনবার রাঙ্গা-মার পান ছেঁচে দিতুম, এবং তাঁর রান্নাবান্নার জন্য টুকিটাকি এটা ওটা কিনে আনতুম। রাঙ্গা-মার মুখে নিত্যপ্রসন্ন হাস্য যেন ঝলমল করত। উনি কিশোরী জীবনে দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা দেবীকে এবং স্বামী বিবেকানন্দর সকল খবর উনি রাখতেন। সকল ঘটনাই ওঁর মনে আছে।

বারীনদা যে কয়টি কারণে পণ্ডিচেরী ছেড়ে চলে এসেছেন, তার অন্যতম হল তাঁর এই রাঙ্গা-মার শেষ জীবনের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা। নিজের জননী নয়, কিন্তু তাঁর পিতার এই নিঃসন্তান উপপত্নীর নিকট তিনি সেই দুর্লভ মাতৃস্নেহ লাভ করেন। অথচ একই বাড়িতে তিনতলার উপরে থেকেও বারীনদার দিদি সরোজিনী এই বৃদ্ধার প্রতি বিরূপ ছিলেন। দিদির প্রতি আমি খুবই শ্রদ্ধাশীল, ভক্তিমান এবং অনুরক্ত। তিনি যখন তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, পরিচিত, আপন-পর ইত্যাদি সকলের সমালোচনায় মুখর হতেন, আমি হাস্যমুখে সেগুলির থেকে রস পেতুম। তিনি একদা প্রতাপ নামক এক যুবকের সহিত প্রণয়ে আসক্ত হয়েছিলেন এবং সেই যুবক অবশেষে কীভাবে তাঁর প্রতি অসৎ আচরণ করে এটি আমাকে আনুপূর্বিক শুনতে হয়েছিল। দিদি এক সময়ে তাঁর সেজদা শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে কিছুকাল ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিচেরী ত্যাগ করার সময়ে তিনি শ্রীমা-র প্রতি অপ্রসন্ন মন নিয়ে ফিরে আসেন!

আমি একপ্রকার অমায়িক সৌজন্যের সঙ্গে নিরিবিলি এক-এক সময়ে তাঁর কাছে বসতুম। আমার চেয়ে তিনি হয়ত তিরিশ বছরেরও বেশী বড়। কিন্তু আলাপচারীতে বয়সের পার্থক্য ভুলে তিনি অন্তরঙ্গের মতো কথা বলতেন। তিনি যাঁদের কথা বলতেন, তাঁদের অনেকেরই নাম আমার শোনা। বাঙ্গলার সমাজ জীবনে তাঁরা নিতান্ত অপরিচিত নন। কেউ তাঁদের মধ্যে আজও বেঁচে আছেন কেউ বা নেই।

আমি প্রায়ই লক্ষ্য করতুম, আমাকে এগুলো বলবার জন্য দিদি অবসর খুঁজে ফিরতেন এবং আমি প্রায়ই তাঁকে এড়িয়ে চলতুম। তাঁর হাতে এবং ঠোঁটে একটু শ্বেতী রোগ ছিল। বারীনদারও পায়ের দিকে ছিল এই রোগের চিহ্ন। এঁদের বংশে ও গোষ্ঠীতে একদিকে যেমন হাঁপানি, যক্ষ্মা, শ্বেতী, মস্তিষ্কবিকার, পাগল বা অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধি—তেমনি অন্য দিকে দেখি পাণ্ডিত্য, মনীষা, কাব্য ও

সাহিত্যপ্রীতি, চিন্তাশীলতা, জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রীতি, সমাজচিন্তা ইত্যাদি। এই একই পরিবারে কবি, সাহিত্যকর্মী, দার্শনিক, দেশসংস্কারক, জনহিতব্রতী, বিপ্লববাদী, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ইত্যাদি বহু দেখা যায়। শিশির ভাদুড়ীর এত বড় নাট্যপ্রতিভা, কিন্তু একই রক্তধারায় তাঁর পিসি হয়েছিলেন বদ্ধ উন্মাদ, পিসির মেয়ে আদমবাউড়ো—আরও কত কি। বারীনদাকে দেখছি স্নেহের কাঙ্গাল হয়ে জন্মেছিলেন। শিশুর মতো তিনি সরল, স্নেহশীলা নারীর মতো তিনি স্বভাবকোমল। কিন্তু তিনি কবি হয়ে জন্মেছিলেন। গোলাপের মতো সুগন্ধী তাঁর মন। তিনি শুধু ভালবাসতে চেয়েছিলেন, ভালবাসা পেতে চেষ্টা করেছিলেন। নিজেই তিনি বলেছেন, তিনি মনেপ্রাণে অহিংস, তিনি মানবপ্রেমিক। ইংরাজ রাজশক্তির উপর রাগ করে তিনি নিরপরাধ এক-একজন ইংরেজকে হত্যা করতে একেবারেই নারাজ!

তবু তিনি হয়ে উঠলেন ভারতের প্রথম বোমার স্রষ্টা। হয়ে উঠলেন এই শতাব্দীর প্রারম্ভকালের রক্তবিপ্লববাদীদের অবিসম্বাদী নেতা! বাল্যে স্নেহপিপাসু, কৈশোরে কাব্যপিপাসু, তারুণ্যে প্রেমপিপাসু, যৌবনে অগ্নিপিপাসু।

পণ্ডিচেরী ছেড়ে আসার আগে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যৌগিক দৃষ্টি দ্বারা বারীনদাকে পর্যবেক্ষণ ক'রে বলেছিলেন, তুমি ফিরে যেয়ো না, এখানেই তোমার চিত্তের প্রশান্তিলাভ ঘটবে, তুমি এখানেই থাকো, বারীন।

শ্রীমা তাঁর যোগবলে বারীনদার চিত্তশুদ্ধির জন্য বহুতর ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় বারীনদাকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা পান। কিন্তু অদৃশ্য নিয়তি বারীনদাকে অস্থির ক'রে তুলছিল। একদা নিঃসম্বল অবস্থায় তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন পণ্ডিচেরী থেকে সোজা কলকাতার দিকে!

'বিজলী' নিয়মিতই বেরোচ্ছে, আমি তার কর্ণধার। এমন সময় একদিন শিলং থেকে কবি রাধারাণী একখানা কালো বাঁধানো খাতা রেজেস্টারি করে পাঠিয়ে লিখলেন, এর মধ্যে কবিতাগুলি আমার এক বান্ধবী 'অপরাজিতা দেবী'র লেখা। এর থেকে একটি কবিতা 'ভারতবর্ষ'-এ পাঠিয়ে দেবেন।

সেই প্রথম অপরাজিতা দেবী! কয়েকটি কবিতা পড়ে আমার তাক লেগে গেল। শুধু সেদিন আমারই তাক লাগেনি, বারীনদাও চঞ্চল হয়ে উঠলেন, এবং লেখক সমাজেও একটা কলরব দেখা দিল। 'বিজলী' ও 'ভারতবর্ষ'-এর সম্পাদক রায়বাহাদুর জলধর সেনের কাছে অনুসন্ধিৎসু চিঠির পর চিঠি! কে এই মেয়ে-কবি? নামটা তো খুব ইনট্রিগিং? থাকে কোথায়? স্বামী আছে কি? বয়স

কত? এমন সুন্দর ছন্দে মেয়েদের মনের মধুর প্রণয়-রসাস্বাদ আর কোন্ মেয়ে কবে লিখেছে কবিতায়? এ মেয়ে যে প্রায় প্রতি কবিতায় নিজের শয়নকক্ষের শূন্য শয্যার দিকে ইঙ্গিত করে! কে এই রসভাষিণী মধুরহ্লাদিনী?

পরে শুনলুম স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত একটু নড়ে বসেছেন! অতঃপর লক্ষ্য করলুম, কবি নরেন্দ্র দেব মহাশয় অপরাজিতা দেবীর "বুকের বীণা" বইটির ছাপা নিয়ে গুরুদাসে আনাগোনা করছেন।

আমার কোনও প্রকার উদ্বেগ বা কৌতূহল ছিল না। আমার কাছে কোনও প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা এলে আমি সোজা শিলংয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিতুম। পরে শুনলুম কবি রাধারাণী ও কবি অপরাজিতা—উভয়েই নাকি হরিহরের মতো একাত্ম। শিলংয়ের নিভৃত পাইনবনকুঞ্জে কৃষ্ণ হয়েছেন কালী, শ্যাম হয়ে উঠেছেন শ্যামা! দুই মিলে এক, একাঙ্গিনী।

আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে যেমন সমগ্র ভারতবর্ষে, তেমনি কলকাতার পূর্ব উপকণ্ঠে লবণহ্রদের অন্তর্গত মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহ চলছে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সামনে নতুন সমস্যা উপস্থিত। চারিদিক থেকে পিলপিল করে এই প্রথম মেয়ে সত্যাগ্রহী বেরিয়ে পড়েছে। তারা পথে পথে, দোকানে ও বাজারে, ভবানীপুরে আর কালীঘাটে, সাহেব পাড়ায় আর লালদিঘিতে, কলেজ স্ট্রীটে আর বড়বাজার অঞ্চলে—বাঙ্গলার জেলায়-জেলায় পুরুষের পাশে পাশে তারা। এ দৃশ্য নতুন। দিদিমা থেকে দিদিমণি, বালিকাকিশোরী থেকে কোলের খুকীটি পর্যন্ত। পুলিস যদি ওদের ধমকায় তা হলে 'দেশী' খবরের কাগজে বেরোবে—মারতে এল! মারতে এলে ছাপা হবে মারলো! আর যদি বা দু-এক ঘা বসিয়ে দেয় তবে আর রক্ষা নেই—বোলতার চাকে ঘা! সুতরাং মেয়েদের পিকেটিং, গ্রেপ্তার ও মারমুখী পুলিসের কর্মতৎপরতা দেখার জন্য সর্বত্র জনারণ্য!

ঠিক এমনি সময় ১৮ এপ্রিল সমস্ত ভারতবর্ষকে উচ্চকিত করে একটি যুগান্তকারী সংবাদ এল, "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন!" এই আক্রমণের পিছনে প্রকৃত নেতা ছিলেন সূর্যসেন, কিন্তু এর প্রকাশ্য অধিনায়ক ছিলেন অনন্ত সিং, তার সঙ্গে লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি বহু অসমসাহসিক তরুণ। তারা চট্টগ্রাম স্টেশনের অস্ত্রাগার লুট করেছে, প্রহরীকে খুন করেছে, কোষাগার ভেঙ্গেছে, এবং পুলিসের নাকের উপর পাঞ্জা পাঠিয়ে জালালাবাদ পাহাড়ের বনপথে আত্মগোপন করেছে। বাঙ্গলার গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন হুকুম জারী করলেন,

কলিকাতার পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবেন। চারিদিকে প্রবল জনরব ও আন্দোলন মাথা তুলল।

খবরটা যখন ঠিক বাসি হয়নি সেই সময় একদিন সকালে দুইজন মহিলা বুঝি বারীনদার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে উপর থেকে নেমে গলির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। বোধ হয় ওরই মধ্যে বারীনদার জনৈক সহচর অমূল্য আমার কথা ওঁদেরকে বলে থাকবে। আমার নামটা যেন একটু বুড়ো-হাবড়ার বয়সের ইঙ্গিত করে। 'উত্তরা'র ক্যানভাসার হয়ে যখন ভাগলপুরে গিয়েছিলুম তখন শরৎ চাটুজ্যের এক মামা গিরীন গাঙ্গুলী আমাকে দেখে সচকিত হয়ে বলেছিলেন, এ কি, আপনার নাম শুনে আমি ভাবতাম আপনার বয়স অন্তত পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ হবে! মাত্র সাড়ে চব্বিশ। অবাক করলেন আপনি!

যাই হোক, অমূল্যর সঙ্কেতে মহিলা দুজন আমার ঘরে হঠাৎ ঢুকলেন এবং সেই মুহূর্তেই আমার ভাগ্যনিয়ন্তা আমার জীবনে আরেকটি মোচড় দিলেন!

আমার পরনে ছিল ধুতি ও হাত-কাটা বেনিয়ান। অন্তত আমার গায়ে পাঞ্জাবিটা থাকা উচিত ছিল। ওঁরা দুজন মাতা ও কন্যা, দুজনেই সুশ্রী। জননীর বয়স আমার মা অপেক্ষা অনেক কম এবং কন্যাটিও বোধ করি আমার বয়স অপেক্ষা কিছু কম। আমি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ওঁদেরকে নমস্কার করলুম। শুকনো আপিস ঘরটা যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠল।

আমার নামটি ওঁদের পরিচিত, কিন্তু আমাকে আগে ওঁরা দেখেননি। বোধ হয় আমাকে দেখে প্রথমটা ওঁরা একটু থতিয়েই গিয়ে থাকবেন। ওই ফাঁকেই দেখে নিলুম বিধবা ভদ্রমহিলার নধর মুখশ্রীর উপর একজোড়া চশমা—তার ভিতরে দুটি আয়ত কালো চোখ। পরনে ধবধবে মোটা খদ্দরের শাদা থান এবং গলায় বৈষ্ণবদের মতো কণ্ঠী। কন্যার মুখে সহজ পরিচ্ছন্ন হাসি। কপালের সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন নেই। ধবধব করছে রং। হাতে সামান্য দু-গাছি সরু সোনার চুড়ি ছাড়া সর্বাঙ্গ অলঙ্কারশূন্য। পরনে কোমল বাসন্তী রংয়ের মোটা রাঙ্গা-পাড় খদ্দরের শাড়ি। আধুনিক টয়লেটের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। মাথার রেশমী চুল পিছন দিকে টানা খোঁপায় বাঁধা।

কন্যার কণ্ঠ নির্ভয়, নিঃসঙ্কোচ ও স্বচ্ছ। বললেন, আপনার লেখাগুলো পড়ে মনেই হয় না আপনি এত লাজুক। ইনি আমার মা লাবণ্যপ্রভা দত্ত।

লাবণ্যপ্রভা বললেন, এ আমার ছোট মেয়ে শোভা। আমাদের দলের সব মেয়ে মহিষবাথানে কাজে নেমেছে, আবার ভবানীপুরের ওদিকে পিকেটিং করছে। গ্রেপ্তার হয়েছে অনেক মেয়ে।

শোভা বললেন, আপনারা বিজলীতে যে গান্ধীবাদ আর অহিংসার বিরুদ্ধে লিখছেন, এতে আমরা খুব দুঃখিত নয়! আমাদের কাছে এই আইন অমান্য আন্দোলন একটা মুখোশ।

এতক্ষণ পরে মুখ তুললুম। বললুম, কেন?

—আপনি নিজেই বুঝবেন একদিন। শুনুন—শোভা বললেন, মা আমাদের গ্রুপকে পরিচালনা করছেন, কেননা উনি গান্ধীজীর ভক্ত। কিন্তু আমাদের কাজকর্ম একটু অন্য রকম। বারীনদার কাছে সেই জন্যেই এসেছিলুম!

—কী বললেন বারীনদা?

লাবণ্যপ্রভা হাসলেন। শোভা কিন্তু উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বললেন, এখন সেকালের সেই বারীন ঘোষের বয়স হয়েছে! খোলে আর বারুদ নেই।

লাবণ্যপ্রভা সেদিন আমাকে ওঁদের বাড়িতে যাবার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানালেন এবং শোভা বললেন, আসছে কালই আসুন না? দুপুরে আমাদের ওখানে খাবেন? আপনি দেখছি বড্ড মুখচোরা!

ওঁরা আমাকে হাজরা রোডের একটা ঠিকানা দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন এবং সৌজন্যবশত আম ওঁদের পিছনে পিছনে চললুম। কয়েক পা এসে শোভা বললেন, আমার সঙ্গে হাঁটবেন না, গোয়েন্দার চোখ আছে আমার ওপর। আচ্ছা এবার যাই, কাল আবার দেখা হবে।

বিষধর জাত-গোখরো যেন লীলায়িত ভঙ্গীতে জননীর পিছু-পিছু এগিয়ে চলল, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম পিছন থেকে।

"কাননে যত কুসুম ছিল
ফুটিল তব পায়ে—"

ঘরে এসে একবারটি দাঁড়ালুম। সেদিন ভোর থেকে একটা ছোটগল্প লিখতে আরম্ভ করেছিলুম। পাতা তিনেক প্রায় লেখা হয়েছিল। বোধ হয় গল্পটা প্রণয় কাহিনীর দিকেই ঘেঁষতো। কিন্তু আর না এগোয়! এ জীবনে যে ব্যক্তি এখনও কোনও মেয়েকে ভালবাসতে শেখেনি, সে লিখবে প্রেমের গল্প?

নন্‌সেন্স! খাতাখানা থেকে তিনটে পাতা তুলে নিয়ে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে মোহনলাল স্ট্রীটের ফুটপাথে উড়িয়ে দিলুম—"কাননে যত কুসুম ছিল—"

সমস্ত সকালটা কী নিয়ে যে কাটল বুঝতে পারলুম না। 'বিজলী'র জন্য কি যেন একটা লেখা লিখতে গেলুম, কিন্তু সব লেখাই মনে হচ্ছিল হিজিবিজি! না, আমি লেখক নই, লিখতে আমি জানিনে। এযাবৎ যা কিছু লিখেছি সব বাজে, ফাঁকি, রাবিশ। জীবনের সত্য উপলব্ধির সঙ্গে ওগুলোর কোনও যোগ নেই।

আমার মধ্যে রয়েছে সাংঘাতিক অতৃপ্তি আর অসন্তোষ। যাদের জীবনে বার বার নৌকা ডুবেছে, হাল ভেঙেছে, পাল ছিঁড়েছে, অকূলে ভেসেছে—কই তারা আমার লেখায়? আশাহত, ভাগ্যহত, নিরন্ন, আতুর, পথহারা, সকল পরিচয়হারা —কোথায় তাদেরকে আমি হারিয়ে ফেলছি? কিন্তু ওসব থাক এখন।

দুপুরবেলা পাইস-হোটেল থেকে ফিরে একটু জিরিয়ে বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছিলুম। ও-ঘর থেকে হঠাৎ বারীনদা আমার ওপর আক্রমণ করে এগিয়ে এসে হাসছিলেন। বললেন, ও, এবার বুঝি সেজেগুজে যাচ্ছ সেই জমাদারনীর ওখানে?

জমাদারনী! বারীনদার বাকভঙ্গিতে আমার দুর্বলতার প্রতি ইশারা ছিল। আমি হাসিমুখে থমকিয়ে বললুম, জমাদারনী আবার কে? কী যা-তা বলছেন!

—বটে! আমাকে ক্ষেপাবার জন্য বারীনদা আবার হাসিমুখে বললেন, ওই যে জমাদারনী তোমাকে দেখবার জন্যে সকালে ছুটে এসেছিল! ওর মা ছিল সঙ্গে, তাই বেকায়দায় পড়েছিলে, কি বলো?

—ছিঃ বারীনদা, আপনি একদম উচ্ছন্নে গেছেন!

রক্তবিপ্লবের অগ্নিঋষি তাঁর পরিচ্ছন্ন দাঁতের পাটিতে হাসলেন। দু' পা কাছে এসে তেমনি হাসিমুখেই বারীনদা বললেন, তুমি তো নজরুল নও, তুমি বুঝবে কতটুকু? পুরুষের কাম টেনে বার করে কামিনীকে! বিশ্বসৃষ্টির সবচেয়ে বড় সংবাদ সেইটি।

বারীনদা হাসছিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত নির্বোধ, বিশ্বাসভাজন, নির্ভরযোগ্য এবং কোন-কোনও বিষয়ে অপদার্থ মনে করতেন! আমার মুখের উপরকার নির্বিকার চাতুরীকে তিনি অমায়িক সরলতা বলে ভাবতেন।

আমি হাসিমুখে তেতলা থেকে নেমে গেলুম।

ভবানীপুরে স্যার আশুতোষের বাড়ির গায়ে তিনতলা বাড়িটা যেমন সরু তেমনি উঁচু—কংগ্রেস নেতা সুবোধ বসুর চেহারার মতো ছিপছিপে ও লম্বা। তিনি রাজনারায়ণ বসুর সম্পর্কে ভাইপো। লতিকা হলেন রাজনারায়ণের দৌহিত্র কবি মনোমোহন ঘোষের ছোট মেয়ে। বড় মেয়ে মৃণালিনী। লণ্ডনে ছাত্রী অবস্থায় সুবোধ বসুর সঙ্গে লতিকার বিবাহ হয়। উভয়ের সম্পর্ক নাতনী ও দাদামশায়। এই বিবাহের কিছুকাল পর থেকে সুবোধ বসুর বিভিন্ন দুর্বলতা লক্ষ্য করে লতিকার মনে স্বামীর সম্বন্ধে অসন্তোষ ও বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। ওঁদের সন্তানাদি হয়নি। কালক্রমে কলকাতায় ফিরে লতিকা বসু স্বামীর

নিকট নানাবিধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবিচার সহ্য করতে থাকেন। ১৯৩৫-এ তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে।

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে লতিকা বসু যখন রাজনীতিক্ষেত্রে ঝলমল করছিলেন, তখন আমরা তাঁকে দেখছিলুম কলকাতার নানা সমাজকর্মে, জনপ্রতিষ্ঠানে, 'ফরোয়ার্ড' অপিসে এবং স্কুল-কলেজে। নব্য বাঙলার এই প্রথম যুবনেত্রীকে কেউ কোথাও পথেঘাটে হঠাৎ দেখেছে—এটি ছিল সেদিনের সংবাদের মতো। মাঝে মাঝে আমাদের কল্লোল ও কালি-কলমের অপিস এবং আর্য পাবলিশিং হাউস এই বিদুষী মহিলার সম্পর্কে সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব ও অবাস্তব নানাবিধ কল্পিত কাহিনী নিয়ে প্রমত্ত কোলাহলে মুখর হয়ে উঠত।

১৯২৮-এর শেষপ্রান্তে কলিকাতা কংগ্রেসের কালে—শোভাযাত্রার সর্বাধিনায়ক হিসাবে চিরতরুণ সুভাষচন্দ্র যখন সামরিক পোশাকে এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পুরোধারূপে কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুকে হাওড়া স্টেশন থেকে সভামণ্ডপের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সেই বাহিনীর পিছনে পিছনে বিশাল এক নারী স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর সর্বাধিনায়িকা রূপে অগ্রসর হচ্ছিলেন লতিকা বসু। সেদিনের সেই এক মাইল লম্বা বিরাট শোভাযাত্রায় মূর্তিমান অ্যাপলোর মতো পরম সুন্দর সুভাষচন্দ্র এবং অপরূপ লাবণ্যে ও গরিমায় শ্রীমতী লতিকা বসু—এঁদের দুজনকে নিয়ে সেদিন লক্ষ লক্ষ বাঙালী পরিবার নানা রসকল্পনায় মেতে উঠেছিল। কলকাতার এই কংগ্রেস অধিবেশনের প্রায় দেড় বছর পরে আমি লতিকা বসুর সংস্পর্শে এসেছিলুম। আমার চেয়ে বয়সে তিনি বছর তিনেকের বড়। বাঙলা ভাষায় তিনি কিছু অপটু ছিলেন এবং বারম্বার আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে ইংরেজিতে বলে যেতেন তাঁর বক্তব্যপূর্ণ রচনা, আর আমি টুকে নিতুম। তাঁর উচ্ছল প্রাণবন্যার সঙ্গে এমন একটি সংযম ও শালীনতার মাধুর্য দেখতুম যেটি আমাকে বার বার আকর্ষণ করে তাঁর কাছে নিয়ে যেত। যেহেতু আমি তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ সেজন্য তিনি কোনও বিষয়ে দ্বিধা ও সংকোচ রাখতেন না, এবং আমারও কোন আড়ষ্টতা ছিল না। তাঁর ওখানেই জনবরেণ্য চিত্রশিল্পী লক্ষ্ণৌয়ের অসিতকুমার হালদারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষও লতিকার বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন।

শ্রীমতী লতিকা রাজনীতিক নেত্রী হয়ে জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি কবি-কন্যা, উচ্চশিক্ষিতা, পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি তাঁর চিত্তের উৎকর্ষ এনে থাকবে। তিনি শিক্ষাজগতের মানুষ, রুচিশীলতা তাঁর সহজাত। সম্ভবত শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর অনুরোধে ডাঃ বিধানচন্দ্র লতিকার বিবিধ

গুণপনা লক্ষ্য করে তাঁকে ভিক্টোরিয়া ইন্স্টিট্যুশনের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করেন, এবং সুবোধ বসুর নানাবিধ বিরূপ আচরণের থেকে লতিকাকে মুক্ত রাখার জন্য চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের নার্স কোয়ার্টারে তাঁর থাকার বন্দোবস্ত করে দেন। প্রকৃতপক্ষে ডাঃ রায় শ্রীমতী লতিকার সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

তারপর আমরা দেখলুম লতিকা বসু নামলেন রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্রের সহকারিণীরূপে।

এই সময়ের আনুপূর্বিক ঘটনা সম্পূর্ণ না জানার জন্য আমি শ্রীযুক্তা লতিকার বাসস্থানে গিয়ে তাঁর মুখ থেকেই তাঁর জীবনকাহিনী শুনছিলুম। একসময় তিনি হাসিমুখে বললেন, হ্যাঁ, আমার মধ্যে বোধ হয় বারুদ ছিল, উনিই ত আমার মধ্যে ছিটিয়ে দিলেন আগুনের ফিন্‌কি। আমি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলুম। কোথায় ছিলেন ছোটকাকা বারীন ঘোষ, কোথায় ছিলেন পিসি সরোজিনী আর কোথায়ই বা রইল দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেসের সুবোধ বসু। আমি ঝাঁপ দিলুম আগুনে, সুভাষের রাজনীতিতে!

—সুভাষবাবু বোধহয় আপনার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়?

—হ্যাঁ, তা হবে—লতিকা বললেন, কিন্তু যাঁর সামনে এসে দাঁড়ালুম তিনি ত তপস্বী, কঠোরপ্রকৃতি এক ব্রহ্মচারী, চিরকৌমার্য ব্রতধারী—। আমি ভয়ে দুর্ভাবনায় সঙ্কোচে জড়োসড়ো।

—তারপর?

হাসছিলেন লতিকা। বললেন, পেতলের হাঁড়ির মতন মুখ করে সুভাষচন্দ্র আমার দিকে চেয়ে শুধু বললেন, আপনার সঙ্গে কাজ করতে পারি শুধু দুটি শর্তে—।

—কি বলুন?

সুভাষচন্দ্র বললেন, প্রথম শর্ত—আমি আমার অপিসে যখন একলা বসে কাজ করব, আপনি আমার ঘরে ঢুকবেন না। আমার মেজবউদির (শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্ত্রী বিভাবতী) ওখানে যাবেন, সেখানেই আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলব।

—দ্বিতীয় শর্তটা কি?

—সেটি হল এই, কোনও সভা সমিতিতে বা সম্মেলনে যদি আপনি এবং আমি উভয়ে একই সঙ্গে উপস্থিত হতে বাধ্য হই, তাহলে আমরা যেন কেউ কারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করি, কাছাকাছি না আসি, একত্র কেউ যেন আমাদের ছবি না তোলে, এবং আমরা কেউ কারোকে যেন না চিনতে পারি!

—মেনে নিলেন দুটো শর্ত ?—আমি হেসে উঠলুম।

লতিকা বললেন, নিশ্চয় ! আমার মধ্যে এসেছিল জোয়ার, ভাবের বন্যা ! আমার নিজের কী পরিচয় ? নানা কারণে আমার মন তখন ক্ষতবিক্ষত ! আমি সুভাষের সকল নির্দেশের ক্রীতদাসী হয়ে গেলুম সেইদিন থেকে। সেদিন থেকে আমার আর কোনও ভয় রইল না। রাজভয় শত্রুভয় সমাজভয় নিন্দা রটনার ভয়—সব ঘুচে গেল ! ডাঃ রায় আমার জীবন-ব্যবস্থার সব দায়িত্বই তুলে নিয়েছিলেন সেদিন, এবং একটি মাত্র নির্দেশ দিয়েছিলেন—আমি যেন কখনো কারোকে আমার হাতের লেখা চিঠি বা কোনও লিখিত নোট না দিই। সাবধান, পুলিসের খানাতল্লাসিতে তোমার হাতের কোন চিহ্ন যেন ধরা না পড়ে ! —ডাঃ রায়ের এই নির্দেশ ছিল।

এদিকে শ্রীমতী লতিকার জেঠতুতো ভগ্নী বুলারাণীর সঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিবাহ দেওয়া যায় কিনা, এ নিয়ে বারীনদা আমার সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। কিন্তু দৌত্যগিরি বা ঘটকালি—এ দুটোতেই আমি কাঁচা। অতএব চিঠিখানা বারীনদাই লিখলেন। সেই চিঠির জবাবে অন্নদাশঙ্কর জানালেন, আমি রায় বটে, তবে আসলে 'ঘোষ'। এক গোত্রে আমি বিবাহ করব না।

"'বিজলী'তে বারীনদা যে লেখাগুলি লিখছিলেন সেগুলি সময়কালের পরিপ্রেক্ষিতে অপদার্থ এবং অন্তঃসারশূন্য। লেখা যদি সুপাঠ্য এবং মনোজ্ঞ হয় তবে সেগুলি গান্ধীবাদ বিরোধী হলেও সুখপাঠ্য। বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, বারীনদার নতুন কোনও বক্তব্য নেই, দেশকর্মের নতুন নির্দেশ কিছু নেই। দাহ্যসামগ্রীর অবশেষ যতক্ষণ থাকে, আগুন ততক্ষণ জ্বলে। যখন সবই ছাই হয়ে যাচ্ছে, তখন কেবলমাত্র ফুঁ দিয়ে আগুন জীইয়ে রাখা যায় না। বিজলীর দীপ্তি কমে আসছিল। শোভা ব'লে গেছেন, বারীনদার খোলে আর বারুদ নেই!

বারীনদা কোথা থেকে টাকা যোগাড় করে এনে বিজলীতে চালছেন বা ম্যানেজার ক্ষিরোদ কীভাবে আয়-ব্যয় চালাচ্ছেন আমি জানিনে। তবে মেটকাফ প্রেসের রমেশ বোস বারীনদার অতিশয় ভক্ত। তিনি ছাপা ও কাগজের সব দায়িত্ব নিয়েছেন—সপ্তাহে যার খরচের পরিমাণ হয়ত টাকা পঞ্চাশেক। আমি পাই সপ্তাহে পাঁচ টাকা, ওতেই আমার খাইখরচ চলে যায়। দিনের বেলা চর্ব্যচুষ্য খাই পাইস-হোটেলে, আর রাত্রের দিকে খাই শ্যামবাজারের মোড়ের কাছে দ্বারিক ঘোষের দোকানে। আধপোয়া ওজনের খাঁটি ঘিয়ের লুচি—দু'খানা ফাউ—এগারো পয়সা, একখানা লম্বা বেগুনভাজা এক পয়সা। মাটির গেলাসের এক গেলাস ঘন ছোলার ডাল, এবং এতখানি একথাবা আলু-কুমড়োর ছক্কা—এ দুটি সামগ্রী বিনামূল্যে।—শেষপাতে দুটো ভাল সন্দেশ আর রসগোল্লা—এক আনা। মোট খরচ চার আনা। প্রতি রাত্রে আমি এক কোণে ব'সে নিয়মিত খাই, সেজন্য আমার প্রতি দোকানীর কিছু পক্ষপাতিত্বও ছিল। দু'চারখানা লুচি ফাউ দিতে তাদের কোনও দ্বিধা দেখা যেত না। আমার পান্‌জাবির গলার কাছে পৈতার গোছাটা বার করে রাখতুম। ওরা ব্রাহ্মণ-ভোজনের পুণ্যঅর্জন করত!

কিছুদিনের মধ্যেই বারীনদা অমূল্যকে ধরে কয়েক শত টাকা ধার নিয়ে বেহালার ওদিকে এক পুরনো বাগানবাড়ি লীজ নিলেন। সম্ভবত ওটা অমূল্যর নামেই নেওয়া হ'ল। সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য ক'রে আমার মধ্যে চাপা অসন্তোষ জমছিল, এবং তার সঙ্গে কতকটা নৈরাশ্য। অদূর ভবিষ্যতের চেহারা আমি ভাল দেখছিনে।

অমূল্য রোগা, কালো, সিপসিপে এবং তার মুখশ্রী ভাল না। সে বিয়ে-থা

করেনি। অগ্নিঋষি বারীনদার সান্নিধ্য পেয়ে সে ধন্য হয়েছিল বটে, কিন্তু এসেছিল এক নিগূঢ় আকর্ষণে। এইটি স্থির হ'ল, বেহালার বাগানবাড়িতে বারীনদা তপশ্চর্যা করবেন, এবং তাঁর সঙ্গে জনৈকা নির্মলা দেবী, তাঁর কন্যা শ্রীমতী কনক ও অমূল্য —এরা থাকবে। মাঝে মাঝে বারীনদা তাঁর বউদিদি ও বুলারানীকে নিয়ে যাবেন। আমি যদি মধ্যে মাঝে যাই তবে বারীনদা হাতে চাঁদ পাবেন।

আমি গিয়েছিলুম একদিন বিব.লের দিকে।

বেহালার বড় রাস্তার ধারে জোড়া শিবমন্দিরের কোলের যে-রাস্তা গেছে পশ্চিমে ওই রাস্তায় আমার আনাগোনা অনেক দিনের। ওই পথটা ধ'রেই যাই ভবানী মুখুজ্যের বাড়ি 'কমল-কুটির'-এ। বয়ঃকনিষ্ঠ ভবানীকে না পেলে তখন সাহিত্যের আড্ডা জমতো না। যাই হোক, ওই রাস্তায় কয়েক পা এগিয়ে বাঁ হাতি এক পুরনো ভূতুড়ে বাড়ি বারীনদা দখল করেছেন। নিচের তলাটা খাঁ খাঁ করছে ছমছমে অন্ধকারে। পুরনো ইমারতের ভিতরে সোঁটকা এক প্রকার প্রাচীন বন্য গন্ধ, এখানে-ওখানে ঝোপড়া-জঙ্গল জটলা, গুহা-গহ্বরের মতো এক-একখানা শূন্য ঘর, চুন-সুরকি-পেটাই মেঝে, পুরনো জরাজীর্ণ দোতলার সিঁড়ি,—সমস্তটা মিলিয়ে বারীনদার এক আজগুবী পরিকল্পনার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

দোতলায় উঠে এলুম। বারীনদা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মধুর ও সহাস্য আপ্যায়নের দ্বারা আমাকে ধ'রে নিয়ে এক মস্ত টেবিলের সামনে বসালেন। বললেন, এই ত চাই, এই হ'ল তোমার আসল জায়গা। এখানে বসে গাঁজা খাও, গুলি খাও, —যা ইচ্ছে তোমার। ওই তোমার জন্যে ওখানে কাঁথা-মাদুর রেখেছি, আজকের মতন গড়িয়ে পড়ো!

মোহনলাল স্ট্রীটের বিজলীর বাড়ি কি করবেন?

কেন, তোমার আপিসটা থাকবে, রাঙ্গা-মা থাকবেন তোমার পাশে! আর দিদি থাকবে দোতলায়। বাকি ছ'খানা ঘরে ভাড়া চলবে! কিচ্ছু ভাবতে হবে না, অমূল্য সব করে দেবে।—বারীনদা আমাকে নিশ্চিন্ত করবার চেষ্টা পেলেন।

ওঘরের ওদিকে এতক্ষণ হাস্যকলরবের মধ্যে নির্মলা, কনক, অমূল্য ও বুলারানী টের পায়নি যে আমি এসে উপস্থিত হয়েছি। এবার ওরা সবাই ছুটে এল এবং নরক গুলজার হয়ে উঠল। অমূল্যর সঙ্গে আমার খুবই হৃদ্যতা, কিন্তু মনে-মনে বুঝি আমার এখানে আসা-যাওয়া ওর পছন্দ নয়।

গল্পগুজবের মাঝখানে আমি বললুম, বারীনদা, আজ আপনার কাছে আমাকে আসতেই হল একটা কারণে। ক্ষিরোদবাবু পর-পর দু' সপ্তাহ আমাকে টাকা দেননি। উনি বলেন, বিজ্ঞাপনের টাকা আদায় হচ্ছে না।

বুলারানী বলল, ছোটকা, আপনি সব ফেলে চলে এসেছেন, উনি কেমন করে চালাবেন ?

বারীনদা স্নেহশীল। বললেন, না না, ফেলে আসিনি। দাঁড়াও, আমি এখুনি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। অমূল্যি, তোমার পকেটে আছে কিছু ?

—আছে বই কি, বারীনদা—কত চাই ?

—বেশি নয়, দশ পনেরো টাকা।

অমূল্য তা'র সোনার বোতাম পরানো সিল্কের পানজাবি থেকে মনিব্যাগটা বার করে বুলারাণীর হাতে দিল। বুলা আমাকে কতক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলল, না, এ টাকা আপনাকে নিতে হবে না !

মনিব্যাগটা বুলা অমূল্যর দিকে সরিয়ে দিল। আমি হাসিমুখে বললুম, টাকা না পেলে আমার চলবে কি করে ? আট আনা দশ আনা রোজ আমার খাই-খরচ। আমি না খেয়ে মরতে বসেছি !

বুলারাণী বলল, ওই কি আপনার না-খাওয়ার চেহারা ? সব আপনার মিথ্যে কথা !

বারীনদা, কনক, অমূল্য, নির্মলা—সবাই হাসছিল। আমি বললুম, বুলা, তোমার লেখাপড়া কামাই হচ্ছে না ?

বুলারাণী বলল, ছোটকা বলে, পাস করে বিদ্যেবুদ্ধি হয় না !

আমি এবারও হাসলুম। বুঝতেই পাচ্ছিলুম, এরা সব বারীনদার বিপ্লববাদের পাল্লায় পড়ে গেছে ! অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে সকলে ছুটছে।

ঘণ্টা দুই সেদিন আমি ছিলুম। এদের সমস্তটাই পর্যবেক্ষণ করছিলুম। আমি 'নিহিলিস্ট' এখনও হইনি, অথবা এখনও 'পেগানিজম' বরণ করিনি। সুতরাং সেদিন ওদের বেপরোয়া, শৃঙ্খলবিহীন ও অদ্ভুত ধরনের পারস্পরিক আচরণ লক্ষ্য করে আমার গালের নিচে চোয়াল দুটো মাঝে মাঝে একটু কঠিন হচ্ছিল !

এক সময় আমি নাছোড়বান্দার মতো উঠে পড়লুম। ওদের কারও অনুরোধ আমার ভাল লাগেনি। আসবার সময় বারীনদা বলে দিলেন, আগামীকাল বেলা দশটার মধ্যে তিনি 'বিজলী' আপিসে যাবেন। আমি বেরিয়ে পড়লুম।

আমার আর্থিক অবস্থা যতটা মন্দ বলে বর্ণনা করলুম, ততটা ঠিক নয়। প্রতি মাসে আমি দু'তিনটে গল্প লিখি এবং কমপক্ষে গোটা পঞ্চাশেক টাকা তার জন্য পাই। সম্প্রতি 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রের সম্পাদক এবং শরৎচন্দ্রের মামা সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমার কাছে আনাগোনা করছিলেন। তিনি এই কাছাকাছি কোথাও থাকেন। তাঁর কাগজের জন্য 'প্রেতিনী' নামক একটি ছোট

গল্প লিখে দিলুম। গল্পটা পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছিল। অতঃপর 'প্রেতিনী' এখানে ওখানে পুনর্মুদ্রিত হয়, এবং পরবর্তীকালে সিগনেট প্রেসের কর্ত্রী নীলিমা দেবী এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

'বিজলী'তে আমি দুজন বিশিষ্ট লেখিকাকে পেয়েছিলুম। একজন শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী, যিনি আমার সহপাঠী গিরিজা সেনের দিদি এবং জয়পুরের মহারাজার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সংসারচন্দ্র সেনের পৌত্রী। জ্যোতির্ময়ী দেবী অল্প বয়সে তিন-চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বিধবা হন। ওদের মধ্যে অরুণ এবং অশোকার বয়স তখন খুবই কম। মেয়ে-লেখকদের মধ্যে এমন ক্ষুরধার সমাজ ও সাহিত্য-চেতনা খুব কম লেখিকার মধ্যেই সেদিন দেখেছি। তাঁকে অনেক তাগাদা দিয়ে 'বিজলী'তেই বোধ করি তাঁর প্রথম লেখা ছাপি। তাঁকে আমি দিদি বলতুম এবং তিনি তাঁর জীবনের ছোট ছোট কাহিনী অনেকটা যেন স্বীকারোক্তির মতোই আমাকে ব'লে যেতেন। আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু কবি কান্তি ঘোষ—যিনি প্রথম ওমর খৈয়ামের 'রুবাই' বা ছন্দকাব্য বাঙ্গলায় অনুবাদ করেন তাঁর সঙ্গে জ্যোতির্ময়ী দেবীর পরিচয় ছিল। পরবর্তীকালে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্সকে ধরাধরি করে জ্যোতির্ময়ী দেবীর একখানি গল্প-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করি। তিনি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ ও ছোটগল্প লিখতেন। কিন্তু লিখতেন কম। আমার চেষ্টা ছিল, তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করুন।

আমার দ্বিতীয় দিদি হলেন কবি প্রিয়ম্বদা দেবী। তিনি স্যার আশুতোষ চৌধুরী ও প্রমথ চৌধুরীর ভগ্নী শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ীর কন্যা। আমার বয়স যখন চব্বিশ, প্রিয়দিদির বয়স তখন চৌষট্টি, এবং প্রসন্নময়ী তখন আশী পেরিয়েছেন। প্রিয়ম্বদা ছিলেন স্বভাবকবি। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে প্রিয়দিদি একটি শিশুপুত্রকে নিয়ে বিধবা হন এবং শিশুর নাম হয় অংশু। কিন্তু অংশুরও এক সময় মৃত্যু ঘটে। সেই শিশুর নামেই প্রিয়দিদির প্রথম ছোট একটি কবিতার বই 'অংশু' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়। বইটির শেষ দু'কপির একখানি প্রিয়দিদি আমাকে উপহার দেন।

একটি পোস্টকার্ড কিংবা বাবুর্চি মারফৎ ছোট্ট দু'লাইনের চিঠি, ব্যস—আমি তখনই দৌড়তুম ঝাউতলায় প্রিয়দিদির বাড়িতে। বাড়ির নাম ছিল 'তারাবাস'। প্রিয়দিদির স্বামীর নাম ছিল বোধ করি তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন পার্ক-সার্কাস অঞ্চল এবং প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড সবেমাত্র নির্মাণ করা চলছে।

প্রসন্নময়ী ও প্রিয়ম্বদা দেবীর কাছে এলেই আমার মনে হত আমি যেন উনিশ শতাব্দীর কোনও প্রাচীন বৃক্ষচ্ছায়ার নিচে এসে বসে তার স্নিগ্ধ মধুর

হাওয়ায় কপালের ঘাম মুছছি। প্রিয়দিদির বাড়ির দুদিকেই মস্ত বাগান—আম জাম তাল সুপারি নারিকেল প্রভৃতি নানা গাছ এবং কোলে-কোলে অজস্র ফুলের সমারোহ। বাগানবাড়িটি উত্তরে ও দক্ষিণে সুলম্বিত এবং দক্ষিণ অংশে গিয়ে এই বাগান সংকীর্ণ হয়েছে। বাড়ির পূর্ব ও পশ্চিমে বড় রাস্তা। এ বাড়িতে মাতা ও কন্যা ছাড়া আরও থাকে তিন-চারজন—তারা চাকরবাকর ঝি ও বাবুর্চি। আমি গেলেই আউট-হাউসের রান্নাঘরে কিছু চাঞ্চল্য দেখা দিত। ওঁরা যথেষ্ট ধনসম্পত্তির মালিক ছিলেন।

প্রিয়ম্বদা আমার আবৃত্তি পছন্দ করতেন। তৎকালে রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা আমার মুখস্থ ছিল এবং আমি নানা সভা সমিতি ও সম্মেলনে আবৃত্তি করার জন্য আমন্ত্রিত হতুম। অনেক সময় মনে হত রবীন্দ্রনাথের অগণিত সংখ্যক কবিতা যেন আমারই রচিত এবং সেগুলি আবৃত্তি করার কালে বহু শ্রোতা ভাবতো, ওগুলি আমারই বক্ষের বিদারণ ও বিস্ফোরণ! প্রিয়দিদির কাছে বসে আমি তাঁর 'অংশু' থেকে যে কোনও কবিতা কেবলমাত্র সেদিনের জন্য আবৃত্তি করতুম। আবৃত্তির পর দেখতুম তাঁর দুই চোখ অনুপ্রাণনায় টসটস করছে। একসময় তিনি বলতেন, এ কি আমারই লেখা? কবে লিখলুম! এ কবিতা যে নতুন করে জন্মাল তোমার মুখে! অংশু নেই, কিন্তু সে যেন বইয়ের ভিতর থেকে উঠে আমার সামনে দাঁড়াচ্ছে! আচ্ছা, তুমিই বলো ত?

আমি প্রিয়দিদির মুখের দিকে তাকাতুম।

—বলো ত, সেদিন কে ছিল আমার? মামারা আমাকে ছোটর থেকে ক্ষেপাতেন, আমি নাকি সুন্দরী, আমি নাকি মেমসায়েব!—প্রিয়দিদি বলছিলেন, কিন্তু সব ত শেষ হয়ে গেল যখন চব্বিশ বছরে পা ফেললুম। কেউ ছিল না আমার সামনে সেদিন। ছিল শুধু অংশু আর আমার কবিতা লেখার বাতিক।

—সেই শোকসন্তাপের দিনে যখন চারিদিক মরুভূমির মতন খাঁ খাঁ করছিল, কোন দিকে কোনও আশা-প্রত্যাশা নেই—সেই সময়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন এক দীর্ঘকায় বিরাট পুরুষ—

প্রিয়দিদি নারকেল গাছের শীর্ষের দিকে একবার তাকালেন, পরে বললেন, হ্যাঁ, সেই প্রথম দেখলুম গোদাবরী তীরের বিশাল শাল্মলীতরু! ভেবে ছাখো তুমি, আমার বয়স মাত্র চব্বিশ, রবীন্দ্রনাথের তখন তিরিশ বছরও হয়নি! তিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, প্রিয়, মৃত্যু অনেক বড়, কিন্তু জীবন তার চেয়েও বড়। তুমি উঠে দাঁড়াও, তোমার চোখের জল তোমার কবিতার মধ্যে মিলিয়ে দাও! সেদিন রবিদা যেন অহল্যা পাষাণীকে উদ্ধার করেছিলেন! উনি

আমাদের দূর আত্মীয়, কিন্তু ঘনিষ্ঠ। একদিন হাসিমুখে বলেছিলুম, রবিদা, তোমার কবিতার মধ্যে আমার কবিতা যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল! যাই হোক, তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছিলে, রবিদার 'লেখন' কবিতায় বইটিতে ভুল করে আমার কয়েকটি কবিতা উনি নিজের কবিতা ভেবে ওই বইতে যোগ করে দেন?

আমি খুব হাসলুম। বললুম, 'লেখন' এবং আপনার কবিতার সম্বন্ধে ওঁর বিবৃতিটি বড়ই মধুর।

প্রিয়দিদি বললেন, সত্যি, তোমাকে ঠিকই বলছি। ওঁর কথা ভাবলে আমার অন্য ভাবনা থাকত না। আমি কবিতা লিখতুম একমনে। কিন্তু সে-মন ওঁরই মন। আমার হাত দিয়ে রবিদা যেন ওঁর নিজের কবিতাই লিখিয়ে নিতেন। 'লেখন' বইটাতে বিভ্রাট ঘটল এই কারণেই। কার কবিতা কোনটা ধরাই গেল না! আনন্দের কথা এই, সেই রবিদা আজও তেমনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আমার জন্য তখন খাবারের আয়োজন হয়েছে।

এরপর অনেকদিন পর্যন্ত প্রিয়ম্বদা বেঁচে ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি তাঁর সম্পর্কের এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে পাঠান আমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে। আমাকে তাঁর কী প্রয়োজন ছিল আমি জানিনে। তখন আমি সুদূর গহন হিমালয়ের মধ্যে বিচরণ করে ফিরছিলুম। ফিরে এসে সংবাদপত্রে একদা দেখেছিলুম, কবি প্রিয়ম্বদা দেবী মৃত্যুর আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিরিশ হাজার টাকার একটি 'এনডাউমেণ্ট' করে যান।

সাহিত্য জগতে আমার তৃতীয় দিদি যিনি—তিনি আমার খুব কাছাকাছি। আমার সমবয়স্ক সহপাঠী নবকৃষ্ণ ঘোষ—যার সঙ্গে প্রতি পরীক্ষায় আমার 'টাই' হতো ইতিহাস ও ভূগোলে,—দুজনের মধ্যে কে ফার্স্ট হয়, তারই পিঠোপিঠি বড় বোন শ্রীমতী রাধারাণী আমার চেয়ে প্রায় দু' বছরের বড়। ওদের বাবা ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এবং তিনি অবসর গ্রহণের পর আমাদের পাড়ায় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের বাড়ির ঠিক উত্তরে দীনবন্ধু লেনে থাকতেন। মনে আছে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র বলে নবকৃষ্ণকে আমরা কজন 'বাঙ্গাল' বলে ক্ষেপাতুম। যাই হোক, রাধারাণীর প্রথম বিবাহ হয় যখন তাঁর মাত্র তেরো বছর বয়স। রোহিল্লাখণ্ডের জনৈক ইঞ্জিনিয়ার মিঃ দত্তর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বছরেই ভদ্রলোকের মৃত্যু ঘটে এবং কিশোরী রাধারাণী প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগেই বিধবার সজ্জায় দেখা দেন। তখনও রক্ষণশীল সমাজের নৈতিক অনুশাসন প্রবল।

রাধারাণী সেই সজ্জা নিয়েই পড়াশুনো এবং সাহিত্য চর্চায় মন দেন। 'কল্লোল'-এ যখন তাঁর লেখা বেরোয় তখন তাঁর বয়স বোধ হয় কুড়ি-একুশ। তাঁর ছোট ছোট রস-কাল্পনিক কবিতা পড়ে 'কল্লোল-কালিকলম' গোষ্ঠীর মধ্যে সাড়া পড়ে যায় এবং নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। রাধারাণী তখন অধিকাংশ কাল থাকেন ভবানীপুরে চন্দ্র চাটুয্যের লেনে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ মামাশ্বশুর সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক সি-আই-ই মহাশয়ের বাড়িতে। এই সময়ে তাঁর দূরসম্পর্কীয় ভাই-সুবাদে বহুজনপ্রিয় সাহিত্যকর্মী, কবি ও কৌমার্যব্রতধারী নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে নানা অছিলায় তাঁর রোমান্স ঘনীভূত হয়। নরেন্দ্র দেব ছিলেন লেখক সমাজের দল-ছাড়া গোত্রছাড়া। অর্থাৎ 'ভারতী গোষ্ঠী' ও 'কল্লোল-কালিকলম' গোষ্ঠীর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ হয়েও তিনি আপন চরিত্রের নিষ্কলুষ শুচিতা বজায় রাখতে জানতেন। কাজী নজরুল তাঁকে অনেক ক্ষেপাতো, কিন্তু নরেন্দ্র দেব তাঁর জীবনেও একটি অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করেননি! তিনি কলকাতার এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান এবং ঠনঠনে কালীর মন্দিরের মুখোমুখি ছিল তাঁর নিজ বাড়ি। তিনি 'জে-টমাস' কোম্পানীতে চাকরি করতেন। অনেকেই তৎকালে জানত, নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে রাধারাণীর একটা অনির্দিষ্ট ও অনির্ণেয় সম্পর্ক এবং নরেনদা তখন রাধারাণীকে 'অনুজা' বলে উল্লেখ করতেন। অনুজার অর্থ কনিষ্ঠা ভগ্নী। বিবাহের পূর্বকাল পর্যন্ত এই সংজ্ঞাটি পরিচিত সমাজে বজায় রেখে চলাটা নরেন্দ্র দেবের সুরুচি, সৎপ্রকৃতি ও শালীনতার কথাই বলে।

এর পরের বছরে রাধারাণী ও নরেন্দ্র দেব রক্ষণশীল সমাজনীতির শাসনকে এড়িয়ে পূর্বকল্পিত ব্যবস্থা মতো সঙ্গোপনে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে উভয়ে গৃহত্যাগ করেন এবং হাওড়ার অন্তর্গত লিলুয়ার এক রেল-কলোনির বাড়িতে উঠে সমারোহ সহকারে উভয়ের বিবাহ হয়। সেই বিবাহ বাসরে আমি নিমন্ত্রিত হয়েছিলুম।

অতঃপর রাধারাণী দেবীর সঙ্গে যখন আমার প্রকৃত ঘনিষ্ঠতা হয় তখন তাঁকে দেখলুম মুখরা, চতুরা, প্রখরা—কিন্তু মধুরা! তাঁকে আমি 'রানুদি' বলে সম্ভাষণ করেছিলুম। তিনি চৌদ্দ বছর বিধবার সজ্জায় থেকে—সাতাশ বছরের পরিণত যৌবনে এসে সিঁথিতে সিঁদুর ও রাঙ্গাপাড় শাড়ি পরিধান করলেন এবং হিন্দুস্থান পার্কে তাঁদের 'ভালো-বাসা' নামক বাড়িতে এসে উঠলেন। এই বাড়ির নম্বর হল ৭২, সেই কারণে আমি এ-বাড়ির নাম দিয়েছিলুম, 'বাহাত্তুরে ভালবাসা'! যাই হোক, রাধারাণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়, এবং ওই 'ভালো-বাসা'য় প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যের বহু দিকপাল ওই কবি-দম্পতির আকর্ষণে

এসে মজলিস জমিয়ে তুলতেন। আমাদের অনেকের বন্ধু শরৎ-স্তাবক ও 'বাতায়ন' নামক সাপ্তাহিকের সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের মুখে শুনতুম, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রাধারাণী ও নরেন্দ্র দেবের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতায় ও অন্তরঙ্গতায় খুবই মধুর ছিল।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাধারাণীর কথা নিয়ে যখন তোলাপাড়া করছি তখন একদিন সকালে ভারতপ্রসিদ্ধ দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর কন্যা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে 'বিজলী' আপিসে এলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য বিপ্লবের অগ্নিঋষি বারীন ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা। সেখানে আমার উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল না এবং তাঁদের কথাবার্তাও আমি শুনিনি। কিন্তু সেই সূত্রে ষোড়শবর্ষীয়া মৈত্রেয়ীকে দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছিলুম। এই বালিকার কমনীয় মুখশ্রী এবং শান্ত মধুর লাবণ্য, পরে শুনেছি, রবীন্দ্রনাথকেও অভিভূত করেছিল।

বিজলীতে সমালোচনার জন্য মৈত্রেয়ী তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উদিতা' বইটি রেখে যান। কিন্তু পরে সেই সমালোচনায় কাব্য অপেক্ষা কবি প্রশস্তির পরিমাণ বেশি ছিল কি না, এখন আর অতটা মনে নেই। তবে 'উদিতা' বইটির সুদীর্ঘ একটি ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। কাব্যসমীক্ষার দিক থেকে সেই ভূমিকাটি ছিল অনবদ্য।

এই সময় বিজলী সম্পাদকের নিকট দু'জন মহিলা নিয়মিত চিঠি লিখতেন এবং প্রায়ই গল্প, কবিতা ও কথিকা পাঠাতেন। একজন লিখতেন রাঁচির অন্তর্গত 'হিনু' অঞ্চল থেকে—তিনি নীলিমা চট্টোপাধ্যায়। অন্য জনের নাম রমলা রায়—লিখতেন মালদহ থেকে। তাঁদের রচনা বা চিঠি বারীনদার কাছেই আসত এবং বারীনদাই হয়ত মধ্যে মাঝে প্রাপ্তি-স্বীকার করতেন। তাঁদের এক আধটা লেখা ছাপা হ'ত, নইলে বাকি লেখাগুলো জঞ্জালের ঝুড়িতেই চলে যেত।

হঠাৎ এক সময় দেখলুম ওঁদের চিঠি বা লেখা আমার নামে আসতে আরম্ভ করল এবং আমি খোঁজ নিয়ে জানলুম, বারীনদাই চিঠি দিয়ে ওদেরকে এই রূপই নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ চিঠিপত্রের জবাব দেওয়ার দায় থেকে বারীনদা নিজে নিস্কৃতি পেতে চান। কিন্তু তাঁর এই নির্দেশের ফলস্বরূপ এই দুই অজানা ও অচেনা লেখিকা, বিশেষ করে ওঁদের মধ্যে একজন—তাঁর কালক্রমিক আচরণের পরিণামে আমার জীবনে যে বিড়ম্বনা ঘটিয়ে তোলেন সেটি যথাসময়ে বলব।

সে যাই হোক, 'বিজলী'তে তখন তিনটি উপন্যাস এক সঙ্গে বেরোচ্ছে, তার মধ্যে 'কাজল-লতা' উপন্যাসটি আমার লেখা। নলিনী সরকারের 'চাটিম চাটিম' বেশ নাম করেছে। নজরুলের পরিহাস সরস কবিতা বেরোচ্ছে একটির পর একটি। নজরুল তখন ডি-এম লাইব্রেরির গোপালদাস মজুমদারের সঙ্গে দাবা খেলা নিয়ে পাগল। সম্প্রতি সে চার না পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বেগুনি রংয়ের একখানা নতুন মোটরগাড়ি কিনেছে। গাড়িখানা তার পক্ষে কেনা একান্তই দরকার ছিল কিনা, সে নিজেই জানে না। কিন্তু গাড়িখানা দিনরাত্রির অধিকাংশ সময় ডি এম লাইব্রেরির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে এবং কাজী দোকানের ভিতরে অথবা পাশের মেসবাড়ির দোতলায় একখানা ঘরে গোপাল মজুমদারের সঙ্গে অবিশ্রান্ত দাবা খেলতে খেলতে হাস্যমুখর হয়। সে খেলা এমনি যে, শনিবারে বসে মঙ্গলবারে ওঠে!

নজরুলকে আমরা কাজী বলতুম এবং তাকে কোনও শাসন, বাঁধন, অথবা সাংসারিক দায়িত্বে ধরা যেত না। জাতশিল্পীর সকল প্রকার গুণপনা ছিল তার মধ্যে। কাণ্ডজ্ঞানহীন বেপরোয়া আড্ডাবাজি ছিল তার স্বভাবসিদ্ধ। কে তাকে কখন কোথায় ডেকে নিয়ে গেল, অনেক সময় তার খোঁজ পাওয়া যেত না। গান গাইতে আরম্ভ করলে কেউ তাকে ছাড়ত না। তার ডাক পড়ত মেয়েমহলে যখন-তখন। এর মধ্যে একবার কবে যেন সে ঢাকায় গিয়ে কি সব কাণ্ডকারখানা বাধিয়ে এসেছে। সে বাঙ্গালীমাত্রেরই প্রিয়, সকলের চোখের মণি, লেখক বা সাহিত্যকর্মী-সমাজ তার প্রতি ভালবাসায় উচ্ছ্বসিত, তার যৌবনচ্ছটা ও প্রাণশক্তির প্রবলতা সকলকে সম্মোহিত করে—সেই কারণে তার কোনও প্রকার অপযশ রটলে কলকাতার সাংবাদিকরা সেগুলি কাগজে ছাপতেন না। যাই হোক, এই সময়টায় কাজী থাকত বাহির-সিমলার সীতানাথ রোডে, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের জংশনের কাছাকাছি —ডি এম লাইব্রেরী থেকে পাঁচ ছয় মিনিটের হাঁটাপথ। এই পাড়ায় নজরুলের বসবাসের পক্ষে কতকগুলি সুবিধাও ছিল। সে যখন আত্মহারা আড্ডায় বা দাবাখেলায় মশগুল হয়ে থাকত, তখন তার বাড়ির বাজার-হাটের খোঁজখবর রাখত ডি এম লাইব্রেরীর অতি ভদ্রপ্রকৃতি এবং 'ওমর খৈয়াম'-এর দ্বিতীয় অনুবাদক সতীশ মিত্র, সুখদুঃখের খবর রাখত চিরনিরীহ ও অজাতশত্রু পবিত্র গাঙ্গুলী এবং আরও কেউ কেউ। টাকাকড়ি যোগাতেন গোপালদাস মজুমদার এবং ডি-এম থেকে নজরুলের একটির পর একটি বই বেরোত। বলা বাহুল্য, গোপালে-নজরুলে ঘনিষ্ঠতা ছিল আন্তরিক, সেই কারণে টাকাকড়ি

নেবার আগে ও পরে নজরুল চোখ বুজে সই করে দিত যে কোনও দলিলে। এর পরিণাম কি হয়েছিল সঠিক আমার জানা নেই।

এই সময় 'কল্লোল-কালিকলম'-এর প্রত্যেকটি লেখকের ঘোরতর দারিদ্র্যের যুগ চলছে। তাদের অনেকের একটু আধটু খ্যাতিও হয়েছে, এবং প্রত্যেকের এক-আধখানা বইও বেরোচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেক লেখকই কয়েকখানা করে 'কমপ্লিমেণ্টারি' কপি পান। সেইসব বইয়ের অনেকগুলি সঙ্গোপনে আসতো ডি এম লাইব্রেরীতে। পনেরো টাকার বই এনে দিতে পারলে গোপালদা তখনই পাঁচ-সাত টাকা বার ক'রে দিতেন। এতে লেখকরা কৃতার্থ বোধ করত। এটা উঞ্ছবৃত্তি, এতে দারিদ্র্য ঘোচে না, কিন্তু দরিদ্র ও ভাগ্যহত লেখকরা এতে উপকৃত হত।

গোপালবাবুর সঙ্গে তৎকালীন নব্য লেখকদের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। তাঁর দোকান ছিল কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট আর মানিকতলার মোড়ের কাছাকাছি সরু এক ফালি পশ্চিমমুখো ঘরে। তিনি একজন জাতীয়তাবাদী, মোটা খদ্দর ছাড়া তিনি অন্য কিছু পরেন না এবং সেই খদ্দর তাঁর কৃষ্ণ কটিতটে গেরো বাঁধাও থাকতে চায় না। তিনি শ্যামবর্ণ। একদা তিনি বারীন ঘোষ, উপেন বাঁড়ুয্যে প্রভৃতির সেবক ছিলেন এবং ১৯২০ সালের আমলে বহুবাজারের বিজলী আপিসের বারান্দায় জনৈক মিঃ দে-কে নিয়ে প্রথম ডি এম লাইব্রেরীর পত্তন করেন। তিনি একদা সাইকেলে বইয়ের বাণ্ডিল বেঁধে কমিশনে বিক্রি ক'রে বেড়াতেন। কষ্ট ও পরিশ্রম করেছেন তিনি অনেক। গোপালবাবু সেই যুগে নজরুলের সংস্পর্শে আসেন, এবং বারীন ঘোষ প্রভৃতির বই ছেপে প্রকাশক হয়ে ওঠেন। ক্রমে তিনি নতুন বই বা উপন্যাসের দরুন লেখকদেরকে অসময়ে টাকা দাদন দিতে থাকেন কিন্তু লেখকরা পূর্বতন সংস্করণের হিসাব চাইলে তিনি দুঃখিত হন। এইভাবে তাঁকে ঘিরে একটি উর্ণনাভের জাল সৃষ্টি হয় এবং ওই জালে এক-একটি মক্ষিকা এসে যেন আটকিয়ে যায়! এই মক্ষিকারা হল নজরুল, অন্নদাশঙ্কর, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর, মানিক, শিবরাম, বনফুল, প্রেমেন্দ্র প্রভৃতি। ওঁর ওই অর্থনীতিক উদারতার ফাঁদে আমিও পা দিয়েছি বার বার। একবারও আমাকে উনি ঠকাননি, বরং বহুবার অসময়ে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তবু ওঁর প্রতিষ্ঠান থেকে মুক্তিলাভের কামনায় বার বার অনেকের মতো আমারও নাভিশ্বাস উঠেছে! এক সময়ে গোপালবাবু লেখকদেরকে সন্দেশ-রসগোল্লা খাওয়াতেন প্রচুর। কিন্তু সেই রসগোল্লা ঠাসাঠাসি করে খেতে-খেতে গলায় আটকিয়ে আমাদের অনেকের চোখ দুটোও রসগোল্লার মতো টসটসে হয়ে বেরিয়ে আসত!

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের কাল রাজনীতিক ও সামাজিক বিপ্লবের বছর। এই বছরে মেয়েদের মধ্যে প্রথম ব্যাপক উত্তেজনা আসে এবং তারা হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষ্য করে পথে নেমে আসে। অবরুদ্ধ জলস্রোত যেন বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল। যারা ছিল অসূর্যম্পশ্যা তারাও ঘরের কোণে থাকেনি। যারা উৎপীড়িতা, শাসনভয়ভীতা, প্রবঞ্চিতা, স্বামী-পরিত্যক্তা, কুরূপা, অরক্ষণীয়া, অকাল-বিধবা—তারাও পিল-পিল ক'রে বেরিয়ে এল। অন্যদিকে রক্তবিপ্লববাদীদের কর্মতৎপরতা এ বছর থেকে আরও ঘনীভূত হল, এবং তার সংবাদ পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের পথে-ঘাটে, শহরে-বাজারে গ্রামে গঞ্জে—সর্বত্র সবিস্তারে রটে যাচ্ছিল। ফাঁসী যাওয়ায় ছেলেরা ভয় পাচ্ছে না, গোয়েন্দাদের কেন্দ্রে দৈহিক উৎপীড়নকে তারা গ্রাহ্য করছে না, তারা যেন মরীয়া। কলকাতায় মিটিং আর মিছিল, পিকেটিং আর লাঠিচার্জ, ধর-পাকড় আর কারাগার—এসব নিয়ে মেয়েরাও মেতে উঠেছে। কোলে-কাঁকালে শিশু নিয়ে মেয়েরা গিয়ে ঢুকছে সেণ্ট্রাল আর প্রেসিডেন্সি জেলে। এরই ভিতর দিয়ে দু'জন তরুণী নেত্রী মহিলা সত্যাগ্রহীদেরকে পরিচালনা করছিলেন। তাঁদের একজন হলেন শান্তি দাস, অন্যজন জ্যোৎস্না মিত্র। এই সময়কার রাজনীতিক উদ্দীপনার মধ্যে যে কয়েকজন গণনেতার আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কারাবরণ করেছিলেন। যাই হোক পরবর্তীকালে বন্ধুবর হুমায়ুন কবির বিবাহ করেন শ্রীমতী শান্তি দাসকে, এবং তৎকালের দৈনিক 'বঙ্গবাণী'র সম্পাদক বন্ধুবর গোপাললাল সান্যাল বিবাহ করেন শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্রকে। গোপাললালের বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়ে আমার নতুন জুতোজোড়াটা হারিয়ে গিয়েছিল। তবে সেই আসরে উপস্থিত পরিহাসরসিক নলিনীকান্ত সরকারের মুখে "প্রলয় নাচন নাচলে যখন হে নটরাজ (তোমার) জটার বাঁধন পড়ল খুলে—" এই গানটির আনন্দদায়ক প্যারডি শুনে হেসে লুটোপুটি খেয়েছিলুম। গানটি অবশ্য তিনি গলা নামিয়ে চুপি চুপি গেয়েছিলেন এবং ওতেই আমার জুতো চুরির ক্ষতিপূরণ হয়ে গিয়েছিল! অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্রের পুত্র বিনয়েন্দ্র আর্য পাবলিশিং হাউসে ছাত্রাবস্থায় এসে আমাদের সঙ্গে গল্প-গুজব করতেন। তখন তিনি বোধ হয় এম-এ দিচ্ছেন। মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি।

এই বছরেই 'কল্লোল' বন্ধ হয়ে আসছিল।

আমাদের অনেকের ঘনিষ্ঠ আড্ডাটাও ভেঙ্গে যাবার যোগাড় হচ্ছে। তখন আমরা ছোট ছোট দলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। অচিন্ত্যর নিত্য সহচর ছিল বয়ঃকনিষ্ঠ ছাত্র শ্রীমান বিষ্ণু দে আর ভবানী মুখুজ্যে। বিকাল বেলায় যেখানেই অচিন্ত্য, সেখানেই বিষ্ণু। বিষ্ণু ছিল মনোযোগী ছাত্র, বিদেশী সাহিত্যের পোকা। আড়ালে-আবডালে সে তখন এক-আধটুকরো কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছে।

অবিবাহিত অচিন্ত্য যখন 'বিজলী'তে লিখছে 'বিবাহের চেয়ে বড়' নামক উপন্যাসটি তখন একদা অচিন্ত্যর বিয়ে হয়ে গেল। ওর দেবতুল্য বড় ভাই জিতেনবাবু মেয়ে দেখাদেখি ক'রে এই বিবাহ স্থির করলেন। অনেকের সঙ্গে নজরুলও গেল বরযাত্রী হয়ে। আমি ছিলুম বউভাতে। অচিন্ত্য তখন থাকত গিরিশ মুখার্জী রোডে এবং ওদের বাড়িওয়ালা ছিল আমাদের এক বন্ধু নৃপেন্দ্রগোপাল মিত্র। সে ডাকাবুকো লোক। তখন তার আরেক বাড়ি ছিল মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামের থেকে একটু দূরে জোয়ালভাঙ্গা গ্রামে। সে ছিল মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের হর্তাকর্তা। ওই জেলা বোর্ডেরই এক সভায় মেদিনীপুরের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগলাসকে গুলি করে হত্যা করেছিল প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য। প্রদ্যোৎ যখন গুলি করে পালাচ্ছিল সেই সময় নৃপেন ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে। প্রদ্যোতের ফাঁসি হয়, কিন্তু নৃপেন 'রায় সাহেব' খেতাব পায়। মেদিনীপুরে পর পর তিনজন ম্যাজিস্ট্রেটকে বিপ্লবীরা হত্যা করে। তাঁরা হলেন পেডী, বার্জ ও ডগলাস।

প্রতি মঙ্গল এবং বুধবার 'বিজলী'র কাজ নিয়ে আমার সারাদিন মেটকাফ প্রেসে কেটে যেত। ওই কাজের ভিড়ের মধ্যেই এক-একদিন এসে দাঁড়াত আমার প্রিয় বন্ধু ও সুলেখক আবদুল কাদের। সে 'জয়তী' নামে একখানি সুপাঠ্য মাসিকপত্র প্রকাশ করত। সে আসত আমার লেখা চাইতে। যাই হোক এই দুদিন অবিশ্রান্ত খেটেখুটে বৃহস্পতিবার দুপুরে 'বিজলী' বার করে দিতুম এবং দুখানা কাগজ হাতে নিয়ে চলে যেতুম সোজা আর্য পাবলিশিং হাউসে। সেখানে সেই দুপুরে প্রতি সপ্তাহে আসতেন শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু। ইনি 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে'র সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ বসুর স্ত্রী এবং রাজনারায়ণ বসুর জামাতা কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কন্যা। কুমুদিনী বারীনদার আপন মাসির মেয়ে।

আমার দুর্ভাগ্য কুমুদিনীর হাতে এই কাগজখানি স্বহস্তে দিতে হত, এবং সেই কাগজটি নিয়ে এই বর্ষীয়সী মহিলা গম্ভীর মুখে চলে যেতেন। ওঁদের

বাড়ি এই কাছাকাছি গোলদীঘি অঞ্চলে। ওঁর গাম্ভীর্যের কারণ, বিজলীতে বারীনদা ধারাবাহিকভাবে তাঁর 'আত্মকথা' লিখে যাচ্ছেন। দেশপ্রসিদ্ধ অগ্নিযুগের নেতা তাঁর কৈশোর থেকে সমগ্র যৌবনকাল অবধি কি প্রকার অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে সর্বত্র ঘুরেছেন, 'বিজলী'তে তারই ইতিবৃত্ত ছাপা হচ্ছিল। কুমুদিনীর সহিত বারীনদার তরুণ বয়সের সংসর্গের ছবি এই ইতিবৃত্তের অন্যতম উপজীব্য। রক্ষণশীল বাঙালী সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা, যিনি রবীন্দ্রনাথকেও নানা প্রকারে লাঞ্ছনা করতে কসুর করেননি, সেই কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কন্যা তাঁর প্রবীণ স্বামীর নিকট এ ব্যাপারে কি প্রকার কৈফিয়ত দিচ্ছিলেন, সেটি অবশ্য জানা যায়নি। কিন্তু বারীনদাকে বহু অনুরোধ করেও তাঁর এই 'আত্মকথা' আমি থামাতে পারিনি। আমার প্রতি সন্দেহবশত তিনি নিজেই এ লেখার ফাইন্যাল প্রুফ দেখে দিতেন।

অমনি একটা বুধবারে বেলা তিনটে নাগাদ যখন আমি মেটকাফ প্রেসে অতিশয় কাজে ব্যস্ত, তখন হঠাৎ চমকিয়ে উঠে মুখ তুলে দেখি শ্রীমতী বুলারানী আমার পাশে দাঁড়িয়ে। মুখে চোখে তার প্রবল উত্তেজনা। রুদ্ধ আবেগের সঙ্গে সে আমার হাত ঠেলে দিয়ে বলল, চলুন, এখনই চলুন আমার সঙ্গে—

সে যেন কান্না চাপছিল। বললুম, কোথায় যাব? কি হয়েছে?

বুলা বলল, আপনাকে আমি নিতে এসেছি। যেখানে আপনি নিয়ে যাবেন সেখানেই আমি যাব। চলুন—উঠুন—

আমি উঠে দাঁড়িয়ে সভয়ে এদিক ওদিক তাকালুম। ছাপাখানার চার পাঁচজন 'ভূতকে' নিয়ে আমি কাজে মেতেছিলুম। বুলার কথায় শুধু আমার বুকের মধ্যেই কাঁপন ধরল না, আমার পা দুখানাও ঠক ঠক করছিল। আমি বললুম, এ ছাপাখানায় তোমার ছুটে আসা উচিত হয়নি, বুলা। তুমি নাবালিকা নও, তোমার বদনাম রটতে পারে। বাড়িতে কি তুমি ঝগড়া করে এসেছ?

হ্যাঁ—বুলা বলল, মা'র সঙ্গে আমার কিছুতেই বনিবনা হবে না।

আচ্ছা, চুপ করো, এখানে নয়—এই বলে আমি ভিতর-বাড়ির দরজায় এগিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলুম রমেশবাবুকে। তিনি মধ্যাহ্নভোজনের পর দোতলায় গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমার ডাকে নেমে এলেন। বুলাকে তিনি ভালই চেনেন। আমি বললুম, একে আপনি দোতলায় নিয়ে যান মেয়েদের কাছে।

বুলা বলল, কখন আপনার কাজ শেষ হবে?

অন্তত দেড় কি দু ঘণ্টা,—আজ যে বুধবার! যাও, তুমি ওর সঙ্গে ওপরে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি ডেকে পাঠাবো ঠিক সময়!

রমেশবাবু বুলাকে সসম্মানে ভিতর মহলে নিয়ে গেলেন। আমি এসে আবার প্রুফ দেখতে বসলুম।

শ্রীমতী বুলার এই হঠকারিতা ও মন-উচাটনের পিছনে আমার পরম শ্রদ্ধেয় বারীনদার কিছু অসঙ্গত ও যুক্তিহীন অনুপ্রেরণা ছিল। বুঝতে পারা যাচ্ছে আমার চোখের আড়ালে এবং অজ্ঞাতে বারীনদা তাঁর এই ভাইঝিটিকে নানা-ভাবে তাতিয়ে তুলেছিলেন। বুলার দোষ নেই। বুলা সরল, মিষ্টপ্রকৃতি, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সে হয়ে উঠেছে অপরিণামদর্শী। ওর সম্বন্ধে শুধু এইটুকু শুনেছিলুম, নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় ওকে গান শেখাচ্ছিলেন। নলিনীদা তখন কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। যাই হোক, মনে মনে স্থির করলুম, আজ বারীনদার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করব। এতে আমার 'বিজলী'র চাকরি থাকুক আর যাক্।

চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুর মোড়ে এসে আমি বুলাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলুম। নির্দেশ দিলুম চলো বেহালায়। বুলার উত্তেজনা তখন কিছু কমেছে। কিন্তু সে মূলত ছেলেমানুষ এবং অজ্ঞান। তার কথাবার্তা, ভাবালাপ এবং আমার সম্বন্ধে তার আজগুবী কল্পনা আমাকে বিব্রত করে তুলছিল। ট্যাক্সিখানা যখন চৌরঙ্গী, হাজরা রোড ও জাজেস কোর্ট রোড ধরে ডায়মণ্ডহারবার রোডে গিয়ে পড়েছে, ততক্ষণে সে আমাকে খামোকা 'তুমি' বলে সম্ভাষণ আরম্ভ করেছে।

বেলা পাঁচটা। বেহালার সেই ভূতুড়ে বাড়ির দরজার কাছে এসে তৎকালীন মিটার অনুযায়ী প্রায় সাড়ে তিন টাকা দিয়ে ট্যাক্সিকে বিদায় দিলুম। নিচের তলায় ছমছমে ছায়ায় সেই চাকরটা তার সঙ্গীকে নিয়ে বসে গল্প করছিল। তাদের পাশ কাটিয়ে আমরা দুজন দোতলায় উঠে গেলুম।

দোতলায় ভোঁ-ভাঁ। কেউ কোথাও নেই। এ-ঘর ও-ঘর সে-ঘর সব শূন্য। না বারীনদা, না নির্মলা, না অম্র্যল, না বা শ্রীমতী কনক। বুলা নিচের তলায় গিয়ে চাকরটার কাছে জেনে এল, ওরা দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে একসঙ্গে বেরিয়েছে—ফিরতে রাত হবে। আমার মেজাজটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। এই বৃহৎ প্রাচীন ইমারতের নিশুতি শূন্যতাটা চারদিকে যেন খাঁ খাঁ করছে। ফস করে আমি বললুম, এ আমার ভাল লাগছে না, বুলা। মনে হচ্ছে আমি যেন একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়ে গেছি। চলো, তোমাকে সিকদার বাগানের বাড়িতে পৌছিয়ে দিয়ে আসি—

না, আমি যাব না, কক্ষনো না—অমন মায়ের মুখ আমি দেখব না—বলতে বলতে সে টেবলের সামনে বসে হঠাৎ কেঁদে ফেলল।

যাই হোক, সেদিন ঘণ্টা দেড়েক ধরে তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করে যখন তাকে নিয়ে ভবানীপুরে সুবোধ বসুর বাড়ির তেতলায় উঠলুম এবং শ্রীমতী লতিকা বসুর কাছে তাকে গচ্ছিত করলুম, তখনও বুলার মুখে অসন্তোষের ছায়া রয়েছে। ওঁরা দুজন খুড়তুতো-জেঠতুতো ভগ্নী।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাতনামা ছিলেন। শুনেছি তাঁর স্বামী ছিলেন ব্যারিস্টার। কিন্তু তিনি দুটি নাবালিকা কন্যাকে নিয়ে একদা বিধবা হন। সেই অবস্থায় তিনি থাকতেন পুরীর কোন্ এক আশ্রমে। তাঁর ভাসুর ছিলেন বোধ হয় কলকাতায় অথবা অন্যত্র একজন ম্যাজিস্ট্রেট্, তাঁর বোধ করি পাঁচটি ছেলে। তিনিও এক সময় গত হন।

লাবণ্যপ্রভার দুই কন্যা শ্রীমতী উষা ও শোভা কালক্রমে সাবালিকা হয়ে ওঠেন। অতঃপর জনৈক ধীরেন ডাক্তার এই পরিবারটির বিশেষ সাহায্যকারী হন, এবং শ্রীমতী উষার বিবাহ ঘটে জনৈক সৌরেন বসুর সঙ্গে। শ্রীমতী শোভার সিঁথিতে সিঁদুর বা এয়োতির চিহ্ন না দেখে আমি ধ'রে নিয়েছিলুম তাঁর বিবাহ হয়নি। তৎকালে বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ের বিবাহ হয়নি, এটি আমার পক্ষে একটু নতুন মনে হয়েছিল।

শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ও তাঁর ছোট মেয়ে শোভার আন্তরিক আমন্ত্রণে যখন তাঁদের হাজরা রোডের বাড়িতে প্রথম গিয়ে দাঁড়ালুম, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চার অধ্যায়' নামক উপন্যাসটি লেখেননি। তা যদি লিখতেন তাহলে আমি শ্রীমতী শোভার দিকে সেই চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে তাকিয়ে 'অন্ত' যেমন 'এলালতাকে' বলেছিল, তেমনি বলতে পারতুম, "প্রহরশেষের আলোয় রাঙ্গা সেদিন চৈত্র মাস/তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ।"

এর আগে লাবণ্যপ্রভার নাম কখনও শুনিনি এবং আমি কাগজের লোক হয়েও তাঁর নাম কোনও কাগজে ছাপা হতে দেখিনি। তিনি ভবানীপুরের মহিলা-সত্যাগ্রহীর দলের সঙ্গে দু'একবার ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মহিষবাথানে গিয়ে লবণ সত্যাগ্রহ দেখে এসেছিলেন মাত্র। ওঁরা 'বিজলী' পড়ছেন নিয়মিত। আমি কোনও এক সংখ্যায় আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহের আলোচনায় লাবণ্যপ্রভা ও শোভার নামোল্লেখ করেছিলুম। বলা বাহুল্য, সেই অংশটুকু ছিল স্তুতিবাদ, এবং সেই প্রথম ওঁরা দেখলেন কাগজে ওঁদের নামোল্লেখ। ওঁদের বাড়িতে আমি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলুম এবং আমার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছিল প্রায় নিত্য নিয়মিত। আমি এখন অনেকটা যেন ওঁদের পরিবারভুক্ত। ওঁরা জানতেন আনন্দবাজার, বঙ্গবাণী, লিবার্টি প্রভৃতি কয়েকখানি কাগজের সম্পাদক মহলের

সঙ্গে আমি সুপরিচিত এবং আমার বহু অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেন সাংবাদিক। ওঁরা বোধ হয় এক-আধবার কোনো কোনো কাগজে দেখে থাকবেন আমি কলকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করার জন্য আমন্ত্রিত হই এবং সেনেটে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে, দ্বারভাঙ্গা হলে, আশুতোষ বিল্ডিংয়ে, রবীন্দ্র জন্ম-তিথিতে ও নানা সাহিত্য সভায় বা সম্মেলনে আবৃত্তি করে থাকি। শিশির ভাদুড়ী বা নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সমকালে আমি ছিলুম তখন তরুণ ঝাঁঝালো আবৃত্তিকার। শ্রীমতী শোভা সেজন্য আমাকে একান্তে নিয়ে গিয়ে আবৃত্তি করাতেন এবং রবীন্দ্রনাথের 'সুপ্রভাত' কবিতা আবৃত্তিকালে যখন আমার বিদীর্ণ কণ্ঠে রসরক্তধারা ছুটত, তখন তাঁর দুই কপোল ঘনরক্তিম বর্ণ ধারণ করত। তাঁর দুই নিবিড় চক্ষু আমার অনুপ্রেরণার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। উনি আমাকে 'পূরবী' ও নবপ্রকাশিত 'মহুয়া' ও 'শেষের কবিতা'—এই তিনটি বই উপহার দিয়েছিলেন এবং আমি ওঁকে দিয়েছিলুম টলস্টয়ের সেই 'ক্রুৎজার সোনাটা'র ইংরেজি অনুবাদ। তখন আমি রুশ-সাহিত্যের বিশেষ অনুরক্ত।

শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা তখন জপতপ পূজো-আহ্নিক নিয়ে থাকতেন। তাঁর নামের সঙ্গে চেহারার হুবহু মিল ছিল, এবং আমি তাঁকে মা বলতুম—যদিও আমার জননী অপেক্ষা বয়সে তিনি অনেক ছোট ছিলেন। আমি তাঁর জন্য পিয়ারীমোহন সরকারের ফার্স্ট বুক অফ ইংলিশ রীডার এবং বাঙ্গলার কয়েকখানি সহজপাঠ্য বই এনে দিয়েছিলুম। তিনি খাতা ও পেন্সিল নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার অনুশীলন করতেন। আমার চেষ্টা ছিল তিনি তাঁর স্বকীয়তা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নির্মাণ করে তুলুন নিজের শিক্ষার সাহায্যে। আমি বিকালের দিকে মধ্যে মাঝে তাঁর কাছে বসতুম। আমাকে তিনি তাঁর পুত্রসন্তান বলে গ্রহণ করেছিলেন।

লাবণ্যপ্রভার বড় মেয়ের বয়স তিরিশের কিছু কম। তাঁর ছেলেমেয়ে তিন চারটি। এমন হাসিখুশী ও মিষ্ট প্রকৃতির মহিলা আমি কমই দেখেছি। আমি তাঁকে 'দিদি' বলতুম। প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই বাড়ির গৃহিণী। তাঁর স্বামী সৌরেনবাবুকে আমরা সবাই ডাকি জামাইবাবু। তিনিও সদাশিব এবং অতি মধুর প্রকৃতি। তিনি সকাল নটায় আপিসে বেরোন,—সন্ধ্যার পরে ফেরেন। তখনকার দিনে শ্যালক-শ্যালিকারা বড় ভগ্নীপতিকে জামাইবাবু বলত,—অতুলদা, প্রতুলদা, নীরেনদা ইত্যাদির রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু মেয়েছেলেরা নিজেদের মধ্যে ওটার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। অর্থাৎ দুই মহিলা একত্র দেখাশোনা হলে পরস্পরকে 'দি' বলে সম্ভাষণ করত। যেমন তরুদি,

শোভনাদি, শেফালিদি ইত্যাদি। দি-অর্থে এখানে দিদি নয়। পুরুষের বেলায় 'দি' হয়ে ওঠে 'বাবু'।

এ বাড়িতে হেরম্ব মুখুজ্যে আসে। সে আমার চেয়ে সামান্য বড়। হেরম্ব ছাত্রনেতা। সে সিটি কলেজে সরস্বতী পূজো প্রবর্তন করতে গিয়ে কলকাতাকে বোধ হয় বছর দুই আগে তোলপাড় করে তোলে। ব্রাহ্মদের কলেজে প্রতিমা পূজা মঞ্জুর করা হয় না। কিন্তু হুজুগপ্রিয় বাঙ্গালী যুব সমাজ নিয়ম শৃঙ্খলা ভাঙ্গতে সিদ্ধহস্ত। সুতরাং সরস্বতী পূজা নিয়ে হেরম্ব ব্যাপক আন্দোলন চালায় এবং সুভাষচন্দ্র এসে হেরম্বকে সমর্থন করেন। অতঃপর এটি একটি ব্যাপক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এই প্রকার একটা কৃত্রিম আন্দোলনের চাপে সিটি কলেজকে যখন নতিস্বীকার করাবার চেষ্টা চলছে, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি বিবৃতিতে এই সাম্প্রদায়িক ও পৌত্তলিক রাজনীতির বিশেষ নিন্দা করেন। এ ব্যাপারটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। অবশেষে 'মহাজাতি সদন'-এর প্রতিষ্ঠা উৎসবের কালে বাঙ্গলার চিত্তবিজয়ী সুভাষচন্দ্র মহাকবির নিকটে গিয়ে তাঁর পাদ্যঅর্ঘ দিয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনেন।

হেরম্বর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সেই উপলক্ষে। হেরম্ব আমার বিশেষ বন্ধু, তার ব্যবহার অতি মিষ্ট, সে নম্র ও শান্ত স্বভাব।

লাবণ্যপ্রভার পাঁচটি ভাসুরপোর মধ্যে চারটি এখানে থাকে। বড় ভাই সপরিবারে থাকেন অন্যত্র। মেজভাইয়ের স্ত্রী এখানে থাকেন, তাঁকে আমরা মেজবউদি বলি। থাকেন সৌরেনবাবুর আর দুই ভাই। তাঁদের একজন বিবাহিত, তাঁর স্ত্রীর নাম সুধা। সুধা হল কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম প্রধান পলাতক আসামী এবং আমার কাশীর বন্ধু শচীন্দ্রনাথ বক্সীর ভাইঝি। শচীন ধরা পড়লে তার ফাঁসি হবে, সবাই জানে। কিন্তু কাকোরি স্টেশনের থেকে কিছু দূরে ট্রেন ডাকাতি ও খুনের ঘটনার উনিশ মাস পরে শচীন ধরা পড়ে এবং তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ওই ষড়যন্ত্র ও ডাকাতির সঙ্গে যারা লিপ্ত ছিল তাদের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ছিলেন নেতা। এ ছাড়া ছিলেন রাজেন লাহিড়ি, মন্মথ গুপ্ত, যশপাল, যোগেশ চাটুয্যে, প্রতুল গাঙ্গুলি প্রভৃতি। ওদের মধ্যে রাজেন ও যোগেশ চাটুয্যে ছাড়া সকলের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ওদের মধ্যে প্রথমেই রাজেনের ফাঁসী হয়ে যায়, কিন্তু তার অন্যান্য ভাইরা আমার বন্ধু ও কুটুম্ব। পরবর্তীকালে 'বন্দীজীবন'-এর লেখক শচীন্দ্রনাথ সান্যাল কারাগার থেকে আমাকে দুতিনখানি চিঠি লেখেন এবং তাঁর মুক্তি-

লাভের পর কাশীতে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়।

যাই হোক, এ বাড়িতে যখনই আমি আসি, তখনই হাজরার মোড়ের পানের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে ধূমপান করতে করতে আসি। এঁদের গলির মধ্যে ঢুকে কয়েক পা এগিয়ে নিচের তলায় ঢোকবার সময় পোড়া সিগারেটের অংশ ফেলে দিই এবং দেশলাইটা লুকিয়ে রেখে ওপরে উঠে আসি। তখন বিলেতী সিগারেট বয়কটের কাল। আমাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হত। গান্ধীমার্কা সিগারেট বেরিয়েছে, সেটা আবার চন্দনগন্ধী। সুতরাং অপেয় ও অপাংক্তেয়।

এ বাড়ির প্রকাশ্য জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কালক্রমে খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কিন্তু আরেকটা জগৎ এ বাড়িতে আছে সেটা আমার কাছে যেন অনেকটাই ছায়াঢাকা। সেই ছায়ার মধ্যে শ্রীমতী শোভা নিঃশব্দে এবং অলক্ষ্যে আনাগোনা করেন। রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে ও নিশাযোগে এ বাড়িতে যারা আসে, কথা কয় এবং চলে যায়, তাদের নিয়ে আমার মনে একটা রহস্যজাল সৃষ্টি হয়। আমি তখন এ বাড়ির মক্ষীরানী শোভাকে দেখি অন্য চোখে। হঠাৎ কোন তরুণী কিংবা কোনও যুবক শোভার ঘরে ঢুকল, কিংবা এসে ঢুকলেন ধীরেন ডাক্তার, অমনি সে-ঘরের দরজা-জানলা ইন্দিছিন্দি বন্ধ হয়ে গেল। যুবকদের অনেককেই আমি চিনিনে, কিন্তু তরুণীদের মধ্যে থাকতেন বেণীমাধব দাসের কন্যা কল্যাণী দাস, আর নয়ত শ্রীমতী সুলতা কর—যাঁর স্বামী প্রেসিডেন্সির প্রফেসর। এ বাড়িতে এসেছে আরেকটি যুবতী মেয়ে বোধ হয় নবদ্বীপ থেকে। মেয়েটি বিধবা, পরনে খদ্দরের থান ও জামা, গলায় কণ্ঠী, নাকটি খড়্গাকার, সুন্দর স্বাস্থ্য, নধর দুই চোখ, শোভারই প্রায় সমবয়সী। নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি বললুম, বিষ্ণু মাথায় থাকুন, ওঁর নাম থাক শুধু প্রিয়া। প্রিয়া সকল কর্মে শোভার দোসর হলেন। প্রিয়ার অভিভাবক হলেন তাঁর বৃদ্ধ ভাসুর। ওঁরা আইন অমান্য আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে কলকাতায় এসে উঠেছেন অপূর্ব মিত্র রোডের পশ্চিম কোণের একতলা বাড়িতে। সেখানে দুটি ঘরভাড়া নিয়েছেন ওঁর ভাসুর পণ্ডিত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনি পূজাপার্বণে পুরোহিতের কাজও করেন। শুদ্ধাচারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

এ বাড়ি হয়ে উঠল নারীরাজ্য। মা, দিদি, শোভা, সুধা, দিদির তিনটি ছোট ছোট মেয়ে,—বড়টির নাম কমলা, মেজবউদি,—এবার এলেন প্রিয়া। প্রিয়া সকলেরই প্রিয়। আমার বিশেষ প্রিয় এই কারণে যে, আমাকে প্রায়ই ওঁকে সঙ্গে নিয়ে হাজরা রোড ছেড়ে সতীশ মুখুজ্যের রোড ধরে সোজা দক্ষিণে গিয়ে

কালীঘাট পার্কের বিপরীত দিকে অপূর্ব মিত্র রোডে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতে হয়। ও পথ দিয়ে তখন বেশি রাত্রে যাওয়া-আসাটা খুব যুক্তিসঙ্গত নয়। ওদিকে আবছা আলো ছায়াপথে নৈশনারীরা ঘোরাফেরা করে এবং পুরুষমানুষরা ওই পাড়ায় ইশারা-ইঙ্গিতে মেয়েদেরকে ডেকে নিয়ে যায়। পশ্চিম হাজরা রোড, কালীঘাটের ঘনবসতিপূর্ণ পাড়া, সতীশ মুখার্জি রোড, মনোহরপুকুর রোড, ল্যান্সডাউন রোডের দক্ষিণাঞ্চল, নবকল্পিত লেক-এর অন্ধকার আশপাশ,—তখন নৈশনারী ও পুরুষদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। দিনের আলোয় চলাফেরায় গাড়ি-ঘোড়ায় কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে সমস্তটাই যেন রহস্যাচ্ছন্ন হতে থাকে।

একদিন প্রতিবাদ জানালুম,—আমিই বা কেন এ-মেয়ে ও-মেয়ে সে-মেয়েকে পৌঁছিয়ে দিতে যাব? আমার কী দায়?

মক্ষীরানী হাসলেন। বললেন, তার কারণ আপনাকে কেউ পুরুষ মানুষ মনে করে না!

শোভা কিয়ৎক্ষণ আমার উত্তেজিত মুখের দিকে তাকালেন, তারপর খপ করে আমার একখানা হাত ধরে হিড়হিড়িয়ে টেনে নিয়ে গেলেন দিদির কাছে। দিদি গল্প করছিলেন হেরম্বর সঙ্গে। আমার হাতের কব্জিটা দিদির সামনে বাড়িয়ে ধ'রে শোভা বললেন, আচ্ছা দিদি, দেখো ত—এ কি পুরুষ মানুষের আঙুল। সব আঙুল মোটা থেকে একেবারে সরু হয়ে এসেছে,—দেখলে ঘেন্না করে। কে বলবে পুরুষ মানুষ।

দিদি আবার ফোড়ন দিলেন,—আপনি একবারটি পুরুষ হন্ ত? এই দেখুন পুরুষ আমার পাশে বসা।

হেরম্বর দিকে চেয়ে আমরা সবাই হেসে উঠলুম।

একদিন আমাকে নিরিবিলিতে পশ্চিমের ছোট ঘরখানায় নিয়ে গিয়ে শোভা বললেন, 'মহুয়া'র সেই কবিতাটা আরেকবার আবৃত্তি করুন ত?

কোন্‌টা?

সেই যে "শরৎ আকাশ হেরো ম্লান হয়ে আসে/বাষ্প আভাসে দিগন্ত ছলো ছলো।"

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালুম। সোজা নির্লজ্জের মতো তাকিয়ে রইলুম এই বিপ্লববাদিনীর চোখের দিকে। সে যেন ক্ষণকালের মধ্যেই অনন্তকাল। কী ছিল আমার সেই চাহনির মধ্যে আমি জানিনে, কিন্তু শোভা ক্ষিপ্ত হয়ে এক সময় বলে উঠলেন, ফাজলামি হচ্ছে, না? আমি কিন্তু উঠে চলে যাব।

বেশ ত, যান?

উনি যেতে পারলেন না। নড়তেও চাইলেন না। তখন আমি নরম গলায় একটু চাপা আবেগের সঙ্গে আমার কয়েকটি মুখস্থ কবিতা একটির পর একটি আবৃত্তি করে গেলুম।

একদিন শোভা বললেন, আচ্ছা, আপনি কি শুনেছেন, আমার একটা ভয়ানক অসুখ আছে?

অসুখ? সে কি? ফুলবাগানে সাপ?

আঃ, আবার আপনার তামাশা!—মনে রাখবেন এ অসুখ কারও সারে না। দেখছেন না ডাক্তারমামা এর চিকিৎসে করছেন?

বললুম, কি অসুখ?

বোধ হয় যক্ষা! আমার কাছাকাছি যেন আসবেন না কোনদিন!

আমি এবার হেসে উঠলুম। বললুম, এবার যেন মনে হচ্ছে আপনিই ফাজলামি করছেন?

শোভা হেসে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। শ্রীমতী শোভাকে আমি বরাবরই আপনি বলে সম্ভাষণ করি—যদিও তিনি আমার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। এখানে সস্তারসের কথায় বলা চলত, আগুন আর ঘি। কিন্তু সমস্ত বছর ধরে দেখা গেল, আগুনও জ্বললো না, এবং ঘিও গললো না। প্রকৃতপক্ষে এই তরুণী নারীর মধ্যে দেখতে পেয়েছিলুম অনন্যসাধারণ চরিত্রবত্তা, শুচিশুদ্ধ সংযমের কাঠিন্য, শান্ত ও অবিচল দেশানুরাগ এবং বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা। এ মেয়ে আগে দেখিনি। ওঁদের সঙ্গে ১৯৩০ এইভাবেই কাটছিল।

কেন জানিনে, সমকালীন কোন কোন লেখকের প্রতি আমার মন বিরূপ হচ্ছিল। ওরা যেটুকু লেখক সেইটুকুই মানুষ, বাকিটুকু অন্যরকম। ওদের আচরণ কথায় কথায় বিরক্তিকে ঘুলিয়ে তোলে। সাহিত্য-বৃক্ষের এ ডাল থেকে ও ডালে লেখকরা তখন লাফালাফি করছিল। এটা কিন্তু লেখকদের অপরাধ নয়। এর মূলে ঘোরতর দারিদ্র্য। ওদের পক্ষে দু বেলা দু মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার প্রশ্ন। তখনকার দিনে লেখকরা হয়ত কোন-কোনও দৈনিক কাগজে দু'একটা কাজ জোটাতে পারত, কিন্তু তখন না ছিল রেডিও, না সিনেমায় কোনও ব্যবস্থা, না বা অধিক সংখ্যক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। তখন গুরুদাস, বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ডি-এম এবং বড়জোর শ্রীগুরু। কিন্তু শ্রীগুরু তখন বেচতো কমিশনে কতগুলি অপাঠ্য ধর্মগ্রন্থের জঞ্জাল। অথচ ওই জঞ্জালগুলি শরৎ চাটুয্যের বইয়ের চেয়ে বেশি বিক্রি হত। রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বকবি, কিন্তু তাঁর তখন বাজার-

মূল্য খুবই কম। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' লুকিয়ে কিছু বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু চার টাকা দামের 'গৃহদাহ'র এডিশন্ পাঁচ সাত বছরেও ফুরোয় না। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' ডি-এম বার করেছে তিন টাকায়—লাল মলাটের বই। কিন্তু কে কত কিনছে? বিভূতিভূষণও তখন এখানে ওখানে ঘুরছেন ফ্যা ফ্যা করে। কলকাতার পথে-পথে তাঁর সম্বল হল দু' পয়সার চানাচুর ও ছোলাভাজা আর তাঁর বন্ধু ব্যারিস্টার নিরোদ দাশগুপ্ত বা 'বিচিত্রা'র কর্তা সুশীল মিত্রর ওখানে নিমন্ত্রণ পেলে ভাল-মন্দ খাওয়া-দাওয়া! বিভূতিভূষণ তখন থাকতেন মির্জাপুর স্ট্রীটের এক মেসে। তাঁর সম্বল ছিল একখানা কাঠির মাদুর, ময়লা একটা বালিশ আর একটা পুঁটুলি। কিন্তু সমগ্র লেখক সমাজে এমন শুদ্ধচিত্ত এবং মধুর চরিত্রের মানুষ আমি আর দেখিনি। তাঁর কথা পরে বলব।

গুরুদাসে তখনও আধুনিক কোনও লেখক ঢোকেনি, কেবল 'ভারতবর্ষ' মাসিকে আমাদের কয়েকজনের দু-একটা করে ছোট গল্প ছাপা হয়েছে। ডি এম লাইব্রেরীতে বই দিতে গেলে অল্পবিস্তর অনেককেই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে হয়। বরেন্দ্র লাইব্রেরী ফর্মা গুণে তবে দাম কষে। কমলিনী সাহিত্য মন্দিরে তখন নারায়ণ ভট্টাচার্য, সুরেন ভট্টাচার্য, নরেশ সেনগুপ্ত এবং 'ভারতী' গ্রুপের খাতির বেশি। কিন্তু আমরা যাব কোন্ চুলোয় এবং কোন্ প্রকাশকের তাড়া খেতে? সুতরাং লেখকরা চেয়ে থাকত পূজা সংখ্যা সাময়িক পত্রিকাগুলির দিকে। ছোট গল্পের সমাদর সাময়িক পত্রিকায়, কারণ ছোট এবং গল্প, এ দুটোতে পাঠকরা খুশী। কিন্তু এক গোছা ছোট গল্প নিয়ে যদি বই আকারে কোন প্রকাশককে ছাপতে অনুরোধ করো তবে ওই ডি এম লাইব্রেরীর কৃষ্ণকর্তার মতো দোকানে বসতেও বলবে না অথবা এক পেয়ালা চা অফারও করবে না। বরং যে-দরজা দিয়ে তুমি দুঃসাহসের সঙ্গে ঢুকেছ সেই দরজাটার দিকেই তিনি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

এই সব কারণে নতুন লেখকদের পক্ষে তখন 'টিকে ধরাতে জামিন' লাগত। কোনও তরুণ লেখক বা কবি বা সাহিত্যকর্মী তখনও সামাজিক বা সাংস্কৃতিক স্বীকৃতিলাভ করেনি। সাহিত্য সম্মেলনে তাদেরকে কেউ ডাকে না, তারা কেউ গাড়ি-চাপা পড়লে কেউ খোঁজ করে না, মারা গেলে কোনও কাগজে সংবাদ ছাপা হয় না, অন্নসংস্থানের জন্য ঘুরে বেড়ালে কেউ ডাকে না! অমন যে অচিন্ত্য, বাঙলা সাহিত্যে যে-ছেলে এনেছে অভিনব লিখন ভঙ্গী তার কোনও কদর নেই প্রকাশক সভায়। অমন যে শক্তিমান লেখক প্রেমেন, তার ছোট গল্প আর কবিতার তারিফ কি বন্ধুমহলে কিছু কম? কিন্তু তার কোনও বাজার নেই!

শৈলজানন্দ—যে কয়লাকুঠি আর গরীবদের গল্প লিখে একপ্রকার যুগান্তর আনল তার অভাব-অভিযোগ লেগেই রয়েছে। অমন যে বুদ্ধদেব—ইংরেজী এম-এ পরীক্ষায় যে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, যার জুড়ি নেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যে তার 'বন্দীর বন্দনা' লিখে নতুন কাব্যযুগের প্রবর্তন করল, তার না আছে বাজার, না যোগ্য সমাদর। এর ওপর আবার 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে'। প্রতি সাহিত্য সম্মেলনে এবং বাৎসরিক 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে' 'কল্লোল-কালিকলম' গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদেরকে গালাগালি দিয়ে আসা! অর্থাৎ এরা সব 'মায়ে-তাড়ানে বাপে-খেদানে' লেখকগোষ্ঠী। সম্প্রতি মুজাফফরপুরের এক সাহিত্য সভায় 'মা' উপন্যাসের লেখিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী থামোকা আমাকে গালি দিয়ে বলেছেন তিনি আমার মা হলে আঁতুড়েই আমাকে নুন খাইয়ে মারতেন! এর উত্তরে আমি কোনও একটি কাগজে মন্তব্য করলুম, সেই মা কী প্রকার, যে-মা তাঁর সদ্যোজাত সন্তানকে নুন খাইয়ে মারতে বাধ্য হন?

এই মন্তব্যটি প্রকাশ করা আমার পক্ষে উচিত হয়নি। কিন্তু তখন আমার তরুণ রক্তে কিছু অগ্নির প্রবাহ ছিল। ঔপন্যাসিক সৌরীন মুখুজ্জে মশায় এই নিয়ে বসুমতীতে আমার বিরুদ্ধে লেখেন।

'কল্লোল'-এর মৌচাক তখন ভেঙ্গে যাচ্ছিল। মৌমাছিরা তখন জোড়ায় জোড়ায় মধুর লোভে ফিরছিল। গুপ্ত ফ্রেণ্ডস-এর প্রকাশক হাস্যরসিক আশু ঘোষের দোকানের সামনে দিয়ে লেখকরা যখন জুড়ি বেঁধে যায়, আশু তাদের ডেকে চা খাওয়ায় এবং হাসি পরিহাসের সঙ্গে গালি দেয়। ওই পরিহাসের ভয়ে কবি জসীমউদ্দীন ওপাড়া মাড়ায় না, সে তখন 'পল্লীকবি' হয়ে উঠছে!

আমি তখন 'বিজলী' আর হাজরা রোড নিয়ে মেতে আছি। তরুণ-বয়স্ক বিপ্লববাদী ছেলে আর মেয়েদের কর্মপদ্ধতি নিয়ে মাথা ঘামাই। ওরা কোথায় যায় সঙ্গোপনে, কার কাছে কে 'মেসেজ' নিয়ে যাচ্ছে কীভাবে, দীনেশ মজুমদারকে কোথায় কিভাবে রাখা হয়েছে, সতীন সেন সঙ্গোপনে কোথায় এসে উঠেছেন, লান্টুদার সাংকেতিক নাম কে কি ভাবে ব্যবহার করছে এবং সূর্য সেন পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে কোথায় কি ভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন—এই সব খোঁজখবরের মধ্যে আমি থাকি। এদিকে আমি অতিশয় ভীরু,—পুলিস 'একবার ছুঁলে আঠারো ঘা'—এটি মর্মে মর্মে বুঝি। একদিকে বারীন ঘোষের সঙ্গে মাখামাখি, অন্য দিকে হাজরা রোডের বাড়িতে নিত্য নিয়মিত আনাগোনা—সুতরাং আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে আসছে! ওদেরই ফাঁকে ফাঁকে যাই নাট্যমন্দিরে, নয়ত যাই বাওয়ার কিংবা টাওয়ার কিংবা ক্যানটন হোটেলে—নতুন গল্প লেখার দরুন

টাকাটা ফুঁকে দিয়ে রাত এগারোটায় 'বিজলী'র ডেরায় এসে উঠি। গোয়েন্দারা বোধ হয় বিশ্বাস করে আমি কাপুরুষ, কিন্তু আমার ধারণা আমি কুপুরুষ! যাই হোক, এরই ফাঁকে যদি অবসর পাই তখন হিজিবিজি নিজের লেখা লিখি। আর্থিক অবস্থা মধ্যে-মাঝে বেশ সচ্ছল হয়ে ওঠে। অনেক দিন হয়ে গেল আমি বাড়ি ছাড়া। তবে মাঝে মাঝে মা এসে দেখে যান।

এরই মধ্যে একদিন একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটল। আমার পক্ষে অবিশ্বাস্য ছিল, কোনও বয়স্ক যুবক কোনও তরুণী যুবতীর পায়ের ধুলো নেয় ভক্তিগদগদ হয়ে, বিশেষ করে উভয়ের মধ্যে যদি কোনও আত্মীয়-কুটুম্বিতার সূত্র না থাকে। হাজরা রোডের বাড়িতে একদিন ভরা দুপুরে জনৈক সুশ্রী, বলবান ও পেশীবহুল স্বাস্থ্য নিয়ে একটি আমার বয়সী যুবক সোজা উপরে উঠে এসে শ্রীমতী শোভার ঘরে ঢুকল এবং শ্রীমতী তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করে দিলেন ভিতর থেকে। আমি একটু অবাক হলুম বই কি। আমি ক্ষুদ্রচিত্ত, আমার পাপ মন। যাই হোক, আমি ওঘরে গিয়ে দিদির কাছে বসে গেলুম এবং আমার দিন-তিনেক এ বাড়িতে না আসার জন্য দিদি তাঁর ছোট ভাইকে পাঠিয়ে ছিলেন 'বিজলী' আপিসে—তাই নিয়ে হাসি-তর্ক আরম্ভ হয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে দরজা খুলে আমাদেরই চোখের সামনে দিয়ে সেই অতি রূপবান ও স্বাস্থ্যবান যুবকটি নতমস্তকে বেরিয়ে নিচে নেমে গেল। বোধ হয় মিনিট দুই। তারপরেই শ্রীমতী শোভা এসে আমার হাতখানা ধরে তুলে সেই পশ্চিমের ছোট ঘরে নিয়ে গেলেন এবং ওই অল্পকালের স্পর্শের মধ্যেই উপলব্ধি করলুম, তাঁর হাতখানা কাঁপছিল! ঘরে যখন নিয়ে এলেন তখন তাঁর সেই চেহারা এর আগে দেখিনি। এ যেন দশমহাবিদ্যার সেই আরক্তিম চণ্ডীর রূপ! বোধ হয় কেঁদে ছিলেন একটু আগে। দুই রাঙ্গা চোখ রগড়িয়ে ঘষে মোছা। কিন্তু তিনি অবরুদ্ধ উত্তেজনাটা দমিয়ে রেখে শুধু ভাঙ্গা গলায় বললেন, সেই কবিতাটা আরেকবার বলুন ত? সেই যে সেই "জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর পেতে হবে তব পরিচয়/তোমার—"

না, আমি পারব না, আমি মেসিন নই। দম দিলেই আমি ঘুরিনে! আমি বেঁকে বসলুম।

উনি হঠাৎ দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে যা উনি কোনদিনই করেন না, তাই ওঁকে করতে দেখলুম। আমি একেবারে অবাক। উনি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু এবার ত কাপুরুষের পালা! আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গেলেই ত মেলোড্রামা! সে আমি পারব না। বরং ঈষৎ

কঠিন কণ্ঠে বললুম, ও ভদ্রলোক কে তখন এসেছিলেন? আপনি ত বেশ সহজ ছিলেন হু' ঘণ্টা আগে!

ও আর আসবে না কোনদিন!

শ্রীমতীর কথায় তৎক্ষণাৎ মূল কথাটা বুঝে নিলুম। সেই চিরকালের পুরনো গল্প! বললুম, ও এই! বেশ ত, তার জন্য ওই কবিতাটা কেন, বরং 'মহুয়া'র একটা কবিতা—

না, না—ওই কবিতাটাই বলুন—অধীর আবেগে শ্রীমতী শোভা বললেন, আপনার গলার ভেতর দিয়ে আমার বুকের রক্ত উঠে আসুক! ও আমার ছোট ভাই নির্মল সেন, ও আর ফিরবে না কোনদিন!

আমি তৎক্ষণাৎ আবেগের সঙ্গে ওখান থেকেই কবিতাটার শেষাংশ ধরে নিলুম, "জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর পেতে হবে তব পরিচয়/ তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে সকল শঙ্কা করি জয়/ ভালোই হয়েছে ঝঞ্ঝার বায়ে প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়ায়ে/ ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে মেঘের সিংহবাহনে/ মিলন যজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে বজ্রশিখার দাহনে।"

এই সামান্য ঘটনাটুকুর অল্প কিছুকালের মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইংরেজ পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে নির্মল সেন নিহত হন। এবং এরও কিছুদিন পরে চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করেন শ্রীমতী প্রীতিলতা ওয়াদেদার। তিনি ধরা পড়ার আগেই বিষ খেয়ে আত্মনাশ করেন। সমগ্র ভারত এই দুই তরুণ তরুণীর প্রতি প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। সেদিন আরেকবার আমরা বিপ্লব নেতা সূর্য সেন বা মাস্টারদার উদ্দেশে নমস্কার জানালুম। যাই হোক, বোমা নিক্ষেপ ও গুলী বিনিময়ের ফলে বহু ইংরেজ রাজপুরুষ হতাহত হন। কিন্তু এই দুই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তরুণ-তরুণীকে নিয়ে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোট উপন্যাস 'চার অধ্যায়' লিখেছিলেন কিনা সে আমার জানা নেই।

এই সময়টায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কর্তৃপক্ষের মধ্যে ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বিপ্লবীকর্মী মাখনলাল সেন মহাশয়। ওঁদের কেউ কেউ অনুযোগ করেন নব্যকালের লেখকরা দেশের এই রাজনীতিক ঘনঘটার মধ্যে সময়োপযোগী সাহিত্য রচনার প্রয়াস পাচ্ছে না কেন? তারা কোথায়? কী করছে তারা?

তাঁদের অনুযোগটি আমার মনে ছিল।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় যখন প্রবল আন্দোলন চলছে, যখন বয়কট, পিকেটিং, মিছিল, ধরপাকড়, লাঠি চার্জ ইত্যাদি ঘনীভূত হচ্ছে সেই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে অনেকগুলিকে গ্রেপ্তার করে পুলিসের ট্রাকে তুলে গাড়ি

চালানো হয়। কিন্তু সেই ট্রাকের ওপরেই জনৈক শ্বেতচর্মী সার্জেণ্ট একটি ছেলেকে মারধর করতে থাকে এবং ধাক্কাধাক্কির ফলে ছেলেটি চলন্ত ট্রাক থেকে ট্রাম-লাইনের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে যায় এবং তার মাথা ফাটে। আমি সেদিন সন্ধ্যারাত্রে যখন হাজরা রোডের বাড়িতে উপস্থিত তখন একটি শীর্ণকায় মহিলা আহত ওই তরুণ যুবককে সঙ্গে নিয়ে ওখানে হাজির হন। দেখলুম ছেলেটির মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এবং সর্বাঙ্গে কালশিরার দাগ। ছেলেটির নাম মাখন আর মহিলার নাম বোধ হয় মলিনা। উভয়ে সহোদর ভাই-বোন। ওরা বড়ই গরীব। ভাইটিই হল বড় বোনের একমাত্র সম্বল। কিন্তু মলিনার বোধ হয় একটু মাথায় ছিট ছিল। তিনি চিৎকার করে এই অত্যাচারের প্রতিকার দাবি করলেন। প্রতিকার? শ্রীমতী শোভা আমার দিকে চেয়ে শুধু হাসলেন!

এই ঘটনারই বছর দুই পরে কাশীতে একদিন সকালে হরিশ্চন্দ্র ঘাটের কাছে একটি মেয়েছেলে হঠাৎ আমাকে চিনলো। চেয়ে দেখি সেই মলিনা। পরনে ছিন্নভিন্ন জীর্ণ একখানা শাড়ি, ওতে লজ্জানিবারণ হয় না। চেহারা কর্কশ, চাহনি বন্য।

মনে পড়ছে আমাকে?

বললুম, হ্যাঁ, মাখন কোথায়?

মাখন? আসুন আমার সঙ্গে।—মলিনা আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

শিবালার ওদিকে এক সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে একটি পুরনো বাড়ির নিচের তলায় একটি খুপরি ঘরে সে আমাকে এনে তুললো। ঘরে কেবল সরু একখানা নড়বড়ে তক্তা, উপরে ময়লা বিছানা পাতা। একধারে দু-তিনটে হাঁড়িকুড়ি, একটা তোলা উনুন, সামান্য রান্নাখাওয়ার সরঞ্জাম। মলিনা বলল, আমি হয় কেদার নয়ত বিশ্বনাথের গলিতে গিয়ে বসি। যে যা ভিক্ষে দেয়।

বলতে বলতে সে উবু হয়ে বসে তক্তার তলা থেকে একটা হাঁড়ি টেনে বার করল, তার মধ্যে দেখলুম, একটা মড়ার মাথার খুলি! বড় বড় দুটো চোখের গহ্বর, মুখের ও দাঁতের বীভৎস দৃশ্য!

এই আমার ছোট ভাই মাখন! গত বছরের গোড়ায় সে এক সার্জেণ্ট খুনের ঘটনায় জড়িয়ে আমাকে নিয়ে লুকিয়ে কাশীতে আসে। এখানকার পুলিস খবর পায়। যখন ওরা বাড়ি ঘেরাও করে তখন সে পিছলিয়ে ঘাটের দিকে পালায়। সেদিন খুব বর্ষা, বিকেল বেলার দিকে অন্ধকার। মাখন সাঁতার কেটে ওপারে পালাতে চেয়েছিল। পুলিস সেই জলের মধ্যেই গুলী চালায়। দু' ঘণ্টার মধ্যে মাখনের মড়া ভেসে উঠে কেদারঘাটে আটকিয়ে পড়ে। সেদিন শেষ

রাত্তিরে ওই গঙ্গায় মাখনের মড়া বুকে নিয়ে কেঁদে বলেছিলুম, যতদিন দেশ স্বাধীন না হয় ততদিন মাখনের মাথার খুলি আমি রেখে দেবো!

এই পাগলিনীকে নিয়ে তৎকালে আমি একটি ছোট গল্প লিখেছিলুম। নাম দিয়েছিলুম 'অপর্ণা'। গল্পটি আনন্দবাজারের একটি বিশেষ সংখ্যায় ছাপা হয়। পরে শুনেছি ওটি কর্তৃপক্ষের ভালই লেগেছিল।

এদিকে বারীনদার কল্যাণে 'বিজলী'র নাভিশ্বাস দেখা দিচ্ছিল এবং আমি তার অন্তিমকালে অক্সিজেন প্রয়োগ করছিলুম। বারীনদার 'আত্মকথা' জনসমাজে কতকটা তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করছিল। তাছাড়া ইংরেজ শাসকবর্গের অন্যতম মুখপত্র দৈনিক স্টেটসম্যানে তিনি লিখতে আরম্ভ করায় তাঁর দুর্নাম ও অপযশ রটছিল প্রচুর। এ ছাড়াও তাঁর আইন অমান্য আন্দোলনবিরোধী রচনাগুলো এবং গান্ধীজীর প্রতি শ্লেষোক্তি কেউ বরদাস্ত করতে পারছিল না। আমার ভবিষ্যৎ আবার অনিশ্চিত হয়ে উঠল।

যতদূর মনে পড়ছে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বারীন ঘোষ মহাশয় তাঁর 'বিজলী' সাপ্তাহিকখানি হস্তান্তরিত করলেন। যাঁদের হাতে দেওয়া হলো, তাঁরা দু'জনেই আমার তরুণ বন্ধু—দেবজ্যোতি বর্মন ও বীরেশ মজুমদার। দেবজ্যোতি তখন বার দুই মাত্র দুটি বিষয়ে এম-এ পাস করেছে এবং সে একজন সাংবাদিক হয়ে উঠছে। 'বিজলী' হাত ছাড়া হবার পর আমি বাঁচলুম। সোজা কাশী গিয়ে দু'চারদিন ধ'রে কেদারঘাটে ডুব দিলুম, ভাঙের সরবৎ-সহ খোয়াক্ষীরের নাড়ু ও কালীতলার রাবড়ি মনের আনন্দে চেটে খেলুম এবং কয়েকদিন সুধাদার ঘরে বসে কাব্য সাহিত্য ইতিহাস দর্শনের সহিত বেদান্তের ব্যাখ্যা শুনতে বসলুম। সুধাদা আমাদের কাছে কোনদিন পুরনো হননি। আমরা রসবোধের দিক থেকে তাঁর মধ্যে নতুন-নতুন আকর্ষণের উপকরণ খুঁজে পেতুম। এই সময় আমার মাসতুতো ভাই প্রভাসের স্ত্রী শ্রীমতী অনিতা ওরফে দুর্গাঠাকরুন কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তাঁর পিত্রালয় দেবনাথপুরায় চলে যান।

তৎকালে কাশীতে খ্যাতনামা কীর্তনবিশারদ রামকমল ভট্টাচার্য মশায় কীর্তন গান করতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শ্রাদ্ধবাসরে কীর্তন গান করার ফলে রামকমলের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই কীর্তন গান ধরেছিলেন দেশবন্ধু ও বাসন্তী দেবীর কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা রায় ও এই সব আসরে ব'সে তৎকালে পাখোয়াজ ও খোল বাজাতেন নাটোরের মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায়। ভবানীপুরের সেই কীর্তনের আসর কলকাতার মস্ত আকর্ষণের বিষয় ছিল। পরবর্তীকালে যোগীনবাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ হৃদ্যতা ঘটে।

সেবার কলকাতায় ফিরে খবর পেলুম, জনৈক বৈদ্যনাথ বিশ্বাস আমার খোঁজ-খবরের জন্য ছুটোছুটি করছেন। আমাকে তাঁর অত্যন্ত দরকার। কে তিনি আমি জানিনে, তবে তিনি তাঁর সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়ির ঠিকানা রেখে গেছেন। আমি যেন ফিরেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। সুতরাং তাঁকে আমি চিঠি দিলুম।

একদিন দেখলুম একখানা মোটর গাড়ি এসে আমাদের গলির মুখে দাঁড়ালো এবং তার টুপিওলা ড্রাইভার আমাকে ডেকে নিয়ে তার গাড়িতে তুললো। গাড়িখানা দেখে ভাবলুম, দরিদ্র এক লেখক হিসেবে এর তলায় আমার চাপা পড়ার কথা ছিল, দৈবাৎ এর ভিতর চড়ে বসলুম! দামী গাড়িতে চড়ে যাবার

কালে কোনও চেনা লোক আমাকে দেখলে বড়ই পুলকিত হই। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সেই দুপুরে কারও চোখেই পড়লুম না। গাড়িখানা যখন বহুবাজারে এসে লালবাজারের দিকে যাচ্ছে, তখন একবারটি সন্দেহ হচ্ছিল, পুলিসে নিয়ে যাচ্ছে নাকি? কিন্তু প্রায় বেন্টিক স্ট্রীটের মোড়ের কাছাকাছি গাড়িখানা বাঁ দিকে থামল, এবং ড্রাইভার আমাকে বলে দিল উল্টো দিকের তেতলা বাড়িতে উঠে যান, ওখানে দোতলার অপিসে আপনার জন্য ওঁরা অপেক্ষা করে রয়েছেন। সামনেই সিঁড়ি। হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ অ্যাস্যুরেন্স লিঃ। ৩০৯, বহুবাজার স্ট্রীট। দক্ষিণ-মুখো বাড়িখানার দোতলায় উঠে গিয়ে দেখি মস্ত আপিস। সামনে বসে আছেন সৌম্যদর্শন প্রবীণ এক ভদ্রলোক, এপাশে আরেকজন যেমন-তেমন ব্যক্তি। ওঁরা বুঝেই নিলেন আমি কে। যেমন-তেমন লোকটির নাম বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, আর ওই যিনি রাশভারী—ওঁর নাম পূর্ণচন্দ্র রায়।

যথারীতি অভ্যর্থনার পর ওঁরা বললেন, আমার পরিচালিত 'বিজলী' নিয়মিত পড়ে ওঁরা খুব আনন্দিত এবং উৎসাহিত। এখানেই 'উপাসনা' মাসিক পত্রের আপিস। কিন্তু 'উপাসনা'র সম্পাদক সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এখন আর নেই। সুতরাং আমি উপাসনায় যোগদান করতে পারি কিনা। দ্বিতীয়, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস আরেকখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করতে চান এবং আমি তার সম্পাদকীয় দায়িত্ব নিলে তিনি সুখী হবেন। আপাতত আমাকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা করে দেওয়া হবে।

ভেবে দেখলুম কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি, ধূপছায়া—একে একে সব কাগজ বন্ধ হয়ে গেছে। বিজলীরও ভরাডুবি ঘটল বারীনদার কল্যাণে। আমার তত্ত্বাবধানে 'দুন্দুভি' নামক সাপ্তাহিকেরও ভরসা কম। নজরুল আমাকে পরিহাস করার জন্য 'দুন্দুভি' নামটা বিকৃত করে একটি অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে। ও-কাগজে আমি 'শাদা চোখে' নাম দিয়ে সম্পাদকীয় লিখি—যেমন লিখতুম 'বিজলী'তে। কিন্তু এবার আমি আর নিজের কথা ভাবব না। অনেক ভেবেচিন্তে আমি বললুম, আপনাদের প্রস্তাব আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি শুধু একটি শর্তে, আপনারা লেখকদের লেখার জন্য পারিশ্রমিক দেবেন এবং তার পরিমাণ আমি স্থির করব। শুধু আমার নিজের লেখার জন্য আমি পারিশ্রমিক নেবো না। যদি রাজি থাকেন আমাকে নিয়োগপত্র দিন। ওঁরা তখনই রাজি হলেন এবং আমাকে চিঠি দিলেন। এইরূপ স্থির হল, ছোট গল্প বা ভাল প্রবন্ধর জন্য দশ টাকা এবং কবিতার জন্য পাঁচ টাকা দেওয়া হবে। তবে নজরুলের কবিতার জন্য দশ টাকা দেওয়া চাই। ওঁদের ইচ্ছা, সামনের বৈশাখেই যেন কাগজ বেরোয়

এবং সেই মাসিকপত্রের নামকরণ আমিই যেন করে দিই।

আমি নাম রাখলুম 'স্বদেশ'।

কথাবার্তার পর বৈদ্যনাথবাবু আমাকে তেতলায় নিয়ে গেলেন তাঁর আপিসে। এটা মস্ত বড় একটা হল। একধারে আমার আপিস হবে, এবং আপাতত আমার সহকারী হবে দুজন। একজনের নাম ভোলানাথ বিশ্বাস, অন্যজন কি যেন—নাম ভুলে গেছি। এটি লক্ষ্য করলুম, মাইনে মাত্র পঞ্চাশ টাকা হলেও ওঁরা আমাকে একটা উঁচু পজিশন দিতে চান।

কোথা থেকে কোথায় এসে দাঁড়ালুম এটি তলিয়ে বুঝবার আগে একটির পর একটি ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল! দিন আষ্টেক পরে আবার এসে দেখি, আমার আপিস একেবারে সুসজ্জিত। লম্বা-চওড়া এক দেরাজওলা টেবিল, খান আষ্টেক চেয়ার, গোটা চারেক র‍্যাক, মস্ত দুটো কাঠের আলমারি, তার পাশে ছোট টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম, আমার বড় টেবিলের ওপর কাচের দোয়াতদান, পেতলের কয়েকটা পেপারওয়েট, অ্যাশ-ট্রে, চিঠিপত্রের জন্য কাঠের বাক্স, টেবলের পাশে মেঝেতে নতুন ওয়েস্টপেপার বাস্কেট, হাতের কাছে টেলিফোন,—এবং কী নেই? শুধু কি তাই? সবাই আমাকে দেখে একেবারে জোড়হাত! কাঁচের পার্টিশনের পাশে আমার সহকারী কৃষ্ণকান্ত ভোলানাথ আর সুধীর মিত্তির। একটা ছোকরা বেয়ারা হুকুমের অপেক্ষায় বশম্বদ। আমাকে আর প্রুফ দেখতে হবে না, ছাপাখানায় ছোটবার দরকার নেই, ধার দেনা নিয়ে অন্য লোক ভাববে, বিজ্ঞাপন আসবে অজস্র। আমি কেবল লেখা ও লেখকদের নিয়ে থাকব এবং কেবল হুকুম করে যাব। যখন খুশি চা, পান ও সিগারেটের অর্ডার দেবো। আমার মাথার ওপর পাখা ঘুরছে, এবং আমার মুখের সামনে দামী টেবল ল্যাম্প জ্বলছে। 'বিজলী'তে ছিলুম 'মধো', এখানে আমি 'মধুসূদন'।

এইখানে বসেই আমি স্থির করলুম, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, পরিচয়, বিচিত্রা, উদয়ন—এইসব মাসিক পত্রগুলির উপর আমি টেক্কা দেবো এবং বাঙ্গলার প্রত্যেক আধুনিক লেখককে 'স্বদেশ'-এর সঙ্গে বেঁধে রাখব। যে লিখবে সেই পারিশ্রমিক পাবে। এবার থেকে কবিতার জন্য পারিশ্রমিক দেবো—যা নজরুল ছাড়া কেউ কোনদিন পায়নি! কল্লোল-কালি-কলমের পর নতুন করে আবার দল বাঁধব, আবার নতুন এক গোষ্ঠী তৈরি করব। কাঠবিড়ালী হয়ে সাগর বাঁধব!

প্রগতির বুদ্ধদেব, কল্লোল-এর অচিন্ত্য, ধূপছায়ার পাঁচুগোপাল, প্রণব রায় আর সুনীল ধর, বঙ্গবাণীর বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, লিবার্টির প্রমোদ সেন, সত্যেন বসু, নীহাররঞ্জন রায়, নতুন উঠতি লেখক মানিক—এদের সবাইকে ডাকলুম।

হাতের তাস ছিল বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, জসীমউদ্দীন, মন্মথ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আবদুল কাদের, বন্দে আলী মিঞা, শৈলজানন্দ, মহেন্দ্র রায় প্রভৃতি। রংয়ের গোলাম ছিল নজরুল। দেখি যদি রবি ঠাকুরের দু'একটা আশীর্বাদী কবিতা আনতে পারি। না, শরৎ চাটুয্যেকে বাগানো যাবে না। সেবার নলিনীকান্ত সরকারের মুখে শুনেছিলুম, কবে যেন তিনি শরৎবাবুকে চা খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়েছিলেন। অতঃপর চেঁচামেচি হই-চই। অবশেষে জানলায় মুখ রেখে বাইরে থেকে নলিনীদা বললেন, দাদা, আমার কাগজটির জন্য একটি ছোটখাটো লেখা না লিখলে আপনার মুক্তি নেই। ওই ওখানে রয়েছে দোয়াত-কলম আর কাগজ। জানলা গলিয়ে চা দেবো যত খুশি খান।

শরৎবাবু একটা প্রবন্ধ লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন।

যাই হোক, 'স্বদেশ' নামক নতুন মাসিকপত্র বেরোচ্ছে এবং কুখ্যাত অতি-আধুনিক লেখকরা আবার জোট বেঁধে কাগজে যা খুশি লিখবে, এজন্য একটা সাড়া পড়ে গেল। আমি গেলুম আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন মজুমদার ও তাঁর সহকারী তরুণ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অরুণ মিত্রর কাছে। সত্যেনদা রক্ষণশীল সমাজ-মনের প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন, এবং বিবেকানন্দ অতি আধুনিক-দেরই একজন উদীয়মান কবি ও সাংবাদিক—সত্যেনদার উপযুক্ত সাকরেদ। অরুণ ছিল মিষ্ট-মধুর প্রকৃতি এবং সত্যেনদার মানসপুত্রের মতো। তখনও পর্যন্ত সত্যেনদাকে নিয়ে সাংবাদিক মহলে একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসি পরিহাস ছিল। ঘটনাটি বোধ হয় ১৯২৩ কি ২৪ খৃষ্টাব্দের। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মফঃস্বলের এক রাজনীতিক সম্মেলনে গিয়েছেন। ফিরবার পথে ঘোড়ার গাড়িতে তিনি ফিরছিলেন। ওই গাড়িতেই উঠেছিলেন তৎকালীন মহিলা নেত্রী সন্তোষ-কুমারী গুপ্তা। এই নিয়ে সত্যেন মজুমদার আনন্দবাজারে ঈষৎ পরিহাস করে-ছিলেন। সেই পরিহাস শ্রীমতী গুপ্তা বরদাস্ত করেন নি! তিনি কলকাতা ফিরে কয়েক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে সোজা মির্জাপুর স্ট্রীটে আনন্দবাজার আপিসে গিয়ে সত্যেনদার গালে একটা না দুটো চড় বসিয়ে দেন! এ নিয়ে চারদিকে হই-চই পড়ে যায়।

অতঃপর একে একে গেলুম লিবার্টি, বঙ্গবাণী, নবশক্তি, অ্যাডভান্স ইত্যাদির আপিসে। এঁদের প্রত্যেকের সম্পাদকীয় দপ্তরে আমাদের বহু বন্ধুবান্ধব ছিলেন। সুতরাং 'স্বদেশ' পত্রিকার প্রচারকার্যের পক্ষে কোনও অসুবিধা ছিল না। আমি কোমর বেঁধে কাজে লেগেছিলুম।

আমার প্রাত্যহিক কর্মে, কথাবার্তায় ও সহায়তায় তখন এসে পড়েছিল সাহিত্যিকবন্ধু ভবানী মুখোপাধ্যায়। সে রেল আপিসের কর্মী, স্বভাবমধুর এবং সুখদুঃখের সহচর। তাকে সময়মতো না পেলে অনেক কাজই অসমাপ্ত থাকে। এরই মধ্যে একদিন 'স্বদেশ' আপিসে এসে একখানা চিঠি পেলুম, লিখে রেখে গেছেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখেছেন আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম। বিশেষ দরকার ছিল। আসছে কাল আবার আসব।

সেটা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ। সেই প্রথম তারাশঙ্করের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। তখন কলকাতায় কারও সঙ্গে তার পরিচয় নেই। তার দু'টো ছোটগল্প 'রাইকমল' বা 'রসকলি' আর 'হারানো সুর' স্বল্প প্রচারিত কল্লোলে প্রকাশিত হবার পর থেকে সে নিরুদ্দেশ হয়। কলকাতায় সে ক্বচিৎ কখনো আসে। এখানে তার কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই। লেখক বলে তাকে কেউ চেনে না। সে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ,—শৈলজা ও নজরুলের সমবয়সী। অনেকদিন পরে তারাশঙ্কর বরানগরে একটি ছোট্ট পুরনো বাড়ি সস্তায় কেনে এবং সেখানেই থাকতে আরম্ভ করে। অতঃপর সে একে একে সরোজ রায় চৌধুরী, কিরণকুমার রায়, পবিত্র, শিবরাম ও সজনীকান্তর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়। সজনী তার প্রতিষ্ঠালাভের ক্ষেত্রে অনেকটা সহায়তা করে। তারাশঙ্কর কতকটা নীতিপরায়ণ, আদর্শান্বেষী ও জাতীয়তাবাদে একনিষ্ঠ ছিল। আমাদের মতোই অভাব-অনটনে তার জীবন বিপর্যস্ত হত।

যাই হোক, ফিরে আসি অন্য প্রসঙ্গে। ১৯৩১-এর এই বছরে ২৬ জানুয়ারী তারিখটি 'প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতা দিবস'রূপে পালন করার জন্য দেশব্যাপী আয়োজন চলছিল। সেদিন লক্ষ লক্ষ লোকের জনতায় সমগ্র এসপ্লানেড কার্জন পার্ক হোয়াটওয়েলেড-ল'র নিচের চৌমাথা মনুমেণ্টের তলার মাঠ,—সমস্ত ভরে যায়। চারিদিকে ঘন ঘন আকাশ-বাতাস মুখরিত হচ্ছে 'বন-দে-মাতরম' ধ্বনিতে। অহিংস রণসজ্জায় অগ্রসর হয়ে বাঙালী জাতি সেদিন কমিশনার টেগার্টের সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর ১৪৪ ধারার ব্যূহ ভেদ করার জন্য এগিয়ে চলেছে। পুলিসের শত শত লাল পাগড়ি যেন শত শত রক্তবিন্দু! ওদের পাশে পাশে রয়েছে অগণিত সংখ্যক কালো কালো কয়েদীর গাড়ি। অন্য দিকে কর্ডন করে রয়েছে অসংখ্য শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্ট—যাদের পিতামহ বা প্রপিতামহরা সেই নীলচাষের আমলে বাঙ্গালী ঘরের বউ-ঝিদের গুণ্ডা লেলিয়ে ধরে নিয়ে যেত আপন আপন কুকর্মের জন্য। তাদেরই উদ্ভূত বংশীয়রা ইংরেজ অফিসারদের সঙ্গে মিলিয়ে রয়েছে এই সার্জেণ্ট বাহিনীর মধ্যে সাহেবী পোশাকে। চেয়ে দেখছিলুম, এই বিশাল রণক্ষেত্রের

একদিকে রক্তমাখা খড়্গহস্তা মহাকরালীর সাধক বাঙ্গালী আজ অহিংস, অন্যদিকে আপন সাম্রাজ্যরক্ষক সশস্ত্র বৃটিশরাজ। নাটকটা বিয়োগান্ত হবে কিনা এখনও ঠিক জানা যাচ্ছে না।

ঠিক এমনি সময়টায় শীতের সেই অপরাহ্ণে সহসা চারিদিক থেকে যেন মহা-জীবনের এক মহারোল উঠল, বন্-দে-মাতরম। কে যেন আসছে এক মহান নেতা এগিয়ে,—আসছে তার সঙ্গে সমগ্র মিলিটাণ্ট বাঙ্গালী জাতি তার পিছু-পিছু। সে অপরাজেয়, সে সর্বভয়বাধাহীন, সে বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলার দুরন্ত তারুণ্যের প্রতীক—সে আসছে, যার ভয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূলভিত্তি থরথরিয়ে কাঁপে। কিন্তু ততক্ষণে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করে চিৎকার উঠেছে, 'সুভাষ বোস কি জয়!'

দেখতে দেখতে পুলিসের কঠিন ব্যূহভেদ করলেন সুভাষচন্দ্র এবং ক্ষিতীশ-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। পুলিস লাঠি চার্জ করল। পুলিস আগেই লাঠি বসালো ক্ষিতীশপ্রসাদের ওপর। তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে লাঠির ঘা পড়ল সুভাষচন্দ্রের একখানা হাতের তালুতে—হাতখানা ফেটে গেল! সেই মুহূর্তে আমার নিত্য-সঙ্গী সুধীন্দ্র নিয়োগী সুভাষচন্দ্রকে বাঁচাতে গিয়ে কপালের উপরে লাঠির আঘাত খেয়ে মাটিতে পড়ল এবং তার চশমাখানা ছিটকিয়ে কোথায় গেল। অবশেষে প্রবীণা মহিলা নেত্রী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী সুভাষচন্দ্রকে যেন আপন সন্তানের মতো দুই হাত দিয়ে আগলিয়ে ধরলেন। টেগার্টের নির্দেশ ছিল, মেয়েছেলের উপর লাঠির ঘা না পড়ে—ওতে দেশী কাগজগুলো বড়ই ঝামেলা বাধায়।

সুভাষচন্দ্রকে রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিস ধরে নিয়ে যায় লালবাজারে। তাঁকে ছয়মাসের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সুধীন্দ্রকে সেই মাথাফাটা অবস্থায় কারা যেন হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এই ঘটনার চৌদ্দ বছর পরে জনবরেণ্যা নেত্রী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে আমেরিকান মিলিটারী ট্রাকের ধাক্কায় আহত হয়ে মারা যান।

যাই হোক, সুভাষচন্দ্রের উপরে এই লাঠির আঘাত নিয়ে বাঙ্গলায় এবং ভারতের সর্বত্র যখন ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ধিক্কার চলছে, তখন কলকাতার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্দরমহলে শান্তশিষ্ট এক তরুণী গ্রাজুয়েটের মনে তার স্বভাব-বিরোধী এক প্রতিহিংসা সম্ভবত তাকে স্থির থাকতে দেয়নি। তখন বাঙ্গলার গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক কন-ভোকেশন উপলক্ষে চান্সেলর হিসেবে সেনেট হলে উপস্থিত ছিলেন। হাসান সুহরাবর্দি তখন ভাইস-চ্যান্সেলর। এই সুযোগ! খুন-কে বদলা খুন! হঠাৎ

পর পর পিস্তলের দুটি গুলী ছুটে গেল জ্যাকসনের দিকে। কিন্তু চিরনিরীহ মেয়েটির হাত বোধ হয় কেঁপেছিল—লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। সুরাবর্দি সাহেব ছুটে গিয়ে ঝাপটিয়ে মেয়েটিকে ধরে ফেললেন।

আমার পক্ষে সেদিন অবিশ্বাস্য ছিল, এ মেয়েটি আমাদেরই সুপরিচিতা শ্রীমতী কল্যাণী দাসের কনিষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতী বীণা দাস। বীণা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

কিন্তু তখন অপর একটি ঘটনায় দেশবাসীর মন শোকাচ্ছন্ন। যে দুই বিরাট ব্যক্তিত্ব একদা উত্তর ভারতে গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করেছিল তাঁরা দু'জন হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু। এঁরা দু'জনেই ছিলেন অতুল বৈভবের অধিকারী এবং এঁদের ভোগবিলাসের নানা কাহিনী আমরা এক কালে শুনতুম। কিন্তু এঁরা উভয়েই দেশের ও জাতির কল্যাণের জন্য যথাসর্বস্ব দান করে পথে এসে দাঁড়ান। দেশবন্ধুর মৃত্যু ঘটে জুন, ১৯২৫-এ। এবার পণ্ডিত মোতিলালের মৃত্যু ঘটল ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১-এ।

'স্বদেশ'-এর প্রথম সংখ্যা বেরোল সগৌরবে। প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় নজরুলের কবিতা ছাপা হল। নাম, স্বদেশ। প্রত্যেক পৃষ্ঠা ওল্টালেই একে একে পরিচিত নাম। কাগজের মোটা মলাট, লাল আর সবুজে ছাপা। সামনেই আমার নাম সম্পাদক হিসাবে মুদ্রিত। ইমিটেশন আর্ট পেপারে সমস্ত কাগজ ছাপা এবং লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চির পৃথিবী-প্রসিদ্ধ একটি ছবি ইতালীয়ান আর্ট পেপারে খুব সুন্দরভাবে মুদ্রিত। এক মাসের মধ্যে এই কাগজের খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হয়। বৈদ্যনাথ বিশ্বাস খরচপত্রের ব্যাপারে কিছুমাত্র কৃপণতা করেননি এবং প্রথম সংখ্যাটি দেখিয়ে তিনি প্রচুর বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি নিজে বীমা কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক।

লেখকদের তালিকায় যারা ছিল তাদের অনেকেই পারিশ্রমিক পেল। বুদ্ধদেব লিখতে লাগল গল্প ও কবিতা দুইই। আর একটি ধারাবাহিক লেখা আরম্ভ করল, নাম দিল, 'এরা ওরা এবং আরো অনেকে'। তার লেখার প্রচুর নাম হল। প্রেমেন লিখল তিনটে কবিতা, মজুরি পেল পনেরো টাকা। তার সাহিত্য জীবনে কবিতার জন্য সেই প্রথম পারিশ্রমিক পেল! 'স্বদেশ' সম্বন্ধে তার উৎসাহ এখন প্রচুর এবং সে এখন এখানে প্রায়ই আসে! গ্রন্থ-সমালোচনা লেখবার জন্য সে ছদ্মনাম নিয়েছে 'কৃত্তিবাস ভদ্র'। অচিন্ত্য নাম নিয়েছে 'অভিনব গুপ্ত'। আমি নিজে কিছুদিন থেকে 'কীর্তনীয়া'—এই ছদ্মনামে লিখছি নানা কাগজে। স্বদেশেও

ওই নামে কিছু কিছু লিখতে আরম্ভ করলুম। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে ওই ছদ্মনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলুম কোন্ কাগজে যেন। সেটির রচনাভঙ্গীতে বোধ হয় কিছু নতুনত্ব ছিল, তাই তিন-চারটি কাগজে ওটি পুনর্মুদ্রিত হয় এবং একই 'মুরগি' বার বার 'জবাই' করার ফলে বেশ কিছু অর্থপ্রাপ্তিও ঘটে।

যাই হোক, এই সময়ে আমার কিছু খ্যাতি বেড়ে উঠেছিল নানা লোকের কথায় কথায়। আমি তার সুযোগ নিয়েছিলুম একদিন অপরিসীম দুঃসাহসের সঙ্গে। হঠাৎ গিয়ে গুরুদাস চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড সন্সের দোকানে ঢুকলুম। অতি বৃহদাকার ওদের প্রতিষ্ঠান। ওঁদের ওই অট্টালিকার নিচের তলাকার দক্ষিণ-পূর্বাংশটা হল ছাপাখানা। ওঁরা তখন কলকাতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্য প্রকাশক এবং শরৎচন্দ্রের বই ছাড়া পরবর্তীকালের কোনও লেখকের বই ওঁরা অদ্যাবধি বিশেষ ছাপেননি। ডি-এল-রায় প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' মাসিকের ওঁরাই মালিক। ভারতবর্ষে তখন আমরা সবাই গল্প লিখতুম, কিন্তু ওঁদের বইয়ের দোকানে ঢোকার সাহস কারও ছিল না। ওঁদের আভিজাত্যের আত্মাভিমান ছিল প্রবল। লেখকদের পরিচয় সেখানে সামান্যই। যাই হোক, ওঁরা দু' ভাই— হরিদাস ও সুধাংশুশেখর, স্বর্গত গুরুদাসের দুই পুত্র। ওঁদেরই প্রথম ছাপাখানা 'বেঙ্গল প্রেস' ছিল আমার দিদিমার বাড়িতে মদন মিত্র লেনে। তখন আমার শৈশবকাল।

সামনেই বসেছিলেন সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়। সুশ্রী, সিপসিপে, চোখে চশমা— পরিণত যুবা। আমি 'ভারতবর্ষ'-এ মধ্যে মাঝে ছোট গল্প লিখি, তিনি জানেন বই কি। এখন আমি যে একখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রস্তুত করেছি এবং সেটির জন্যই তাঁর কাছে সসঙ্কোচে এসেছি, এটি শোনামাত্রই তিনি বইটি প্রকাশ করতে রাজি হলেন। পরদিন ওই একই সময়ে যখন পাণ্ডুলিপিটি এনে তাঁর হাতে দিলুম তখন তিনি বেশ সাগ্রহেই সেই বইয়ের গ্রন্থস্বত্ব বা কপিরাইট কিনে নিলেন আড়াই শ' টাকায়! তখনকার দিনে সর্বস্বত্ব কেবল গ্রন্থস্বত্বকেই বোঝাতো। তখন না ছিল সিনেমা, না বেতার, না নাটক, না ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ, না বা অন্য কিছু। সর্বস্বত্ব মানেই গ্রন্থস্বত্ব!

আড়াই শ' টাকা! এক সঙ্গে পঁচিশখানা করকরে দশ টাকার নোট! সেদিনকার দুপুর বেলাটা আমার চোখে মনে হয়েছিল এক জ্যোতির্ময় প্রভাত! আমি ছুটে চলে গিয়েছিলুম বাড়িতে। তখন আমার বড়দার কন্যার সঙ্গে এক ইস্কুল মাস্টারের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। আমি মায়ের হাতে সমস্ত টাকা দিয়ে বললুম, রুমার বিয়ের জন্য চাঁদা দিলুম।

আমার কাছে এই 'যুগান্তকারী' সংবাদ পেয়ে অচিন্ত্য আমাকে ধরে বসল. আমার একখানা বই গছাতে পারিস? বইখানা বেশ মোটা হবে।

দু' দিনের মধ্যেই অচিন্ত্যকে নিয়ে হাজির হলুম সুধাংশুবাবুর কাছে। একেবারে সঙ্গে সঙ্গে, তিনি যেন মুখিয়েই ছিলেন! আমার মত অচিন্ত্যও বেচলো কপিরাইট—নগদ দুশ' পঁচাত্তর! আমার চেয়ে তার বই বড়। অচিন্ত্যর জীবনেও এই প্রথম 'বিপুল' পরিমাণ সাহিত্যকর্মের মজুরি। তার বইয়ের নাম হল 'কাক-জ্যোৎস্না', আমার উপন্যাসের নাম 'দুই আর দুয়ে চার।'

এরপর একে একে আমি সুধাংশুর কাছে 'নিশিপদ্ম' আর 'কলরব' দিলুম। ওগুলো তখন শুধু এডিশন বিক্রি। প্রত্যেকখানা একশ পঁচিশ টাকা। কথা রইল, আমার বই আমি সুন্দর করে ছাপবো। প্রসাধন ও প্রচ্ছদপট আমার রুচি অনুযায়ী, এবং বিলেতী বইয়ের মতো 'র‍্যাপার' জড়ানো হবে। ওঁরা ওতেই রাজি। বাঙলা বইতে সেই প্রথম 'র‍্যাপার' জড়াবার রেওয়াজ শুরু হয়।

অচিন্ত্য আর আমার কথাবার্তা ছিল নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি। কিন্তু কৈ-মাছের মতো কথাও কানে হাঁটে! সুতরাং আমাদের ওই যুগান্তকারী সংবাদ হাঁটতে হাঁটতে এখানে-ওখানে ঘুরে-ফিরে আদিগঙ্গার পোনাঘাটে গিয়ে পৌছল।

প্রেমেন একদিন চলল আমার সঙ্গে। তার ছোট গল্পের বই 'পুতুল ও প্রতিমা' নিল সুধাংশু। মোট একশ পঁচিশ টাকা সে পেয়ে গেল।

পাঠক সমাজ তখন 'স্বদেশ'কে বিশেষ সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করছে। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু লিবার্টির সত্যেন বসু ও প্রমোদ সেন, ভবানী মুখুজ্জে ও অবনী রায়—এরা লেখা পাঠাচ্ছে নিয়মিত। নজরুল, অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র, জসীম, অখিল নিয়োগী—সবাই লিখছে। তখন ইউরোপে প্রথম যুদ্ধের ফলশ্রুতিস্বরূপ একটা রাজনীতিক ডামাডোল চলছে। জার্মানীর প্রেসিডেন্ট হিনডেনবুর্গ জার্মানীকে বাগ মানাতে পারছেন না। এখানে ওখানে কম্যুনিস্টদের কর্মতৎপরতা চলছে। সেই সময় একজন জার্মান আন্দোলনকারী একটা নতুন রাজনীতিক ধুয়ো তোলে, তার নাম 'ন্যাশনাল সোসালিজম'। তার বক্তৃতা নাকি জ্বালাময়ী এবং ইঙ্গ-ফরাসী বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। পরাজিত জাতি যদি বিজেতাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার কথা শোনে, তবে পরাজয়ের জ্বালা ইন্ধন পেয়ে আরও জ্বলে! সুতরাং সমগ্র জার্মানী ওই আন্দোলনকারীর বক্তৃতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে এবং হাততালি দেয়। সকল দেশের ও সকল কালের জনসাধারণ রাজনীতিকদের হাতের ক্রীড়নকমাত্র। যাই হোক, 'স্বদেশ'-এর লেখক সুনীল ধর একদিন কোন একখানা বিলেতী কাগজের একটা কাটিং আমার কাছে নিয়ে এল। দেখলুম, ওই জার্মান 'এজিটেটরের'

একখানা ছবি ও তার কর্মতৎপরতার পরিচয় সংযুক্ত রয়েছে। লোকটার নাম অ্যাডলফ হিটলার। বাঙ্গলায় তখনও তার নাম জানে না কেউ। সুনীলকে বললুম, ওই কাটিং থেকে একটা প্রবন্ধ বানিয়ে দাও। সেই প্রথম হিটলারের ছবি ও পরিচয় এলো বাঙ্গলায়। কেউ কেউ বলল, কোথাকার কে একটা লোক তার জন্য স্বদেশের তিনটে পৃষ্ঠা নষ্ট হল। সবাই জানে, হিটলার ক্ষমতায় আসেন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর ডিক্টেটর হয়ে। তিনি যথাসময়ে প্রেসিডেণ্ট হিনডেন-বুর্গকে তাড়িয়ে দেন এবং নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফন প্যাপেনকে নিষ্ক্রিয় করেন।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী কল্যাণী দাসের আত্মীয়রা 'পুণ্যাশ্রম' নামক একটি মহিলা প্রতিষ্ঠান নতুন করে গড়ে তোলেন। এর সঙ্গে শ্রীমতী শোভারও কিছু সম্পর্ক ছিল। সুতরাং 'পুণ্যাশ্রমে'র প্রথম আলোচনা আমার সঙ্গে। হিন্দুস্থান রোড আর গড়িয়াহাটের মোড়ের দিকটা তখনও বনবাগানে ঘেরা অনুন্নত ও জনবিরল। তখনও গড়িয়াহাট মার্কেট স্বপ্নাতীত। না আছে গুরুদাস ম্যানসন, না যশোদা ভবন। সাদার্ন অ্যাভেন্যু তৈরি হয়নি। ট্রাম-লাইন ছাড়লেই লেক অঞ্চল বনবাদাড়ে অগম্য। সুন্দরবন যেন গায়ে-গায়ে। তখন লোকে ওদিককার গোবিন্দপুর এবং রাজা সুবোধ মল্লিকের যাদবপুর আর যোধপুর ক্লাবের নাম জানত, আর জানত নলিনীরঞ্জন সরকারের হিন্দুস্থান ইন্সুয়োরেন্স স্কীমের ভবিষ্য নতুন বালিগঞ্জের নকশা। সে যাই হোক, ওই পাড়াতেই একটি পুরনো বাড়ির নিচের তলাকার তিন-চারটে ঘর নিয়ে 'পুণ্যাশ্রম' বসল। তখন ওটার বিশেষ দরকার হয়েছিল। যেসব মেয়ে তাদের বাপ দাদা বা স্বামীর অবাধ্য হয়ে আইন অমান্য আন্দোলনে নেমেছিল, মফঃস্বল থেকে এসে দুরবস্থায় পড়েছিল, অথবা জেল থেকে বেরিয়ে আর ঘরে ফিরতে চাইছিল না, তাদের উপায়? কোথা যাবে তাঁরা? কে তাদের খাওয়া-পরা যোগাবে? কে তাদের আগলিয়ে রাখবে? এসব নিয়ে মেয়েমহলে মস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

শ্রীমতী শোভা পুণ্যাশ্রমের জন্য আমার কাছে একদিন হাত পাতলেন। সুতরাং আমি দিন তিনেক ধরে সাত হাত মাটি খুঁড়ে মোট একশ' টাকা এনে তাঁর হাতে দিলুম। টাকাটা তিনি এমনভাবেই নিলেন যেন এ তাঁর প্রাপ্য। না ধন্যবাদ, না দুটো মিষ্টি কথা, না বা কিছু। তাঁর বিশ্বাস তাঁর অঙ্গুলি হেলনে আমি সমুদ্র মন্থন করতে পারতুম!

আমার আরেক কাজ এ বাড়ির মাতাঠাকুরাণী শ্রীযুক্ত লাবণ্যপ্রভা দত্তর সভানেত্রীত্বে একটি প্রতিষ্ঠান আমি গড়ে তুলছি যার নামকরণ আমিই করেছি 'আনন্দমঠ'। এই আনন্দমঠের জন্য শ্রীমতী শোভা একটি ঘরভাড়া নিয়েছেন

ভবানীপুরে ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে দেবেন্দ্র ঘোষ রোডে ঢুকেই বাঁহাতি একটি বাড়ির দোতলায়। ঘরটি উত্তরমুখী এবং দক্ষিণে লম্বা। সিঁড়ি ভিতরের দিকে। আমাদের উদ্দেশ্য, সামনের দিকে একটি পাঠাগার—সেখানে থাকবে নানা রকমের বই এবং পড়াশুনোর সুবিধা। ঘরখানা আলমারি দিয়ে পার্টিশান করা হবে। ভিতরের দিকে থাকবে শুধু একখানা বড় তক্তাপোষ, সেখানে আনন্দমঠের 'সন্তানরা' অর্থাৎ বিপ্লবীরা গোপনে এসে মিলিত হবে। এই আইডিয়াটা পাওয়া গিয়েছিল 'সিমলা ব্যায়াম সমিতির' কল্যাণে। সামনের দিকে বাৎসরিক বারোয়ারি দুর্গাপুজো, ভিতর দিকে সকল দলের বিপ্লবীদের বাৎসরিক সঙ্গোপন সম্মেলন!

পাছে আনন্দমঠের উদ্বোধন অনুষ্ঠান গোয়েন্দা পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেজন্য আমরা স্থির করলাম এর উদ্বোধন করা হবে হাজরা রোডের বাড়িরই নিচের তলায়। এখানে উঠোন ছিল প্রশস্ত যেটি সমাবেশের পক্ষে সুবিধাজনক। আমি নিজে গিয়ে কাজী নজরুল, নলিনীকান্ত সরকার এবং কাকে কাকে যেন নিমন্ত্রণ করে এলুম। আমাদের মূল উদ্দেশ্য যে পাঠাগার নয় এটি ইষ্টমন্ত্রের মতো সকলের কাছেই চেপে রাখতে হল। এটি একটি মহিলা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজসেবা কেন্দ্র—এইটিই প্রচারিত থাক। নলিনীদা ও নজরুল আমাকে অবিশ্বাস করেননি।

আগের দিন রাত জেগে আমি সভানেত্রীর অভিভাষণটি লিখে প্রস্তুত করলুম। কারণ এটি লাবণ্যপ্রভার ছবি সহ 'স্বদেশ'-এর আগামী সংখ্যায় আমি প্রকাশ করব।

'আনন্দমঠ'-এর উদ্বোধনের দিন বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদেরকে আনিয়েছিলুম। দক্ষিণ কলিকাতার বহু নেত্রীস্থানীয়া মহিলা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। উদ্বোধন সঙ্গীত গাইল নজরুল তার অনবদ্য কণ্ঠে। এই উপলক্ষে সে একটি গান রচনা করেছিল, 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা জাগো পদদলিতা—' ইত্যাদি। অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল এবং সভার সম্পূর্ণ বিবরণটি ছাপা হয়েছিল কোনও কোনও সংবাদপত্রে। লাবণ্যপ্রভা দক্ষিণ কলিকাতার অন্যতম নেত্রী হিসেবে সেই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

আমি নিজে ভারবাহী জন্তু। আর-জি-কর হাসপাতালের পাশে নীলমণি মিত্র রো-র বাড়ি থেকে ভবানীপুরের দেবেন্দ্র ঘোষ রোডের বাড়ি ক' মাইল? আমি সেই দূর পথ হাঁটতে হাঁটতে সঙ্গে ঠেলাগাড়ি করে প্রায় দেড় হাজার বই—তৎকাল পর্যন্ত আমার যা কিছু বাংলা আর ইংরেজী সংগ্রহ, যা কিছু প্রাচীন আর নবীন—সব এনে জড়ো করেছিলুম 'আনন্দমঠে', পরোক্ষে সেই মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণকমলে।

ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি রদ করাবার জন্য গান্ধীজী প্রচুর চেষ্টা-চরিত্র ও আবেদন নিবেদন করেছিলেন। তাঁর রাজনীতিক নীতিধর্ম অহিংসা, কিন্তু বিপ্লবীরা কোনদিনই তাঁর অপ্রিয় ছিল না। তারা হয়ত অহিংসাবাদের বিরোধী, কিন্তু দেশের শত্রু নয়।

সুভাষচন্দ্রের মধ্যে এসব নীতি-বিশ্লেষণ ছিল না। তাঁর কথা সোজা। যে দুষ্কৃতকারী স্রেফ গায়ের জোরে আমাদের ওপর চেপে বসেছে সেই 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী,' সুতরাং তার প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করা দরকার। যদি ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি হয়, তাহলে মনে রেখো, লক্ষ লক্ষ ভগৎ সিং মাথা তুলবে। আমাদের দেশে এবং প্রতিটি ইংরেজকে এর উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে!

সুভাষবাবুর চোখ দুটো চশমার ভিতর দিয়েও দেখা যাচ্ছে টসটসে রাঙা। কী সুন্দর মুখশ্রী, বলবান স্বাস্থ্যের উপর ঝলমল করছে তারুণ্য! উনি চমৎকার হিন্দুস্থানী ভাষায় বক্তৃতা করছিলেন গ্যাঁড়াতলার ময়দানে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষের সামনে। ওই ময়দানটা ছিল একটু উঁচু, ওর চারদিকে ছিল অবাঙালী মুসলমানদের খোলাখাপরার বস্তি। ও-অঞ্চলে রাত্রের দিকে ভয়ে কেউ হাঁটাচলা করত না। পরে কবে যেন ওই উঁচু মাঠটার চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ওর নামকরণ করল 'মহম্মদ আলি পার্ক'। গান্ধীজীর আমলে অনেকগুলো মহম্মদ আলির মধ্যে এই মহম্মদ আলি ছিলেন প্রধান। ওঁর সহোদর ভাইয়ের নাম ছিল সৌকত আলি। দু'জনেই মোটা, দু'জনেরই মস্ত ভুঁড়ি এবং দু'জনেই ঘাড়ে-গর্দানে এক। ওঁদের সঙ্গে শীর্ণকায় গান্ধীজীর ভাব হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনের কালে। ওঁরা দু'জন মধ্যপ্রাচ্যের কোন্ খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে গান্ধীজীর নাম জড়িয়ে রেখেছিলেন, এবং এই সূত্র ধরেই বুঝি কিছুকাল পরে ওঁরা দুই ভাই গান্ধীজীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজী তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন কিনা সেটি ইতিহাসই জানে। তবে তাঁর বড় ছেলে হীরালাল একদা কল্‌মা পড়েন, ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন্ এবং 'আবদুল্লা' গান্ধী নামে পরিচিত হন।

শোনা যায়, এই ধর্মান্তরিত হবার জন্য পুরস্কারস্বরূপ হীরালালজী হাজার পঞ্চাশেক টাকা 'ইনাম্' গ্রহণ করেন। আবদুল্লা গান্ধীর সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধেয় সুধাদার বন্ধুত্ব ছিল। হীরালাল কলকাতার এক বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন এবং

বাঙ্গলায় কথা বলতেন। তাঁর প্রকৃতি ছিল উচ্ছৃঙ্খল, তাই বোধ করি ব্যবসায় গণেশ উল্‌টিয়ে যায়।

তখন বারুদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বাঙ্গলায়। বাঙ্গলা দেশ মনে-প্রাণে অহিংসাবাদকে গ্রহণ করেনি, বোধ হয় করবেও না। বাঙ্গালী একটুখানি রক্তের ভক্ত। কালীঘাটে পাঁঠা বলি দিয়ে তার রক্তের টিপ কপালে তুলে নেয় বাঙ্গালী। মাথায় সিঁদুর, কপালে রাঙ্গা টিপ, ঠোঁটে রাঙ্গা পানের রস, পরনে রাঙ্গাপাড় শাড়ি, হাতে রাঙ্গা শাঁখা, পায়ে রাঙ্গা আল্‌তা—এই হ'ল বাঙ্গালী মেয়ে! এ মেয়ে সর্বাপেক্ষা উৎপীড়িতা ও নির্যাতিতা, সর্বাপেক্ষা কোমলা, দুর্বলা, অবলা; এ মেয়ে রোগে দুঃখ-দারিদ্র্যে অভাব-অনটনে বিশীর্ণা—কিন্তু এই মেয়েরই জঠরে জন্মায় দিগ্বিজয়ী বড় বড় প্রতিভা। প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, নন্দকুমার, রানী ভবানী, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশ,—কে আসেনি ওই জঠরে? শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক, শ্রেষ্ঠ শিল্পী, শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক, শ্রেষ্ঠ সাধক—কে নয়?

১৯৩০ থেকে বেশ কোমর বেঁধে সাম্রাজ্যরক্ষী ইংরেজের সঙ্গে বিপ্লববাদী বাঙ্গালীর 'ক্রিকেট' খেলা আরম্ভ হয়েছিল। আমরা চারিদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম কে কাকে আউট্‌ করে এবং কার কত রান্‌ হয়। বিপ্লবীরা যদি একটা ইংরেজকে মারে, ইংরেজ অমনি দুটোকে ফাঁসিতে লট্‌কিয়ে দেয়। পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট ছিল ইংরেজ পক্ষের নাটের গুরু, কিন্তু ওই লোকটিকে কোনমতেই বাগে পাওয়া যাচ্ছে না, এই দুঃখ। লোকটা আবার নাকি বিভিন্ন ছদ্মবেশে এখানে-ওখানে যখন-তখন ঘুরে বেড়ায় এবং ঘরের শত্রু বিভীষণদের রাখে সামনে ও পিছনে। লোকটার চেষ্টা ছিল, যেখানে যত গহ্বর ও গর্ত আছে, সেগুলোর মধ্যে খোঁচাখুঁচি করে বিপ্লবীদের খুঁজে বার করা। সন্দেহ নেই, লোকটা ছিল অসমসাহসিক।

আমি 'স্বদেশ'-এর সম্পাদকীয় লিখতুম বেশ উগ্র মেজাজ নিয়ে। কিন্তু আমার চেষ্টা কাগজখানা যেন বাঁচে। সন্ন্যাসী সাধুখাঁ নামক হাওড়ার এক লেখককে দিয়ে জগৎ-প্রসিদ্ধ নর্তকী ইসাডোরা ডানকানের সদ্য প্রকাশিত 'মাই লাইফ'-এর অনুবাদ করাচ্ছিলুম। রবীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন দার্জিলিংয়ে, নজরুলও তখন সেখানে। দুই কবির দেখা-সাক্ষাৎ ও উভয়ের আলাপ-আলোচনার বিবরণ 'স্বদেশ'-এ ছাপছিলুম। অন্নদাশঙ্কর তখন ম্যাজিস্ট্রেট, এখানে ওখানে তাঁর পোস্টিং হয়। কিন্তু নিজের নাম তিনি তাঁর কোনও রচনায় কোনও সাময়িকপত্রে ছাপাতে পারতেন না। ইংরেজ আমলে কারণটা সুস্পষ্ট। তখনকার কালে

আরেকজন জাতীয়তাবাদী আই সি এসের নাম শুনতুম, তিনি শৈবাল গুপ্ত। তাঁর আবার এমনই দুঃসাহস, তিনি নাকি খদ্দরও ব্যবহার করতেন। পরবর্তী-কালে আমার জ্যোতিদি ওরফে সুলেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবীর কন্যা শ্রীমতী অশোকার সঙ্গে মিঃ গুপ্তের বিবাহ হয়। যাই হোক, অন্নদাশঙ্কর একটি ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন, 'লীলাময় রায়'। সবাইকে লুকিয়ে চুপিচুপি নিজের হাতের লেখাটি পর্যন্ত অন্যকে দিয়ে নকল করিয়ে তবে লেখা ছাড়েন সাময়িক পত্রে! সেই সব লেখা কিন্তু সাহিত্যেরই লেখা, তাতে রাজনীতির গন্ধও নেই—কিন্তু তবু বৃটিশ আমলের আতঙ্ক ও নিষেধ অন্নদাশঙ্করকে সতর্ক করে রাখত।

এমনি একটা সময়ে একটি সাহিত্যোৎসাহী ও সুশ্রী তরুণী লেখক সমাজের মধ্যে কোথা থেকে যেন ছটকিয়ে আসে। মেয়েটির দেহলাবণ্য ও নবীন তারুণ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওর মিষ্ট মুখশ্রী, মধুর হাসি, ভদ্র ব্যবহার এবং প্রত্যেক লেখক-লেখিকার প্রতি ওর আন্তরিক অনুরাগ—ওকে অল্পকালের মধ্যে সকলের প্রিয় ক'রে তোলে। মেয়েটির নাম জাহানারা বেগম চৌধুরী। সাংবাদিক আলতাফ চৌধুরী ওর ভাই কিনা আমি জানিনে, এবং ওই চৌধুরী পদবীটি বগুড়ার প্রাক্তন নবাব, নবাব আলী চৌধুরীর থেকে নেমে এসেছিল কিনা তাও আমার অবিদিত। জাহানারার জননীও সুদর্শনা, এবং হিন্দু বাঙ্গালীর কন্যা বলে শুনেছি। জাহানারার সর্বাপেক্ষা যে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও হিতৈষী ছিল, সেও আমাদের বন্ধু দেবু চৌধুরী। দেবু বিশেষ অমায়িক ও সজ্জন। যাই হোক, জাহানারার বয়স তখন আর কত হবে? বছর ষোল-সতেরো!

শ্রীমতী জাহানারা ছোট বড় মাঝারি প্রবীণ—সব লেখক, কবি, শিল্পী-সমালোচক, সাংবাদিক এবং বিজ্ঞাপন-দাতাদের সঙ্গে তার এই সুন্দর যৌবনশ্রী, মিষ্ট ভাষণ ও অত্যাধুনিক প্রসাধন সজ্জা নিয়ে একখানা নতুন মোটরে চড়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কেননা সে তার নতুন এক সাহিত্যপত্র প্রকাশ করবে। কাগজের নাম রেখেছে 'বর্ষবাণী'। এই বর্ষবাণীর জাল ফেলে সে যেমন গভীর জল থেকে চিতল-বোয়াল, রুই-কাতলা তুলবে, তেমনি আমাদের কয়েকজনের মতন অল্প জলের শফরিকেও বাদ দেবে না। ও-মেয়ের চেহারায় রয়েছে "—পলাশের নেশা, কিছু বা চাঁপায় মেশা।" সুতরাং ও-মেয়ে যে রবিঠাকুরের কাছে যাবে না, এ কি কখনও হয়? তা ছাড়া কিশোরী-কবি মৈত্রেয়ী দেবী যদি কবি সম্রাটের কাছে প্রশ্রয় পেয়ে থাকেন, জাহানারা কি দোষ করল?

অল্পকালের মধ্যে কবি ও লেখক মহলে জাহানারা ঝড় তুলল। অনেক লেখকের বউ ঈর্ষা ও সন্দেহে জরজর হতে লাগল, এবং ওই বালিকা জাহানারা

অবশুই জানত, প্রতি' লেখক সম্বন্ধে তার শরসন্ধান ব্যর্থ যাবে না। জাহানারা প্রচুর খ্যাতি অর্জন করল। আমি ওর খ্যাতি লক্ষ্য করে প্রথমটা কুঁকড়িয়ে গিয়েছিলুম। কেননা তখনকার দিনে খ্যাতনামা কোনও সুন্দরীর সঙ্গে ভাব-আলাপ বা ঘন পরিচয় ঘটলে খুব সহজেই কানাকানি রটে! এইটি মনে রেখে আমি খুবই সতর্ক থাকতুম। দেবুর সামনেই একদিন আমি জাহানারাকে বলতে বাধ্য হয়েছিলুম, দেখো, আমার নামের পাশে শুধু 'দা' বসিয়ো না, বলবে 'দাদা'। লেখা নেবে, পারিশ্রমিক দেবে। নইলে তোমার 'ঘরের ওই আলমারি থেকে খানকয়েক শাড়ি নিয়ে সরে পড়ব! সাবধান বলছি—

জাহানারা হেসে অস্থির হয়েছিল। মেয়েটা নাকি শুনেছিল, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তর ছয়শ'খানা ধুতি ছিল, সুতরাং তাকেও অন্ততপক্ষে ছয়শ'খানা শাড়ি জমাতেই হবে!

যে-কয়জন ব্যক্তি জাহানারার প্রিয় ছিল, তাদের মধ্যে দেবু, নজরুল ও কালিকা প্রেসের মনোরঞ্জন চক্রবর্তীর নাম মনে পড়ছে। এরা এদের ভদ্র ব্যবহার ও মিষ্ট প্রকৃতির জন্য জাহানারার সকল কর্মে সহায়ক হয়েছিল। যাই হোক, পরবর্তী তিরিশ বছরেরও বেশি কাল অবধি সে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখেছিল। তার দু'তিনটি বিবাহ, এবং বিভিন্ন দুর্দশা ও দুর্গতি, এবং তার অবস্থার বিলম্বিত পরিণতি—কিন্তু এসব সত্ত্বেও সকল সময়েই সে আমাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছে। বোধ হয় আমার ওই কথাটা সে মনে রাখত, আমি নির্মোহ।

১৯৩০ থেকেই মেয়েরা বহু ক্ষেত্রে গার্হস্থ্য জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করেছিল। ঘরে বন্দিনীর জীবন তারা চাইছে না, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে কোনও কাজও খুঁজে পাচ্ছে না। মেয়েদের লেখাপড়া করাটা তখনও আবশ্যিক হয়ে ওঠেনি। মধ্যবিত্ত বা স্বল্পবিত্ত সমাজে তখনও নারী শিক্ষার যথেষ্ট প্রচলন হয়নি। আবার যেসব মেয়ে সুশিক্ষিত, তারা উপযুক্ত কাজ না পেয়ে বিয়ে করে বসে যাচ্ছে। - অন্যদিকে আবার উচ্চশিক্ষিত মেয়েকে চট ক'রে ঘরে আনতেও গৃহস্থরা ভয় পাচ্ছিল। গত বছর 'বিজলী'তে যখন ছিলুম, তখন শ্যামবাজারের কাপড়-পটির এক গলিতে ছিল 'হিন্দু অবলা আশ্রম'। এই আশ্রমের পরিচালক ছিলেন পদমরাজ জৈন। একজন ব্যবসায়ী হয়ে ইনি হঠাৎ 'অবলা আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করতে গেলেন কেন, আমি জানিনে। বিজলী আপিস থেকে এই আশ্রম বোধ হয় মিনিট তিনেকের পথ। এক-একদিন ভর-দুপুরে এই আশ্রম থেকে একটি অথবা দুটি, কখনও বা তিনটি যুবতী মেয়ে বিজলী আপিসের তিনতলায় সোজা উঠে যেতো আমাদের ঘরে—যেখানে অনিল ভটচায, রতিকান্ত পালিত ও আমি

আড্ডায় মশগুল থাকতুম। ঘরের মধ্যে হঠাৎ মেয়েছেলের আবির্ভাব—আমরা আড়ষ্ট হতুম। জনতিনেক মেয়ে এলে একজন ওদের মধ্যে থাকত বর্ষীয়সী। ওরা কাজ চাইত—যে কোনও কাজ। আশ্রয় চাইত—যে কোনও শর্তে। শুধু তাই নয়, যেটা ওদের মুখে চোখে আভাসে ইঙ্গিতে অনুভব করতুম, সেটি কিছু অন্য প্রকার! আমার ধারণা, একটা কোনও অছিলায় ওদেরকে আমাদের কাছে পাঠানো হ'ত! আমার তৎকালীন বন্ধু ধ্যানেন্দ্র মিত্র বলেছিলেন, ১৯৩০ সালে করাচিতে কংগ্রেসের এক বৈঠকের কালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সময়ে কতগুলি বাঙ্গালী হিন্দু মেয়ে রামানন্দবাবুর কাছে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে বলে, কলকাতার 'অবলা আশ্রম'-এ তাদেরকে নানা আশ্বাস দিয়ে গ্রামাঞ্চল থেকে এনে এখন করাচী থেকে তাদেরকে আরব দেশে দলে দলে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তা'রা বাঙ্গলাদেশে ফিরে যেতে চায়! মেয়েরা কান্নাকাটি করতে থাকে।

রামানন্দবাবু মেয়েদের এই করুণ আবেদন শুনে কি প্রকার প্রতিকারের চেষ্টা করেছিলেন আমার মনে নেই। তবে এ নিয়ে মস্ত এক আন্দোলন হয়েছিল। এর মধ্যে নাকি লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন ছিল।

এ ছাড়া রাজনৈতিক নেতারা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, শহরে, গ্রামে ও গঞ্জে বক্তৃতা দিয়ে ফিরেছেন এবং ছেলেমেয়েদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন। অতঃপর ১৯৩১-এর মার্চের প্রথমে যখন গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের ফলে সাময়িক কালের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন থামল, তখন কলিকাতার এই নবাগত ছেলেমেয়েরা নিরাশ্রয় বোধ করেছিল। তাদের অনেকেই দেশে ফিরে যেতে চায়নি। ওদের মধ্যে এমন শত শত ছেলে ও মেয়ে ছিল, যারা কারাবরণ করতে পারলে খুশী হ'ত—কারণ তাদের সামনে ছিল অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয় সমস্যা।

পূর্বোক্ত 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে আলোচনার জন্য শ্রীমতী শোভা একদা আমাকে পাঠালেন শ্রীমতী বিমলপ্রতিভা দেবীর কাছে। তখন রাসবিহারী অ্যাভেন্যু তৈরী হয়েছে কিন্তু ওই চওড়া রাস্তার দুই পাশে মাঝে মাঝে দু'চারখানা বাড়ি সবেমাত্র তৈরি হচ্ছিল। যেগুলো দুদিকের সাইড স্ট্রীট, সেগুলোর ভিতরে-ভিতরে ফাঁকা মাঠ। লেক-এর দিক সন্ধ্যার থেকে ঘন অন্ধকার। মনোহরপুকুর পল্লীতে তখনও আশ-সেওড়ার জঙ্গল। ওরই একস্থলের নাম দেওয়া হয়েছে বুঝি হিন্দুস্থান পার্ক—অর্থাৎ নলিনীরঞ্জন সরকার ও সুরেন ঠাকুরের সেই হিন্দুস্থান লাইফ ইনস্যুরেন্সের নামানুসারে। ওইখানে জমি কিনেছেন নরেন্দ্র দেব এবং বাড়ি করেছেন কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী। ওঁর ওখানে মাঝে মাঝে আসতুম বউদিদির হাতের

চানাচুর আর চায়ের লোভে, আর যতীনদা সেই সুযোগে ওঁর কবিতা আমার মুখ দিয়ে আবৃত্তি করিয়ে নিতেন! তখন সন্ধ্যার পর সমগ্র নতুন বালীগঞ্জ অন্ধকারে আর ঝিঁঝিঁর ডাকে থমথম করত।

কিন্তু বিমলপ্রতিভার বাড়ি ছিল লেক মার্কেটের এদিকে দক্ষিণ ফুটপাথে। ওঁর স্বামী হলেন ডাঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দেশকর্মী এবং খুবই ভদ্র ও মধুরভাষী। কিন্তু শ্রীমতী শোভা আমাকে পুরুষ অপেক্ষা যেহেতু স্ত্রীলোক বলে কল্পনা করতেন, সেই হেতু আমি যে-কোনও বাড়ির কর্তা অপেক্ষা গৃহিণীদের নিকট বেশি অন্তরঙ্গ ছিলুম!

শ্রীমতী বিমলপ্রতিভা তখন তরুণী নেত্রী হিসাবে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর একখানা মোটরকার ছিল। আর্থিক অবস্থা তাঁদের ভাল। তিনি বোধ করি তখন লতিকা বসুরই সমবয়সী। বিমলপ্রতিভা যখন আমাদের আমন্ত্রণে সভায় এসে উপস্থিত হতেন এবং যখন তাঁর অতি মূল্যবান ও মিহি খদ্দরের রাঙ্গাপাড় শাড়ির সঙ্গে চিত্তাকর্ষক প্রসাধন পারিপাট্য দেখতুম, তখন অনেকের মতো আমারও ভাবান্তর ঘটত। এঁদের অনেকের চেহারার জন্য এঁদের দেশকর্মের খ্যাতি সহজেই ছড়িয়ে পড়ত এবং সংবাদপত্রে এঁদের ছবি ছাপা হ'ত। শ্রীমতী শোভার নির্দেশক্রমে আমিই ওঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ ক'রে 'আনন্দমঠ'-এ টেনে এনেছিলুম। কিন্তু তার পরে যে ঘটনা ঘটেছিল সে কথা পরে বলব।

'স্বদেশ' মাসিকপত্র নিয়ে আমি তখন ডুবে রয়েছি। সম্প্রতি হিন্দু মিউচুয়াল বীমা কোম্পানির শ্রদ্ধেয় পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয় যিনি আধুনিক লেখিকা শ্রীমতী বাণী রায়ের পিতা, তিনি আমাকে 'উপাসনা' মাসিকপত্রটিও দেখাশোনা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। এ ব্যাপারে আমি খুব সতর্ক। কারণ আমার বয়োজ্যেষ্ঠ প্রিয়বন্ধু সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের কতটুকু স্বার্থ এখনও পর্যন্ত এই 'উপাসনা'র সঙ্গে জড়িত, সেটুকু আমার দেখার দরকার ছিল। কিন্তু কালের গতির সঙ্গে সাময়িক পত্রের প্রকৃতি যদি গতিশীল না হয়, তবে সেই কাগজের অপমৃত্যু অনিবার্য। সাবিত্রীপ্রসন্ন মূলত কবি এবং সাহিত্যরসের কারবারী। তিনি ভদ্র, বন্ধুবৎসল, সুলেখক—কিন্তু সাপ্তাহিক বা মাসিকপত্রের পরিচালনা অন্য জিনিস। সেখানে ভিন্ন প্রকার যোগ্যতার কথা থাকে। প্রতি মাসিক সংখ্যায় পাঠকদের মনকে নাড়া দিতে হয়, ঘুম ভাঙ্গাতে হয়, উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করতে হয়, নতুন চিন্তাধারার চাবুক মারতে হয়। সাবিত্রীপ্রসন্ন হয়ত সে বিষয়ে কতকটা অসতর্ক ছিলেন। যে রোগী আধপেটা খেয়ে মরতে বসেছে, যার এ জীবনে

পুষ্টিকর খাদ্য জোটেনি, তা'কে মরণকালে যতই আঙুর-বেদানা, ফলমূল বা দুধ-মাখন গোগ্রাসে গেলাও, তা'র মরানাড়িতে কোনটাই ধরবে না! তার মৃত্যু ঘটে দুরারোগ্য ব্যাধিতে। 'উপাসনা'কে বাঁচাবার সাধ্য আমার নেই। পাঠক সমাজ 'উপাসনা'কে আর চায় না।

দোতলায় যখন উপাসনার মৃত্যু ঘটছে এবং খাবি খাচ্ছে ও তারই শিয়রে বসে প্রবীণ ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয় যখন তারকব্রহ্মনাম জপ করছেন, তখন তিনতলায় 'স্বদেশ' তার প্রচণ্ড প্রাণশক্তি নিয়ে সমগ্র পাঠক সমাজে প্রবল ঝড় তুলেছে! প্রতি মাসে উদ্‌গ্রীব পাঠকসাধারণ নতুন একটা জীবনের স্বাদ পাচ্ছে, নতুন সাহিত্যের প্রবল চেতনায় তারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে। দুর্ধর্ষ কবিতা লিখছে নজরুল, দুঃসাহসিক উপন্যাস লিখছে বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যর গল্পে এবং কবিতায় নতুন নতুন চিন্তার উদ্দীপনা,—আর প্রেমেন? সে এক মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক কবিতা রচনা করেছে, "অগ্নি আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম, চেনো কি তাদের ভাই? দুই তুরঙ্গ জীবন ও মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম/দুয়েরই বল্গা নাই।" কবিতাটি পড়ে আমরা চমৎকৃত হয়েছিলুম।

নিচের তলায় তখন উনিশ শতাব্দীর মৃত্যু ঘটছে, আর তিনতলার উপরে বিশ শতাব্দীর "প্রাণবন্যায় উঠিল ফেনায়ে মাধুরীর মঞ্জরী—"। এর কিছু আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁর অনন্যসাধারণ একটি উপন্যাস 'শেষের কবিতা'। প্রমাণিত হয়েছে আধুনিকতায় তিনি তাঁর সত্তর বছর বয়সেও সর্বাগ্রগণ্য। 'শেষের কবিতা'কে তার স্বভাব-সৌন্দর্যের জন্য একটি মহৎ কাব্যোপন্যাস বলা চলে। সেই সময়ে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ভারত-প্রসিদ্ধ দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় ছিলেন বাঙ্গালোরে। তিনি রবীন্দ্রনাথের বন্ধু। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় ১৯২৮-এ মাদ্রাজ ও কলম্বো হয়ে পণ্ডিচেরীতে যান শ্রীঅরবিন্দের আমন্ত্রণে। অতঃপর কবি সাগ্রহে বাঙ্গালোরে যান শীল মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সেখানে ব্রজেন্দ্রনাথের উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষের কবিতা'র সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি তাঁকে পড়ে শোনান।

এটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রবীন্দ্র জয়ন্তীর বৎসর—১৯৩১। মহাকবির বয়স এখন পূর্ণ সত্তর। এটির জন্য সমগ্র বাঙ্গলার সর্বজনবিদিত শ্রেষ্ঠ মনীষীদের নিয়ে এক বিরাট কমিটি গঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে একখানি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হবে, তার নাম দেওয়া হচ্ছে "গোল্ডেন বুক অফ টেগোর"। সম্পাদনা করবেন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক—যিনি দেশের সকল সম্পাদকেরই নমস্য—সেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁর জামাতা ডাঃ কালিদাস নাগ

ও মিউনিসিপাল গেজেটের সম্পাদক সৌম্যদর্শন অমল হোম—এঁরা দুজনে এই উৎসবে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তখন বাংলায় মনীষী ও প্রতিভাবান ব্যক্তির সংখ্যা এত বেশি এবং কমিটির সুদীর্ঘ তালিকায় প্রবীণ লেখক, কবি, ঔপন্যাসিক, শিল্পী, দার্শনিক, অধ্যাপক, জজ, ব্যারিস্টার ইত্যাদির নাম এত বেশি জুড়ে রয়েছে যে, আমাদের মতো নবীন লেখকদের কোথাও ঠাঁই নেই, এবং কেউ আমাদের পোঁছে না। তাছাড়া আমরা তখন 'বস্তি সাহিত্যের' লেখক, আমাদের নাম দিয়েছে 'ছাগ-সাহিত্যিক'—অমল হোম নাম রেখেছেন 'অতি আধুনিক'। আমাদের নাম উচ্চারণ করলে তখন ভাতের হাঁড়ি ফাটে, আমাদের মুখ দেখে বেরোলে তখন অযাত্রা, ভদ্র সমাজে আমাদের প্রবেশ ঘটলে আশেপাশে আতঙ্ক, সভাসমিতিতে গেলে 'ভদ্রলোকেরা' সভা ছেড়ে চলে যান। সুতরাং আমাদের কারোকে ওই কমিটিতে ঢুকতে দেবার কথাই ওঠে না!

আমি নিজে তখন স্বদেশের, উপাসনার, বিজলীর বা দুন্দুভির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পাদক হলে কি হবে আমার মূল্য কানাকড়িও নয়। অতএব আমি যথাসময়ে গিয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী দেখার জন্য একখানা পাঁচ টাকার টিকিট কিনলুম। এমনি একটা সময়ে বক্সা দুর্গের অন্তরীণ বন্দীরা রবীন্দ্রনাথকে তাদের কারাগার থেকে একটি অভিনন্দন পাঠান। রবীন্দ্রনাথ তখন দার্জিলিংয়ে। তিনি এই অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে যে প্রত্যভিনন্দন কবিতাটি বক্সা দুর্গের রাজবন্দীদের নিকট পাঠিয়ে দেন সেটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। সেই কবিতাটি হাতে পেয়ে ছুটে গিয়ে শ্রীমতী শোভার কাছে প্রথম আবৃত্তি করেছিলুম—"নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন/পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা সঙ্গীত না মানিল বন্ধন—" ইত্যাদি। কবিতাটি শুনে শোভার চোখে জল পড়েছিল।

বৃহত্তর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন গোল্ডেন বুক অফ টেগোর গ্রন্থে। সম্পাদক রামানন্দবাবু অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের কাছেও একটি চিঠি দিয়ে একটি লেখা চেয়েছিলেন। সম্ভবত রামানন্দবাবু তাঁর চিঠিতে শরৎচন্দ্রকে এই প্রকার লিখে থাকবেন, 'গোল্ডেন বুক অফ টেগোর' গ্রন্থে সব লেখাই থাকবে ইংরেজিতে বা বিদেশী ভাষায়। আপনার বাঙ্গলা লেখা পেলে আমরা ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে নেবো।

একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ। ব্রাহ্ম সমাজ খুশি ছিল না শরৎচন্দ্রের 'দুর্নীতি পূর্ণ' সাহিত্যের জন্য এবং শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাস 'দত্তা' লিখে হয়ত তার প্রতিশোধ নেন। ওদিকে 'প্রবাসী' মাসিকপত্র শরৎচন্দ্রের কোনও লেখাও ছাপে

না। সুতরাং শরৎচন্দ্রের মনে একটা অভিমান বা আক্রোশ ছিল। এমন সময় রামানন্দবাবুর এই চিঠি সেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল। চিঠির মধ্যে এই গন্ধ পাওয়া গেল যে শরৎচন্দ্র ইংরেজি ভাষা রচনায় অপটু অর্থাৎ তিনি উচ্চ-'শিক্ষিত' নন। শরৎচন্দ্র ক্রুদ্ধকণ্ঠে বন্ধু মহলে বললেন, রামানন্দবাবু কি জানেন যে আমি বাঙ্গলার চেয়ে ইংরেজিতে ভাল লিখতে পারি? স্পেন্সারের লেখা আমার আগাগোড়া মুখস্থ, তিনি কি তার খোঁজ রাখেন?

অনিলা 'দেবী'—এই ছদ্মনামে শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্য' নামক একখানা ছোট প্রবন্ধের বই লিখেছিলেন। ওই বইটিতে মাঝে মাঝে দু-চার ছত্র ইংরেজি কোটেশন থাকার জন্য পাঠক সমাজ প্রথম জেনেছিল'যে, শরৎচন্দ্র ইংরেজি বেশ ভাল জানেন! তাছাড়া তিনি চাকরি করতেন রেঙ্গুনে, এবং সম্প্রতি তিনি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এক বিশিষ্ট পরামর্শদাতা। ইংরেজি কিছু না জানলে তাঁর চলবে কেন?

যাই হোক 'গোল্ডেন বুক অফ টেগোর'-এ শরৎচন্দ্রের লেখা ছাপা হয়নি। কিন্তু এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাঁদের শ্রদ্ধা অনুরাগ, সম্মান ও প্রীতির বাণী ছাপা হয়েছিল, তাঁরা সকলে তখন জগৎসভায় অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। কয়েকজনের নাম এখানে আমি উল্লেখ করতে পারি। যেমন রোমাঁ রোঁলা, আইনস্টাইন, কাউন্ট কাইজারলিঙস্টেলা ক্রামরিশ, হ্যারল্ড ল্যাস্কি, এইচ জি ওয়েলস, মরিস মেটারলিঙ্ক, বার্নার্ড শ, নুট হামসুন, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, যোহান বোয়ার, সোয়েন হেডিন, জুলিয়ন হাক্সলি, আপটন সিনক্লেয়ার, হেলেন কেলার, কবি নোগুচি, টুচি, হ্যাভেলক এলিস, কবি ইয়েটস, কোচে, জন গলসওয়ার্দি, অধ্যাপক পিনকেভিচ (মস্কো) নিকলাস রোয়েরিথ, সি এফ এণ্ডরুজ প্রভৃতি। এছাড়া চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, জাভা, শিয়াম, ব্রহ্মদেশ, পারস্য, আরব, মধ্যপ্রাচ্য, সোভিয়েট ইউনিয়ন, সমস্ত ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা কানাডা আফ্রিকা,—সর্বদেশের বিপুল অভিনন্দন বাণী গ্রন্থে ছাপা হয়েছিল। ভারতবর্ষের পক্ষে গান্ধীজী, শ্রীঅরবিন্দ, রাধাকৃষ্ণণ, আচার্য জগদীশ, সি ভি রমন, জওয়াহরলাল নেহরু, স্যার অতুলচন্দ্র, ভাণ্ডারকর, আনন্দ কুমারস্বামী, মেঘনাদ সাহা, সুরেন দাশগুপ্ত—এবং আর কত নাম করব? বর্তমান শতাব্দীকালে 'গোল্ডেন বুক অফ টেগোর-এর মতো বিরাট বাণী-সংগ্রহ-গ্রন্থ আর কখনও ছাপা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবী জয় করেছিলেন, এবং শোনা যায় কমবেশি আড়াইশটি ভাষায় তাঁর সাহিত্য ও কাব্যের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

আমার পাঁচ টাকার টিকিট, তাও অমল হোম আর প্রবোধ চাটুয্যেকে ধরে

কেঁদেকেটে যোগাড় করেছি। আমার নৈতিক অধিকার ছিল টিকিট পাবার। কেননা তখন কোথাও রবীন্দ্র-কবিতার আবৃত্তির আসর বসলে প্রথমে আমার ডাক পড়ে!

গভর্নমেণ্ট হাউসের পশ্চিম প্যাচিল থেকে স্ট্রাণ্ড রোড পর্যন্ত—এই বিরাট অবকাশের মধ্যে 'রবীন্দ্র জয়ন্তীর' উৎসব অনুষ্ঠান বসছে। উত্তরের ফুটপাথে অ্যাকাউণ্টাণ্ট জেনারেল অফ বেঙ্গলের আপিস থেকে আরম্ভ করে টাউন হল, টেম্পল চেম্বার্স, হাইকোর্ট ও ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্কের কোণ পর্যন্ত প্রায় দুই লক্ষ চেয়ার দেওয়া হয়েছে। এটি জনসমুদ্র নয়, এটি ছিল সেদিন জগজ্জয়ীপ্রতিভাধর ও মনীষীদের এক মহাসাগর সঙ্গম। সেদিন পৃথিবীর ছয়টি মহাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্বজ্জন ও মনীষীদের একত্র সমাবেশ ঘটেছিল কলকাতায়,—ভারত ইতিহাসে এই শতাব্দীতে এত বড় একত্রিত সম্মেলন আর কখনও ঘটেনি। কেবলমাত্র ভারতীয় সামন্ত নরপতিগণের সংখ্যা ছিল চারশ'রও বেশি। এঁদের বাইরেও ছিলেন তুর্কী বংশীয় হায়দারাবাদের নিজাম, নেপালের সম্রাট ও প্রধানমন্ত্রী, শিয়ামের সম্রাট, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা, মিসরের ফারুক, অযোধ্যা ও মুর্শিদাবাদের নবাব, কাশ্মীরের মহারাজা, কাশী-নরেশ ইত্যাদি।

তখন বর্তমান বিধানসভার অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল কিনা মনে পড়ছে না। বোধ হয় হয়নি। ওরই সীমানায় এক অতি উচ্চ সালঙ্কার মঞ্চ তৈরি হয়েছে। তারই চূড়ায় সিংহাসনে বসবেন বিশ্বকবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ। সেই মঞ্চটা এত উঁচু যে, মনে হচ্ছে উপর দিককার সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র ছাড়িয়ে মহাকবির শ্বেতশুভ্র ললাট গগন চুম্বন করবে।

তাই হল। মহাকবি সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিলেন। পরনে তাঁর গরদের ধুতি, পাঞ্জাবি ও কাঁধে চাদর। তাঁকে একদিকে ধরে আছেন অমল হোম এবং অন্য-দিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আচার্য তাঁর পুরনো অভ্যাসবশত বার দুই মহাকবির পিঠ চাপড়িয়ে নিলেন! আচার্য কবির প্রায় সমবয়সী।

আর কিছু নয়, সেদিনকার ওই সমাবেশের কালে পৃথিবী ও ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদেরকে মহাকবির তুলনায় অত্যন্ত সামান্য ও নগণ্য মনে হয়েছিল।

কিন্তু রবীন্দ্র জয়ন্তীর ওই বিরাট উৎসবের কালে চারিদিকে যখন 'মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ' তখন সেই উৎসবের দিন প্রভাতকালে কলকাতার সংবাদপত্র জগতে এক প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণ ঘটল। সেই সাংঘাতিক বোমাটি আচমকা ওই শুভ সমারোহের উপর নিক্ষেপ করল আমাদের শিবরাম চক্রবর্তী। তার ওই জয়ন্তী বিরোধী প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল 'নবশক্তি'তে। প্রচুর পরিমাণ

মিষ্টান্ন খেয়ে সকলের গলার মধ্যে যখন কিটকিট করছে সেই সময়ে শিবরামের এই চাটনি নিন্দারসিক বাঙ্গালীর পক্ষে বড়ই উপাদেয় লাগল! সকাল থেকে 'নবশক্তি' সাপ্তাহিক পত্রিকাটি পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে হাজার-হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেল। শিবরামের এই প্রবন্ধ রঙ্গে ব্যঙ্গে বিদ্রূপে উপহাসে বক্রোক্তিতে একদিকে ছিল যেমন প্রখরভাবে রবীন্দ্র-বিরোধী অন্যদিকে তেমনি ছিল ক্ষুরধার, সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক। এই প্রবন্ধে শিবরাম হয়ে উঠেছিল 'পরশুরাম'!

শোনা যায় আগের দিন মধ্যরাত্রে কোন কোনও লোক এই লেখাটার খবর পেয়ে শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের কাছে ছুটে যায় যাতে তিনি এই লেখাটার প্রকাশ বন্ধ করে দেন, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। শরৎবাবু চেষ্টা করেও ওটা বন্ধ করতে সমর্থ হননি। কারণ, ফর্মাগুলো তখন হাতের বাইরে চলে গেছে।

'মহিলা' শব্দটি তৎকালে সবেমাত্র এখানে ওখানে অল্পস্বল্প ব্যবহার করা চলছে। যতদূর মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির রচনায় ওই শব্দটি তখনও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। নারী, মেয়ে, স্ত্রীলোক, মেয়েছেলে, স্ত্রী-কবি, নারী-লেখিকা—এইগুলি প্রচলিত ছিল। কিন্তু রেলগাড়ির কামরায়, থিয়েটারের প্রবেশপথে, সরকারী স্নানাগারে, প্লাটফরমের প্রান্তিক বাথরুমে শুধু লেখা থাকত 'ফিমেল'। ফিমেল অর্থে মহিলা নয়, পুরুষের বিপরীত লিঙ্গ মাত্র! সেই কারণে এর আগে এসেছিল ইংরেজিতে 'লেডি'। যাঁরা ইংরেজের কাছে সমাদর পেয়ে নাইটহুড লাভ করতেন তাঁদের স্ত্রীরাই হতেন 'লেডি'। যেমন লেডি প্রতিমা মিত্র, লেডি সরকার, লেডি রাণু ইত্যাদি। এই লেডি শব্দটাই ক্রমশ 'মহিলা' শব্দে পরিণত হল।

যাই হোক, এমনি একজন তরুণী মহিলা শ্রীমতী চৌধুরী 'বিজলী' আপিসে মাঝে মাঝে বারীন ঘোষের কাছে আনাগোনা করছিলেন। খ্যাতিমান ব্যক্তিদের পক্ষে এগুলো প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক। শুধু মেয়ে নয়, পুরুষও আসে। অনেকে এদেরকে বলে 'সেলেব্রিটি হানটার'। বারীনদা তখন একটি ছোট বই প্রকাশ করেছেন। নাম 'নতুন সমাজের ইঙ্গিত'। এই হৃষ্টপুষ্ট তরুণী মহিলাটি সেই বইটি নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করতে আসেন। ক্রমশ এই মহিলার নাম শুনলুম অণিমা এবং ইনি এম এ-তে ইকনমিকসে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন। সম্প্রতি উনি কোন্ এক নতুন গার্লস স্কুলে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর দায়িত্বভার নিয়েছেন, এবং শীঘ্রই নাকি দক্ষিণ কলকাতায় একটি উইমেনস কলেজের প্রফেসারি পাচ্ছেন। মহিলার

বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হতে পারে। তা হোক। আমার নিজের বিত্তেবুদ্ধি কম। ইকনমিকস-এর অ-আ-ক-খ তখন জানিনে। সুতরাং কি বেফাঁস বলে বসব— আমি ভয়ে-ভয়ে দূরেই থাকি।

শ্রীমতী চৌধুরী যখন দিনের পর দিন বারীনদার সঙ্গে 'নতুন সমাজের ইঙ্গিত' নিয়ে আলোচনা করছেন, তখন আমরা তিনজন—রতিকান্ত পালিত, অনিল ভট্টাচার্য এবং আমি দিনমান ও সন্ধ্যারাত্রির অনেকটা অংশ 'চিত্রমন্দির'এ অতিবাহিত করি। এটি রতিবাবুর ফটোগ্রাফীর দোকান, এবং ট্রামরাস্তার ধারে ও 'চিত্রা' সিনেমার গায়ে এই মস্ত বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটটি তিনি ভাড়া নিয়েছেন। আমাদের মধ্যে অনিল শুধু বিবাহিত। সে বিজলীর বাড়িতে থাকে, ইণ্ডিয়ান সিল্ক হোমের তসর-গরদ ক্যানভাস করে এবং অবসরকালে এই চিত্র-মন্দিরে আড্ডা দেয়। সে আমার অত্যন্ত প্রিয়, এবং সে যখন আমাকে না জানিয়ে আমার পকেট থেকে পয়সা নিয়ে খরচ করে, অথবা যখন হাতে-নাতে ধরা পড়ে, তখন আমার দিকে চেয়ে মিষ্ট হাস্যে শুধু বলে, লজ্জা করে না বলতে ?

আমার পকেট সে মারছে অথচ 'চোর' ধরলে আমারই লজ্জা—এটি শুনে আমরা সবাই হেসে গড়িয়ে পড়তুম। আমরা তখন পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দের যোগাশ্রম নিয়ে আলাপ আলোচনা করি এবং এক-এক সময় চোখে পড়ে অনিল কেমন একটা ভাব-সমাধিতে বসে বসেই নিস্তব্ধ হয়ে যায়। তার মিষ্ট স্বভাব, মধুর ব্যবহার এবং এক প্রকার অদ্ভুত ধরণের নিরাসক্তি লক্ষ্য করে আমিও উন্মনা হয়ে যেতুম। এই চিত্র মন্দিরে প্রায়ই আসতেন বারীনদা, নির্মলা, কনক, অমূল্য, শশাঙ্ক চৌধুরী, পণ্ডিচেরীর নলিনী গুপ্ত মহাশয়ের স্ত্রী ইন্দুলেখা দেবী, নলিনীকান্ত সরকার ইত্যাদি। এই চিত্রমন্দিরের দোতলা পরবর্তীকালে গুপ্ত বিপ্লবীদের একটি যোগা-যোগ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। সে-কথা পরে বলব।

এই চিত্রমন্দিরের দোতলায় হঠাৎ একদিন বারীনদার দলবলের সঙ্গে শ্রীমতী চৌধুরী এসে উপস্থিত হন। বেলা আন্দাজ এগারোটা। আমি তখন সবেমাত্র অনিলের সঙ্গে বসে চা পান করছি এবং খবরের কাগজখানা ওলটাচ্ছি, সেই সময় বারীনদা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসের সঙ্গে বললেন, 'ওই যে পেয়ারেলাল' ওই নাও—এখানেই পেয়ে গেলে তো ?

বারীনদা আমাকে গান্ধীর চেলা ঠাউরিয়ে মধ্যে-মাঝে 'পেয়ারেলাল' বলে তামাশা করতেন। পেয়ারেলাল গান্ধীজীর অন্যতম সেক্রেটারী। বারীনদা বললেন, অনিমা ধরেছে তোমার সব দিগ্বিজয়ের গল্প শুনবে! তোমার

কাশ্মীরের কাহিনী, তোমার মিলিটারী লাইফ, পাঠানদের নিয়ে তোমার ঘরকন্না —সব ওকে বলো দেখি একে একে—।

শ্রীমতী চৌধুরী হাসিমুখে পাশে বসলেন। বললেন, এতদিন ধরে বিজলী আপিসে আপনাকে দেখে চলে যাচ্ছি, আপনি আমলই দেন না—

নির্মলাদের নিয়ে বারীনদা চলে গেলেন বেহালার দিকে। থাকবেন সেখানে দু'চারদিন। রতিবাবু ডার্করুমে ছবি ডেভেলপ করতে ব্যস্ত। অনিল তৈরি হয়ে যাচ্ছিল সিল্ক হোমে। আমি একটু অসহায় বোধ করে বললুম, গল্প শুনতে চাইলেই গল্প আসে না, বোঝেন তো?

সে আমি জানি। বলুন তবে কবে আসব?

ওঁর ওই চাহনি আর ঔৎসুক্য আমার মনে বিকলন ঘটিয়ে দিল। মনে হল গল্প শোনাই ওর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। শুধু মুখে বললুম, আমার গল্প শুনে কি হবে আপনার? তাছাড়া আপনার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই।

আছে, আপনি ধরতেই পারেন নি—অণিমা বললেন, বারীনবাবু কি ভাবছেন তাঁর বই নিয়ে আমি যখন তখন আলোচনা করতে আসি? ওটা তাঁর ভুল। আমি মোহনলাল স্ট্রীটে আসি ওঁর জন্যে নয়, ওঁর বইয়ের জন্যেও না—

এমন সময়ে ডার্করুম থেকে বেরিয়ে এলেন রতি পালিত। হাসি মুখে তিনি এগিয়ে এলেন। বললেন, একটু চা চলবে নাকি?

বললুম, উনি রতিকান্ত পালিত, এখানকার মালিক। না রতিবাবু—চা আর আনাবেন না। সকাল থেকে সাত আট পেয়ালা হয়ে গেল। এবার বাড়ি যাব। ইনি হলেন অণিমা চৌধুরী—

উভয়ে নমস্কার বিনিময় হল বটে কিন্তু পলকের মধ্যে লক্ষ্য করলুম শ্রীমতী চৌধুরী তৃতীয় ব্যক্তির গায়ে-পড়া আবির্ভাবে খুশী হননি। ঈষৎ বিমর্ষ মুখে তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং আমি তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, ক্ষমা করবেন, এবার আমি যাই। রতিবাবু চমৎকার লোক, ওর সঙ্গে দুদণ্ড আলাপ করে যান।

শ্রীমতী চৌধুরী আমার নিরুৎসাহের চেহারাটা ভাল করেই অনুধাবন করলেন। আমি তাঁর চোখের উপর দিয়েই নিচে নেমে গেলুম। আমি ভয় পেয়েছিলুম।

আমার মনে হচ্ছিল বারীনদা বোধ হয় আমার সম্বন্ধে একটা কিছু প্ল্যান ভাবছিলেন। নইলে শিকদার বাগানে তার বড় দাদা বিনয়ভূষণবাবুর বাড়িতে যখন একটা আনন্দ সম্মেলনের মাঝখানে এসেছিলুম, এবং নজরুলের গানের সুরলহরীতে সবাই যখন তন্ময়, তখন হঠাৎ শ্রীমতী অণিমা কোথা থেকে এসে

হাজির হলেন সেই সন্ধ্যায়? তিনি আমারই খোঁজে এসেছেন! সকলের মাঝখান থেকে একটু বিব্রতভাবেই বাইরে এসে ওঁকে নমস্কার জানিয়ে বললুম, আসুন না ভেতরে, অনেকেই আছেন। চমৎকার গান হচ্ছে নজরুলের—

উনি বললেন, না এখানেই দু মিনিট বসে চলে যাব। আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এলুম।

যাতায়াতের পথে একখানা বেঞ্চি পাতা ছিল জানলার ধারে। তার ওপর বসে তিনি আমাকে পাশে বসতে বললেন। কেমন করে তিনি এ বাড়ির ঠিকানা পেলেন আমার এ-প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন রতিকান্তবাবুর কাছ থেকে পেয়েছেন। সেদিন এটি আমার পক্ষে নূতন অভিজ্ঞতা যে একজন স্বল্পপরিচিতা মহিলা দু'চারটি কথাবার্তা বলার পর একখানা হাতে আমার পিঠের দিক বেষ্টন করে আমার চেহারার সুখ্যাতি করতে লাগলেন। অধ্যাপিকা চৌধুরী প্রায় আমার সমবয়স্ক মহিলা, কিন্তু তিনি বোধহয় ধরেই নিয়েছিলেন আমি অজ্ঞ এবং অর্বাচীন। আমাকে এইভাবে বেষ্টন করাটা তাঁর পক্ষে নিছক স্নেহের সরলতা নয় এটি তিনি জানেন, এবং তাঁর হাতের ভাষায় কী অর্থ রয়েছে, সেটি আমিও উপলব্ধি করতে পারি।

আমি অস্বস্তি বোধ করাতে তিনি হাতখানা সরিয়ে নিলেন। তখন আমি বললুম, আপনাকে একদিন গল্প বলতে হবে, এই তো? আপনার যখন এত আগ্রহ গল্প শোনার জন্য তাহলে আপনি বারীনদার আত্মকাহিনী পড়ুন না? আমি তো সামান্য!

মুগ্ধচক্ষু :চিনবার মতো চোখ আমার হয়েছে। আমি স্পষ্টই যেন দেখতে পাচ্ছি সেই চোখের নিবিড় উন্মুখতা। আমি নাবালক নই।

শ্রীমতী বললেন, আপনি সামান্য কিনা আমি বুঝব। গল্প আপনি বলবেন, আমি শুনব—আর কেউ থাকবে না সেখানে। শুধু আপনি আর আমি। বলুন সে কবে? আমি কি আবার আসব?

ওঁর আগ্রহ যত বাড়ে আমার বুকে ততই কাঁপন ধরে। আসলে আমি ভীরু। আমার চেহারাটা ডাকাবুকো হলে কি হবে, আসলে আমার মধ্যে জমে রয়েছে সেই পুরোনো কালের রক্ষণশীল সংস্কার। সেই হতভাগ্য ব্রাহ্মণ খানিকটা নীতিবিদ্, কতকটা নিষ্ঠাবান, বাকিটা কাপুরুষ। আমার গলায় কী যেন আটকিয়ে যাচ্ছিল, আমি থতিয়ে একটা জবাব দিলুম—আপনাকে আর আসতে হবে না। আমিই যাব।

—বেশ তো আপনিই আসবেন! কবে আসবেন বলুন?—অণিমা বললেন,

তার চেয়ে আমিই বরং বিজলী আপিস থেকে আপনাকে নিয়ে যাব সামনের শনিবার? ঠিক কখন আসব বলুন? আমাদের বাড়িতে গেলে আপনার কোন অসুবিধা হবে না। আমরা দিনাজপুরের লোক। আমাদের ওখানে থাকেন আমার দিদির বিধবা জা—তাঁর অনেক বয়েস এবং বাতের ব্যামো। তাঁর ঘরে তিনি শুয়েই থাকেন। আপনার কোনও সঙ্কোচের কারণ নেই। বলুন ক'টার সময় আসব? আজ কিন্তু বুধবার, আপনার মনে থাকবে তো?

বললুম, চারটের সময় আসবেন!—আমার কান দুটো ঝাঁঝাঁ করছিল।

শ্রীমতী চৌধুরী তখনই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আসুন আমাকে গলির মোড়ে পৌঁছে দিন একটু—।

আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শিকদার বাগান স্ট্রীটের কতকটা পশ্চিমে এগিয়ে চললুম। প্রায় উনি আমার কাঁধ ছাড়িয়ে উঁচু। দীর্ঘাঙ্গ ও সুন্দর স্বাস্থ্যে যেন গরীয়সী। এবার মাথায় তিনি সামান্য ঘোমটা তুললেন। কিন্তু কথাবার্তার মধ্যে লক্ষ্য করেছি উনি যে একজন উচ্চশিক্ষিতা অধ্যাপিকা, একথা ওঁর মনেই থাকে না! ডাঃ ব্রহ্মচারীর বাড়ির কোণে দাঁড়িয়ে আমি প্রশ্ন করলুম, আমি যে আপনাদের বাড়িতে যাব আপনার স্বামীর অনুমতি আছে তো?

স্বামী! স্বামী কোথায়?—স্বচ্ছ সুন্দর হাসি হেসে শ্রীমতী চৌধুরী বললেন, এতদিন ধরে আপনার সামনে আসছি, আমার মাথায় কি সিঁদুর দেখেছেন?

একখানা ট্রাম এসে থামল, তিনি আমার একখানা হাত একটু টিপে দিয়ে হাসিমুখে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু আমার হাতখানা অবশ হয়ে গিয়েছিল।

পরবর্তী শনিবার মোহনলাল স্ট্রীটের বাড়ি থেকে ইচ্ছে করেই আমি অদৃশ্য হয়েছিলুম। তার অন্যতম কারণ ও-বাড়ি অপেক্ষা 'স্বদেশ' আপিসের দিকে আমার মন পড়ে থাকত। তখন আমি স্বদেশ-এর শরৎচন্দ্র জন্মতিথি সংখ্যার আয়োজন নিয়ে খুবই ছুটোছুটি করছি। আমাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করছে আমাদের ভবানী মুখুজ্যে।

হঠাৎ সেদিন অণিমা চৌধুরী এসে উপস্থিত। মধ্যাহ্নকাল। আমি একা। বলা বাহুল্য, তাঁর প্রথম অনুযোগ শনিবারে তিনি আমাকে খুঁজে পাননি। আমি হাসিমুখে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসালুম। তিনি বললেন, আমি নাকি বড্ড ভীতু! আমি বললুম, আমার ভয়ের সঙ্গে একটা বিবেচনা থাকে। আপনি উচ্চশিক্ষিতা মহিলা অধ্যাপিকা, আমার ভয় আর বিবেচনা নিশ্চয় বুঝবেন আপনি। আমার

দিকে শান্ত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে অনিমা বললেন, ভয় আর বিবেচনা—এ দুটো মেয়েদের ভাগেই পড়ে। সুতরাং আপনি নির্ভয়ে থাকুন। হাসিমুখে আমি বললুম, কিন্তু আপনার সঙ্গে গল্পে-গল্পে যদি রাত কাবার হয়ে যায়? উনিও হাসি-মুখে বললেন, শনিবারে গেলে দু রাতও কাবার হতে পারত!

মহিলার দিকে আমি এবার স্পষ্ট চোখে তাকালুম। ওঁর মাথার উপরে পাখা ঘুরছে। কিন্তু ঘামের ফোঁটা নামছে ওঁর কপালের চুলের ঝালরের ভিতর দিয়ে। সেই ঘন চুলের বনাঞ্চলে আমি যেন দেখতে পাচ্ছিলুম, বাঘিনীর টসটসে দুটো বড় বড় চোখ শিকারের দিকে নিবদ্ধ হয়ে জলজল করে জ্বলছে। অধ্যাপিকা নয়, ইকনমিকসের এম-এ নয়, উচ্চশিক্ষার আভিজাত্যও নয়। উনি শুধু যুবতী মেয়ে। অস্ফুট জড়িত স্বরে উনি শুধু আমার চোখের দিকে চেয়ে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, আজ আপনাকে নিতে এসেছি। চলুন—

চা

'স্বদেশ'- এর নাম হয়েছে খুব। যে কখানা মাসিক ও সাপ্তাহিক এতদিন ধরে তরুণ লেখকদের হাতে ছিল সেগুলো একে একে টাকা, বিজ্ঞাপন ও সুপরিচালনার অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। প্রবাসী ও ভারতবর্ষ এখন মামুলী। কিন্তু মামুলী হলেও তারা আপন সম্পদে গরীয়ান। তবে কিনা লেখকরা তাদের অনুগ্রহের পাত্র। ভারতবর্ষের সম্পাদক রায়বাহাদুর জলধর সেন হলেও মূল পরিচালক হরি-দাস ও সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। জলধরদার চেহারাটা আমাদের ঠাকুরদাদার মতন। শান্ত, নিরীহ, ভদ্র ও স্নেহশীল বৃদ্ধ। তাঁর প্রধান কাজ ছিল শিবপুর অথবা সামতাবেড় গ্রামে গিয়ে লেখা পাবার জন্য শরৎ-চন্দ্রের কাছে ধরনা দেওয়া। 'বক্স-অফিস' হলেন তখন শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ নন। রবীন্দ্রনাথের বই তেমন বিক্রি হয় না—কেঁদে-ককিয়ে দু' বছরে বড়জোর একটা এগারশো'র এডিশন কাটে। শরৎচন্দ্র বাজারে পড়তে-না-পড়তে হট-কেকের মতন বিক্রি! যখন-তখন একটার পর একটা এডিশন। একদল শরৎভক্ত কবে যেন শরৎবাবুকে বলতে গিয়েছিল, আজ্ঞে, দেখুন দাদা—আপনার সব লেখা আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি, সেই জন্যে এত ভাল লাগে। কিন্তু বিশ্বকবির লেখা আমরা বুঝতে পারি নে।

কেমন করে পারবে ?—শরৎচন্দ্র জবাব দিয়েছিলেন, আমি যা কিছু লিখি, সেসব তোমাদের জন্য! বিশ্বকবি যা লেখেন সেসব আমাদের জন্য!

ভক্তরা ভোঁতা মুখে ফিরে এসেছিল।

শরৎচন্দ্রের পরিহাসবোধের আরেকটি কাহিনী বলি। 'মৌচাকে'র সম্পাদক সুধীর সরকার মশায়ের ওখানে আসতেন কবি গিরিজাকুমার বসু। তিনি বয়সে তখন ষাট থেকে পঁয়ষট্টি। অত্যন্ত সরল মিষ্ট আমুদে লোক। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের খুবই ভক্ত এবং উভয়েরই খুব প্রিয়পাত্র। তিনি বলিষ্ঠ, খর্বকায় ও স্থূলকায়। গল্পটা তাঁরই মুখে শোনা :

"শরৎবাবু একদিন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কয়েকজন ভক্তর কাছে বলছিলেন, আমিও ত লেখক, কিন্তু রবিঠাকুর অত ভালো কী করে লেখেন বল ত! শুধু ভাবি, কেন ওঁর মতন কিছুতেই আমি লিখতে পারি নে। রাগে-আক্রোশে আমার হাত-খানা যেন নিসপিস করে! আমি এর প্রতিশোধ নিতে চাই! হ্যাঁ, নিলুম সেই প্রতিশোধ একদিন! বিশ্বকবির ওই শান্তিনিকেতনে এক দাগা ষাঁড়

লেলিয়ে দিলুম।"

"ষাঁড়? বিশ্বকবির পিছনে ষাঁড় লেলিয়ে দিলেন? মানে?"

"হ্যাঁ গো, ওই তোমার গিরিজাকে পাঠিয়ে দিলুম কবির কাছে! বুঝলে না?"

গল্পটা বলতে বলতে গিরিজাদা নিজেই হেসে কুটোকুটি। তিনি তাঁর মধুর ও সরস আলাপচারীর জন্য বন্ধুমহলে খুবই প্রিয় ছিলেন।

আমি স্থির করেছিলুম, এবার শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে 'শরৎ-জয়ন্তী-সংখ্যা' বের করব 'স্বদেশ'এর। সেজন্য তোড়জোড় করছিলুম। স্থির করলুম, আমার সমকালীন লেখক-লেখিকাদের লেখাই ছাপব, বড়দের কাছে যাব না। শরৎচন্দ্রকে তখন গালি দিচ্ছেন ব্রাহ্মসমাজের সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ, 'অবতার' সাপ্তাহিকের অমরেন্দ্র রায়—আর কে কে যেন। 'অবতার'-এর দাম ছিল এক পয়সা। ওটা ঝেড়ে গালাগাল দিত শিশির ভাদুড়ি আর শরৎ চাটুয্যেকে। কাগজখানা বোধহয় বৃহস্পতিবারে বেরোত। সেদিন একখানা টাটকা কাগজ নিয়ে কয়েকটি হুল্লোড়বাজ বাঙালী তরুণ উঠেছে পটলডাঙ্গার মোড় থেকে এক ডবলডেকার বাসে। 'অবতার'খানা হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে সোল্লাসে চেঁচামেচি করছিল, এবং তাদের ভাষাটা ছিল এইরূপ—দেখেচিস মাইরি, দেখেচিস—স্-সালা সরৎ চাটুয্যেকে কি রকম জুতিয়েছে, দেখেচিস্-স?"

ছেলেরা জানত না তাদের সামনেই শরৎচন্দ্র একঠোঙ্গা কচুরি ও সিঙ্গাড়া নিয়ে এক সীটে বসেছিলেন। তিনি শ্যামবাজার থেকে ভবানীপুর যাচ্ছিলেন। শ্যামবাজারে দ্বারিকের দোকানের নোনতা খাবার তাঁর খুব প্রিয় ছিল। এ গল্পটি তিনি নিজেই বলেছিলেন কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'রসচক্রে' বসে।

লেখকদের মধ্যে নজরুল প্রমুখ সকলে তো আমার হাতের পাঁচ। লেখিকাদের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী, রাধারাণী—আর কে? একজন রয়েছেন, তাঁর নাম কনকলতা ঘোষ। আরেক জন দীপালি। আরও আছেন জন দুই, তাঁরা একটু-আধটু লিখতেও পারেন! একজনের নাম নীলিমা চট্টোপাধ্যায়, অন্যজন রমলা দেবী। মুশকিল এই, এঁরা ছোট ছোট প্রবন্ধ এবং কথিকা লিখে পাঠান যত, চিঠিপত্র লেখেন তার চেয়ে অনেক বেশি। গত বছর বারীনদা ওঁদের সব চিঠিগুলো আমার ঘাড়ে চাপাতেন, চিঠির জবাব দেবার দায় নাকি আমার বেশি। খানপাঁচেক চিঠি একজনে লিখলে অন্তত একখানারও জবাব দিতে হয়, নইলে ভদ্রতা থাকে না। নীলিমা চট্টোপাধ্যায় থাকেন রাঁচীর হিনু অঞ্চলে। বোধ

হয় তাঁদের অবস্থা ভাল, চিঠির সঙ্গে অনেকগুলো ডাকটিকিট থাকে। উনি আবার নামের পাশে লেখেন বি-এ। একে মেয়ে তায় বি-এ, স্থতরাং সাবধানে জবাব দিতে হয়। কনকলতা, রাধারাণী, জ্যোতির্ময়ী—এঁদের নিয়ে অস্থবিধা নেই। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী তখন উঠছেন, তবে তিনি এখন জলধরদার 'কপিরাইট'। আমার পুঁজি হচ্ছেন কবি প্রিয়ম্বদা দেবী। মালদা থেকে চিঠির পর চিঠি রমলা দেবীর। তাঁর চিঠিতে প্রায়ই থাকে আমার নিজের কোন কোন লেখার স্তুতিবাদ। ওটায় আমি অস্থবিধা বোধ করি। হঠাৎ একবার একখানা চিঠিতে তিনি লিখলেন, আমার একখানা ছবি নাকি কোন্ কাগজে বেরিয়েছে, তিনি সেখানি কেটে যত্ন করে রেখে দিয়েছেন! উপরন্তু আবার প্রশ্ন করেছেন, এ কাজ কি আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছে? দাও, এবার জবাব দাও! আমার পদ্ধতি হচ্ছে, 'শতং বদ মা লিখ।' অত চিঠিপত্র লেখা আমার আসে না, ওতে আমি বিরক্ত হই। পুরুষ হোক বা মহিলাই হোক—সামনে এসে দাঁড়াও, কাজের কথা বলো, লেখা দেবার থাকে দিয়ে যাও, তারপর ভেগে পড়ো! ইনিয়ে-বিনিয়ে চিঠির জবাব দেবার সময় সম্পাদকদের নেই। ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়িতে কত অপদার্থ লেখা ফেলে দিয়েছি, তার খবর তুমি নিতে চাও চিঠি লিখে-লিখে! অত মাথা ঘামাবার সময় কোথায়? তখন আমার 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল।' এর ওপর আবার রমলা দেবী লিখছেন, কলকাতায় গেলে আমি কোনও কাজ পেতে পারি কিনা! আমি হাতের কাজ, সূচীশিল্প, মেয়ে-ইস্কুলে মাস্টারি, আমসত্ত্ব তৈরী, পশমের সোয়েটার বোনা, হাসপাতালে নার্সিং—এসব পারব। আপনি যদি এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করেন, আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

আমার সম্পূর্ণ অক্ষমতা জানিয়ে সেই দিনই ছু' লাইন চিঠি পাঠিয়ে দিলুম। এক সপ্তাহের মধ্যে আবার সেই চিঠির জবাব এল: আপনার চিঠির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আমার বাক্সর ভিতর থেকে আপনার ছবিটি আরেকবার বার করে দেখলাম আপনার ছু' লাইনের কঠোর ভাষার সঙ্গে আপনার ছবিটির কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার এই চিঠির সঙ্গে বারীন ঘোষ মহাশয়কে একখানা চিঠি দিচ্ছি, দয়া করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আমি যেমন করেই হোক নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।

চিঠিখানা ছিঁড়ে ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিলুম। খবর পেয়েছি বারীনদা যাচ্ছেন কাশীতে নির্মলাকে সঙ্গে নিয়ে। অমূল্য টাকাকড়ি দিচ্ছে। আমি এর মধ্যে কবে যেন বেহালায় গিয়ে বারীনদার সঙ্গে বচসা করে এসেছি।

—আপনি নিজের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার সর্বনাশ করছেন, তা ছাড়া আপনার জন্য বাঙ্গলার বিপ্লবীরা তাদের সম্মান হারাবে! আপনার নানা আচরণের মধ্যে আর সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বারীনদা—

চিরদিনের সেই স্নেহশীল বারীনদা, আজন্মের থেকে পঞ্চাশ বছর অবধি যিনি নারীর স্নেহ ভালবাসার থেকে বঞ্চিত, তেরো বছর বয়স অবধি যিনি আপন উন্মাদিনী জননীর কাছে নিত্য-উৎপীড়িত, সেই বারীনদা আমার দিকে চেয়ে মধুর হাসি হাসছিলেন। পরে বললেন, নির্মলার বাইরেটা দেখলে তুমি, ভেতরটার দিকে চোখ পড়ল না? 'পেয়ারেলাল' তুমি চটেছ দেখছি! কিন্তু আমার দরকার নির্মলাকে।

আমাকে দেখলেই বারীনদা আর উপেন বাঁড়ুয্যের মুখ চুলকোয়। ওঁদের মুখে কিছু আটকায় না। একই আড্ডায় যদি বসেন আনন্দবাজারের সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, পরলোকগত দেশবন্ধুর প্রিয়পাত্র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন হেমন্তকুমার সরকার, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ওরফে আমাদের সর্ব-প্রণম্য দা'-ঠাকুর, নলিনীকান্ত সরকার, নজরুল ইসলাম, 'উনপঞ্চাশীর' লেখক অগ্নিহোত্রী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও দু-একজন—তাহলে আর রক্ষা থাকত না! ভাগ্যি সেখানে কোনও যুবতী মহিলা উপস্থিত থাকতেন না, তাই রক্ষে। আমরা কয়েকজন আশেপাশে থাকতুম সে কেবল হেসে-হেসে গড়াগড়ি দেবার জন্য। একবার বাজি রাখা হল, এই আসরে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য অশ্লীল কে বলতে পারে? একে একে সকলের পালা এল। নজরুল ছিল সেদিন সবশেষে। সে তখন কবি-খ্যাতিতে দেশে জাজ্জ্বল্যমান। মিনিট খানেকের মধ্যে সে মুখে মুখে একটি পয়ার ত্রিপদীতে কবিতা আউড়িয়ে দিল! তার ফলে সেদিন সকলে কানে আঙ্গুল দিয়ে ওই কবিতার থেকে আত্মরক্ষা করে চলে গিয়েছিলেন! নজরুল ফার্স্ট হয়েছিল। আমরা নজরুলের গর্বে গর্বিত। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়, নজরুল সেই সময় শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে সমগ্র বাঙ্গলাকে মুগ্ধ করে তুলেছিল। সাধক রাম-প্রসাদের পরে নজরুলের মতো এমন শ্যামাসঙ্গীত বোধ হয় আর কেউ লেখেনি।

যাই হোক, সেই বছর কাশী গিয়ে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি মাঠের ধারে দেখলুম, বারীনদার এক চায়ের দোকানের তাঁবু পড়েছে। অমূল্য হিসাব মেলাচ্ছে, নির্মলা চা বানাচ্ছে, বারীনদা ছাত্রদের মাঝখানে গিয়ে চা সার্ভ করছেন, এবং উচ্ছিষ্ট পেয়ালাগুলি একে একে এনে গরম জলে ধুয়ে গুছিয়ে রাখছেন। ছেলেরা কেউ জানে না, ইনি জগৎপ্রসিদ্ধ অগ্নিবিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—যিনি

মাত্র পঁচিশ বছর আগে ব্রিটিশ ভারত সাম্রাজ্যের ভিতের তলায় ভূমিকম্প এনেছিলেন এবং যিনি ভারত-আত্মার অবিনশ্বর বাণীমূর্তি শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর।

স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বারীনদা বললেন, এখানেও তাড়া করে এসেছ? বসো, চা খাও। এই তো বেশ, স্বাধীন ব্যবসা—বেশ আছি এখানে। ওই বেঞ্চিতে বসো। ছেলেরা এখানে খুব ভদ্র।

নির্মলা ও অমূল্য আমাকে বাগে পেয়ে খুব হাসি পরিহাস করতে লাগল। ওঁরা সব কাশীবাসই করবেন এবং এই প্রকার দোকান দিয়েই চালাবেন। এই ধরণের চায়ের দোকান দেওয়া বারীনদার পক্ষে নতুন নয়। ওঁর যৌবনকালে পাটনাতে এমনি এক দোকান দিয়েছিলেন! নাম ছিল, 'বি-ঘোষের টী-স্টল।' সেখানে তিনি তাঁর রাঙ্গা-মাকে সঙ্গে রাখেন। তারপর সেখানে বসন্তরোগের মহামারীর কালে দোকান ফেলে ছোটেন বরোদায় টাকার জন্য! সেখানে তখন ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। অতঃপর সে অনেক কাহিনী। পাটনার সেই চায়ের দোকান ইতিহাসের অতল তলে তলিয়ে যায়।

সন বা তারিখ আমার মনে পড়ছে না। তবে কাশীর এই চায়ের দোকান দেখে যাবার পর বোধ হয় বছর খানেকের মধ্যে বারীনদা বিবাহ করেন। এই বিবাহে যে কয়েকজন বাধা দিয়েছিলেন আমি তাঁদের অন্যতম। তবে কিনা বারীনদাকে সাগ্রহে যিনি বিবাহ করেন, তাঁর নাম শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী। তিনি পটলডাঙ্গাবাসিনী এক বিধবা, দুটি পুত্রের জননী। বড় ছেলেটির বয়স তখন সতেরো-আঠারো। ছোটটির বছর ষোল। এই বিবাহের ফলে বারীনদার শেষ জীবন কিছু স্থিতিলাভ করেছিল। অতঃপর শ্রীমান অমূল্য, শ্রীমতী নির্মলা ও তার কন্যা কনক এরা কোথায় হারিয়ে গেছে আমি আর খোঁজ করিনি। সে যাই হোক, মহাপুরুষের বংশ বিশেষ থাকে না, বারীনদারও নেই।

আসবার সময় বারীনদা হাসিমুখে বললেন, তোমার সেই মালদার রমলা ঠিকানা খুঁজে আমার কাছে এসেছিল যে। বেশ ভাল মেয়ে হে। আমি তোমার নাম করে বললুম, সেই হল নাটের গুরু! সে সব পারে। তৈরি হয়ে থেকো, সে গিয়ে তোমার ওপর চড়াও হবে।

দূরের থেকে লক্ষ্য করলুম, ওই চায়ের দোকানের তাঁবুর আশেপাশে জনবসতি বিশেষ কোথাও নেই। এটি ক্যাম্পাসের ঠিক বাইরে মাঠের একান্তে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হিন্দু ছেলেরা তখনও ডিম মাছ বা মাংস খেতে শেখেনি! খাচ্ছে চা বিস্কুট, টোস্ট বা চানাচুর। দোকানে নানা রকমের কেক্ সাজানো রয়েছে।

জানি বারান্দায় এ তাঁবুও উঠে যাবে একদিন। জানি একদিন 'প্লাবন এসে নিয়ে যাবে সব সর্বনাশার কূলে।' এ-খেলাঘরও বারান্দা একদিন ভেঙে পালাবেন।

'স্বদেশ' মাসিক পত্রিকার শ্রেষ্ঠ সংখ্যা বোধ করি শরৎ-সংখ্যা। একটি চেয়ারে-বসা শরৎচন্দ্রের ছবি 'পিয়োর ইতালিয়ান আর্ট পেপারে' ছাপা হয়েছিল প্রথমারম্ভে। এর আগে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে কেউ কোথাও বিশেষ-সংখ্যা প্রকাশ করেনি। 'স্বদেশ'ই প্রথম। পাঠকরা আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। শরৎচন্দ্রের বয়স তখন বোধ হয় তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন। সেটি ১৯৩১।

এই সংখ্যাতেই বেরিয়েছিল লীলাময় রায় ওরফে অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি কড়া সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'শেষ প্রশ্ন'। এই প্রবন্ধটি তখনকার তরুণ ছাত্র বিষ্ণু দের কাছে অন্নদা স্বদেশের জন্য পাঠিয়েছিলেন। বিষ্ণুকে আমি কথা দিলুম, প্রবন্ধটির নকল কপিটি আমি সরিয়ে রাখব। কেননা ব্রিটিশ আমলে দেশী এস-এর লেখা সাময়িকপত্রে ছাপা নীতিবিরুদ্ধ। যাই হোক, এই প্রবন্ধে অন্নদা শরৎবাবু ও 'শেষপ্রশ্ন'কে একেবারে তুলোধোনা করেছেন। বলেছেন, এ উপন্যাসই হয়নি, এ বই হল অসংলগ্ন 'এক বাণ্ডিল তর্ক।'

তখন শরৎবাবুর স্তাবকমণ্ডলীতে দেশ ভরপুর। সেই কালে এই ধরনের শরৎ-বিরোধী লেখা এবং সেই লেখা তরুণদের 'স্বদেশ'-এ ছাপানো অত্যন্ত দুঃসাহসের পরিচয়। অন্নদা কেটে পড়লেন তাঁর ছদ্মনামের আড়াল দিয়ে। আমার মাথায় ইটপাটকেল পড়তে লাগল।

এই সময় ১নং গারস্টিন প্লেসে নৃপেন মজুমদার মশায় ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করে বেশ চালাচ্ছিলেন। ওখানে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই আমাদের বন্ধু। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অন্তরঙ্গ হলেন নলিনীকান্ত সরকার, বীরেন ভদ্র, বাণীকুমার প্রভৃতি। প্রসঙ্গত বলা চলে, ভারতবর্ষে বেতার কেন্দ্র প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার ও দমদমায় প্রথম বিমানঘাঁটি তৈরী হয় বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের উদ্যোগে। এই প্রতিষ্ঠান তৎকালে সাহেবদের দ্বারায় পরিচালিত হলেও বাঙ্গালীরা ছিল এর প্রাণশক্তি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, জে পি গাঙ্গুলী ও বেহালার তরুণ জমিদারপুত্র বীরেন রায়—যিনি আমাদের ভবানী মুখুজ্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পরবর্তীকালে ইংরেজরা বিদায় নেবার পর বীরেন রায় বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের সর্বাধিনায়ক হন এবং এঁরই তত্ত্বাবধানে ভারতের প্রথম মেয়ে-পাইলট হন যিনি, তিনিও বাঙ্গালী

মেয়ে। তিনি কোচবিহার মহারাজার কন্যা প্রিন্সেস শ্রীমতী ইলা। এঁরই ভগ্নী বর্তমানে রাজস্থানের অন্যতমা সুন্দরীপ্রধানা মহারাণী গায়ত্রী দেবী। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, কোচবিহারের একখানি মুখপত্র ছিল, নাম 'পরিচায়িকা।' সেই কাগজে আমার কি কি লেখা ছাপা হয়েছিল এখন আর মনে নেই, তবে গান্ধীশিষ্য বিনোবা ভাবের পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে কাজল-নয়না রাণী নিরুপমার সঙ্গে পরবর্তীকালে আমার চিঠিপত্রের আদান-প্রদান ঘটে। আমি খুব দুঃখিত যে, লেডি রাণু মুখার্জির দিদি শ্রীমতী আশা আর্যনায়কমের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও আমি শ্রীযুক্ত বিনোবা ভাবের 'গ্রামদান' আন্দোলনের অলীক ভাবোচ্ছ্বাসকে সমর্থন করতে পারিনি, এবং বিনোবাজীর সামনেই আমার সুস্পষ্ট মনোভাব ব্যক্ত করার ফলে সেবার ভাবোচ্ছ্বাসী তারাশঙ্কর সেই সভা ছেড়ে পালিয়েছিল। অত বড় লেখক তারাশঙ্কর, এমন জনপ্রিয়—কিন্তু অনেক সময় তার বেহিসাবী ছেলে-মানুষী নিজের সত্যদৃষ্টি হারাতো। যুক্তিবাদী পশ্চিমবঙ্গে শ্রীযুক্ত বিনোবাজী ঠাঁই পাননি। তাঁর আন্দোলন গ্রাম্য সরলতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে ভাল হয়!

ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন শরৎ বন্দনার আয়োজন করেছেন অনেককে নিয়ে। আমি তাঁদের মধ্যে একজন। এই সূত্রে আমি এমন একটি লেখা লিখেছিলুম যেটি ঠিক প্রবন্ধ নয়, শরৎবাবুর একটা রেখাচিত্র বা স্কেচ। সেই ছবি তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে একটি নাট্যরূপ। অনেক লেখক বা রচনাকার বেতারে প্রবন্ধ পড়তে যান। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, ঐতি-হাসিক, অধ্যাপক, সম্পাদক, সমাজনেতা, রাজনীতিক ইত্যাদি অনেকেই যান। কিন্তু বেতারের মূলনীতি 'রীডিং' নয়, 'টকিং'। শ্রোতাদের আমি প্রবন্ধ শোনাতে যাইনি, তাদের কানে কয়েকটা কথা বলে এলুম মাত্র! আমার ওই লেখাটা 'কীর্তনীয়া' নাম দিয়ে পাঁচ-ছয়বার নানা কাগজে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

যাই হোক, আমার পড়াটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিক থেকে এগিয়ে এসে শরৎচন্দ্র আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, একটু আড়ালে এসো ভাই, দুটো কথা আছে তোমার সঙ্গে—

তখন গারস্টিন প্রেসের দোতলায় কোনও পার্টিশন-করা ছোট ছোট ঘর হয়নি এবং ইংরেজিয়ানা ঢোকেনি। কথায় কথায় ঘণ্টা বাজে না এবং চাপরাসী ছোটে না। চারদিকে দেশী ব্যবস্থা। নিয়মনীতির কড়াকড়ি নেই। তখন ওর মধ্যে চলছে পারস্পরিক ভালবাসার যুগ, বোঝাপড়ার যুগ নয়। নৃপেন মজুমদার মশায় সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

যাই হোক, শরৎচন্দ্র আমাকে নিয়ে গেলেন সেই বড় হলের এক কোণে

যেখানে আলো নেই। এক জায়গায় দুজনে বসলুম। প্রথমে উনি আমার 'টক'-টির সুখ্যাতি করে' বললেন, এমন করে ওঁর সম্বন্ধে আর কেউ বলেনি। তোমারটি চমৎকার হয়েছে। কিন্তু এ তুমি কি করলে? তোমার 'স্বদেশে' এমন অপমানজনক লেখা তুমি কেমন করে ছাপলে?

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালুম। উনি লীলাময় রায় ওরফে অন্নদার লেখাটার কথা বলছিলেন।

শরৎবাবুর মুখে যে বিরক্তি ও আক্রোশ সেটি তাঁর প্রতি কথায় যেন প্রকাশ পাচ্ছিল। অতঃপর সুদীর্ঘ পনেরো মিনিটকাল অবধি তিনি যে উষ্মা প্রকাশ করে গেলেন, তার সব কথাগুলি এখন আর আমার মনে নেই।

আমি শুধু বলেছিলুম, 'স্বদেশ' সব রকম ভাল লেখাই ছেপে যাচ্ছে। লেখা সুলিখিত কিনা আগে দেখব। সাহিত্যের আলোচনা-সমালোচনায় নিন্দা-সুখ্যাতি দুই আছে। আপনার মতো বড় লেখক এ সবের উর্ধ্বে।

আমার নিজের কথাগুলোও সব মনে নেই। এইটুকু মনে পড়ে, শরৎচন্দ্র আমার কথায় সুখী হননি। তিনি আমার সম্বন্ধে কেমন একটা সন্দেহ নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলেন।

তৎকালে হিংসাবাদীদের রাজনীতিক মামলা চলছে অনেকগুলি। এক চট্টগ্রামেরই তিনটি। আসানুল্লা হত্যা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, চট্টগ্রাম রেলওয়ে ইনস্টিট্যুট ইত্যাদি। আগে বলেছি আমার সন্ তারিখ অতটা মনে থাকে না। আমি লেখার কালে পাঁজিও ঘাঁটছি নে, ইতিহাসও পড়ছি নে। শুধুমাত্র টুকরো টুকরো স্মৃতিচারণ করে যাচ্ছি। এই সময়ে অনন্ত সিংয়ের দিদি ইন্দুমতী একবার আসেন শ্রীমতী শোভার ওখানে। ইন্দুমতী নিজেও ছিলেন বিপ্লববাদিনী। তিনিও সূর্য সেনের সঙ্গে যুক্ত। উভয় মহিলার মধ্যে কি কথা হল আমি জানিনে। এর পরেই দুটি কিশোরী মেয়ে শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী কুমিল্লায় গিয়ে তৎকালীন কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্টিভেন্স-এর নিকট চাঁদা চাইবার অছিলায় সামনে গিয়ে তাঁকে পিস্তল বা রিভলভারের সাহায্যে হত্যা করে। মেয়ে দুটি পালাতে পারেনি। কিন্তু এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীমতী ইন্দুমতীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সত্য মিথ্যা জানিনে ইন্দুমতীকে নাকি বিভিন্ন প্রকার শারীরিক শাস্তি দেওয়া হয়! ব্রিটিশ প্রশাসন অতঃপর স্থির করেন, সূর্য সেনকে গ্রেপ্তার না করলে এর প্রতিকার হবে না। সুতরাং তাঁরা একটির পর একটি গ্রাম ঘেরাও করছিলেন সূর্য সেনের জন্য—কখনও চট্টগ্রামে, কখনও নোয়াখালি

বা বরিশালে, কখনও বা ঢাকায়। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে পুলিসের দল বার করল এক গরুর গাড়ির গাড়োয়ানকে। সে 'মাস্টারদা'র খবর বেশ ভালই জানত। সেই গাড়োয়ান ওদেরকে সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল। মাস্টারদার ঠিকানা কি, নিয়মিত কখন তিনি কোথায় আসেন বা থাকেন, কত রাত্রে কোথায় ফেরেন—আনুপূর্বিক সমস্ত গোপন সংবাদ দেওয়ার ফলে গাড়োয়ান বুঝি পেয়ে গেল টাকা দশেক বকশিশ। কিন্তু ওই পাগড়ি-পরা অর্ধনগ্ন ব্যক্তিটি কে এবং খড়বোঝাই গাড়ি নিয়ে সে ভাটিয়ালি সুর ধরে কোন্ মাঠ পেরিয়ে কোন্ দিকে গিয়ে অদৃশ্য হল—সে খবর পুলিস একেবারেই নিল না! এইভাবেই সূর্য সেন পালিয়ে পালিয়ে ছদ্মবেশে ঘুরছিলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি ধরা পড়েন এবং বিচার-শেষে তাঁর ফাঁসি হয়।

ঢাকায় খুন হল দুটো, চট্টগ্রামে একটি। যথাক্রমে কামাখ্যা সেন, মিঃ লোমান এবং মিঃ আসানুল্লা। লোমান মস্ত বড় ইংরেজ প্রশাসক—বিনয় বসু তাকে হত্যা করে ফেরার হল। এইভাবেই রক্তবিপ্লব চলছে, এবং জীবন দিচ্ছে একের পর এক। মেদিনীপুর মার খাচ্ছে সব চেয়ে বেশি। জবাবও দিচ্ছিল তেমনি। ওই মেদিনীপুরেই তিনজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে একে একে হত্যা করা হল—মিঃ পেডি, বার্জ ও ডগলাস। মেদিনীপুর ফার্স্ট হয়ে গেল!

কুমিল্লায় কিংবা নোয়াখালিতে ঠিক মনে পড়ছে না, একজন পুলিস ইন্সপেক্টর তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়কে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, হত্যাকারী ধরা পড়ে গেল এবং তার নাম বলল, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। ছেলেটার বয়স বছর বাইশ। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমার জীবনের যে একটা অংশ জড়িয়ে যাবে এটা সেদিন স্বপ্নেও ভাবিনি! পরে বলছি সে কথা।

ইতিমধ্যে নিমতলা ঘাট স্ট্রীটের এক ধনী পাট ব্যবসায়ীর সুদর্শন তরুণ পুত্র বরেন্দ্রসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। সে এক সাপ্তাহিক বার করে। কী যেন তার নাম। ওর বন্ধুরা হল প্রণব রায়, 'চুল' পাল, ওরফে ফণীন্দ্র পাল, পাঁচুগোপাল, সুনীল ধর—এরা। খামোকা আমাকে দিয়ে ওরা সম্পাদকীয় লেখা লেখাতে গেল। তখন চারিদিকে হিংসা, হানাহানি ও ব্রিটিশ শাসনের অমানুষিক উৎপীড়ন চলছে। কোনও ছেলে মার খেয়ে পাগল হচ্ছে, কেউ পুলিস লক-আপেই মারা যাচ্ছে, কেউ যাচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, কেউ বা 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে (যারা) গেল জীবনের জয়গান।' আমি তখন বেশ কলম শানিয়ে বিপ্লবীদের বন্দনা লিখে যাচ্ছিলুম তিন-চারখানা মাসিকপত্রের সম্পাদকীয় হিসাবে। আমি তখন কেউ-কেটা!

আমাদের বন্ধু সত্যেন বসু ছিল খুবই সুশ্রী যুবক, আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়। সে ছিল লিবার্টির সাব-এডিটর। স্বভাবমধুর ব্যক্তি। কিন্তু তার পরনে থাকত ধবধবে মিহি খদ্দরের পাঞ্জাবি, তার সঙ্গে সোনার বোতাম। ওর দেখা-দেখি আমিও সেই পরিচ্ছদ তৈরি করালুম। চেনসুদ্ধ খাঁটি গিনি সোনার এক ভরি ওজনের বোতাম—মজুরিসুদ্ধ প্রায় আটাশ-ত্রিশ টাকা বেরিয়ে গেল। পায়ে আমার রাশিয়ান উইলো কাফ চামড়ার গ্রীসিয়ান স্লিপার জুতো। পকেটে সুগন্ধী রুমাল। মাথায় 'ক্যালিফর্নিয়া পপি মার্কা' সুগন্ধী তেল। মাথায় আমার ঘন চুলের ঝাঁক। বাঁ হাতের আঙুলে নীলা বসানো আংটি। অর্থাৎ গলায় একগাছা জুঁই ফুলের গোড়ে মালা দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে কারও ঘরে টেনে তুললেই হয়! না, একবর্ণও বাড়িয়ে বলছিনে। রাস্তার ফুটপাথে চলবার সময়ে লোকে আমার দিকে চেয়ে কী দেখত জানিনে, কিন্তু সুধীন নিয়োগী আর শশাঙ্ক চৌধুরী কথায় কথায় আমাকে খোঁটা দিত। আমার শরীর স্বাস্থ্য বন্ধুমহলে ঈর্ষার কারণ ঘটাতো।

এই পরিচ্ছদেই সেদিন 'স্বদেশ' আপিসে আসছিলুম। সেদিন কী যেন এক মারাত্মক রাজনীতিক ঘটনার ফলে কলকাতার রাজনৈতিক নাড়ি ছিল চঞ্চল। বহুবাজারের ট্রামে চড়ে আসছিলুম লালদীঘির দিকে। ট্রাম থামল লালবাজারের আগের স্টপে। কয়েক পা পশ্চিম দিকে হাঁটতে-না-হাঁটতেই দেখি, ৩০৯ ও ৩১০ দুটো বাড়ির নিচে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লালপাগড়ি পরা পাহারাওয়ালা, দশ বারো জন সশস্ত্র শ্বেতচর্মী বৃটিশ সার্জেণ্ট, খাকি জামাপরা জনকয়েক জমাদার ও হেড কনস্টেবল—ওই বাড়িকে সব দিক থেকে ঘেরাও করেছে। আমার আপিস ৩০৯ নম্বরের তেতলায়। কিন্তু কড়া পুলিস পাহারায় তার প্রবেশ-পথ বন্ধ। চারিদিক লোকে লোকারণ্য! ওই ভিড়ের মধ্যে কানাকানি শুনলুম, এখানে এক হত্যাকারী ও দাগী বিপ্লবী লুকিয়ে রয়েছে, তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য এই তোড়-জোড়।

আমি ছিলুম দক্ষিণ ফুটপাথে। ট্রাম লাইন পেরোলে তবে আমার আপিস। আপিসে আমি 'বড়বাবু'। সুতরাং দুপুর একটা থেকেই আমার জন্য সবাই অপেক্ষা করে। 'স্বদেশ'-এর মালিক বৈদ্যনাথ বিশ্বাস আসেন সকাল সাড়ে দশ-টায়। তাঁর ইনস্যুরেন্সের কাজ। আমি আসি গদাই-লসকরি চালে। পঞ্চাশ টাকা মাত্র মাইনেতে এমন সর্বব্যাপী প্রভুত্ব আর কোনদিন পাইনি। সবাই সেলাম ঠুকে আমার পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। আর আমি শুধু মনে মনে ভাবি "নিজেরে করিতে গৌরব দান/নিজেরে না যেন করি অপমান—।"

আমার তখন পান জর্দা খাবার সামান্য একটু অভ্যাস চলছে। আমার

জামায় একটু-আধটু ফরাসী এসেন্স-এর গন্ধ ও মুখে বদলরাম লছমীনারায়ণের জর্দার খুসবু থাকার জন্য শ্রীমতী শোভা প্রায়ই আমাকে তাড়না করতেন। যাই-হোক মোড়ের মাথায় পানের দোকান থেকে পান কিনে জর্দা মুখে দিয়ে ওই পুলিস-বেষ্টনী ভেদ করে যখন প্রবেশ পথে ঢুকছি, জনৈক সার্জেণ্ট এগিয়ে এসে আমাকে ধরে নানা প্রশ্ন করে আমার জামার পকেট, কোমর ইত্যাদি টিপে সার্চ করল। তখনও কিছু বুঝিনি। এটা আপিস বাড়ি, কিন্তু সিঁড়ি ধরে যতদূর উঠি ততদূর পর্যন্ত দল দল লালপাগড়ি ও জমাদারের জনতা। তেতলায় আমার বড় হলে ঢুকে দেখি সশস্ত্র পুলিস অফিসাররা গিজগিজ করছে। রাস্তা থেকে এই তেতলা পর্যন্ত দেড়শ দুশ পুলিস।

ব্যাপার কি?

বৈদ্যনাথ বিশ্বাস মশায় এগিয়ে এসে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটার ডেপুটি পুলিস কমি-শনার প্রবীণ বয়স্ক মদনমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া মাত্রই আমাকে বলা হল, "ইউ আর ইন ট্রাবল—"

বিশ্বাস মশায় সহাস্যে যুগিয়ে দিলেন, "আপনাকে গ্রেপ্তার করার জন্যই ওঁরা সবাই এসেছেন। ওদের ধারণা এটা বিপ্লবীদের আড্ডা—আপনি নাটের গুরু!!"

প্রথমটা মিনিট দুই আমার গলার মধ্যে পান সুপারি ও জর্দা সব কিছু শুকিয়ে গিয়েছিল। পরে বললুম, মশা মারতে কামান দাগতে গেলেন কেন? আমি এসেছি আমার অফিসে, এখানে অনেক কাজ আমার। আপনারা আমাকে টেলিফোন করলে আমি লালবাজারে গিয়ে ধরা দিতুম। ওয়ারেণ্ট কই, দেখান?

মদন চক্রবর্তী প্রবীণ অফিসার। তিনি ওয়ারেণ্ট বা'র করলেন। আমার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের জন্য ১২৪ক ধারা এবং তারই সঙ্গে ৩০২/১১৭ ধারা যোগ হয়ে আমি খুনের মামলার এক আসামী,—'এডিং অ্যাণ্ড অ্যাবেটিং'। অর্থাৎ মামলা শুধু পুলিস কোর্টেই নয়, হাইকোর্ট পর্যন্ত যাবে।

খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই আমার! আমি লেখক আর সম্পাদক। আমি যাব খুন-খারাপির কাজে? ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ? আসুন মিঃ চক্রবর্তী, একটু চা খান্—। আপনি ত নিশ্চয়ই জানেন, পুলিসের টিকটিকি আমার সব গতিবিধি জানে!

ওরা সবাই আপিস তোলপাড় করে খানাতল্লাসী চালালো। আমার টেবল, আলমারি, র‍্যাক, চিঠিপত্র, ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি, কিছু বাদ দিল না। ওঁরা বললেন, আমি নাকি অনেক বিপ্লবীর বন্ধু। বারীন ঘোষের সঙ্গে আমার গলায়-

গলায় ভালবাসা! উপেন বাঁড়ুয্যেরা আমার গুরুস্থানীয়, সুতরাং আমি একজন বিপ্লবী!

যাঁদের নাম করলেন, তাঁরা এখন বারুদের খোল, ভিতরে বারুদ নেই। আর আমি? পাঁজি খুলে দেখুনগে আমার জন্মের দিন থেকে বাঙলায় বিপ্লববাদ আরম্ভ—দেখুনগে, ৭ জুলাই, ১৯০৫! যতদিন আমি বাঁচব, ততদিন অবধি আমি বিপ্লবী থাকব। ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ—এরা যদি কখনও তাড়া খেয়ে পালায়, তার পরেও দেখবেন, আমি নিজের দেশের সর্বপ্রকার সামাজিক ও নৈতিক পুরনো ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে এক বিপ্লবী!

মদন চক্রবর্তীর এক অধস্তন কর্মচারী আমার কথাগুলো দ্রুতহস্তে টুকে নিচ্ছিলেন।

আমি খুনী নই, কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে আমি বিষবাষ্প তৈরি করি! আমি লেখক, সাহিত্যকর্মী। আমার কলমই আমার তরোয়াল। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসীর পূর্ব রাত্রে যিনি সকল বিপ্লবীর শিরচুম্বন করে যান, সেই উৎপীড়িতা আলুলায়িতকুন্তলা দেশজননী রামকৃষ্ণকেও চোখের জলের সঙ্গে আশীর্বাদ করে গেছেন—'স্বদেশ'-এর সম্পাদকীয়তে আমি এই কথাগুলিই গুছিয়ে লিখেছি। ওটা যদি রাজদ্রোহ হয় হোক। আর খুনের মামলা? সে যদি হাইকোর্টে আসে আসুক! 'নেংটার নেই বাটপাড়ের ভয়!'

মদন চক্রবর্তীকে সেদিন সমাদরের সঙ্গে চা খাওয়ালুম, এবং বৈদ্যনাথ বিশ্বাস মশায় ওখানেই আমার জন্য কী একখানা কাগজে সই-সাবুদ করলেন। ওই প্রথম, কি জানি কেন, বিশ্বাস মশায়ের সম্বন্ধে আমার মনে একপ্রকার সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছিল! তাঁর সঠিক পরিচয় তখনও আমি যথেষ্ট পরিমাণ জানিনে। আমার এই গ্রেপ্তারের ব্যাপারটা তাঁর যেন আগে থেকেই জানা ছিল!

এধারে এসে দেখি, প্রেমেন্দ্র আগেভাগে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সে তার লেখার দরুণ আজ কয়েকটা টাকা পাবে, এইরূপ কথা ছিল। ভাদ্র-আশ্বিনের রোদ মাথায় নিয়ে বেচারীকে আসতে হয়েছে সেই কালীঘাট থেকে বহুবাজার। এ ছাড়া ঢাকা থেকে বুদ্ধদেব তাগাদা দিচ্ছে, তার দুটো গল্প ও একটি কবিতার জন্য মোট পঁচিশ টাকা অবিলম্বে পাঠাতে। প্রেমেন্দ্র আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, ভয় পাসনে। পুলিস কোর্টে গিয়ে আমি তোর জামিন দাঁড়াব, তুই নিশ্চিন্ত থাক্। যাই হোক, সেদিনকার থানাতল্লাসীর অন্যতম সাক্ষীস্বরূপ প্রেমেন্দ্র ওয়ারেন্টে সই করে দিল।

অতঃপর সেদিন বেলা প্রায় সাড়ে তিনটের সময় যখন রাস্তায় নেমে এলুম,

দেখি, দৈনিক 'বঙ্গবাণী'র একখানা টেলিগ্রাম বেরিয়েছে, এবং তার শেষ স্তম্ভের মাঝামাঝি আমার গ্রেপ্তারের খবরটিও ফলাও করে ছাপা হয়েছে। এক পয়সায় একখানা 'বঙ্গবাণী' কিনে পকেটে পুরে চললুম এবার হাজরা রোডের দিকে। শ্রীমতী শোভার কাছে এখনই না পৌঁছলে আমার চলবে না।

নির্দিষ্ট দিনে পুলিস কোর্টে গিয়ে দেখি, 'আনন্দবাজার'-এর সুরেশচন্দ্র মজুমদার মশায় উপস্থিত রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধেও রাজদ্রোহের মামলা। তিনি আমার সঙ্গে কোর্টের উকীল জ্ঞানশঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয়ের আলাপ করিয়ে দিলেন। তখনকার দিনে রাজদ্রোহের মামলা সহসা কেউ নিতে চাইত না, পাছে সেই উকীল রাজরোষে পড়ে। জ্ঞানবাবু অতি মিষ্টপ্রকৃতির মানুষ। তিনি শুধু এ ধরনের মামলায় দক্ষ ছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁর প্রাপ্য ফী নিতেও নারাজ ছিলেন। আমার কেস তিনি বিনা পারিশ্রমিকেই করবেন। আমার মামলা উঠেছিল টি-আহমেদের এজলাসে।

নিজের চেম্বার থেকে বেরিয়ে কোর্টে যাচ্ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটার তারকনাথ সাধু মহাশয়। মোটা পরকলা কাঁচের চশমা তাঁর চোখে। বয়সে প্রবীণ, দাড়িগোঁফ কামানো। তিনি তখন অতিশয় ক্ষমতাবান সরকারী কর্মচারী, বাঙ্গলায় যাকে বলে 'নগর কোতোয়াল' এবং তিনি ওই দুর্ধর্ষ পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্টের বিশেষ প্রিয় ব্যক্তি। তাঁকে নিয়ে দা'ঠাকুরের একটি গানের কলি রসিক সমাজে চালু আছে।

তাঁর চেম্বার থেকে তিনি বেরিয়ে কয়েক পা এগোতেই জ্ঞানবাবু তাঁকে ধরলেন। সেদিন আমার কেস উঠছে আদালতে, সুতরাং জামিন একটা লাগবে। প্রেমেন্দ্র কথা দিয়ে রেখেছে, সে এসে জামিন দাঁড়াবে। সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত। যাই হোক, মাঝপথে জ্ঞানবাবু ধরলেন পাবলিক প্রসিকিউটারকে। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আমি নিতান্ত অকিঞ্চনের মতো নতবিনয়ে তাঁকে নমস্কার জানালুম। সহসা ভদ্রলোক আমার প্রতি ক্রুদ্ধ কটাক্ষে বললেন, তুমিই না সেই বিজলীতে চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা লিখতে? সব জমা আছে আমার কাছে। আমার সময় নেই কথা বলবার। তোমার আস্পর্দা চরমে উঠেছে। 'স্বদেশ'-এর এ-কেস সিরিয়স্। বাঙ্গলাদেশ থেকে তোমাকে আমি তাড়াবো।

দাঁড়ান্—আমি আগুন হয়ে তাঁকে থামালুম—আমার কথাটাও শুনে যান। আপনি না সেই চোরবাগানের তারক সাধু? বাঙ্গলাদেশ থেকে আপনি আমাকে তাড়াবেন? আমাকে তাড়ালে আপনি থাকবেন কি?

আচ্ছা দেখা যাবে।—তারক সাধু চলে গেলেন।

জ্ঞানবাবু বললেন, এ তুমি কী করলে ভাই ? সব যে ভেস্তে গেল!

বললুম, ভয় পাবেন না জ্ঞানদা, মরার বাড়া গাল নেই।

এমন সময় এসে দাঁড়ালো আমার অসময়ের বন্ধু লেখক ভবানী মুখুজ্যে। যখন যে কাগজেই থাকি, ভবানী আমার দক্ষিণ হস্ত। বিনা স্বার্থে, বিনা দ্বিধায় হাসিমুখে সে কাজ করে দেয়। এখন সে এল রেল-আপিস থেকে—যেটি এই কোর্টের পাশেই। সে আজকের মতো ছুটি নিয়ে এসেছে।

টিফিনের পর আমার কেস উঠল কোর্টে। তারক সাধু কেসটি তুললেন। যতদূর মনে পড়ছে, তিনি কেসটির মধ্যে যোগ করলেন আমার বিরুদ্ধে ৩০২/১১৭ ধারার অভিযোগটি অর্থাৎ আমি খুনে-ফাঁস্নুড়ে! এ ব্যাপারটায় নাকি অভিযুক্ত হয়েছে আমাদের প্রিয় কবি বন্ধু প্রণব রায়, এবং তার সতীর্থ বরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোথায় যেন পালিয়ে গেছে!

জ্ঞানবাবু সেদিন কেস মুলতুবি হবার আগে আমার জামিন কে হবে, সেজন্য অপেক্ষা করে রইলেন। ভবানী আর আমি প্রেমেন্দ্রর পথের দিকে চেয়ে বসে রয়েছি। সুরেশ মজুমদার মশায়ের কেস চলছে। একবারটি এসেছেন প্রফুল্ল সরকার মশায়। ওঁরা দুজন প্রীতিবদ্ধ ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

বেলা গড়িয়ে যায়, প্রেমেন্দ্র আসে না! গতকাল রাত্রেও সে কথা দিয়ে রেখেছে! এর মধ্যে বার দুই আমাদের চা খাওয়াও হয়ে গেছে। বেলা চারটে বাজতে চলল। জ্ঞানবাবু কোনও মতে জামিন ঠেকিয়ে রেখেছেন। আমার পকেটে টাকা এনেছিলুম প্রেমেন্দ্রকে আজ ইম্পিরিয়ল রেস্তোঁরায় পেট ভরে খাওয়াব বলে।

না, সে আসবে না মনে হচ্ছে। আমি তার পথের দিকে চেয়েছিলুম। আমার খুব রাগ হচ্ছিল। কিন্তু এটা আমারই নির্বুদ্ধিতা। আমার পক্ষে ভেবে রাখা উচিত ছিল, আমার প্রতি যতই ভালবাসা থাক্, তার 'সিয়োরিটি' দেবার পক্ষে অসুবিধা আছে। তবু সারাদিন গেল আশার ছলনায়। অবশেষে বেলা প্রায় পাঁচটার সময় ভবানী কোমর বাঁধল। সে ভারত গভর্ণমেণ্টের কর্মচারী, মস্ত এক সম্পত্তির মালিক। ভবানী সেদিন সর্বপ্রকার ঝুঁকি নিল, এবং প্রায় গোধূলিকালে আমার জন্য জামিন দাঁড়িয়ে আমাকে ছাড়িয়ে আনল। ততক্ষণে প্রেসিডেন্সী জেলের গাড়ি এসে অপেক্ষা করছিল, আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে যাবার জন্য। ভবানী সেদিনকার বিপদে প্রকৃত বন্ধু ছিল।

জ্ঞানবাবুর চেষ্টায় আমার বিরুদ্ধে কোনও মামলাই টেকেনি। ম্যাজিস্ট্রেট

শুধু সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'ডোণ্ট্ ড্যাবল্ ইন্ পলিটিক্স।' রাজনীতির ব্যাপারে মাথামাখি করো না! খবরটা নিয়ে শ্রীমতী শোভার কাছে গিয়েছিলুম। তিনি সব শুনে বললেন, বেড়ালের ভাগ্যে এবারেও শিকে ছিঁড়ল না।

সেদিন তিনি আমার জন্য লুচিমোণ্ডার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু বিনামূল্যে নয়। রাত্রে খাবার আগে ঘরের দরজা বন্ধ করে আমাকে জানলার ধারে বসিয়ে হুকুম করলেন, বক্সাদুর্গের বন্দীদের ওপর রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা আরেকবার আবৃত্তি করুন।

বললুম, আগে পাঁচটা টাকা ফেলুন।

পাঁচ টাকা? কেন?

আজকাল রেডিয়োতে আবৃত্তি করে পাঁচ টাকা রোজগার করি। শুনেছি মহাকবিও নাকি আমার আবৃত্তি শোনেন—।

ফাজলামি রাখুন। বলুন—শোভা গুছিয়ে বসলেন।

সন্দেহ নেই, সেই রাওয়ালপিণ্ডি-মারীর জগদীশচন্দ্রের ভগ্নী সরস্বতীর পর শোভার মতো এমন আবৃত্তির আন্তরিক শ্রোতা আর পাইনি। অনেক সময় দেখেছি এই বিপ্লববাদিনীর শিরার রক্তের মধ্যে মহাকবির কবিতা কী যেন একটা অমোঘ মন্ত্রের মতো কাজ করে যেতো। শ্রীমতী শোভা ছিলেন বস্তুতান্ত্রিক, অতিশয় হিসাবী, সর্বদা চড়াসুরে বাঁধা, শাসনে-তিরস্কারে-ঘরকন্নার পরিচালনে,—তিনি খুবই কঠোর। তিনি একেবারেই বুঝতে দেন না তাঁর কোনও সেণ্টিমেণ্ট আছে। একটির পর একটি ছেলের ফাঁসী হয়েছে তাঁর সামনে দিয়ে; একটির পর একটি মামলায় অনেকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছে; লাঠির ঘায়ে তাঁর পরিচিত অনেকে চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়েছে; 'থার্ড ডিগ্রি' উৎপীড়নের ফলে কত ছেলে পাগল হয়েছে—এ সব শুনেও তিনি অবিচল! মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি নিজে কয়েক দিনের জন্য পুলিস লক-আপে যান। আমাদের মনে হয়েছিল তাঁকে সম্ভবত আর্সেনিক বা অমনি কিছু একটা খাইয়ে তাঁর মানসিক পঙ্গুতা আনার চেষ্টা হচ্ছে! তাঁকে আলমোড়া জেলে নিয়ে গিয়েও অনেক উৎপীড়ন করা হয়েছিল।

সেই রাত্রে ঝঙ্কার-ঝঞ্ঝনায় কেঁপে উঠেছিল আমার দীর্ঘকণ্ঠ মহাকবির সেই কবিতায়: "নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন/পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন/ফোয়ারার রন্ধ্র হতে উন্মুখর ঊর্ধ্ব স্রোতে বন্দী বারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন!

"অমৃতের পুত্র মোরা'—কাহারা জানালো সুনিশ্চয়/আত্মবিসর্জন করি

আত্মারে কি জিনিল অক্ষয়/ভৈরবের আনন্দেরে দুঃখেতে জিনিল কে রে/বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।"

এই কবিতাটি তৎকালীন বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বারংবার অনুবাদ করিয়েও এর প্রকৃত মর্মার্থ তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি। সেই কারণেই তাঁদের সেন্সর বোর্ড এটি মঞ্জুর করে বক্সাদুর্গের বন্দীদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

বাঙ্গালী বন্দীরা এই কবিতাটি পেয়ে আনন্দাশ্রুর সঙ্গে মহাকবিকে প্রণাম জানিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে বড়লাট লর্ড রেডিংয়ের আমলে দমননীতি যেমন প্রবল হয়, বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতাও তেমনি বাড়তে থাকে। ১৯২৯-এর সেপ্টেম্বরে যতীন দাস অনাহারে মৃত্যুবরণ করার পর ছেলেরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তখন প্রতিরোধ আর প্রতিশোধের পালা আরম্ভ। কে কাকে মারবে এবং কোন্ পক্ষে কত মরবে, এর হিসেবনিকেশ চলছে বছরের পর বছর।

এ বছর ১৯৩১-এর সেপ্টেম্বর একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল হিজলী জেলে। সম্প্রতি খড়্গপুর থেকে প্রায় মাইল দুই দূরে অন্তরীণ বন্দীদের জন্য এই জেলটি নির্মাণ করা হয়েছিল এবং রেলগাড়ী ওদিক দিয়ে পেরিয়ে যাবার সময় বন্দীরা দূর থেকে রুমাল নেড়ে যাত্রীদেরকে ইশারা করত। ও-অঞ্চলটার জল-হাওয়া মন্দ নয়।

ঘটনাটা ঘটল বোধ হয় সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। বন্দীদের পক্ষে নানাপ্রকার যুক্তিপূর্ণ অভিযোগ ছিল। বিনা বিচারে অকারণে যাদেরকে আটক করা হয়েছে তাদের নানা ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়া আছে বইকি। সুতরাং, জেলের মধ্যে তারা একটা হাঙ্গামা বাধিয়েছিল। তখন বাঙলার গভর্নর বোধ হয় স্টানলি জ্যাকসন। এক-একজন নামে পৃথক, কিন্তু বস্তু হিসাবে সেই একই ইংরেজ! কারও হয়ত বা একটু মুখমিষ্টি, কেউ বা কিছু কূটনীতিক, কারও বা চক্ষু লাল। আসলে কমিশনার টেগার্ট এবং ইংরেজ চীফ সেক্রেটারি—এরাই এক রকম রাজ্যপাট চালিয়ে যায়।

সেদিন গভীর রাত্রে হিজলী জেলের কর্তৃপক্ষই হোক আর কলিকাতার সর্বময় কর্তাই হোক, হুকুম জারী করল—জেলের চারিদিক বন্ধ করে ভিতরে গুলী চালাও! গুলী চালালো গোর্খা সিপাহীরা, তারা হুকুমের চাকর। সেই ঘন অন্ধকার রাত্রে রক্তাক্ত অবস্থায় ২৯ জন বন্দী ধরাশায়ী হল এবং দুজনে ওই ঘটনাস্থলেই মারা গেল। তাদের নাম তারকেশ্বর সেন ও সন্তোষ মিত্র। ওটা ছিল প্রায় ১৯১৯-এর জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের মতো বেঁধে মার দেওয়া! এর ফলে সমগ্র বাঙলা তোলপাড় হয়ে উঠল।

এই তোলপাড় যখন সুদীর্ঘকাল ধরে চলছে, সেই সময় শীতকালে রবীন্দ্রনাথ 'প্রশ্ন' নাম দিয়ে একটি কবিতা লিখলেন। সেই কবিতাটি পড়ামাত্রই আমি ধরে নিয়েছিলুম, এটি হিজলী গুলীচালনার ওপর লেখা। ওরই মধ্যে একদিন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে আবৃত্তি করার জন্য আমার ডাক পড়ল কি এক রাজনীতিক সমাবেশ

উপলক্ষ্যে। বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত। সভাপতি তুলসীচন্দ্র গোস্বামী। ওই কবিতাটি ছাপা হয়েছিল প্রবাসীতে, এবং তার পাঠকসংখ্যাও সীমাবদ্ধ। আবৃত্তি করার আগে ভূমিকাস্বরূপ আমার অনুমানের কথাটা নিয়ে মিনিট দুই বক্তৃতা করে নিলুম। আমি জোর দিয়েছিলুম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্ট্যানজায়। শেষের দিকে যখন বুকফাটা আর্তনাদের সঙ্গে গনগনিয়ে উঠলুম, "যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো/তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?"

তিন চার হাজার লোকের সভা। তারা বিমূঢ় হতবাক। তখন মাইক ছিল না, আমার কণ্ঠস্বর ছিল একাই একশ'। তুলসী গোঁসাই মহাশয় অবাক বিস্ময়ে আমাকে নিরীক্ষণ করছিলেন।

দুটো মামলা থেকেই আমি ছাড়া পেয়েছিলুম। হাইকোর্টের জজ তখন বোধ হয় মিঃ কস্টেলো। জাতভদ্র ইংরেজ। তিনি কবি প্রণব রায়ের কাগজপত্র পরীক্ষা করে বললেন, এ মামলা টেঁকে না, আসামী বেকসুর। যারা এ কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তারাও মুক্ত।

এই প্রকারে মুক্তিলাভের পর আমি 'স্বদেশ' আপিসে বৈদ্যনাথ বিশ্বাসের কাছে চিঠি দিয়ে 'স্বদেশ' সম্পাদক-পদে ইস্তফা দিলুম। দিন চারেক পরে বিশ্বাসমশায় একখানা গাড়ি নিয়ে সকালের দিকে আমার বাসস্থানে এসে উপস্থিত। তিনি অতিশয় চতুর, এবং আমি অতিশয় রগচটা ও বেপরোয়া। প্রথমেই বললুম, আপনি অতিশয় ধূর্ত। আপনার প্রত্যেক আচরণে প্রমাণ পেয়ে এসেছি আপনি ইলিসিয়ম রো এবং লালবাজারের সঙ্গে সংযুক্ত।

আমাকে কিছু বলতে দিন ?

না, একটা কথাও আমি শুনব না আপনার। আপনি আমাকে দিয়ে আপনার পাবলিসিটি করিয়ে আমাকে জেলে পাঠাতে চান। আপনার কাগজে তিন সংখ্যা 'আঁকা-বাঁকা' লিখেছি, এ সংখ্যায় বন্ধ করে দিলুম। যান আপনি—

আমি নিজেই ভিতরে চলে গেলুম।

এবার বহুদিন পরে আমি মুক্ত বিহঙ্গ। গুরুদাস থেকে আমার 'দুই আর দুয়ে চার' বেরিয়েছে। এবার একে একে বেরোবে 'নিশিপদ্ম' আর 'কলরব'। আর আমি কোনও কাগজের মধ্যে ঢুকব না। অনেক শিক্ষা হয়েছে। চুলোয় যাক 'স্বদেশ'।

এমনি সময় কাশী থেকে মাসতুতো ভাই প্রভাস চিঠি লিখল, তোর বউদি

সেই থেকে ভুগছিল, এখন বোধ হয় আর বাঁচার আশা করে না। তোকে দেখতে চাইছে, যদি পারিস চলে আয়।

পরদিন আমি কাশী গিয়ে পৌঁছলুম।

একদা বউদির নাম বদলিয়ে আমি রেখেছিলুম দুর্গাঠাকরুণ। বলিষ্ঠ, সুন্দর চেহারা, স্বাস্থ্য ঝলমল করত। এখন ওর বয়স হয়ত বা বছর বাইশেক। আমি সেই অভিশপ্ত বড় বাড়িতেই উঠেছিলুম। সবাই বিমর্ষ। প্রভাস বলল, এখনই দেবনাথপুরায় চলে যা, ওখানেই আছে।

আমি ছুটলুম। এ-গলি ও-গলির ভিতর দিয়ে আমি বউদির বাপের বাড়িতে এসে উঠলুম। ছোট ছোট ভাই বোন—সকলের মনেই বিষাদের ছায়া। বউদির কবে যেন একটি মেয়ে হয়েছিল, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই বাচ্চাটা মারা যায়।

অতি সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে ঢুকলুম। খাট-পালঙ্ক নয়, মেঝের উপরেই বিছানাটা পাতা। জানলাটা ঠিক মাথার কাছে। এ বাড়িতে তিন চারবার আমি অপরাধীর বেশেই এসেছি। আমার অতীত আচরণের দরুণ এঁরা আমার প্রতি তুষ্ট নন।

রোগিণী বড় বড় চোখে জেগে রয়েছেন। তিনি সজ্ঞান। পড়ে রয়েছেন বিশীর্ণ রক্তহীন একখানা কঙ্কাল। কানাকানিতে শুনলুম, ডাক্তারের পক্ষে আর কিছু করার নেই। প্রভাসের ওদিক থেকে খরচপত্র অনেক দিন অবধি আর আসে না, এঁরাও আর পেরে উঠছেন না। রোগিণী আর উঠে বসেন না। অর্থাৎ আর দেরি নেই। তবে কিনা যক্ষ্মার অন্তিম অবস্থা, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টনটনে জ্ঞান থাকে। ওই ভয়াবহ ভগ্নাবশেষের উপরে শুকতারার মতো জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ আমার নিমেষেনিহত দুটো চোখের উপর! কে কাকে বেশি দেখছে। উনি না আমি! ওঁর ওই চোখের ভিতর দিয়ে আমি যেন দেখতে পাচ্ছিলুম আরেক মেয়েকে। যে-মেয়ে নিজের সেই সুন্দর ছবিটির ওপর ফুলের মালাটা ঝুলিয়ে একদা আমাকে বলেছিল, মিলিটারির চাকরি নিয়ে যাচ্ছ যাও, কিন্তু এ মালা শুকোবার আগে চাকরি ছেড়ে চলে এসো, ঠাকুরপো।

শান্ত কণ্ঠে এবার প্রশ্ন করলুম, প্রভাস আসা-যাওয়া করছে তো?

না,—রোগিণী জবাব দিল অতি ক্ষীণ কণ্ঠে,—তাকে আসতে মানা করে দিয়েছি! তুমি এলে কেন?

ওঁর বাঁকা চোখ দেখে আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলুম। কিন্তু ধীরে ধীরে পকেট থেকে পঞ্চাশটি টাকা বার করে রোগিণীর বালিশের কাছে রেখে বললুম, প্রভাস খুব ভেঙ্গে পড়েছে। আমার হাত দিয়ে এই টাকা কটা পাঠিয়ে দিল।

হঠাৎ দুর্গাঠাকরুণ নড়ে উঠলেন। যেন লকলক করে উঠল আগুন। বললেন, মিছে কথা বলতে ছুটে এসেছ কাশীতে? ও টাকা তোমার। তুলে নাও ···তুলে নাও বলছি? কাকে ভোলাতে চাও টাকা দিয়ে?

সভয়ে আমি টাকা তুলে নিলুম। রোগিণীর উত্তেজনা আমি দেখতে চাইনে। কিন্তু তখনই ওঁর ছোট বোন একটি মিষ্টান্নের রেকাব এনে আমার সামনে রেখে জল এনে দিল। যেহেতু যক্ষ্মা রোগীর ঘর, গৃহস্থের পক্ষে এ ঘরের হাওয়া খারাপ—সেজন্য ওঁর বোন দরজাটা বাইরের থেকে টেনে দিয়ে গেল। মৃত্যু-পথীর পাশে যেন আমি একা পড়ে গেলুম।

লৌকিক সৌজন্যবশত আমি মিষ্টান্নের রেকাবটা কাছে টেনে নিতে যাচ্ছিলুম। বউদি বাধা দিলেন। তিনি প্রথমে মাথা তোলবার চেষ্টা করলেন, তারপর সরু একখানা হাড়ের বাঁকারির মতো হাত বার করে থালার মিষ্টান্নগুলো নিয়ে জানলা গলিয়ে ফেলে দিলেন নীচের গলিতে। তারপর চুপ করে কতক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম।

বউদির গায়ে কোনও অলঙ্কার আভরণের লেশমাত্র নেই। মাথার সিঁদুরের চিহ্ন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। সমস্ত দেহটা ফ্যাকাশে একখানা কাগজ। এগুলো আমার পক্ষে অবিশ্বাস্য ছিল। কিন্তু আমিই বা আর বসে থেকে কী করব? আমার দেখা ত শেষ হয়ে গেল এই অন্তিমকালের বিছানায়। এক সময় বললুম, এবার আমি উঠি বউদি?

যাও—

বললুম, রোজ আমি একবার করে এসে আপনাকে দেখে যাব।

না, আর দেখো না, আর এসো না তুমি।—তারপরেই আবার তিনি যেন বিজবিজ করে বললেন, খুনী, খুনী······সবাই খুনী······

আমি শান্তভাবে উঠে দরজাটা খুলে বেরিয়ে চলে গেলুম। আমারও যেন তাই মনে হচ্ছিল, দুর্গাঠাকরুণের চারিদিকে আমরা যারা রয়েছি, সবাই আমরা খুনী! আমরা মেয়েদেরকে সম্মান ও শান্তি দিইনে, অন্ন-বস্ত্র আশ্রয় দিইনে, রোগে দুঃখে-দুর্দশায় কোনও সাহায্যের হাত বাড়াইনে। তাকে দিয়ে শুধু সকল কাজ করিয়ে নিই, কাজ ফুরোলে তাকে আখের ছিবড়ের মতো জঞ্জালে ফেলে দিই!

এরপর মাস দেড়েক ছিলেন দুর্গাঠাকরুণ, তারপর প্রভাসের চিঠিতে জানলুম, তিনি কদিন আগে সজ্ঞানে মারা গেছেন। কিন্তু আমরা কয়েকজন তাঁর কাছে চিরদিন খুনী হয়ে রয়ে গেলুম এবং এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি চলে গেলেন।

প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর বছরখানেকের মধ্যেই প্রভাস আবার বিবাহ করে। সে বিবাহে আমি উপস্থিত থাকতে পারি নি।

যাই হোক সেবার কলকাতায় ফিরে বাড়িতে ঢুকে প্রথম যাকে দেখামাত্র আঁতকিয়ে উঠলুম সে আমার সেই সর্বনাশিনী ভাগ্নী, তরুণী বিধবা বুলি।

রাজেন্দ্রাণীর মতো বুলির চেহারা। অপরিসীম কঠিন স্বাস্থ্য, সুন্দর মুখশ্রী, কুঞ্চিত ঘন চুলের রাশি পিছন দিকে কতদূর পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। দুই চোখে যেন নধর ভাবাবেশ। রূপের গৌরবগর্ব এখন বুলিকে মানায়। বুলির বয়স এই মাত্র বছর সতেরো। কিন্তু আমি ওকে আমাদের এখানে দেখেই রেগে উঠলুম। চেঁচিয়ে বললুম, আবার তুই মরতে এসেছিস মামার বাড়িতে? তোকে না বলে গিয়েছিলুম, তোদের খিড়কির পুকুরে ডুবে মরতে?

মরব কোন্ দুঃখে?—বুলি ঝাঁঝিয়ে উঠল, পুকুরে তিরিশবার এপার ওপার হতুম! সাঁতার জানলে কেউ ডুবে মরে?

মা দাঁড়িয়েছিলেন সামনে হাসিমুখে। আমি বললুম, বেশ, না হয় বেঁচেই রইলি। কিন্তু দুবেলা দুমুঠো খেয়ে মা-বাপের কাছে পড়ে থাকলিনে কেন? সেখানে চার চারটে গরু, দশ বারো সের খাঁটি দুধ, অঢেল খাবার দাবার, সে সব ছেড়ে এলি কি জন্যে? এখানে যে আধপেটাও জুটবে না!

মা বললেন, আচ্ছা, এসে পড়েছে ছেলেমানুষ······থাক কদিন।

তুমি জানো না মা ও আবার এসেছে আমাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাবে!

বেশ করব—বুলি জিদ ধরল। তারপর হাতের কাছে কিছু না পেয়ে একখানা গামছা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারল। তাতেও হল না, পোড়ারমুখী ছুটে এসে আমার চুলের মুঠি সজোরে পাকিয়ে ধরল।

উঃ ছাড়, লাগছে! আচ্ছা আর কিছু বলব না, ছেড়ে দে।

মা বললেন, বুলি সেই একই রকম, এতটুকু জ্ঞানগম্যি হয় নি।

আমাদের বাড়িতে মাত্র তিনটি শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর এবং তেতলায় একটি ছোট্ট ঘর—ভাঁড়ার আর ঠাকুরঘর মিলিয়ে। দুই দাদা আর আমি তিনটি ঘরই নিয়ে থাকি। ওদের রয়েছে ছেলেমেয়ে কাচ্চাবাচ্চা। আমার ঘরটি ছোট্ট। ওরই মধ্যে লেখাপড়া, গড়াগড়ি, ওরই মধ্যে মালপত্রাদি। এর মধ্যে বুলি কোথায় ঢুকবে, ভেবেই পাইনে। মেয়েটা ওর মা-বাপের কাছে পালপাড়ার ওই বন, বাগান, ক্ষেত-খামার আর পুকুরধারে পড়ে থাকতে চায় না। সে নিজেই জানে না, কী নিয়ে তার জীবন কাটবে! কী উদ্দেশ্য নিয়ে সে বাঁচবে! বুলি এ জীবনে বোধ হয় এক ফোঁটাও লেখাপড়া শেখে নি—বড়জোর

দুচার লাইন ভাঙ্গাভাঙ্গা বাংলা লিখতে পারে। সেই তখনকার কালের স্লেট-পেন্সিলের দাগা বোলানো। বামুন-পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে সে। এগারো বছর বয়সে তার বিয়ে হয়, ফুলশয্যার পরের দিন স্বামী চলে যায় মধ্যপ্রদেশে—আর ফেরেনি। দেড় বছরের মধ্যে সেই ছেলেটা জংলী জ্বরে মারা পড়ে। বুলি রয়ে গেল সেই কিশোরী কুমারী। স্বামীকে একখানা চিঠি পর্যন্ত লেখার বিদ্যে তার হয়নি।

বুলি অত্যন্ত দুরন্ত, ভয়ানক আমুদে, এবং সাংঘাতিকভাবে সুস্থ। কিন্তু সুগন্ধী কৌমার্যে এমন একটি শুচিশুদ্ধ ও পবিত্র তার চেহারা যে, দেখলে কেমন যেন সম্ভ্রম বোধ হয়। এ যেন এক প্রকার আরণ্যক এবং অমার্জিত সৌন্দর্য—যা পরিপাটি প্রসাধনের তিলমাত্র ধার ধারে না! এক পয়সার সাবান, এক পয়সার নারকেল তেল, একখানা চিরুনি—এর বাইরে আধুনিককালের কোনও প্রসাধন সামগ্রী ওদের চোখেই পড়ে না! কিন্তু ওতেই চেয়ে দেখো যেন মহীয়সী জগদ্ধাত্রী! চেয়ে দেখো, পুরাণ আর মহাকাব্যের ভিতর থেকে উঠে এসেছে এক ভুবনমনোমোহিনী মহামায়া! ষোল সতেরো বছরের মেয়েকে দেখলে মনে হয় যেন বাইশ চব্বিশ বছরের।

আমার মাথার উপরে রয়েছেন সপরিবারে দুই দাদা, আমার সর্বংসহা শান্তিময়ী মা, আমার বড় বোনেরা, বুলির মা বাবা ভাই বোন, রয়েছে তার শ্বশুরবাড়ির অনেকে। কে নেই বুলির? চারিদিকে তার গিজগিজ করছে সবাই। কিন্তু কারও প্রতি কোনও আকর্ষণ নেই বুলির। সে সুবেশা হতে চায় না, শ্রেষ্ঠ কোনও আহার্যবস্তুতে তার লোভ নেই, অলঙ্কারাদি তার কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন, গৃহ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সে ভ্রূক্ষেপও করে না—এবং সে কী চায় নিজেও সে জানে না! আমার সামনে আবার সে এসে দাঁড়াল যেন এক বিরাট জিজ্ঞাসার মত। আমার জীবনে সে যেন আর একবার একটা সঙ্কট ঘনিয়ে তুলল।

মা? ঘুমিয়েছ?—আমি ডাকলুম।

মা জেগে উঠে বসলেন। বুলি নিচের তলায় তার মামীর সঙ্গে গল্প করছে।

বললুম, আচ্ছা, বুলি যে আবার এল, ও থাকবে কদ্দিন? এখানে থাকার কত অসুবিধে, তুমি ত জানো, মা। চোখের সামনে ওইটুকু মেয়ে একবেলা হবিষ্যি করে শুকিয়ে মরবে, এ কি সহ্য করতে বলো?

মা বললেন, আমি কি করব বল্? বুলিও নাতনীদেরই একজন। মা-বাপের কাছে ওই পাড়াগাঁয়ে তার মন টেঁকে না।

এখানে বুলি কী নিয়ে পড়ে থাকবে বলতে পার?—আমি বললুম, আমি

নিজে মন বসিয়ে কাজকর্ম করতে পারব মনে করো? ওই বিধবা মেয়েকে নিয়ে তুমিই বা কি করবে? কত দিন কত কাল ওকে পুষবে? ওর সমস্ত জীবনই ত ওর সামনে পড়ে রয়েছে। ওর দুই বড় মামারও তো কোনও গ্রাহ্য নেই!

মা চিন্তিত মুখে চুপ করে রইলেন।

দিনে-দিনে লক্ষ্য করে দেখলুম, সমস্ত সমস্যা ও প্রশ্ন যেন আমার ঘাড়ে চাপিয়ে চারিদিকের সবাই পরম নিশ্চিন্ত মনে চুপ করে গেল। আমার জীবনে এত বড় বিবেকসঙ্কট বুলি সৃষ্টি করবে এ অভাবনীয় ছিল। কে না জানে আমার কিশোর বয়সে ওকে আঁতুড় থেকে তুলে পলতে করে দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে এসেছি—ওর মা ছিল তখন সূতিকারোগে প্রায় মৃত্যুশয্যায়। দর্জিপাড়ায় যখন আমরা নিবারণ দাসের বাড়িতে থাকি, তখন বুলির পিছন দিকে পশ্চিমা ফোঁড়া হয়। সেই আমি আড়াই বছরের মেয়েকে নিয়ে ডাঃ সুন্দরীমোহনের ওখানে ছুটোছুটি করি। আমাদের কাছে ছাড়া বুলি কোথাও থাকত না, তাই বুলি ছিল আমার খেলার পুতুল। রবারের বল ছুঁড়ে দিলে প্রভুভক্ত বাচ্চা কুকুর যেমন ছুটে গিয়ে সেটা মুখে করে আনে বুলি সেইভাবে আমার সঙ্গে খেলা করেছে! ওর এগারো বছর বয়সে আমিই সেই সাংঘাতিক দুর্যোগের রাত্রে বর নিয়ে গিয়ে বুলির বিয়ে দিয়েছি। তার পরের ঘটনাবলী ভাবতে গেলে আজও আমার গা শিউরে ওঠে। অতঃপর সৈন্য দপ্তরে চাকরি নিয়ে আমি যেন পালিয়ে বেঁচেছিলুম! আজ আবার চার বছর পরে ওকে দেখে নতুন করে আতঙ্কিত হয়ে উঠলুম। এ বুলি সেই কিশোরী বিধবা বুলি নয়। এ মেয়ে এখন বৈধব্যকে এবং সেই এক রাত্রির দেখা স্বামীকে ভুলে গেছে, এ মেয়ে হয়ত সেদিনকার দুরন্তপনাও ভুলেছে!

বুলি, তুই ইস্কুলে ভর্তি হবি?

ইস্কুলে?—বুলি ভেংচিয়ে উঠল, খেয়ে দেয়ে আমার যেন কাজ নেই? কিচ্ছু করব না আমি।

কিছুক্ষণ ভেবে আমি বললুম, এক কাজ করা যাক। চল তোকে 'নাট্য-মন্দির'-এ ব্যবস্থা করে দিয়ে আসি। বেশ ত, থিয়েটার করবি? নাচবি ধেই ধেই করে?

বুলি উগ্রকণ্ঠে বলল, তার চেয়ে আমাকে বিষ খেতে দাও না কেন? তোমার কোনও কথা আমি শুনব না!

আমি হাসছিলুম। বললুম, আচ্ছা, এবার তাহলে মাথা ঠাণ্ডা করে শোন যা বলি। একবার ভেবে দেখ্ দেখি তোর নিজের মোটর গাড়ি, কথায় কথায় ড্রাই-ভারের সেলাম, নিজের ফ্ল্যাট বাড়ি, গায়ে মণিমুক্তোর গয়না, সব চেয়ে দামি

পোশাক, টাকার আণ্ডিলের ওপর তুই বসে আছিস! কি রকম লাগে বল্ ত? তোর চারিদিকে সবাই হাতজোড় করে বসে আছে! সবাই তোর হুকুমের চাকর! তোর সোনার খাটে গা, রূপোর খাটে পা!

বুলি চোখ পাকিয়ে বলল, তুমি বুঝি তোমার মামার মতন গাঁজা ধরেছ?

না রে, সত্যি বলছি। তোর যা চেহারা দেবকী বোসকে একবার বললেই হল, তোকে মাথায় তুলে নিয়ে যাবে। ছবিতে তুই নামবি, হইহই পড়ে যাবে চারিদিকে! চিত্রজগতের নতুন তারকা শ্রীমতী—

তোমার মুখে আগুন—মুখ ঝামটা দিয়ে বুলি চলে গেল।

গলা বাড়িয়ে বললুম, তা হলে বলে যা কি চাস তুই?

বুলি আবার ফিরে এল। বলল, এক পা এ বাড়ি থেকে নড়ব না! গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়ালেও আবার ফিরে আসব।

আমি চুপ করে গেলুম। কিন্তু হঠাৎ পিছন থেকে বুলি আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল—ছোট মামা, তুমি চিরকাল ধরে আমাকে দুঃখ দিচ্ছ, আমাকে সব বিপদের মধ্যে তুমি ঠেলে দিয়েছ, আর আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না!

লাবণ্যপ্রভা দত্তকে আমি মা বলতুম, কিন্তু তিনি আমাকে 'আপনি' বলে সম্ভাষণ করতেন। ওঁদের বাড়িতে বহু মেয়ে এবং বহুর আনাগোনা, সেজন্য আমি সতর্ক থাকতুম। বড়দিদি উষা এবং শ্রীমতী শোভা—এঁদের সঙ্গে আমার 'আপনি-আজ্ঞে' সুবাদ। ছেলেরা সবাই আমাকে 'আপনি' বলে। ও-বাড়ির দরজায় পা দেবার আগে আমার সর্বপ্রকার 'বদ্অভ্যাস' আমি পথে ফেলে যেতুম।

১৯৩১ পেরিয়ে ৩২-এ পড়ছে। আমার 'স্বদেশ' গেছে, 'বিজলী' কবেই গেছে। উপাসনা, দুন্দুভি গেছে। এখন আমি ঝাড়া হাত-পা।

লাবণ্যপ্রভা বললেন, বলুন ২৬শে জানুয়ারী কি ভাবে পালন করব আমরা! আমরা শ' দেড়েক মেয়ে যোগাড় করতে পারব। ফ্ল্যাগ তুলব চৌরঙ্গী আর কর্পোরেশন স্ট্রীটের মোড়ে কার্জন পার্ক ঘেঁষে। আমরা ট্রাম বাস বন্ধ করব। আমাদের মেয়েরা দক্ষিণ কলকাতার দল।

শোভা বললেন, দেড়শ মেয়েতে হবে না। আমি পুণ্যাশ্রম আর আনন্দমঠ কুড়িয়ে একশ' দেবো।

এবার বললুম, আমি কেবল একটিমাত্র মেয়েকে দেবো, মা যদি অনুমতি দেন।

ওঁরা বললেন, কে সে মেয়ে ?

সে নতুন, সে অজ্ঞান, তার এতটুকু জাগতিক অভিজ্ঞতা নেই। সে আমার অতিপ্রিয় ভাগ্নী, একমাত্র আপনাদের হাতেই তাকে ছেড়ে দিতে পারি।

মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কই আগে এর কথা বলেননি ত ?

বললুম, বলতে ভাল লাগেনি এত বেদনাদায়ক! আপনারা তাকে দেখলেই ভালবাসতে চাইবেন। আমার বিশ্বাস, সে আপনাদের কাছে নিরাপদে থাকবে।

ওঁদের কাছে সেদিন আমি বুলির আগাগোড়া কাহিনীটি বলেছিলুম।

আমার প্রস্তাবটি শুনে ওঁদের বাড়ির মধ্যেই একটা আনন্দ ও উদ্দীপনার হুজুগ উঠল। প্রায় গত দু'বছর ধরে আমি এ বাড়িতে অবিশ্রান্ত আনাগোনা করছি, এ আমার এক নেশা,—কিন্তু ওঁরা কেউ আমার পারিবারিক পরিচয় বা পটভূমি জানেন না। ওঁদের ধারণা আমি এক ধনাঢ্য পরিবারের ছেলে এবং আমার পোশাক ও পরিচ্ছদে এবং চালচলনে ওঁরা সম্ভবত ওইটিই ধরে নিতেন। আমার কোনও ভান বা ভণিতা ছিল না। আমি ওঁদের অনেক ফরমাশ খেটে দিতুম, কিন্তু কখনও অরক্ষণীয় প্রতিশ্রুতি দিতুম না! আমার বয়স অল্প বলেই আমাকে সর্ববিষয়ে কড়া সংযম পালন করতে হত! ওঁরা এই সূত্রে যেদিন শুনলেন আমি নিতান্তই স্বল্পবিত্ত পরিবারের লোক এবং প্রতি মাসে বিশে-বাইশে তারিখের পর আমাদেরকে দৈনন্দিন বাজার খরচের কথা ভাবতে হয়, তখন ওঁরা একেবারেই আমার কথা বিশ্বাস করেননি! ওঁদের ধারণা এ আমার অতি-বিনয়। আমার দিকে চেয়ে-চেয়ে আমার আরাধ্যাদেবী শ্রীমতী শোভা বলতেন, আপনি আগা-গোড়া মিথ্যুক, সব আপনার ধাপ্পা! যদি এতই আপনি গরীব, তাহলে পকেটে হাত দিলেই টাকা পাই কেন ?

হাসিমুখে বলেছিলুম, আমার সন্দেহ, আপনি আমার পকেটে লুকিয়ে দু'পাঁচ টাকা রেখে দেন!

উনি আমার পরিহাস বুঝতে না পেরে বললেন, আমি ? আমি টাকা পাবো কোথায় ?—গম্ভীর মুখে শ্রীমতী বললেন, আপনি কি আজও বুঝতে পারেননি যে, মা আর আমি থাকি জামাইবাবুর আশ্রিত হয়ে ? আপনি কি জানেন, চারজন জেঠতুতো ভাই এ বাড়িতে থাকে তাদের অতগুলো সমস্যা নিয়ে ? কিছু জানেন না আপনি, জ্ঞান-বিবেচনা কিছুই আপনার হয়নি। এসব কথা কোনও দিন কি আপনি শুনতে চেয়েছেন ?

বাধা দিয়ে বললুম, থাক, আর নয়। এইটুকু শোনাই যথেষ্ট। আমার

নিজের কথাটা বলে রাখি। এখন আমি সাহিত্যকর্মের মজুরি কিছু কিছু পাই, ওতে আমার চলে যায়। পাবলিশার ঠেঙিয়ে যা জোটে তাতেই আমার নবাবী, তার থেকেই যা কিছু খয়রাতি!

উনি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। আমার কথায় কান দিলেন না।

আমার ভাগ্নীকে আমি এ বাড়িতে আনছি, এটা এ বাড়িতে সেদিনের মস্ত খবর। দিদি, মা, বিষ্ণুপ্রিয়া, সুধা, হরেন, মেজবউদি, কমলা—এদের সকলের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে কুণ্ঠিতভাবেই স্বীকার করি, ওঁদের পরিমণ্ডলের মধ্যে সকলে আমাকে যা ভাবতেন, ইংরেজীতে তাকে বলে 'গ্ল্যামারাস'।

রাত্রে বাড়ি ফিরে সেদিন অনেক চিঠি পেলুম পর-পর। তার সঙ্গে প্রুফ—গুরুদাসে বই ছাপা হচ্ছে। আনন্দবাজার থেকে দোল সংখ্যার চিঠি। আনন্দের কথা, গুরুদাসের 'দুই আর দুয়ে চার' নাকি ভাল বিক্রি হচ্ছে। ওদের সঙ্গে কথা হয়ে আছে, 'ভারতবর্ষে' একটি উপন্যাস আরম্ভ করব। ঢাকা থেকে 'সোনার বাংলা' এসেছে। চট্টগ্রাম থেকে 'পাঞ্চজন্য', এটা-ওটার সঙ্গে আবার সেই মালদহের থেকে রমলা দেবীর চিঠি পর-পর চারখানা। ওর সঙ্গে আবার রাঁচীর সেই নীলিমা চট্টোপাধ্যায়। চোখে কখনও দেখিনি রমলাকে। কিন্তু ওঁর প্রত্যেক চিঠির সারমর্ম কি, আমি জানি। উনি আমার কাছে সামান্য ভরসা পেলে কলকাতায় আসতে চান, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চান, স্বাধীন জীবনযাপন করতে চান। এই সব মহিলাদের প্রভাবিত করেছেন তরুণী রাজনীতিক নেত্রীরা! আমি নিজে না দেখেছি রমলা রায়কে, না বা নীলিমা চট্টোপাধ্যায়কে। ওঁদের কি পরিচয়, বয়স কত, গুণপনা কিরূপ, কোন্ কাজের যোগ্য—কোনটাই আমার জানা নেই। এখন পর্যন্ত ওঁদের দুজনের কাছ থেকে অন্তত খান পঞ্চাশেক চিঠি এসেছে বইকি। 'বিজলী'কে আমি ভুলতে বসেছি, 'স্বদেশ' আমার কাছে হারিয়ে গেছে, কিন্তু এরা আমাকে ছাড়ে না কেন? আমার কাছে ওদের চিঠি জমেই যাচ্ছে, চিঠি আর খোলা হয় না! সর্বাপেক্ষা বিপদ, রমলা দেবী আমার সেই কাগজ-থেকে-কাটা ছবিখানা কোথায় পেয়েছিলেন, তাই নিয়ে এখনও চিঠিতে আধিক্যেতা করেন! সেই যে শেক্স্‌পীয়ারের কোন্ নাটকে যে একটি শব্দ আছে 'কট্‌কোয়েন', ঠিক তেমনি। আমি যেন মেয়েছেলের কাজ নিয়েই চিরদিন ব্যস্ত থাকি! আমার যেন অন্য কাজ না থাকে। আমাকে ধিক্, শতোধিক। কিন্তু উপায় নেই, একজন চার-পাঁচখানা চিঠি লিখলে ভদ্রতার খাতিরে অন্তত একখানারও জবাব দিতে হয়!

এর মধ্যে আর এক উৎপাত, মা আবার আমার বিয়ের কথা তুলছিলেন। তিনি দেখছিলেন আমার মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়, তারপর মেয়েছেলেদের এত চিঠিপত্র আনাগোনা—মায়ের ধারণা, আমি বোধ হয় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিলুম। কিন্তু আমার অভ্যাস এই, মায়ের কাছে গোপন করার কিছু নেই আমার। আমার বয়স এখন ছাব্বিশ। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার কোনও প্রকার প্রণয়ঘটিত ব্যাপার নেই। এ জীবনে একখানিও প্রণয়পত্র লিখিনি! কোনও দিন কোনও মেয়ের পেছনে ধাওয়া করিনি। কোনও মেয়ের সঙ্গে সঙ্গোপনে বেড়াতে যাইনি, এবং এমন একটি কথাও কারোকে বলিনি যাতে তাদের মনে কোনও প্রকার ভাবান্তর ঘটে। এখন পর্যন্ত এইটিই চলে আসছে। কিন্তু অন্য দিকে আমি দেখছি, কোন-কোনও মেয়ে আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না! ওদের অনেকে চাইছে আমার ঘুম ভাঙ্গাতে, আমাকে কতকটা অকূলে ঠেলে দিতে, নানা অছিলায় আমাকে বাইরে টেনে নিয়ে যেতে এবং ওদের অনেক ব্যক্তিগত জটিল সমস্যায় আমাকে ডুবিয়ে রাখতে! মাঝে মাঝে আমি অতিশয় যন্ত্রণা বোধ করছিলুম!

যাই হোক, অবিলম্বে একদিন বুলিকে শিখিয়ে-পড়িয়ে মাকে সব কথা বুঝিয়ে নিয়ে চললুম হাজরা রোডে। তখন আমি থাকি আর-জি-কর হাসপাতালের পাশের রাস্তায়। ওখান থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত হাঁটা, তারপর দোতলা বাস, বাসের মাথায় ছাদ নেই। বর্ষাকালে দোতলায় বৃষ্টি হয়, তাই যাত্রীরা নিচের তলায় নেমে আসে। গ্রীষ্মকালে শিখ কন্‌ডাকটররা যাত্রী ডাকে চেঁচিয়ে খোলা দোতলাটা দেখিয়ে—"হাওয়াওয়ালা, হাওয়াওয়ালা!" অর্থাৎ দক্ষিণের ফুরফুরে হাওয়া যদি খেতে চাও, শিগগির উঠে এসো! তখন শ্যামবাজার থেকে কালী-ঘাট ভাড়া হল দু'আনা। বুলিকে নিয়ে যাতায়াত করার অর্থ দু'জনের আট আনা! আট আনায় তখন ভাল ট্যাটলার সিগারেট চার প্যাকেট! বত্রিশটা শক্ত আম-সন্দেশ আট আনায় মেলে। এক সের শ্রেষ্ঠ কাটা রুই মাছ—যেটা বিয়েবাড়ি ছাড়া কখনই খেতে পাইনে—তার দাম আট আনা। আমাদের দৈনিক বাজার-হাট আট আনার বেশি লাগে না।

এর মধ্যে মায়ের নির্দেশে বুলিকে খান দুই ভাল তাঁতের শাড়ি, জামা-সায়া, পাদুকা শিল্পসদন থেকে পছন্দসই একজোড়া চটি—এসব এনে দিয়েছি। ওতেই আমার সর্বনাশ। একটা ছোট গল্পের দরুন পনেরো টাকা আমার বেরিয়ে গেল! বুলি হল গুরু-পুরুতের ঘরের মেয়ে, তায় আবার কড়ে-রাঁড়ি। দু'খানা সরুপাড় মিলের শাড়ি, তার দাম বড় জোর সাত সিকে—তাই নিয়ে ওর খুড়তুতো ভাই

হারুর সঙ্গে মামার বাড়ি এসেছে। হাতে শুধু দু'গাছা কাচের চুড়ি। কিন্তু ওই একখানা নতুন তাঁতের শাড়ি আর একটা সাদামাটা জামা পরে সে যখন হাসিখুশী মুখে আমার আগে আগে চঞ্চল পায়ে বাসে উঠল, এবং ওর জীবনে এই প্রথম ভদ্র ও রুচিশীল সমাজের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবার সুবিধা পেল, তখন ওর আনন্দ আর ধরে না। ওকে নিয়ে যাচ্ছি দুপুরবেলায় যখন পথঘাটে লোক কম, বাসে যাচ্ছে মাত্র দু'চার জন, এবং আমার যখন অবসর। কিন্তু দুনিয়ার লোক যেন চোখ ভরে দেখে নিচ্ছে বুলিকে। বাসে তখনও মেয়েছেলে বড় একটা ওঠে না। যদি বা ওঠে তারা ঘরনী-গৃহিণী জাতীয় মেয়েছেলে। কলেজের ছাত্রী সংখ্যা তখন একেবারেই কম। এ পাড়ার মেয়ে কখনও ও-পাড়ার অচেনায় যায় না। কুমারী মেয়ে কখনও একা বাসে ওঠে না, অথবা কোনও যুবকের সঙ্গে পাশাপাশি বসে কোনও বেহায়া তরুণী বাস-ট্রামে ভ্রমণ করে না। তবে কিনা এটা হল গান্ধীযুগ, এসব বেলেল্লাপনা আজকাল একটু-আধটু পথেঘাটে ঘটছে বইকি!

বুলি তার জীবনে ধর্মতলা চৌরঙ্গী কখনো দেখেনি। দেখল এই প্রথম। হাওড়া স্টেশন দেখেছে, যখন বিয়ের কনে হয়ে কাশী যায় এগারো বছর বয়সে। আবার হাওড়া স্টেশন সে দেখে সাড়ে বারো বছর বয়সে—যখন বিধবা বুলিকে নিয়ে আমি ফিরে আসি। বুলি হয়ত গড়ের মাঠ শুনেছে, কিন্তু সেই প্রান্তরের উদার অবকাশ আর দিগন্তজোড়া মুক্তি বুলি দেখছে এই প্রথম।

ওটা কী ছোটমামা? ওই যে অনেক উঁচু?

ওটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল!

কাছে যেতে দেয় না? একদিন দেখাবে আমাকে?

বললুম, আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। এখন চল ত।

ভবানীপুর ছাড়িয়ে হাজরার মোড়ে এসে নামলুম শীতের রৌদ্রে। বাঁ হাতি চললুম দু'জনে। বুলি এক সময় বলল, ছোটমামা, এটা কি কলকাতার বাইরে? যেমন আমাদের বরানগর?

বললুম, হ্যাঁ, এখন চল—

হনহনিয়ে এসে লাবণ্যপ্রভা দেবীর বাড়ির সরু গলিটিতে ঢুকে স্বস্তিবোধ করলুম। পথেঘাটে মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অভ্যাস তখনও আমার তেমন হয়নি। যাই হোক, বুলি যখন এ বাড়ির দোতলায় আমার সঙ্গে উঠে এল, তখনকার নাটকীয় পরিস্থিতি স্মরণীয়। সহসা বাড়িসুদ্ধ সবাই যেন রুদ্ধবাক ও ম্লান হয়ে গেল। বুলি যে এত সুন্দর, ওঁরা কেউ ভাবেননি। দিদি এবং মা বুলিকে জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন। শোভারানী হাসিমুখে শুধু বললেন,

আপনার ভাগ্নী এত সুশ্রী আগে বলেননি ত? এর বয়স কত?

এই সতেরোয় পড়েছে।

মনে হচ্ছিল চট করে ওঁরা কেউ বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, বুলির বয়স মাত্র সতেরো! অন্যান্য বোনেদের মতো বুলির গায়ের রং ধবধবে শাদা নয়, কিন্তু হিমালয়ের গৌরীগঙ্গা যেন তার দেহবর্ণের উপর এসে ছায়া ফেলেছে। বুলি যদি কখনও আমাদের যোগাসীন শিল্পী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সামনে দাঁড়ায়, তবে তিনি হয়ত বুলির ওই ভাবতন্দ্রিত চক্ষুতারকার ছবি আঁকতে পারেন!

শ্রীমতী শোভা আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন পশ্চিমের ছোট ঘরখানার দিকে। ও-ঘরটা অনেক সময় আমাদের পরামর্শ সভার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ওখানে কতক্ষণ আলোচনার পর স্থির হল, বুলি এখানে দু'-তিন দিন থাক। এখানে সে ভালই থাকবে। মা আছেন, দিদি আছেন—অসুবিধে কিছু নেই। —ফের অমনি করে আমার দিকে তাকাচ্ছেন? চোখ দুটো গেলে দেবো যদি ফাজলামি করেন!—সেই কবিতাটা একটু বলুন ত? কাল থেকেই ভাবছি ওটা শুনব আপনার মুখে—

কোনটা?

সেই যে "যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে—" একটু গলা নামিয়ে বলুন।

হাসিমুখে বললুম, ও-কবিতা শুনতে গেলে আপনাকে এ-ঘরে ঘুমোতে হবে। আমি কানে কানে বলব কবিতা।

আবার ফাজলামি হচ্ছে, কেমন? বলুন শুনি—

এবার আমি নিজেই উঠে দরজাটা ভেজিয়ে দিলুম। উনি শান্ত, অবিচল। ওঁর বাইরেটা হিসেবী, কিছুটা কর্কশ, অনেকটাই বস্তুতান্ত্রিক। কিন্তু ওঁর অন্য চেহারা একটা আছে, যেটা ফল্গুনদী,—যেটা গুপ্তস্রোত। সেখানে তিনি একাকিনী, বিজনবাসিনী। আমি তারই কাছে এগিয়ে গেলুম, এবং কিছু আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলুম, "যে-কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে, সে ক'দিনে সেও কাঁদিল/ যে-বাঁধনে মোরে বাঁধিছে সে বাঁধনে তারে বাঁধিল/ পথে পথে তারে খুঁজিনু, মনে মনে তারে পূজিনু/ সে পূজার মাঝে লুকায়ে আমারেও সে যে সাধিল—"

অন্যদিন আবৃত্তি শোনার পর শ্রীমতী শোভা বাইরে চলে যান, কিন্তু আজ নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। আমার একটু অবাকও লাগল, কৌতূহলও হল। যে-কথাটা অনেক দিন ধরে মনের মধ্যে আনাগোনা করেছে, সেটি আজ মুখ ফুটে হঠাৎ বলেই ফেললুম—ক্ষমা করবেন, আজ একটা কথা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে—

উনি মুখ তুললেন। আমি বললুম, মেয়েদের বিয়ে হয় সাধারণত ষোল

আঠারো বছর বয়সের মধ্যে। আপনি সেদিন বললেন আপনার বয়স চব্বিশ—

আমার বিয়ে হয়নি কে বললে? আপনি কি মাকে কোনদিন জিজ্ঞেস করেছেন? কোনদিন জানতে চেয়েছেন, আমি নিজের কপালের সিঁদুর মুছে কেন একদিন চলে এসেছি?

ওঁর কথার সঙ্গে সঙ্গে সেদিন আমি আমার 'প্রিয় বান্ধবী' উপন্যাসের সম্পূর্ণ নকশাটা তড়িৎ শিখার মতো পলকের মধ্যে আকাশপটে দেখতে পেয়েছিলুম! কিন্তু ওঁর গলায় কাঁপন লেগেছিল। আমি চুপ করে গেলুম।

উনি নিজেই উঠে বাইরে গেলেন, এবং আমি ওঁর পিছনে পিছনে এসে বড় ঘরে ঢুকলুম যেখানে মস্ত আসর বসেছে। আজ ওই আসরের কেন্দ্র হল বুলি।

মা বললেন, এ দুটি মেয়ে এসেছে আপনাকে দেখতে, সেই কখন থেকে বসে আছে। ওরা হেমপ্রভা দেবীর মেয়ে অরুণা আর বরুণা।

হেমপ্রভা মজুমদার হলেন কুমিল্লা কংগ্রেসের প্রসিদ্ধ নেতা বসন্তকুমার মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী। অসহযোগ আন্দোলনকালে পুলিস ইন্সপেক্টর পূর্ণ মুখার্জির লাঠালাঠির মধ্যে পড়ে তিনি আহত হন, এবং সম্ভবত বাঙলায় তিনিই প্রথম পুলিস-লাঞ্ছিতা মহিলা নেত্রী! তাঁর কপালের চওড়া সিঁদুর, চওড়া রাঙ্গাপাড় খদ্দরের শাড়ি, তাঁর স্নেহশীল আচার-ব্যবহার এবং সর্বোপরি তাঁর মাতৃরূপিণী মূর্তি সেদিনের সকল সভা সমিতি, সম্মেলন ও জনসমাবেশকে দেশানুরাগের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করে তুলত। আমি তাঁকে মাসিমা বলতুম, সেই কারণে এই দুটি কিশোরী তরুণী কন্যাকে আমি আমার ভগ্নির মতোই গ্রহণ করলুম এবং বয়সে এরা অনেক ছোট হলেও 'আপনি' বলেই সম্ভাষণ করলুম। তখন বসন্ত মজুমদার মহাশয় একজন সর্বজনমান্য ব্যক্তি।

মেয়ে দুটি দেখতে প্রায় একই রকম, এবং একই পোশাক, যেন একটি জুড়ি। ওর মধ্যে অরুণা হল বড় এবং উভয়ের মধ্যে ছোট মেয়ে বরুণা অধিকতরো স্বাস্থ্যবতী, তার চোখে চাঞ্চল্যের ভাষা আছে। অরুণা শান্ত এবং বিনীত। এরা দু'জনেই প্রায় বুলির সমবয়সী এবং দু'জনেই প্রায় বড় বড় কংগ্রেসী সভা ও সমাবেশে স্বেচ্ছাসেবিকার কাজ করে এসেছে। আগামী ২৬ জানুয়ারী এরা সম্ভবত স্বাধীনতার মহিলা মিছিলে যোগদান করবে। এদের মা-বাবার স্বদেশী শিক্ষা এইভাবেই এদেরকে তৈরি করেছে।

বুলিকে ঘিরে সবাই যেন আনন্দের হাট বসিয়েছে। মা হাসিমুখে বুলিকে ধরে আছেন। স্নেহশীলা দিদি ও তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘিরে রয়েছে সবাইকে। বুলি এবার এসেছে নতুন জগতে, নতুন সমাজে এবং একটা আলোকো-

জ্জ্বল জীবনে। বুলি ওখান থেকেই উদ্দীপ্ত হাসিমুখে বলল, ছোটমামা, আমি থাকব এখানে দু'-তিন দিন, তুমি দিদিমাকে বলে দিয়ো, কেমন?

আমি যেন পরম স্বস্তির সঙ্গে বুলির দিকে তাকিয়ে সম্মতি জানালুম। কিন্তু সেই লগ্নে বুলির ভাগ্যবিধাতা অন্তরীক্ষে হয়ত আরেকবার বক্র হাসি হাসলেন, যেমন তিনি ছয় বছর আগে শ্রাবণ-সংক্রান্তির সেই দুর্যোগের অবিস্মরণীয় মধ্যরাত্রে শ্রীমতী বুলির দিকে চেয়ে হেসেছিলেন!

পিছন থেকে নিঃশব্দে হেরম্ব এসে দাঁড়াল। শ্রীমতী শোভা তার দিকে একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। হেরম্ব কি যেন দু'একটা কথা বলল তামাশার। দিদি এবার উঠলেন সবাইকে ছেড়ে। তারপর সহাস্যে পশ্চিমের ঘরের দিকে গেলেন।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, শ্রীমতী শোভা ঠায় আমাকে নিরীক্ষণ করছিলেন। তিনি জানবার চেষ্টা করে এসেছেন, এ বাড়িতে হেরম্বর আনাগোনা আমি কিরূপ চক্ষে দেখি।

*　　　*　　　*

২৬ জানুয়ারী, ১৯৩২। গত বছরের সেই রক্তাক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা দিবসের তারিখটি আজ আবার ফিরে এসেছে। তা আসুক, বাঙ্গালী এটি একান্ত মনে চায়। এখন উত্তাল হয়ে উঠেছে জাতীয়তাবাদ, সুতরাং আবার সেই অবরোধ ভাঙ্গার কথা উঠেছে। এখন শুধু ভাঙ্গো, ১৪৪ ধারা ভাঙ্গো, পুলিসের কর্ডন ভাঙ্গো—যা কিছু ব্রিটিশ প্রশাসন, সব ভেঙ্গে চূর্ণ করো। সুতরাং আবার সেই লক্ষ লক্ষের অভিযান। দূর-দুরান্তর থেকে মিছিলের পর মিছিল আসছে এসপ্ল্যানেডের দিকে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে সেই নাদধ্বনি, বন্—দে—এ মাতরম!

এই বিপুল জনসমারোহের মধ্যে একজন মাত্র ভীরু ব্যক্তি চৌরঙ্গীর পূর্ব ফুটপাথ ধরে এসপ্লানেডের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, সে আমি! আমি এপার থেকে লক্ষ্য করছিলুম, ট্রাম লাইনের ধার দিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে আসছে প্রায় চারশ' মহিলার মিছিল। তাদের পুরোভাগে ফ্ল্যাগ উঁচিয়ে আসছেন লাবণ্যপ্রভা দত্ত, বিমলপ্রতিভা, কল্যাণী দাস, আরতি মুখার্জি, হোসেন আরা বেগম, বিষ্ণুপ্রিয়া এবং নবসজ্জায় সজ্জিতা বুলি! ওই মস্ত মিছিলের সমস্ত মেয়েরা আজ পুলিসের ব্যূহ ভেদ করবে। ওরা কারাবরণ করতে প্রস্তুত। বুলির দিকে চেয়ে দেখলুম সে গৌরবগর্বিতা।

কিন্তু ওই শত শত মেয়ের মধ্যে মাত্র কয়েকজন ছাড়া আর কে জানে যে, এই মিছিলটির পিছনে এই ভীরু ব্যক্তিটি তার সব পুঁজি খুইয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে?

না, আমার আর কিছু নেই। সব শুষে নিয়েছে ওই ওরা—যাদের নিয়ে আজ ধন্য ধন্য রব উঠেছে! ওদের অনেকে পেট ভরে জল-খাবার খেয়ে এসেছে, সেই আমার আনন্দ! আমি এখান থেকে বাড়ি ফিরব, তার জন্য পকেটে আছে আনা দুই। অদূরে নব-প্রতিষ্ঠিত চৌরঙ্গী গ্রীল, ওখানে বসে যে এক আনায় একখানা চিংড়ির কাটলেট চিবোব, কিংবা দু' পয়সায় এক পেয়ালা চা খেয়ে নেবো—তার সংস্থানও আর নেই। শুধু শুকনো মুখে এক পয়সা দামের 'স্বরাজ' মার্কা একটা সিগারেট টানতে টানতে ফিরব।

শত শত লাল-পাগড়ি লাঠি নিয়ে আগে একটু তাড়া করার চেষ্টা পেল। কিন্তু মেয়েমহলে তালিম দেওয়া ছিল, কিছুতেই যেন ভয় না পায়। যেই লাঠি উঁচিয়ে আসে, অমনি 'বন্—দে—এ মাতরম!' অবশেষে ব্যূহভেদ করল কয়েকজন!

পুলিসের গাড়ি প্রস্তুত ছিল আশেপাশে। চারিদিকের ওই জনারণ্যের ভিতর দিয়ে সবটা ভাল করে দেখতে পেলুম না। বহু মেয়ে গ্রেপ্তার হল। আমি দেখলুম লাবণ্যপ্রভার সঙ্গে বুলিও উঠল পুলিসের গাড়িতে।

বাঁচলুম আমি। ওদের নিয়ে গেল প্রেসিডেন্সি জেলে। পরদিন ওদের বিচার। বিচার না ছাই! এক একজনের ছ'মাস করে কারাদণ্ড হল। মাত্র দিন কয়েক পরে মেয়েদেরকে কলকাতা থেকে হিজলি জেলে নিয়ে গেল। আমি নিশ্চিন্ত, বুলি একটা নতুন জীবনের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

কুসংস্কার, কুশিক্ষা, মূঢ়তা, অজ্ঞান—সব ছাড়িয়ে অন্ধ রক্ষণশীলতা—এদের হাত থেকে বুলি অন্তত কিছু দিনের জন্য বাঁচুক।

শ্রীমতী রমলা দেবী গত দুবছরে অর্থাৎ সেই বিজলীর আমল থেকে, অন্তত একশ' চিঠি আমাকে লিখেছেন এবং আমিও কমপক্ষে কুড়ি-পঁচিশখানা লিখেছি। তাঁর চিঠি সর্বদাই খামে, আমার চিঠি সকল সময়েই পোষ্টকার্ডে। তাঁর প্রতি-চিঠিতে একই সম্ভাষণ 'প্রীতিস্পদেষু', কিন্তু আমার চিঠিতে তিন প্রকার সম্ভাষণ, সবিনয় নিবেদন, সুচরিতাষু ও করকমলেষু। এই তিনটির মধ্যে 'সবিনয় নিবেদন' দেখলেই উনি ক্ষুব্ধ হন এবং আমি তাঁর প্রতি সম্পূর্ণই বিরূপ কিনা, এটি তিনি জানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন। তখন আমি চিঠি লেখা বন্ধ করি। আমার সময় কম।

এ মহিলাকে আজও আমি চোখে দেখিনি।

সম্প্রতি দিন দুই আগে আবার তাঁর চিঠি এল মালদহ থেকে। তাঁর বাবা বিশিষ্ট এক সরকারী কর্মচারী, তিনি বুঝি বদলি হয়ে যাচ্ছেন বগুড়ায়। কিন্তু সে-খবরে আমার কী প্রয়োজন থাকতে পারে? শ্রীমতী রমলা ওরই মধ্যে লিখেছেন, তিনি কলকাতায় আসছেন এবং ভবানীপুরে বকুলবাগানের কোথায় যেন শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ-র ওখানে উঠছেন। তিনি শ্রীমতী চন্দর ঠিকানা দিয়ে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেছেন আমি যেন একটু খোঁজ-খবর রাখি। শ্রীমতী চন্দ ছিলেন তৎকালে জনৈকা গান্ধীবাদিনী সমাজসেবিকা এবং বোধ হয় 'অভয় আশ্রম'-এর মহিলা কর্মী।

কিন্তু তখন 'প্রিয় বান্ধবী' উপন্যাসটির রচনা নিয়ে আমার যে প্রাণ যায়! গত বছর এই বইয়ের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ ছাপা হয়েছিল 'স্বদেশ'-এ—তখন এর নাম ছিল 'আঁকাবাঁকা'। কিন্তু আঁকাবাঁকা নামটা এখন হাতে থাক, ওটার জন্য পরে নতুন ছক কাটব। এখন 'প্রিয় বান্ধবী' লেখা চলুক।

শ্রীমতী দুর্গারানী-বৌদির শোচনীয় মৃত্যু আমার পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক ছিল। ওটা আমি ভুলতে পারছিলুম না। বোধ হয় এই বেদনাবোধের থেকেই আমার নতুন প্রেরণা এসেছে উপন্যাসটি একমনে লিখে যাবার। প্রকৃতপক্ষে বেদনাবোধের থেকেই তো কাব্য বা সাহিত্যের সৃষ্টি। অনুপ্রাণিত আবেগ বোধ করি তার প্রাণরস।

জানিনে কেন এই সময় আমার মধ্যে ঘোরতর অসন্তোষ এবং ব্যর্থতাজনিত একপ্রকার ভয়াবহ নৈরাশ্যবোধ কাজ করছিল। যাঁর কাছাকাছি থাকলে আমি সর্বাপেক্ষা উল্লসিত বোধ করি, সেই শুচিমধুরচরিত্রা শ্রীমতী শোভার ওখানে

যেতেও যেন আর মন ওঠে না। সেই আমার 'ভাষাহীন দিন কুয়াশায় লীন মলিন ঊষার স্বর্গ/কল্পনা যত বাদুড়ের মতো রাতে ওড়ে কালো বর্ণ— ।" নৈরাশ্যবোধ আমাকে যেন পঙ্গু করছিল।

আমার সামনে এই সুদীর্ঘ রাত্রির অন্ধকারে যে সকল কালোবর্ণ বাদুড় আমার এই ছোট্ট ঘরটির মধ্যে উড়ে বেড়ায় তারা আমার অলীক কল্পনা, না বাস্তব সত্য? ওই বাদুড় দলের মধ্যে শত শত ভগ্নপ্রাণ বুভুক্ষিত, হতাশাগ্রস্ত, উৎপীড়িত ও ব্যর্থ জীবন কী নেই? ওদেরই মধ্যে কি নেই সেই প্রেতায়িতা, সাধ্বী, শুচিশুদ্ধা ও নিত্য হাস্যমুখী দুর্গারানী?

লিখে যাচ্ছিলুম 'প্রিয় বান্ধবী'। দারিদ্র্যে উপবাসে জর্জর হয়েও সর্বপ্রকার শারীরিক অযত্নের ভিতর দিয়ে যখন লিখে যাচ্ছিলুম, তখন আমার কল্পভাবনার চারিপাশে এসে দাঁড়াত সেই ছায়াচারীরা। যারা সর্বাধুনিক কালের বুভুক্ষু পুরুষ, নৈরাশ্যবাদে ও দারিদ্র্যে যারা জর্জর, যাদের চোখের সামনে ভবিষ্যৎ নেই, আলো নেই, আশা নেই, আশ্বাস নেই—যারা তাদের রক্তচক্ষে ডাক দিচ্ছে বিপ্লবকে আর জীবনবিধাতাকে। তারা যেন আমার আশেপাশে পদচারণা করত। তাদের সকল স্বপ্ন চূর্ণ হচ্ছে,..সকল রঙ্গিন কল্পনা ধূলিসাৎ হচ্ছে। তারা মার খাচ্ছে বিনা অপরাধে, পিপাসায় তাদের কণ্ঠতালু শুকিয়ে যাচ্ছে। কোথায় অলক্ষ্যে ঘোরতর একটা অবিচার এবং পরোক্ষ উৎপীড়ন তাদের যৌবনশক্তিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে! তাদের পাশে পাশে রয়েছে সেই মেয়েরা—যারা সমাজনীতির শাসনে, নিরক্ষরতায়, অজ্ঞানে, অন্ধ সংস্কারে উৎপীড়িতা। যাদের দুরাশার ডাক কেউ শোনে না, যারা কেবলমাত্র শাসন শৃঙ্খলে বন্দী, যাদের চারিদিকে রক্ষণশীল রক্তচক্ষুর পাহারা, যারা এ জীবনে বৃহত্তর জীবনের কোনও আস্বাদ পায়নি—তারা যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল এই ঘন গভীর রাত্রে আমার চোখের সামনে। 'প্রিয় বান্ধবী' উপন্যাসটি লিখে যাচ্ছিলুম।

সেই নিশুতি অন্ধকারে কেরোসিনের আলোটা রেখে মেঝের উপর শুয়ে বুকে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে আমি বলছিলুম, ওরে, তোদের সঙ্গে আমিও যে কাঁদছি। আমি কাঁদছি তিন হাজার বছর ধরে—যতদিন এই মানব-সভ্যতা! নির্যাতিত উৎপীড়িত মানব বংশপরম্পরার জন্য কল্পে কল্পে যুগে যুগে আমিও ত তোদের মত চোখের জল ফেলতে ফেলতেই এতদূরে এসেছি। আমিও তোদের মত চেয়েছি দেশজোড়া রক্তবিপ্লব। পুরাতনের বিরুদ্ধে তোদের প্রচণ্ড বিদ্রোহ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোদের মরণপণ সংগ্রাম—আমি আছি তোদেরই সঙ্গে। শুধু কাঁদিসনে, বরং জেগে ওঠ। শুধু জেগে নয়, উঠে দাঁড়া। শুধু দাঁড়িয়ে

থাকিসনে, আগে আপন আপন পায়ের শৃঙ্খল কেটে দে—।

শ্রীমতী শোভার জীবন থেকে যেমন 'প্রিয় বান্ধবী'র একটি ইশারা লাভ করেছিলুম, তেমনি আজ ও-বইটি লেখবার কালে আমার চোখের সামনে ভাসছিল, দুরারোগ্য যক্ষ্মায় অন্তিমশয্যাশায়িনী কঙ্কালিকা শ্রীমতী দুর্গারানী—যাঁর পিতাকে একদা আমি বাধ্য হয়ে ঈষৎ প্রতারণা করেছিলুম! কিন্তু দুর্গারানীর কাহিনী একটু অন্যরকম। সামাজিক উৎপীড়ন, অন্যায়ের আস্ফালন, নিষ্ঠুর অবহেলা, শালীনতাবোধের প্রতি অনাচার—এগুলি তাঁর বিক্ষুব্ধ বিবাহোত্তর কালে মর্মে মর্মে আঘাত করেছে! আজ এই অন্ধকার রাত্রে যদি সেই প্রেতিনী সামনে এসে আবির্ভূতা হত, তাহলে চেঁচিয়ে বলতুম, ওরে, তোর এলোচুল ফিরিয়ে বাঁধ, রক্ত-লোভাতুরা সিংহিনীর মতো মাথা তুলে গর্জিয়ে ওঠ, সমস্ত সমাজের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে ডাক দে। বল, স্বীকার করিনে এই অসম্মান, এই অনাচার, নিরুপায় দুর্বল নারীর বিরুদ্ধে বলদর্পীদের এই ষড়যন্ত্র!

'প্রিয়-বান্ধবী'ত আমি মহাকালীর উদ্যত খড়্গকে তুলে নেবার জন্য ডাক দিতে চেষ্টা পাচ্ছিলুম। আমার বিদীর্ণ কণ্ঠে যেন রক্তের ধারা ছুটছে। উপন্যাসটির মধ্যে আমি যখন এই মেজাজটি সঞ্চার করবার চেষ্টা পাচ্ছিলুম, তখন একদিন রাত্রে লক্ষ্য করে দেখি আলোটায় আর তেল নেই! ওটা কেরোসিনের অভাবে আস্তে আস্তে নিবে যাচ্ছে।

এদিক ওদিক খুঁজে কেরোসিনের খালি বোতলটা হাতে নিয়ে গায়ে কোনও মতে জামাটা চড়িয়ে পায়ে চটি দিয়ে নীচে নেমে এলুম। বাইরের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বড়দা সাড়া দিলেন—কে রে?

আমি, বড়দা।

ঘর থেকে বড়দা বেরিয়ে এলেন—কোথা যাচ্ছ এত রাত্রে? প্রায় একটা বাজে!

এই যে, এই যাব আর আসব! তুমি ঘুমিয়ে পড় বড়দা, তুমি এত রাত জেগে নাই বা মহাভারত পড়লে? আমি কেরোসিন আনতে যাচ্ছি—

আমি বেরিয়ে গেলুম সরু গলিপথ দিয়ে। বিপত্নীক বড়দা মুখের একটা শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করলেন। তখন শীতের রাত।

পা-দুটো যেন ঠিকে পড়ছে না। কিন্তু আমি সঠিকভাবে ত অসুস্থ নই! আমি জীবনদর্শী, আমি কবি,—নিরঙ্কুশা কবয়ঃ! 'আমি কবি যুগে যুগে আসি তব তপোবনে। দুর্জয়ের জয়মালা পূর্ণ ক'রে মোর ডালা। ব্যথার প্রলাপে তার গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী—"

থমথম করছে রাত। চারিদিক নিশুতি। কেউ কোথাও জেগে নেই। হাসপাতালের গা বেয়ে জনশূন্য পথ ধ'রে এগোচ্ছিলুম। কিন্তু বিড়বিড় করে বকছিলুম নিজের মনে—"তাঁর লটপট করে বাঘছাল তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে/ তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল যত ভুজঙ্গদল তরজে/তাঁর ববম্ ববম্ বাজে গাল দোলে গলায় কপালাভরণ/তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান, ওগো মরণ, হে মোর মরণ।"

আরে, কি ভাগ্যি আমাদের! বড়বাবু যে,—আসুন, আসুন বড়বাবু। আহা, কদ্দিন পরে দেখা! না, না, কিচ্ছু রাত হয়নি, বড়বাবু। সকাল হতে এখনও চার ঘণ্টা—

আমাকে এক বোতল কেরোসিন দাও মতি, বড্ড দরকার—

এক বোতল?—মতি পাল আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, আপনার হুকুম পেলে অমন বিশ বোতল বার করে দেবো, বড়বাবু। আসুন, আসুন, ভেতরে একবারটি পায়ের ধুলো দিন।

টলতে টলতে মতি পাল বলল, ওর মালিনী, ওরে পোড়ারমুখী বিজনবালা,—কে এসে দাঁড়িয়েছে ত্যাখ···ছদ্মবেশী নারায়ণ! নে নে, পায়ের ধুলো নে! আজ তোদের ভাগ্যি দেখে আমারই হিংসে হচ্ছে!

এটা লোহালক্কড় আর কাঠের কারখানা। ভিতরে সব রকমের তেলের পিপেবোঝাই। এরই মধ্যে কয়লার ডিপো, কেরোসিন বিক্রি—এইটি আমার জানা। আমি অনেক সময় সমস্ত রাত জেগে কাজ করি। সুতরাং রাত দশটা আর রাত দুটো—আমার কাছে একই কথা। কিন্তু গভীর রাত্রে যে এই আড়তের চেহারা বদলায়, মালিক মতি পাল যে টলে, মালিনী আর বিজনবালারা যে এখানে 'ছদ্মবেশী নারায়ণদের' জন্য উৎসুকভাবে অপেক্ষা করে, এতটা ঠিক জানতুম না। সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয়, আমার কেরোসিন নিতে আসাটাকে মতি পাল ছলনা মনে করেছিল।

ওধার থেকে একটা মেয়েছেলে বলল, গোসাঁই বুঝি খোঁজখবর নিয়েই এসেছ?

আমি হাসছিলুম। কিন্তু কথাটা মতি পালের কানে গিয়েছিল। এইটুকুর মধ্যেই সে ঢুলছিল। এবার সে হঠাৎ ঝাঁজিয়ে বলল, এক বড় আস্পদ্দা তোর? বড়বাবুর মুখের উপর কথা বলছিস? তুই কেন বেরিয়ে এসেছিস ঘর থেকে? তোদের ঘরে না পান-বসন্ত ঢুকেছে? যা দূর হ—

মেয়েটা বলল, তা ত যাবই! কিন্তু তুমিই বা কেমন মোড়ল, দুদিন পেটে আমার অন্ন যায়নি —তার খোঁজ রেখেছ? টাকাটা সিকেটা রোজগার না হলে

কাল থেকে খাবো কি ? ছেলেটা ওদিকে মরে কি বাঁচে !

দেখলেন ত বড়বাবু, দেখে নিন—মন্তি পাল আবার গর্জিয়ে উঠল, তুই যে মরদ ধরতে পারিসনে, সে কি আমার দোষ যে, হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গতে এলি ? বুঝলেন বড়বাবু, ছোট জাতকে কখনো মাথায় তুলতে নেই।

মেয়েছেলেটা অন্ধকারে ভিতর দিকে দাঁড়িয়ে তখনও গরগর করছিল।

ওদের বচসা মিটমাট করার জন্যই আমি দু'পা এগিয়ে এসে বললুম, তোমার নাম কি ? চলো দেখি তোমার ঘরে—

মেয়েছেলেটা বলল, আমার নাম সুশীলা। তোমাকে দেখেছি রাস্তাঘাটে, ঠাকুরমশাই। তুমি ত থাকো হাসপাতালের ওই অমন বাগে—

ঝোপড়া ঘরের দরজার কাছাকাছি এসে সুশীলা বলল, ওই ত্যাখো ঠাকুর-মশাই···ছ' বছরের ছেলেটা সাদা কাগজের মতন বিছানায় মিশে রয়েছে।—তার চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

কী হয়েছে ওর ?

এই তিন মাস হল রক্ত-আমাশা চলছে ! ছেলে বোধ হয় আর উঠবে না।

প্রশ্ন করলুম, ওর বাপ কোথায় ?

বাপ ?—বাপ গেছে যমের বাড়ি। ঠিক যেন কেঁদে উঠল সুশীলা,—কিন্তু কে সে বাপ কেমন করে জানব ঠাকুরমশাই ? পাঁচজনের সেবা করেছি, হিসেব কি তার আছে কিছু ?

আমি চুপ করে গেলুম। ঘরের ভিতরে দেখলুম আরেকটা মেয়েছেলে সর্বাঙ্গে মুড়ি দিয়ে পড়ে রয়েছে। সুশীলার মতো ওরও সর্বাঙ্গে গুটি দেখা দিয়েছে। এবার একটু চাপা গলায় সুশীলা বলল, আমার গায়ে যদি 'মার অনুগ্র' না ফুটত, তা হলে মোড়লের কি আর পরোয়া করতুম ?

এদিকটা এই লোহালক্কড় আর কাঠ-গোলার ময়লা জল নিষ্কাশনের নর্দমার ধার। কিন্তু আমি উন্নাসিক নই যে, চারদিকের এই অধঃপতিতা স্ত্রীলোকদেরকে বলে যাব, ওরা নৈশ জীবনের নারকীয় পিশাচী, অথবা বলে যাব এটা হ'ল বীভৎস জীবন ! এই দুর্গত অভিশাপগ্রস্ত জীবনটাই ত তৎকালের কলকাতায় সর্বত্র ছড়ানো ! সুতরাং আমি জানি, কেরোসিন তেলের বোতলটা হাতে নিয়ে আমি অন্ধকারে ঠিক কোন্ স্থলটিতে দাঁড়িয়েছিলুম।

এবার বললুম, শোন সুশীলা, আমি এক বোতল তেল আনতে বেরিয়েছিলুম ছ'টা পয়সা নিয়ে। তুমি যদি কারোকে সঙ্গে দিতে পারো তবে তোমার ছেলেটার জন্যে কিছু সাহায্য দিতে পারি !

পুরুষ মানুষকে ওরা চিরকাল অবিশ্বাস করে এবং নিরাসক্ত পুরুষকে দেখলে ওরা যেন কতকটা ভয় পায়। সুশীলা বলল, সত্যি বলছ গোসাঁই, ঠিক দেবে তুমি?

সঙ্গে একজনকে দাও, আমি এগোই।—এই বলে অগ্রসর হয়ে মৌড়লের কাছে এসে বোতলে তেল ভরে নিলুম এবং ছ'টি পয়সা সামনে রেখে বাইরে বেরিয়ে এলুম। গভীর রাত সাঁ সাঁ করছিল।

বাড়ির কাছাকাছি এসে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলুম, তোর নামই বুঝি মালিনী? সুশীলা তোকে বিশ্বাস ক'রে পাঠালো, তুই যদি তাকে ঠকাস?

কাঁচপোকার টিপ-পরা মেয়েটা বলল, এ আবার কী কথা গো? সুশীলা আমার নিজের দিদি—

আচ্ছা, একটু দাঁড়া এখানে—

আমি ভিতরে গিয়ে কড়া নাড়লুম। বড়দা তাঁর মহাভারত নিয়ে তখনও জেগে। তিনি এসে দরজা খুলতেই আমি বললুম, বড়দা বাড়ি ভাড়ার টাকা থেকে আমাকে দশটা টাকা দাও ত?—এই বলে বোতলটা এক স্থলে রাখলুম।

দাঁড়াও, ব্যস্ত হয়ো না, এনে দিচ্ছি। হুঁঃ...যত সব...!

আমার সম্বন্ধে বড়দার চিরকাল একটা অদ্ভুত ধারণা। আমি অতিশয় বিপজ্জনক ব্যক্তি, সাংঘাতিক বেপরোয়া, কিন্তু আমার স্বভাব-চরিত্র নাকি চাঁদে কলঙ্ক, এবং আমি নাকি তাঁর দেবতুল্য সহোদর!

টাকাটা নিয়ে মালিনী গড় হয়ে প্রণাম করল। আমি বললুম, তুই যদি পারিস ছেলেটাকে নিয়ে কাল সকাল ন'টায় হাসপাতালে আসিস। আমার সঙ্গে ওদের একটু চেনা আছে, আমি বলে দেবো।

মালিনী চলে গেল। আমি স্নানে নামলুম। 'প্রিয় বান্ধবী'র ভূত ততক্ষণে আমার মাথায় উঠেছে।

কিন্তু ওখানেই ও-ব্যাপারটার শেষ। ছেলেটাকে নিয়ে ওরা হাসপাতালেও আসেনি, এবং মালিনী-সুশীলাকেও আর কোনদিন দেখিনি।

১৯৩২-এর বসন্ত কাল। ডালহাউসী বোমার মামলার আসামী দীনেশ মজুমদার ও চট্টগ্রামের কল্পনা দত্ত পালিয়ে বেড়াচ্ছে। শ্রীমতী কল্যাণীর ছোট বোন বীণা সেনেট হাউসে গভর্নর জ্যাকসনকে মারতে গিয়ে হাত ফসকেছে। হাসান সুরাবর্দি ওকে ধ'রে ফেলেন। ঢাকার কর্তা লোম্যানকে হত্যা ক'রে বিনয় বোস এখন পলাতক।

রাত দশটার পর প্রায়ই আমার বাড়িতে আসে শিবু আর অনাথ। অনাথ হল

ডাঃ অমর মুখুজ্যের ছোট ভাই। হাজরা রোডেই ওদের বাড়ি। ডাঃ অমর মুখুজ্যে সৌখিন লোক, পরে উনি ডেপুটি মেয়র হন। ওরা চুপি চুপি এসে দশ, পনেরো, বা আরো বেশি টাকা আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়। আমি তখন সবেমাত্র কাত্যায়নী বুক স্টলের গিরীন সোমের কাছে দাদন নিচ্ছি মাঝে মাঝে। আমার তখন ঈষৎ খ্যাতিও হয়েছে। ডি-এম, কাত্যায়নী, গুরুদাস, বরেন, নাথ ব্রাদার্স,—এরা আমার প্রকাশক হচ্ছিল একে একে। সম্প্রতি এম-সি সরকার একখানা উপন্যাস নিয়েছেন।

কল্যাণী দাসরা জানতেন পলাতক দীনেশ আর কল্পনা কোথায় থাকে। একজন টালিগঞ্জের এক বস্তিতে, অন্যজন সম্ভবত শ্রীরামপুরের এক গৃহস্থ ঘরে। দীনেশ অসুস্থ এবং যক্ষ্মারোগাক্রান্ত—এই কারণে একটি বাড়ির অংশ বিশেষ ভাড়া নেওয়া হয় এবং শ্রীমতী কল্যাণী দীনেশকে দেখাশোনা করার জন্য তথাকথিত ভগ্নী সুবাদে সুতপা নামক একটি মেয়েকে টালিগঞ্জের বাড়িতে মোতায়েন করেন। আমার ওই সামান্য চাঁদা চলে যেত লেক অঞ্চলের নলিনীপ্রভাদের পুরনো বাড়িতে। সেখান থেকে টালিগঞ্জ বা শ্রীরামপুরে সেই চাঁদা গিয়ে পৌঁছত কিনা খবর পাইনি কোনদিন।

ভাগ্যের বিদ্রূপ ছিল দীনেশ মজুমদারের ওপর। একদা যে যক্ষ্মা ছিল তার অজুহাত মাত্র, সেই যক্ষ্মা রোগই তাকে ধরেছিল এবং পাছে পুলিসের চোখে পড়ে সেজন্য তার চিকিৎসাও তেমন করা হয়নি। ধরা পড়ার কালে সে চার্লস টেগার্টের পুলিসের সঙ্গে পিস্তল নিয়ে ঘরের ভিতর থেকে যখন লড়াই করছিল, তখন সে খুবই রোগাক্রান্ত, তার উপরে গায়ে বেশ জ্বর। একদা শেষ রাত্রে যখন তার ফাঁসী হয় তখন সবেমাত্র সে-রাত্রির মতো তার জ্বর ছেড়েছিল।

কিন্তু এসব অন্য ইতিহাস।

এই সময়ে একদিন অজাতশত্রু পবিত্র গাঙ্গুলী আমাদের কয়েকজন লেখককে ধরে নিয়ে গেল শ্রীরামপুরে। এখানে আমার দুঃখ-দুর্যোগের বহু কাহিনী জমা আছে। পবিত্র নিয়ে গেল ঠাকুরদাসবাবু লেনে শ্রীমতী লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে। লীলা ছিলেন লেখিকা, 'স্বদেশ'-এ ওঁর একাধিক লেখা আমি ছেপেছি। উনি বিধবা, এবং ওঁর দুটি নাবালক পুত্র রয়েছে। ওদের নাম চনু আর মনু। চনু বড়, বয়স বছর বারো-তেরো, কিন্তু এখনই সে বেশ সাহিত্যোৎসাহী। লীলা-রানীর এখানে প্রায়ই আসেন শরৎচন্দ্র। ছেলেরা তাঁকে বলে বড় মামা। আমরা সবাই সেদিন লীলারানীর আতিথেয়তায় ও চনু-মনুর উদ্দীপনায় খুবই আনন্দ পেয়েছিলুম। শ্রীমতী লীলা আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, কিন্তু আসবার সময়

আমাকে তিনি ধরলেন, আমি যেন এখন থেকে তাঁকে 'তুমি' সম্ভাষণ করি এবং তিনিও আমাকে 'তুমি' বলে চিঠিপত্রাদি লিখবেন। মেয়েমহলে আমি চিরকালই লাজুক ও মুখচোরা, সুতরাং তাঁর কথায় রাজি হয়ে গেলুম। সেই বছর থেকেই আমি চনু ও মনুর দ্বিতীয় মামা হয়ে রইলুম! আমার কাশী যাতায়াতের পথে দেরাদুন একসপ্রেস ট্রেনে শেষ রাত্রে নামতুম শ্রীরামপুরে, একটা দিন কাটাতুম লীলারানীর ওখানে, সাবলীল একটা আন্তরিক আতিথেয়তার আস্বাদ পেতুম, এবং ছেলেদের নিয়ে কাটাতুম সারাদিন। যেন অনেকটা ওদের সুখ-দুঃখে আমি জড়িয়ে গিয়েছিলুম। আমার একসেট ধুতি ও পানজাবি লীলা দেবী রেখে দিতেন। মনে আছে ওঁদের বাড়িতেই প্রথম এক প্রিয়দর্শন ও মিষ্টভাষী কিশোর কবিকে দেখি, তার নাম হরপ্রসাদ মিত্র। পরবর্তীকালে হরপ্রসাদ একজন বিশিষ্ট কবি, অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ্ হয়ে ওঠে।

আমি দুর্বলচিত্ত, কিন্তু অতিশয় অধ্যবসায়ী। আমি ভীরুপ্রকৃতি, কিন্তু আমার কায়িক শক্তি ও স্বাস্থ্য প্রবল। অতিশয় সৌজন্য ও শালীনতা আমার,—কিন্তু রাগলে চণ্ডাল। আমার বাবার ডাকনাম ছিল 'বাঙ্গাল', আমিও সেই বাঙ্গালের ভগ্নাংশ! বাঙ্গালী মেয়েদের মতো সরষে বাটা ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে গোয়ালন্দর তাজা ইলিশের ঝাল,—আমারও প্রিয়। বস্তুত, লঙ্কা ও সরষে বাঙ্গালীর চরিত্র নির্মাণে কাজ করেছে অনেক! একটায় ঝাল, অন্যটায় ঝাঁঝ। যাই হোক, এইসব এলোমেলো কথা যখন ভাবছি, তখন এক-দিন হঠাৎ সন্ধ্যার সময়ে 'চিত্রমন্দির'-এ গিয়ে রতি পালিতের কাছে শুনলুম, আমার অতি প্রিয় বন্ধু অনিল ভট্টাচার্য আজ দুপুর থেকে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছে।

অনিল অনেকদিন থেকে যোগাসন করছিল একান্তে। সে যখন নিরাসক্ত মনে আমার পকেট থেকে পয়সা তুলে নিয়ে খরচ করত এবং আমার অভিযোগের উত্তরে নিবিড় মধুর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতো, তার সেই চাহনির মধ্যে আমি দেখতুম, কত ক্ষুদ্র ও কত ক্লিন্ন আমি! ওর বিষয়াসক্তি ছিল না, সিঙ্ক হোম থেকে রোজগারপাতি বন্ধ করেছে, তরুণী স্ত্রী ও নবজাত কন্যার বিষয়ে তিলমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই,—কেবল আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করে এবং সকলকে ছেড়ে এই চিত্রমন্দিরে রাত কাটায়। আজ সকাল থেকে অন্তত বারো-চৌদ্দ ছিলিম ছোট কলকের তামাক সে টেনেছে। এতক্ষণে তা'র বুঁদ হয়ে থাকার কথা! কিন্তু যদি পথঘাটে কোথাও দৈবাৎ গাড়ি চাপা পড়ে? আমি যখন তাকে ছেড়ে গেছি বেলা তিনটে নাগাত, সে তখন বেহুঁশ হয়ে ছিল! সুতরাং আমি তার সন্ধানে সিঙ্ক হোমের দিকে ছুটলুম।

অতঃপর রাত্রের দিকে ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস থেকে খবর পেলুম, অনিলের পকেটে ছিল মাত্র এক আনা পয়সা। তার ওপর সে পণ্ডিচেরী যাবার ট্রেন ভাড়া যোগাড় ক'রে আজ বিকালের মাদ্রাজ মেলেই নিঃসম্বল অবস্থায় কলকাতা ত্যাগ করে গেছে! সেদিন তা'র বিরহে আমার চারিদিক শুধু খাঁ খাঁ করেনি, সে যেন আমার জন্য রেখে গেল এক অপরিসীম শূন্যতা ও তার সঙ্গে একটা বিষাদের ছায়া! ফিরবার পথে বিড়বিড় ক'রে বলছিলুম, "গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়/ হে বন্ধু বিদায়।" আমি ক্ষুদ্রচিত্ত, তাই সেদিন আমার চোখে জল এসেছিল। অতঃপর অল্প কয়েক বছরের মধ্যে খবর পেয়েছিলুম, পণ্ডিচেরীতেই এই মহৎপ্রাণ বন্ধুর অকালমৃত্যু ঘটেছে।

কিন্তু আর না, এবার আমিও ছুটি চাইব কিছুকালের জন্য। আমার সব চেয়ে বড় স্বস্তি, বুলি মাস ছয়েকের্র জন্য কারাগারে গেছে! বছর পাঁচেকের জন্য যদি তার জেল হতো আমি আরও খুশী হতুম। আমি তা'র হাত থেকে আপাততঃ মুক্তি চাইছি। তার মা-বাপ, ভাই-বোন, দুই মামা, লাবণ্যপ্রভা, শোভা, প্রিয়া এবং আরও অনেকে রইল, তারাই যা হয় করবে। বুলি এখন আর একা নয়। এবার সে লেখাপড়া শিখুক, রামায়ণ মহাভারত পড়ুক, ধর্ম-কর্মে মন দিক।

রাত্রে ফিরে ঘরে ঢুকেছি, আবার সেই বন্ধ-খামে রমলা দেবীর চিঠি। লিখেছেন বকুলবাগান থেকে। "প্রীতিস্পদেষু, আমি খদ্দর প্রচারের নানা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হয়ে কাজে নেমেছি। শ্রীমতী চন্দ আমাকে খুবই সাহায্য করছেন। কিন্তু আপনি আমার সামনে এসে দাঁড়ান, আপনাকে দেখলে আমি সাহস ও শক্তি পাবো। আপনি আমার জীবনকে অনুপ্রাণিত করুন।"

এসব কী রে বাবা! এই ধরনের চিঠির নামই ত প্রেমপত্র! প্রীতিস্পদেষু লিখেছে নিতান্ত অচেনার খাতিরে, 'প্রেমাস্পদেষু' বসাতে পারেনি বলে বোধ হয় দুঃখিত! কিন্তু আমি অত বোকা কেন? আমি কেন বুঝতে পারছিনে যে, একটি মহিলা আজ প্রায় দু'বছর ধ'রে আমার দিকে এগিয়ে আসছে? আমি নিজে অদ্যাবধি এ ধরনের চিঠি কোথাও কোনও মেয়েকে লিখিনি। ও-ব্যাপারে আমি একেবারেই অপারগ। হৃদয়োচ্ছ্বাস আমার নেই। আমি গরীব, আমার চালচুলো নেই, উপার্জন নিয়মিত নয়, বন্ধন আমি ভালবাসিনে। ওইসব সেণ্টি-মেণ্টাল চিঠিপত্রের আদানপ্রদান আমার দু'চোখের বিষ। শেষকালে কিসের থেকে কী হবে কে জানে। স্ত্রীলোকের ব্যাপারটা বড়ই জটিল।

পরদিন সকালে উঠে চিঠির জবাব দিলুম, সবিনয় নিবেদন, আপনার চিঠির

জন্য ধন্যবাদ। আমি নিজে বহু প্রকার কাজে লিপ্ত। সম্প্রতি বাইরে চলে যাচ্ছি। আপনার কর্মজীবনের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। ইতি—

যাক, এখন আমার মন পরিষ্কার, আমি পরম নিশ্চিন্ত, আমার ঝাড়া হাত-পা, এবং আমি এখন বিশুদ্ধচিত্ত। এতকাল পর্যন্ত আমি কোনও নীতিবিগর্হিত কাজ করিনি, কারও মুখের গ্রাস কেড়ে নিইনি, কারোকে কোনও ব্যাপারে ঠকাইনি, ক্ষতি করিনি কারও—বরং সাধ্যমতো আমি একে-ওকে অল্পবিস্তর সাহায্যই করেছি। এখন আমি নিষ্পাপ, নিরঙ্কুশ, আমি অমৃতের পুত্র! আমি নিজকে বার বার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বিশুদ্ধ করেছি, এবং বার বার ফিরে এসেছি নবজীবনে। প্রত্যেক দিন প্রত্যুষে যখন রক্তিম সূর্যোদয় দেখার জন্য ছাদে উঠি, রজনীশেষের তারারা যখন একে একে বিদায় নেয়, যখন শুক্‌তারাটি সূর্য-সম্ভাষণের জন্য জলজ্বলে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমি ওই আকাশপথে দেখি, আমারই যেন এক নবজন্ম ঘটছে! সন্দেহ নেই, মাঝে মাঝে আমার শিকল-ছেঁড়া বাঁধনহারা প্রবৃত্তি উন্মত্ত অশ্বের মতো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে, খুঁজে বেড়াচ্ছে আপন পরিতৃপ্তি! কিন্তু সে ত আমার "লোয়ার ভাইটালস", সে ত জৈবিক, সে ত সৃষ্টিলোকের পরমাশ্চর্য শক্তির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। তাকে বাদ দিয়ে আমি কোথায়? কে আমি? কতটুকু আমি? কোন্ শক্তি নিয়ন্ত্রিত করছে আমাকে?

মা এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে।—হ্যাঁ রে, তুই যেন কোথায় যাবার যোগাড় করছিস? জামা কাপড় গোছাচ্ছিস, ঝোলা একটা কিনেছিস দেখছি,—কোথা যাচ্ছিস?

আমি খুব হাসলুম। বললুম, কোথা যাব মা তোমাকে ছেড়ে? যেখানেই যাই, তুমি থাকবে সঙ্গে সঙ্গে।

মা বললেন, কিন্তু আমার এখানে যে সেই ভদ্রলোক দু'জন দু'একদিনের মধ্যেই আসছেন, তাঁরা কথাবার্তা বলতে চান—

মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি পুনরায় বললেন, সেই যে ভবানী-পুরের লাহিড়িরা—ওই যে সেই জজের মেয়ে—

আবার আমি হাসলুম।—মা, সেই নির্বোধ জজের মেয়ে এলে এ বাড়িতে কি ধরবে?

তবে কি বিয়ে তুই করবিনে, মুখপোড়া?

হাসি মুখে বললুম, যে কাজ সবচেয়ে সহজ, সে কাজ থাক না কেন স্থগিত? আমাকে ভয় পাও কেন মা? আমাকে বিশ্বাস করলে তুমি ঠকবে না!

—এখন যাচ্ছিস কোথায় ?—মা প্রশ্ন করলেন।

—শোনো মা—আবার আমি বললুম, আমার চারদিকে জঞ্জাল জমেছে, অনর্থক নানা কারণে হয়রান হচ্ছি—এবার কিছুকাল ঘুরে আসি। আজ আমি কাশী যাচ্ছি, তারপর যাবো হরিদ্বার। তুমি কিচ্ছু ভেবো না, যেখানেই যাই তোমাকে চিঠি দেবো।

মা নিজেই আমার এটা ওটা গুছিয়ে দিতে লাগলেন। লালিমলির একটা ফুলহাতা সোয়েটার কিনেছিলুম আড়াই টাকায়। ফিতাসুদ্ধ ঝোলাটা এক টাকা। একখানা ভাল গামছা ছয় আনা। এক জোড়া কেডস চৌদ্দ আনা। সঙ্গে অতিরিক্ত এক সেট পুরনো ধুতি, পানজাবি আর ফতুয়া। মায়ের হাতে সর্বপ্রকার খরচপত্র দিয়ে আমার মোট হাতে রইল পঁয়ষট্টি টাকা।

বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ শেষ হচ্ছিল। রৌদ্রে দগ্ধ হচ্ছিল বাঙ্গলা, বিহার আর যুক্তপ্রদেশ। তখন যুক্তপ্রদেশের নাম ছিল আগ্রা ও অযোধ্যাকে জড়িয়ে। পরদিন আমি কাশীতে গিয়ে নামলুম।

আসবার আগে লাবণ্যপ্রভা দেবীর ওখানে গিয়েও আমি শ্রীমতী শোভার সঙ্গে দেখা করে আসিনি। শোভা এখন অনেকটা একা, নিঃসঙ্গ। তাঁর সহকারিণীরা প্রায় সবাই জেলে গিয়েছে।

'পুণ্যাশ্রম'-এর প্রতি আমার বিরক্তি এসে গেছে। 'আনন্দমঠ'-এর উন্নতির কথা আর ভাবতে ভাল লাগছে না। এ যেন আমার চারিদিকে শুধু 'পেটিকোটে'র ভিড়। মেয়েলী পোশাক, মেয়েলী প্রলাপ, মেয়েলী রাজনীতি, মেয়েলী ব্যবস্থাপনা, ভিড়ের মধ্যে মেয়েলী প্রসাধনের গন্ধ,—এবং আমি নিজে মেয়েলী অনুরোধের আজ্ঞাবাহী ক্রীতদাস—এর থেকে আমার নিষ্কৃতি পাবার দরকার ছিল!

কাশীতে ভূতেশ্বরের গলিতে কয়েকটা সিঁড়ি উঠে একটা মঠের একটি ঘরে আমি আশ্রয় নিয়েছিলুম, দু'একজন হিন্দুস্থানী সাধু-সন্ত, জন দুই পাণ্ডা,—এরা ছিল মঠে। এবার আমি আত্মীয় পরিজনদের মুখ বিশেষ দেখব না, সেজন্য আমাদের কাশীর বন্ধু অধ্যাপক অপূর্বচন্দ্র ভট্টাচার্য আমার জন্য এ ঘরটি ঠিক ক'রে দিয়েছিল। সামনেই কালীতলা আর দশাশ্বমেধ, সুতরাং অসুবিধা কিছু নেই। বাজারে দু'আনার ভাত বা রুটি প্রাণধারণের জন্য। আমি আত্মনিগ্রহের মধ্যে যাবার চেষ্টা পাচ্ছিলুম! একবেলা আহারই যথেষ্ট, কেন না আমার পুঁজিও কম। দুধ, দই, মালাই, রাবড়ি, খোয়া সন্দেশ—এসব থই থই করছে আমার দু'হাতের মধ্যে, কিন্তু এবার আমার জিভে আর জল আসছে না। দু'পয়সার গিরিমাটি এবং সাবান কিনে আমার ধুতি-পাঞ্জাবি ছুবিয়ে নিয়ে গেরুয়ার রং

ধরালুম। ওই দেখে ও-ঘরের জনৈক জটাধর বাবাজি বলল, কাপড়ে কা রং আওর দিলকা আনন্দ্ সাথি-সাথ মিলনা চাহি। জয় শম্ভো! রোটি খা চুকা ক্যা?

বাবাজিকে বুঝিয়ে বললুম, আমি একটু অবেলায় খাই, যাতে রাত্তিরে ভুখ না লাগে!

বাবাজি একটা দুর্বোধ্য উপনিষদের শ্লোক আউড়িয়ে চলে গেল।

রাত্রে এখানে কোনও আলোর ব্যবস্থা নেই, এটি আমার পক্ষে আনন্দদায়ক। রুদ্র বৈশাখের কালে ঠাণ্ডা ঘরের মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে রাত কাটানো আমার বেশ ভাল কাটে। অতি প্রত্যুষে চলে যাই দশাশ্বমেধ ঘাটে। প্রথম প্রভাত সূর্যকে দেখা আমার দরকার। প্রায় গলা-জলে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখলে ওর রশ্মির থেকে রেডিয়ম্ নির্গত হয়ে আমার দুই চোখের ভিতর দিয়ে শরীর-মধ্যে সঞ্চালিত হয়। এটা প্রথম শিখেছিলুম বিপ্লব-নেতা যোগজীবন ঘোষের কাছে। আমি সর্বপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন এবং আত্মনিগ্রহে রত ছিলুম। অন্ধকার রাত্রে একাকী মেঝের উপর গড়িয়ে আমার মনে কোনও প্রকার কুচিন্তা না আসে, সেজন্য আমি সতর্ক থাকতুম। আমি একবেলা বিনা লবণে আধপেটা হবিষ্যির পাক খাচ্ছিলুম এক-একদিন। নিজকে শাস্তি দিচ্ছিলুম পদে পদে। পাশের দুটো ঘরের পাণ্ডা আর বাবাজিরা আমার প্রতি অপরিসীম স্নেহবশত আমাকে অহোরাত্র ধূমপান করিয়ে বুঁদ করে রাখার চেষ্টা পেত এবং ওর ফলে নাকি আমার চৈতন্যবিন্দু ঊর্ধ্বপথে উঠে গিয়ে পরম চৈতন্যের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে ফিরে আসত!

আমি ব্রহ্মচর্যাশ্রমী, অক্ষত কৌমার্যের প্রতীক, আমি অপাপবিদ্ধ ঊর্ধ্বরেতঃ—এগুলি আমার উপলব্ধির মধ্যে নিত্য বিরাজমান! আমি প্রতিপদে শুচি, প্রতি কর্মে অনাসক্ত, প্রতি ধর্মে নিরাসক্ত, আমি বেদব্রহ্মের মধ্যে তদ্গত, এবং আমি দেবলীন। আমি অনায়াসে চেঁচিয়ে বলব, কোনও পাপ, দুর্নীতি, সামাজিক অন্যায়, স্খলন আর পতন,—কিছুর মধ্যেই আমার মনঃসংযোগ ছিল না। কোনটা আমাকে স্পর্শমাত্র করেনি, কোনটায় আমি বশীভূত হইনি। দিকচিহ্নহীন অন্ধকার সমুদ্রে একদা আমার জাহাজ ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে আছাড়ি পিছাড়ি করেছিল, মেরিনার্স কম্পাসের কাঁটা কতবার ছট্‌ফট করে ঘুরেছিল,—কিন্তু ওই কাঁটা সকল দুর্যোগের প্রান্তে এসে দেখিয়েছিল ধ্রুবতারা ঠিক কোন্‌দিকে! আমার পথও ওই ধ্রুবতারকার পথ। আমি অকিঞ্চন, কিন্তু আমি জীবন-বিপ্লবী। আমার সমস্ত চিন্তা চলিত ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা! আমি সর্বপ্রকার সামাজিক শাসনের বিরোধী, জন্মের থেকে 'নিহিলিস্ট',

জীবনধর্মে আমি 'পেগান'। পাছে পিতার শাসন আমার জীবনে কোনও কাজ করে, সেজন্য তাঁকে মরতে হয়েছে আমার শৈশবে! শুধু আমার বিশ্বজননী বিশ্বেশ্বরীর সকরুণ আশীর্বাদ আমার সকল কর্মে চলে আসছে আমার পিছু পিছু—যতদূর আমি যাই!

বাড়িতে আমি চিঠি লিখেছিলুম: মা, তুমি কাশীর মেয়ে, কাশীতেই তোমার জন্ম। তাই এই কাশীতে দাঁড়িয়েই তোমাকে ব'লে যাই, আমি যাচ্ছি এবার তীর্থপথে। যাচ্ছি আমি দুঃসাধ্য জীবনে। যেখানে যত দুর্গম আছে, আছে যত অগম্য,—বিজনতায় ভীষণতায় যেখানে অভিযাত্রীরা নিত্য প্রাণভয়ে ভীত, আমি সেই পথ ধ'রে যাচ্ছি। তোমার নিজের আশীর্বাদকে তুমি বিশ্বাস করো। যতদিন তুমি জীবিত, ততদিন কোনও বিপদ আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করবে না, কোথাও কোনও একটি কাঁটাও আমার পায়ে ফুটবে না।

কাশীতে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে আমার আত্মীয়, স্বজন, কুটুম্ব, ভাই-বোন-ভগ্নিপতি ও বন্ধুবান্ধব। এ ছাড়া রয়েছেন দাদামশায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এমন কি সর্ববরেণ্য সুধাংশু মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত। কিন্তু আমার এই নিভৃত কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন ছিল। আমি চাইছি নিঃসঙ্গবাস, আমি চাইছি নিজকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করে দেখা। শ্রেষ্ঠ দর্শন হল আত্মদর্শন। আমার পক্ষে একা থাকার দরকার।

দশ দিন পরে আমি উঠে দাঁড়ালুম। তারকেশ্বরে হত্যা দিয়ে লোকে যেমন দৈব ঔষধ হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে যায় আমিও তেমনি দশ দিনের দিন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে নিজের মনে বললুম, হ্যাঁ এব্যর আমি তৈরি। আজই যাব। এখনই যাব।

দেরাদুন এক্সপ্রেসে আমার ওই ঝোলাটা নিয়ে যখন তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় চড়ে বসলুম তখন আমার হাতে আছে বাহান্ন টাকা! তখন মধ্যাহ্নকাল! নিজকে দেখে আমার অবাক লাগছে। সহস্র বন্ধনে যেন বাঁধা ছিলুম কলকাতায়। কিন্তু সেই সব চিন্তার বন্ধন যেন গত দশ দিনে একে একে খসে মিলিয়ে গেছে। এখন যেন আর কারোকে মনের·মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিনে। আমি লেখক, এ আমি ভুলে গেছি। ছাইভস্ম কি লিখেছি এতদিন কিছু মনে নেই। আর ওই ত সব ইনিয়ে-বিনিয়ে লেখা। মিথ্যা গল্প, মিথ্যা উপন্যাস, অলস ও অসম্পূর্ণ যত আজ-গুবি কল্পনা—তাদের নাম কবিতা! মিথ্যা দিয়ে মনোহরণ করলে নির্বোধ পাঠকরা তাই পয়সা দিয়ে কেনে। ওরই মধ্যে আবার ভাবাবেগের মোচড় দু'-চারটে দিতে পারলে মেয়েদের এলোচুলের তলায় মাথার বালিশ চোখের জলে ভিজে যায়।

শেষ রাত্রে লাকসার ছেড়ে প্রত্যূষে পৌঁছলুম হরিদ্বারে। এ আমার চেনা জগৎ। আমি পটলডাঙ্গার গলিঘুঁজি সব চিনিনে কিন্তু হরিদ্বারের সব চিনি। আমি যাব টিহরি গাড়োয়ালের পথে। আমি উঠলুম ভোলাগিরির ধর্মশালায়। দুর্গম পথে পা বাড়াবার আগে ওখান থেকেই এক আবেগরসাত্মক চিঠি দিলুম বেহালায় বন্ধুবর ভবানী মুখুজ্যেকে।

তখনও হরিদ্বার জনবিরল, তখনও সন্ধ্যায় এক আধটা তেলের আলো জ্বলে। আশেপাশে বনময় অঞ্চল। ওপারে ঘন বাবলার বন, তার ওপারে মূলগঙ্গার ধারা। চণ্ডীর তলায় তলায় দেরাদুন জেলার অন্তহীন তরাই অরণ্য। ওখান থেকে বেরোয় হাতী, ভালুক আর নরখাদক বাঘ। অপরাহ্নের পর ও-অঞ্চল জনশূন্য হয়ে যায়।

আমি নিজের হাতেই গেরুয়া ধারণ করলুম। আমি পাগড়িপরা সন্ন্যাসী। অন্য কে দেবে আমাকে সন্ন্যাস? কে আমার গুরু? আমার গুরু ত আমিই—আমার মধ্যেই ত আমার পরম গুরু বাস করছে! আমার নাসিকা দিয়েই ত সেই গুরু শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে, আমার দুই চোখের জানালা দিয়ে সে দেখছে, আমার কান দিয়ে সে শুনছে, আমার মন দিয়ে সে ভাবছে! সেই আমার গুরু, সেই আমার দীক্ষাদাতা। সেই আমাকে বলছে চরৈবেতি, চরৈবেতি!

সুতরাং বাইরের কোনও গুরু আমার দরকার নেই। আমার দরকার গৈরিক বসন। আমি ভুল করে আমার মন যদি রাঙ্গিয়ে না থাকি, বসনই না হয় রাঙ্গিয়ে নিলুম—ক্ষতি কি? থাক না গেরুয়ার সঙ্গে পৈতের গোছা। যদি একগাছা রুদ্রাক্ষের মালা এই সঙ্গে গলায় ঝুলিয়ে নিই, কে নিষেধ করছে? লোহা বাঁধানো লাঠি একগাছা হাতে মানাবে বই কি। এবার একখানা কম্বল আর লোটা সংগ্রহ করো বাজার থেকে। তারপর হৃষিকেশ পর্যন্ত চাকার গাড়ি! তারপর থেকে গতিরস্তম্। "হে ভবেশ হে শঙ্কর, সবারে দিয়েছ ঘর, আমারে দিয়েছ শুধু পথ—।"

গহন গভীর হিমালয়ের মধ্যে দিনে দিনে পায়ে হেঁটে যেন নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছিলুম। মানব সভ্যতা এখানে আজও পৌঁছয়নি। আধুনিক যুগ এখনও বহুদূর পিছনে। আমাকে যেন চারিদিকের জনশূন্য স্তব্ধতা ঘিরে দাঁড়াল। দেখতে পাচ্ছিলুম হাজার হাজার বছরের প্রাচীন অতীত কী যেন বলতে চায় আমার কানে-কানে। এটা ব্রহ্মপুরার তপোলোক। আমি যেন প্রথম পদার্পণ করেছি এক নগণ্য মানবক,—দিশাহারা পরিচয়হারা। আমার পায়ের শব্দে ওদের না ঘুম ভাঙ্গে,—যারা অশরীরীর মতো স্থির হয়ে রয়েছে আমার চারিপাশে।

নয়ার নদী আপন মনে এসে মিলেছে বিরহী নদীর সঙ্গে। ব্যাসগুহার ধারে এসে ঝোলা নামিয়ে আসন নিলুম। নদীর ধার থেকে অনামা রঙ্গীন পাখীরা উড়ে গেল চিড়বনের দিকে। আমি একা নই, তুমি আছ আমার সঙ্গে! তুমি ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ করছো নিজকে আমার মধ্যে! ঘন বনপথে, উত্তুঙ্গ চূড়ায়, উদয়স্বর্ণাভায়, উপলাহত স্রোতস্বতীতে,—তোমাকেই দেখছি, আর তুমিই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে তোমার অজানায়, তোমারই অনামায়!

এখানে সভ্যতা নেই। সে আছে অনেক নিচে নরলোকে। এখানে শত শত বর্গমাইলের মধ্যে সামান্য এক টুকরো কাগজ নেই, আজও এখানে আগুন জ্বালায় চকমকি পাথরে। পথ বলতে কিছু নেই, আছে পাথুরে চাটান্—বৃষ্টি-বর্ষণের আঘাতে যে নালিপথগুলো নিজেই তৈরি হয়। চারিদিকে আদিম আরণ্য-ভূমি। আমি এগিয়ে চলেছি নদীর পর নদী, পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে। একা দুর্বলচিত্ত, আমি ভয়ে-ভাবনায় কম্পিত। কিন্তু তুমি আছ, তাই আছি আমি সত্য হয়ে। তুমি আমার গুরু, তুমিই আমার পথ। তপোলোক ছাড়িয়ে তুমি আমাকে নিয়ে যাচ্ছ দেবলোকে, ভয় কি আমার? তুমি কথা বলছ আমার সঙ্গে তাই আমি নিঃসঙ্গ নই!

উখীমঠ পার হয়ে যাচ্ছি দূর-দূরান্তরে গভীর থেকে আরও যেন গহনলোকে। তুমি খুলে দেবে স্বর্গদ্বার আমার জন্য। আমি দেখব আকাশগঙ্গা আর পাতাল-গঙ্গা, আমি গিয়ে দাঁড়াব চীরবাসা ভৈরবে। অন্ধকারে অচেনায় অজানায় দুর্গমে অসাধ্যে,—তোমার মতন আমিও একা!

রুদ্রপ্রয়াগে তুমিই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলে। সেই নারায়ণগিরি স্বামির আশ্রমে গঞ্জিকার ধূমের মধ্যে দেখলুম সোনি আর রুপ্পিকে। ওদের সর্বাঙ্গে লজ্জাবাস

কয়। কিন্তু ওই দুই সংসারহারা যুবতী সেদিন জানিয়ে দিল, দেহ নয়, দেহাতীত! ভুরার সঙ্গে চরস—নারায়ণগিরি মায়ির প্রসাদ। সেই ধোঁয়ার মধ্যে আমার নিবিড়রসের চক্ষু তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখে নিল পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর গর্জমান বন্যশোভা। আমার বুকের ভিতর থেকে ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল এক রাজহংস শ্বেতপক্ষ মেলে। নারায়ণগিরি মায়ি বলে দিলেন, কৈলাস যাওগে বেটা? সিধা রাস্তা! বেটা, ডরো মৎ। তুম চলোগে তব কৈ না কৈ তুমারা হাত পকড় লেগা!

দেবলোক ছেড়ে পেরিয়ে যাচ্ছিলুম ব্রহ্মলোকে। তুষার সমাকীর্ণ চারিধার। নিচে-নিচে তার সেই আদিম অরণ্য। সেদিন অন্ধকারে আমি একা। মেঘমলিন আকাশে ঘোলাটে জ্যোৎস্না। পথের সেই রেখা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। চন্দ্রা আর মন্দাকিনীর সঙ্গমের তীরে এসে আর কোনদিকে আশা-আশ্বাস খুঁজে পাচ্ছিলুম না—"এসেছে নিবিড় নিশি, পথরেখা গেছে মিশি/সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে/হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইনু শরণ, লইনু শরণ।"

আমি কি কখনও বিশ্বাস করেছি অলৌকিক বা অবাস্তবকে? কখনও কি নির্ভর করেছি অদৃশ্য শক্তির উপর যার নাম দৈব? হোক না কেন আমার সন্ন্যাসসজ্জা! আমি ত বসন রাঙিয়েছি, মনে কি কখনও রং ধরেছে? কখনও কি বুকফাটা আর্তনাদ করে চেঁচিয়েছি, 'অপারে মহাদুস্তরে অত্যন্তঘোরে বিপদ-সাগরে মজ্জতাম দেহভজাম/ত্বমেকা গতির্দেবী নিস্তারনৌকা, নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে—'?

পিছন থেকে সহসা পার্বতী উমা ডাকলেন, কৌন্ হ্যায়?

চমকিয়ে তাকালুম পিছনে। অলৌকিক, কিন্তু অতি বাস্তব। তরুণী এক ভৈরবী। মঙ্গোলীয় ধাঁচের মুখ চোখ। মাথায় ময়ূরকেতন। কণ্ঠে, হস্তে রুদ্রাক্ষের মালা। কমণ্ডলু এক হাতে, অন্য হাতে শিঙা। নগ্নপদ। স্বপ্নিল দুই চক্ষু। বয়স আর কত? বছর আঠারো কুড়ি?

কী বলব আমি? কলকাতার কোনও নাটমঞ্চ হলে বলতুম, গ্রীনরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে এক মেয়ে ভৈরবীর সজ্জায়! কিন্তু এ যে জনহীন অন্ধকার পর্বতপ্রান্ত। চারদিকে নিশ্চুপ বনস্থলী। সামনে ও পাশে চন্দ্রা আর মন্দাকিনীর সংযোগস্থল,—আমার দিশা কোনও দিকে নেই। অগস্ত্যমুনিকুণ্ড ফেলে এসেছি তিন মাইল পিছনে। শুনেছি এই নদীপথে কোথায় যেন আছে চন্দ্রাপুরী চটি।

—ক্যা দেখতা, সাধুজী?

অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে কণ্ঠে স্ফুরিত হল, রাস্তা ছুট গৈ।

—ছা পরদেশী ! আও মেরে সাথ—

সেদিন ওই মেয়ের পিছনে পিছনে পায়ে হেঁটে গিরিনদী চন্দ্রা পার হয়েছিলুম। তারপর সে গেল ডানদিকে, আমাকে দেখিয়ে গেল বাঁদিক। না, তাকে থামতে বলিনি, অনুরোধ কিছু করিনি। সে ওই গিরিনদীর ধার দিয়ে ধূমেল জ্যোৎস্নার রহস্য কুয়াশায় এক সময় আমার চোখের স্থির দৃষ্টি থেকে মিলিয়ে গেল। কিন্তু পলকের জন্যও আমার আধুনিক মন একথা ভাবেনি, আমার জীবনে এক আশ্চর্য অলৌকিককে সুস্পষ্ট ও সুপ্রত্যক্ষভাবে দেখে গেলুম ! এই কাহিনীটি শুনে পরবর্তীকালে আমার মা কেবলমাত্র আমারই হাতের রান্না খেতেন।

ত্রিযুগীনারায়ণ, গৌরীকুণ্ড, রামওয়াড়া, তারপর তুষার রাজ্য কেদার। তারপর উখীমঠ, পোথিবাসা, চোপতা, তুঙ্গনাথ। অতঃপর সুদূর লালসাঙ্গা বা চামোলি।

কোথাও চাকার গাড়ি নেই। চাকা কোথাও ঘোরে না, চলে না। কালের চাকাও স্তব্ধ, মহাকাল অনিমেষ চেয়ে রয়েছে। জনচিহ্ন যা চোখে পড়ে, তারা পাহাড় আর পাথরের গায়ে-গায়ে পোকার মতো লেগে থাকে। ছিন্নভিন্ন তালিমারা কম্বলের জামা, মাথায় চাঁদি টুপি, সম্পূর্ণ দুখানা পা ও পাছা উলঙ্গ। তারা ভেড়া ছাগল চরায়, বর্ষায় ভুট্টা বানায়। মেয়েরা জ্বালানি সংগ্রহ করে। ঘরে জন্তুর চর্বির আলো জ্বলে। না, সমতল ভারতের সঙ্গে কোনও যোগ তাদের নেই।

দুর্দশার দহনে আমি দগ্ধ, কৃচ্ছ্রসাধনে শীর্ণ ও অর্ধাশনে ক্লান্ত আমি। নিজকে পঙ্গু করার প্রয়োজন ছিল এবং শরীর ও স্বাস্থ্যকে ভেঙ্গে দেবার জন্য প্রতিশ্রুত ছিলুম। আমার চেহারার আকর্ষণই আমার শত্রু ! আমি সন্ন্যাসের দীক্ষা নিয়েছি নিজেরই কারণে। আমার প্রার্থনা আমি যেন পুণ্যকর্মের সঙ্গে তথাকথিত পাপকর্মেও লিপ্ত হতে পারি ! আমি চিরকাল সামাজিক দুঃসাহসে যেন বাধা না পাই। কিন্তু তুমি বসে থাকো আমার বুকের মধ্যে, ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে নামবো সকল কাজে, সকল চিন্তায়, সকল সাধনায়। আমার অসংযমে, দৈন্যে, কুরূপে, পঙ্কমধ্যে, লোভে ও লালসায়—তুমি থাকবে আমার সহচর। সেই আমার একান্ত আনন্দ। আমার ভয়ে, লজ্জায়, যন্ত্রণায়, অপকর্মে, সকল অপরাধে, সমস্ত ঘৃণ্য জীবনে—তুমি থাকবে আমার আনন্দের সঙ্গী ! আমি যদি প্রেত-পিশাচের ভূমিকা নিয়ে সব লণ্ডভণ্ড করি, তুমি ভিতর থেকে আমাকে উদ্দীপ্ত ক'রো।

বদরিনাথ মন্দির ছাড়িয়ে অদূরে একটি দোকানে আমার মায়ের জন্য এক শিশি শিলাজতু ও পূজার জন্য একটি ছোট্ট চামর কিনছিলুম, কিন্তু সেই সূত্রে সংঘর্ষ হল যার সঙ্গে তার কথাবার্তায় মনে হয়েছিল, এক হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক। পরবর্তী ত্রিরাত্রি বসবাসকালে জানলুম, সে কাশীবাসিনী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কন্যা। তার সেই ধূলিধূসর যত্নবর্জিত চেহারা যেন ছাইচাপা ছিল সেদিন। সন্ধ্যার দিকে দেবারতির কালে দূরের থেকে তার পরিচ্ছন্ন চেহারা দেখে জেনেছিলুম, বিধবা হলেও বয়স কম। আমি ভুরা তামাকে বুঁদ হয়ে অন্যত্র গিয়েছিলুম।

ছোট্ট বাজার তখন বদরিনাথের। যেটুকু জনতা সেটুকু তৃতীয় শ্রেণীর তীর্থযাত্রীতে ভরা। এই দুঃসাধ্য পথে ভদ্রসমাজের দু-চারজন তখন ফোড়নের মতো ছিটকিয়ে আসে মাত্র। পরদিন ওই মহিলা এক ফাঁকে আমাকে একা পেয়ে এক প্রকার জিদ ধরে জানিয়ে গেলেন, আপনার কৈলাস যাওয়া কিছুতেই হবে না। আপনাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। এই আমি বলে রাখলুম।

আমি নারায়ণগিরি মায়ির মন্ত্র জপ করছিলুম। তিনি পথের নির্দেশ দিয়েছেন, —কর্ণপ্রয়াগ থেকে গোয়ালদম, তারপর গরুড় হয়ে বাগেশ্বর,—তারপর সোজা কাপকোটের দিকে। অতঃপর পথ অবারিত। 'বেটা, জায়দি সে জায়দা হো তব পান্‌শ' মিল! ভিখ্ মাঙ্গো, বহুৎ মিলেগি।—বেটা, অপনা পেটকো ভাঁওনা দুনিয়ামে কাঁই নেই। চকাচক চলোগে।'

এক নারী পথ দেখালো অন্য নারী পথ ভোলালো! কর্ণপ্রয়াগে এসে ব্রাহ্মণ-কন্যা তাঁর মস্ত দলবলকে এড়িয়ে সঙ্গোপনে আমাকে ডেকে বললেন, কাশীর পথ সব চেয়ে সোজা পথ। তোমাকে আমি একা ছেড়ে যেতে দেবো না। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবো।

কে তুমি? কী পরিচয় তোমার? কেউ আমরা কারোকে চিনিনে। তোমার-আমার এক পথ নয়! কথাবার্তা না বলে' আমি সেখান থেকে সরে' গেলুম।

নাটকটা ছিল পরে। সিরোলি চটিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বৃক্ষচ্ছায়ার নিচে তিন চারটে চালা। ওখানেই তাঁর প্রথম পরিচয় পেয়ে চমকিয়ে উঠেছিলুম। ওঁর পিতা ছিলেন পুলিস ইন্সপেক্টর যাঁকে চাঁদপুরে গুলী করে মারে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, এবং যার ফাঁসীর পূর্বরাত্রের কথা 'স্বদেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখার ফলে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওঁরা জনাইয়ের মুখুজ্জে।

আমি স্তব্ধ, আড়ষ্ট। এ যেন নিয়তির বিদ্রূপ। এ অভাবনীয়।

পাইন বনের ভিতর দিয়ে ঘোড়া যেত আমাদের। আমরা পাশাপাশি। অন্তহীনকাল ওই উত্তুঙ্গ চূড়াপথে অরণ্যে-অরণ্যে রক্তিম দিনান্তে আমাদের

পটভূমি রচনা করেছিল। উনি ওঁর প্রথম পোশাকী নাম বললেন, সাবিত্রী এবং ওঁর ডাক নাম টুনু। হাসিমুখে পুনরায় তিনি বললেন আমার সত্যবানটি মাস ছয়েকের বেশী বাঁচেনি! বিয়ে হয়েছিল পনেরো বছরে। এই আট বছরের কথা বলছি।

পরদিন সাবিত্রী প্রথম কবিতা বললেন রবীন্দ্রনাথের, 'রাজপথ দিয়ে আসিয়ো না তুমি, পথ ভরিয়াছে আলোকে, প্রখর আলোকে/ সবার অজানা, হে মোর বিদেশী তোমারে না যেন দেখে প্রতিবেশী/ হে মোর স্বপনবিহারী/ তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে/ চিনিব সজল আঁখির পলকে/ চিনিব বিরলে নেহারি পরম পুলকে/ এসো প্রদোষের ছায়াতল দিয়ে, এসো না পথের আলোকে প্রখর আলোকে।'

সেই প্রদোষের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে ওঁর দুই কালো চোখের ভিতরে আমি পরম অমৃতের আস্বাদ পেয়েছিলুম। আমি ওঁকে ঘোড়ার পিঠ থেকে দুই হাতে ধরে নামিয়েছিলুম। সাবিত্রী আমার কানে-কানে বললেন, আমার নাম তুমি দিয়ো 'রাণী'।

আমার কৃচ্ছ্রসাধন শেষ হয়ে গেল! বিগত প্রায় দু'মাস কালের যে কঠোর চিত্তসংযম সেটা যেন হারিয়ে যেতে বসল। সাবিত্রী তাঁর নিজের হাতে আমার ময়লা গেরুয়া-সজ্জা রামগঙ্গার ঘাটে সাবান দিয়ে কেচে তার রং হালকা গোলাপের রঙে রূপান্তরিত করলেন। মেহলচৌরিতে এসে সুগন্ধী সাবান আমাকে দিলেন স্নানের জন্য! এক ফাঁকে আমার জটাজটিল মাথা আঁচড়িয়ে দিলেন। সন্ধ্যায় দেখলুম শান্ত, আত্মসমাহিত সাবিত্রী রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে জপে বসেছেন। যেন তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয়েছে চারিদিকের আরণ্য প্রকৃতি। আমার মুগ্ধ দুই চোখ শ্রদ্ধানিবিড় হয়ে ছিল।

আমরা যেন অনাদি-অনন্তকালের সেই দু'জন—যেন বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার পাঁজরের থেকে বেরিয়ে আমরা জন্ম-জন্মান্তরের পথ ধরে চলছিলুম। যে ভাষায় মাঝে মাঝে আমরা কথা বলছিলুম, সে ভাষা লৌকিক নয়, সেই ভাষা তার স্বগোত্র খুঁজে পেয়েছিল তুষারে, পাথরে, অরণ্যে, গিরিখাদে, নির্ঝরিণীতে—সে যেন এক দৈব ভাষা, তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ঐশী অনুরাগ।

পাহাড়ী ঠাণ্ডায় আমার পরিচ্ছদসজ্জা ছিল কম। একদা মধ্যরাত্রে সাবিত্রী নিঃশব্দে এগিয়ে এসেছিলেন একখানি কম্বল হাতে নিয়ে আমার উপর চাপা দেবার জন্য। কিন্তু পাছে কেউ জেগে ওঠে তাই লোকনিন্দার ভয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন। পরদিন প্রত্যুষে আমার হাতে দিলেন মহাকবির একটি কবিতা —"মোর মরণে তোমার হবে জয়, মোর জীবনে তোমার পরিচয়/ মোর দুঃখ যে

রাঙা শতদল আজ ঘিরিল তোমার পদতল/ মোর আনন্দ সে যে মণিহার, মুকুটে তোমার বাঁধা রয়/ মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়, মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়/ মোর ধৈর্য তোমার রাজপথ, সে যে লঙ্ঘিবে বন পর্বত/ মোর বীর্য তোমার জয়রথ, তোমার পতাকা শিরে বয়।"

কয়েকদিন পরে বিদায় নেবার প্রাক্কালে তাঁর মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর জীবন সত্যই কি ব্যর্থ? জপতপ অনুষ্ঠান সাধনার বাইরে আর কি কোনও সার্থকতার পথ ছিল না?

তাঁর কণ্ঠে চিরবিচ্ছেদের ধ্বনি অনুরণিত হচ্ছিল। বোধ হয় আমার দুই চোখও শুষ্ক ছিল না। বললুম, তোমার সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল ছিল সাবিত্রী। আমরা দু'জনেই হয়ত দগ্ধ হবো চিরদিন।

কিন্তু সাবিত্রী নিজের মনেই প্রশ্ন করছিলেন, তুমি কি বিশ্বাস করো ইহকাল আর পরকাল? বিশ্বাস করো কি পুনর্জন্ম, আর প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী?

অকপটেই বলব, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের উভয়ের ভাবাবেগ সকল বাঁধন ভেঙ্গে দিয়েছিল। বিদায়ের পূর্বরাত্রে বেরিলী থেকে লখনৌর দিকে দ্রুতগতিতে গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল। শেষ রাত, সবাই অঘোরে নিদ্রিত। উনি বসেছিলেন আমার দিকে চেয়ে। দৃষ্টি তাঁর একাগ্র, নিমেষ-নিহত। ওঁর দুই চোখে জলের ধারা নামছিল। সহসা চোখের ইঙ্গিতে উনি আমাকে কাছে ডাকলেন। গাড়ির মধ্যে আলো জ্বলছে। সবাই ঘুমে অচেতন।

আমি এদিক থেকে উঠে গিয়ে নিঃশব্দে চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে ওঁর দিকে মুখ বাড়ালুম। তখন গাড়ির জানলায় গরাদ থাকত না। উনিও জানলার বাইরে মুখ বাড়ালেন। আমি আমার রুদ্রাক্ষের মালাটা ওঁর গলায় পরিয়ে দিলুম। উনি দু' হাত দিয়ে আমার মাথাটা টেনে নিলেন। ক্ষণকাল পরে সেই দ্রুতগতি ট্রেনের বাইরে ওই নিশুতি রাত্রির পিছনে দাঁড়িয়ে যিনি জীবনদেবতা, তিনি দেখলেন আমাদের দু'খানা তরুণ মুখমণ্ডল একাকার হয়ে গেছে পরস্পরের পীড়নে, এবং অবিশ্রান্ত চোখের জলে সেই দু'খানা মুখ ক্ষণে ক্ষণে পিচ্ছিল হচ্ছিল!

আমাদের এই বেদনা সমগ্র হিমালয়কে সেই রাত্রে বিচ্ছেদবিধুর ও শোক-চ্ছায়াময় করে তুলেছিল।

বলাবাহুল্য, সেই কালে শ্রীমতী সাবিত্রী যেন নিয়তির নির্দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন আমার সামনে। তিনি আমার ঝুটো-বৈরাগ্য, মিথ্যা সন্ন্যাস ও লোক-দেখানো গেরুয়া হরণ করেছিলেন তাঁর যাদুস্পর্শে।

আমি অনেকদিন পর্যন্ত সহজ ও সামাজিক জীবনে ফিরে আসতে কিছু কষ্ট বোধ করেছিলুম।

*  *  *

লেখক সমাজের সারথি শ্রীমান ভবানীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় তখনও পুরোপুরি পেশাদার লেখক হয়ে ওঠেনি। তখনও ঘষাঘষি আর শান-পালিশ চলছে। একদিন চকচকে হবে।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ধরে একদিন কবি হেম বাগচীর নতুন বই প্রকাশনার এক ছোট্ট দোকানের দিকে আসছিলুম আমি আর ভবানী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সামনে দিয়ে। দেখছি ভেতরে বেশ ভিড় আর হৈচৈ। আজ এখানে 'সুনীতি সঙ্ঘের' প্রথম উদ্বোধনী সভা। বড় বড় সব বক্তা আজ উপস্থিত। সুতরাং কিছু কৌতূহল হল বই কি। আমরা ভিতরে ঢুকে জায়গা নিয়ে বসলুম এক পাশে। যাঁরা ব্রাহ্ম সমাজের তৎকালীন নেতৃস্থানীয়, তাঁরা আধুনিক সাহিত্যের উপর বক্তৃতা করছেন। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাষায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের কড়া সমালোচনা চলছে। এই সীতা-সাবিত্রীর দেশে তাঁর পক্ষে চোখের বালি, ঘরে-বাইরে, বউ-ঠাকুরাণীর হাট, চিত্রাঙ্গদা কাব্য এসব লেখা উচিত হয়নি। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বাঙ্গলা সাহিত্যের সর্বনাশ করতে উদ্যত। তাঁর 'পাপের ছাপ', 'কাঁটার ফুল'—ইত্যাদি উপন্যাস বাঙ্গলার সমাজ ও পারিবারিক জীবনের ধ্বংস সাধন করতে উৎসাহী। বক্তার পর বক্তা ঠিক যেন পাখিপড়া বুলির মতো গালমন্দ, ধিক্কার, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কঠোরতর সমালোচনা করে যাচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিরূপ হবার অন্যতর কারণ, তিনি তাঁর নানা রচনায় হিন্দুর দেব-দেবীর উল্লেখ করেন অলঙ্কারস্বরূপ। শরৎচন্দ্র হলেন সর্বাপেক্ষা অপরাধী। তিনি সেই তাঁর 'চরিত্রহীন' থেকে আরম্ভ করে তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'শেষপ্রশ্ন' পর্যন্ত একটানা ভাবে সমাজের সকল নীতিধর্ম ও নৈতিক শুচিতাকে জলাঞ্জলি দিতে চাইছেন। তিনি শক্তিমান, কিন্তু সে হল আসুরিক শক্তি!

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন, আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁকে উপদেশ দেবার নৈতিক এবং সামাজিক অধিকার আমার আছে। তিনি কবি, তিনি তাঁর কাব্যপ্রচেষ্টা নিয়ে থাকলেই আমরা সুখী হই, কিন্তু বাঙ্গালীর সমাজজীবনকে ধ্বংস করার রাইট তাঁর নেই। তাঁর এই স্বেচ্ছাচারী অপচেষ্টার থেকে তিনি বিরত হোন, এই উপদেশই আমরা তাঁকে দিতে পারি।

এই সৌম্যদর্শন, সুপণ্ডিত ও ঋষিতুল্য ব্যক্তি ওখানেই থামলেন না, তিনি তাঁর

নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লাগলেন শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধে। উচ্চকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন, আমার এক নিকট-বন্ধুর কন্যা এই প্রকাশ্য রাজপথ ধরিয়া একদিন এক যুবকের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে যাইতেছিল। আমি আর্তনাদ করিয়া ডাকিলাম, মা, তোমার এইরূপ শোচনীয় দুর্দশা কি প্রকারে হইল আমাকে বলিয়া যাও! কন্যাটি বলিয়া গেল, পণ্ডিত মশায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যপাঠ করিয়া আমরা এই প্রকারে নষ্ট হইতে বসিয়াছি।

সভায় প্রবল করতালিধ্বনি শোনা গেল। ভবানীর ঘ্রাণশক্তি বেশ ধারালো। আমার কানে কানে সে বলল, হাওয়া খারাপ রে। এর পেছনে থেকে একটা দল বোধ হয় কাজ করছে!

পণ্ডিত সীতানাথ ওখানেই থামলেন না। তিনি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কঠিন বাক্য উচ্চারণ করছিলেন। পুনরায় তিনি বললেন, সম্প্রতি তাঁর একখানি উপন্যাস পরম আগ্রহ সহকারে রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া একমনে পাঠ করিয়াছি, ছাড়িতে পারি নাই। ওই উপন্যাসটি যেন মাদকের প্রভাবের মতো মস্তিষ্ককে অভিভূত করে। উহা এমনই ভাল লাগিল, যেন উহার প্রতি পৃষ্ঠা আমি পাগলের মতো লেহন করিলাম। আমি স্বীকার করিব আমার মন আনন্দরসে আপ্লুত হইতেছিল—

সভাস্থ জনতা উৎকণ্ঠায় একেবারে স্তব্ধ।

হঠাৎ পণ্ডিত মশায় এবার তাঁর কণ্ঠস্বর তুলে বললেন,—আমার বয়স কত, আপনারা মনে করেন? আমার বয়স এখন ছিয়াত্তর বৎসর! 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসটি পাঠ করিয়া এই ছিয়াত্তর বৎসরের বৃদ্ধের মন যদি এইরূপ নারকীয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পঁচিশ বৎসর বয়স্ক যুবক-যুবতীরা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহারা পাপের পথে তলাইয়া যাইবে কিনা আপনারাই চিন্তা করুন!

সভাস্থ সকলে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে 'শেম শেম' ধ্বনি ও কানফাটা করতালিতে যেন ফেটে পড়ল। ভবানীর সঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় পলকের জন্যও একথা ভাবিনি যে, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নরেশ সেনগুপ্ত—এঁদেরকে শাপ-শাপান্ত করলেও এঁদের কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করবে। অথচ আমার পক্ষে সেদিন এটি অভাবনীয় ছিল যে, ব্রাহ্ম সমাজ পরিচালিত এই 'সুনীতি-সঙ্ঘ' প্রকাশ্যে সাহিত্য-অধিপতিদের গালি দিলেও গোপনে আমার মতো চুনোপুঁটিকে বধ করার জন্য তাদের খড়্গে শান দিচ্ছে।

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের বক্তৃতার সারমর্ম পরদিন কোন কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

কিছুকালের মধ্যেই আমার বিরুদ্ধে বডি-ওয়ারেণ্ট বেরোল এবং আমার বাসস্থান তছনছ করে খানাতল্লাসী চলল। পুলিসের শুধু নোটিস পড়ল অচিন্ত্য ও বুদ্ধদেবের ওপর। অচিন্ত্যর 'বিবাহের চেয়ে বড়'—যেটি আমিই ছেপেছিলুম 'বিজলী'তে এবং বুদ্ধদেবের 'এরা ওরা এবং আরও অনেকে'—যেটিও আমিই ছেপেছিলুম 'স্বদেশ' মাসিকপত্রে, এবং আমার নিজের উপন্যাস 'দুই আর দুয়ে চার'—এই তিনখানা উপন্যাস ওদের চক্ষুশূল হয়েছিল! দুর্ভাগ্যের বিষয়, অচিন্ত্য ও বুদ্ধদেব তাদের সব বই বাজার থেকে তুলে লালবাজারে জমা দিয়ে এল! একজনের সরকারী চাকরি হচ্ছে—তার জন্য সুনাম অব্যাহত থাকা দরকার। অন্যজনের দুর্নাম ঘটলে প্রফেসারী না মিলতে পারে—সম্ভবত এই ছিল আশঙ্কা।

আমি দু'কানকাটা সেপাই। আমার 'ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়'। আমার অনুপস্থিতিতে পুলিস আমারই বাড়ি খানাতল্লাসী করেছে, পাড়াময় হইচই। গত বছরে আমার বিরুদ্ধে ছিল ১২৪-ক ধারায় রাজদ্রোহের মামলা। তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল ৩০২/১১৭-র হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগ। এবার বুঝি এল ২৯২/২৯৩ ধারার অভিযোগ। অর্থাৎ সাহিত্যে দুর্নীতি!

আমার বিরুদ্ধে ছিল 'বডি-ওয়ারেণ্ট'। সকালের দিকে গিয়েছিলুম 'নাট্য-মন্দিরে', বেলা এগারোটায় ফিরে দেখি, বাড়িসুদ্ধ ভয়ে কাঁপছে! পুলিস অফিসার নাকি বলে গেছে, এবার বছরখানেক ওঁকে পাথর ভাঙতে হবে। উনি অশ্লীল সাহিত্যের মস্ত পাণ্ডা। ওঁর দুর্নীতিতে সাহিত্য ভরা।

আহারাদি সেরে একটা পান মুখে দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে সোজা চললুম লালবাজারে পুলিস আপিসে। ওদের কয়েকজন কর্তা আমাকে চেনে, কারণ বার বার এর আগে আমাকে ধরেছে। কয়েকজন গোয়েন্দা বা টিকটিকি আমাকে ভালই চেনে বারীন ঘোষের 'বিজলী'র আমল থেকে। তারা আমার হাজরা রোডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার খবরও রাখে। সম্প্রতি আনন্দমঠ-এর পিছনে ওরা লেগে রয়েছে, খবর পাচ্ছি। সেখানকার পাঠাগার আমিই একপ্রকার সৃষ্টি করেছি, এবং সেখানকার প্রায় প্রত্যেকখানি গ্রন্থ আমার নামাঙ্কিত। এ ছাড়া গত বছরে 'স্বদেশ'-এর রাজদ্রোহের মামলা ছিল আমার বিরুদ্ধে।

তখন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার ছিলেন শান্তি চক্রবর্তী। সোজা তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। আমাকে দেখে ভদ্রলোক প্রসন্ন মিষ্ট মুখে বসালেন। তাঁকে জানালুম, আমার বিরুদ্ধে 'বডি-ওয়ারেণ্ট', সুতরাং আমাকে গ্রেপ্তার করুন।

জামিন আমার নেই। কিন্তু এই মামলা আমি লড়ব। হাইকোর্ট পর্যন্ত যাব।

শান্তিবাবু প্রবীণ বয়স্ক। তিনি হাসছিলেন। বললেন, না, গ্রেপ্তার করব না আপনাকে। এখন আমরা বিপ্লবী দলের ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত নাজেহাল হচ্ছি। আপনাদের এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমাদের নেই। কিন্তু আমাদের ওপর চাপ দিচ্ছে 'সুনীতি সঙ্ঘ'।—এই বলে তিনি একখানা মোটা ফাইল আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এখানা উল্টে-পাল্টে দেখতে পারেন।

ইংরেজ আমলে পুলিস মহলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা অতিশয় নিন্দনীয় এবং কলঙ্কস্বরূপ ছিল। তখন ভদ্রসমাজে কোথাও পুলিস ঠাঁই পেতো না। পুলিসে যারা চাকরি করত তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের বিয়ে-থা দেওয়া অতীব কঠিন সমস্যা ছিল। অন্যদিকে পুলিস অফিসাররাও ভয়ে কাঁপত, কে কখন্ বিপ্লবীদের হাতে খুন হয়। অনেক অফিসার বিপ্লবীদেরকে নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, এমন খবরও আমরা পেতুম।

যাই হোক, ফাইলটা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে প্রথমেই কয়েকজন ব্যক্তির স্বহস্তে লেখা চিঠি পেলুম। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন একজন নামী লেখক—যিনি 'শিশির' সাপ্তাহিকের মালিক শিশির মিত্র মহাশয়ের অনুগ্রহপুষ্ট মজুমদার মশায়। এঁরা এখন 'সুনীতি সঙ্ঘ'-এর এজেন্ট। লেখক-লেখিকা যাঁরা আছেন এই সঙ্ঘে, তাঁদের অনেকের নামের তালিকা রয়েছে। এঁরা এখন নতুন লেখকদের শত্রু।

চক্রবর্তী মশায় আবার হাসিমুখে বললেন, কেমন হল ত? এবার নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান। আমরা গুরুদাস চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড সন্স-এর সঙ্গে যোগাযোগ করছি। পরে আপনি খবর পাবেন।

আমি বিদায় নিলুম।

লালবাজার পুলিস আপিস থেকে সেদিন আমি সোজা চলে গিয়েছিলুম লিবার্টি ও বঙ্গবাণী আপিসে। এই আপিসের মধ্যেই 'নবশক্তি' সাপ্তাহিকের দপ্তর। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তখনও 'নবশক্তি'র সম্পাদক। ওখানে প্রায়ই আসেন ওই সব লেখকদের কেউ কেউ যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেছেন পুলিসের কাছে। কিন্তু ওখানে কেবল শচীন সেনগুপ্তকেই পেলুম। আমি তখন উত্তেজনায় দাউ দাউ করে জ্বলছিলুম।

যাই হোক, পরদিন 'আনন্দবাজারে' সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় সাহিত্যের উপর পুলিসের এই জুলুম নিয়ে তাঁর প্রথম সম্পাদকীয় রচনায় বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেছিলেন, এবং আমি সেই দিন 'বঙ্গবাণী' আপিসে গোপাললাল সান্যালকে জানিয়ে জর্জ বার্ণার্ড শ'কে একখানা প্রি-পেড টেলিগ্রাম

পাঠিয়েছিলুম। ব্রিটিশ-বিদ্বেষী আইরিশ মনীষী বার্ণার্ড শ' তাঁর পৃথিবী ভ্রমণ উপলক্ষে বেরিয়ে তখন বোম্বাই বন্দরে জাহাজে অবস্থান করছিলেন। কলকাতার সেনট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস যেন কার অলক্ষ্য ইঙ্গিতে টেলিগ্রামটি চেপে গিয়েছিল। আমার টাকাও ফেরত দিল না।

অশ্লীলতা যদি চিত্তগ্রাহী, আনন্দদায়ক, মনোজ্ঞ এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়, তবে সে তার পরিচয়কে উজ্জ্বল করে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা, মহাকবি কালিদাসের ঋতু-সংহার এবং আরও বহু—এরা নিত্য সৌন্দর্যের আকর। শক্তিমানদের হাতে 'অশ্লীল' হয়ে ওঠে পরম সুন্দর। মহাভারতে কুন্তী, মৎস্যগন্ধা, অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা—এদের সঙ্গে পরাশর বা বেদব্যাস যে প্রকার আচরণ করেছিলেন সেগুলি রিরংসার চিত্ররচনা নয়—কেননা বেদব্যাসের মনে কুখ্যাত হবার মোহ ছিল না, পাঠক সমাজের কাছে তিনি বাহাদুরি লাভ করতে চাননি, কিম্বা রিরংসার চিত্রে গরম মশলা যোগ করে তিনি উপার্জনের প্রশস্ত পথও খোঁজেননি। কিন্তু ওই একই বেদব্যাস মহাভারতের পরবর্তী বহু পর্বে অশ্লীলতাকে সৌন্দর্য-মণ্ডিত ও মহিমময় করে তুলেছিলেন।

যাই হোক, আমি সাহিত্য বিচারকও নই এবং নীতিবিদও নই—সুতরাং এসব কথা এখন থাক।

সেদিন রাত্রে আমার মা দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তায় যখন কাঠ হয়ে বসেছিলেন, আমি তখন হাসিমুখে বাড়ি ঢুকলুম। আমার নামে 'বডি-ওয়ারেণ্ট' ছিল এবং আমি লালবাজারে আত্মসমর্পণ করতে গিয়েছিলুম—এ সত্ত্বেও আমি বাড়ি ফিরেছি সুস্থ দেহে ও মনে—এটি সকলের পক্ষেই বিস্ময়। আমার মনে তিলমাত্র উদ্বেগ নেই এটি লক্ষ্য করে মা নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁর ধারণা, আমি এ জীবনে কখনও অন্যায় কর্মে লিপ্ত হইনে, এবং আমার ধারণা, মা জীবিত থাকতে কোনও বিপদ আমাকে স্পর্শ করবে না। ইতিমধ্যে আমি বহুবার উচ্ছন্নে গেছি, বহু-নোংরায় ডুবেছি, কিন্তু মা'র ধারণা—আমি একেবারেই উচ্ছন্নে যাইনি এবং কোন নোংরাই আমাকে স্পর্শ করেনি।

রাত্রে মা আমার কাছে বসে বললেন, ওরে, সেই মেয়েটি আবার আজকে তোকে খুঁজতে এসেছিল—

মায়ের মুখের দিকে তাকালুম। মা বললেন, সেই যে সেই রমলা, যার চিঠি ক'খানা তুই আমার কাছে রেখেছিস? মেয়েটা তোকে এত খুঁজছে কেন রে?

তুমি তাকেই জিজ্ঞেস করতে পারতে, মা?

মা বললেন, আমার সঙ্গে অনেক কথা বলছিল। আহা মেয়েটার মা নেই, কিন্তু বাপের অবস্থা ভাল। সিপসিপে মেয়ে। মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল, চোখের চাহনি এমন মিষ্টি যেন সরস্বতীর মুখ। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। একখানা চিঠি রেখে গেছে আমার কাছে।

মা আমাকে চিঠিখানা দিলেন।

শ্রীমতী সাবিত্রী তখন আমার মনের চতুর্দিগন্তকে আচ্ছন্ন করে রয়েছেন। তাঁকে আমি ঠিক মানবীর চেহারায় আর দেখতে পাচ্ছিনে। আমার ভিতরে একটা গুপ্ত অধ্যাত্ম চিন্তার তিনি উদ্বোধন করে গেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার যে রোমান্স, যে দৈবপ্রণয়, যে আকুলতা ও উন্মাদনা—সেটা যে জৈব বাসনায় রঙ্গীন এ আমি স্বীকার করিনে। তাঁকে আমি লাভ করতে চাইনে, কিন্তু চিরদিন পূজা করতে চাই। তাঁর সঙ্গে আমার যৌগিক মিলনের জন্য প্রয়োজন ছিল উত্তরাখণ্ডের সমগ্র হিমালয়ের গিরিনির্ঝরের, তুষার নদীর, চীড় আর পাইন অরণ্যের। সাবিত্রী ছিলেন সেই বিরাটের সঙ্গে মিলিয়ে সেই বিশ্বজোড়া বৃহতের পরিব্যাপ্তির মধ্যে। আমি সামান্য, নগণ্য, তুচ্ছাতিতুচ্ছ,—কিন্তু সাবিত্রী আমাকে দেবোপম ক'রে তুলেছিলেন। তিনি আমার শিরা-উপশিরায়, প্রতি রক্তকণিকায়, প্রতি অন্ত্রে-তন্ত্রে, প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে—আমাকে জড়িয়ে ছিলেন। আমি যেন পৃথ্বিমতী শ্রীরাধাকে নিয়ে ওঙ্কারের মধ্যে বাস করছিলুম! আমার উজ্জীবন ঘটেছে সাবিত্রীর আরাধনায়।

চিঠিখানা আমি সযত্নে পড়লুম মধ্যরাত্রে। এক মনে নিবিড়ভাবে পড়লুম। এখনও পর্যন্ত বিস্ময় এই, আমি আজও এ মহিলাকে চোখে দেখিনি! উনি ঠিকানা যোগাড় করে আমার এখানে দু'দুবার এসেছেন, এবং মা'র সঙ্গে আলাপ করে গেছেন। কিন্তু শ্রীমতী রমলার এই আকুলতা একটু অভিনব বইকি। চিঠিতে উনি কেবলই লিখছেন, আমি যেন ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকি, সেই জোরে উনি আপন জীবন রচনা করবেন! শুধু দাঁড়াবো, আর কিছু নয়। প্রণয়, ভালবাসা, প্রেম, অনুরাগ, বন্ধুত্ব—কোনও কথাটাই উনি স্পষ্ট করে বলছেন না। শুধু চাইছেন আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াই! অনেক রকমের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আমাকে আসতে হয়েছে, কিন্তু বিগত দু'বছর ধরে আমার একখানা ছবির কাটিং নিয়ে এক অপরিচিত মহিলা এইভাবে আমার পিছনে ছুটছেন—এ যেন মনে হচ্ছে তিনি তাঁর নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন! মেয়েদের অন্ধ হৃদয়াবেগ আমার কাছে ভয়ের বস্তু।

আজকের চিঠিতে দেখছি উনি আমাকে একান্তভাবে অনুরোধ করেছেন,

আগামীকাল বিকাল ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আমি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। রিচি রোডের গায়ে যে নতুন পার্কটি হয়েছে তার উত্তর দিকের ঠিক মাঝের অংশে তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন।

এবারে আমি প্রস্তুত। পরদিন দুপুরবেলায় আগে গেলুম হাজরা রোডে। বুলি জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে বেশ পাকাপোক্ত তরুণীতে পরিণত হয়ে। তার বন্ধু জুটেছে অনেকগুলি মেয়ে ও মহিলা। তাদের মধ্যে কল্যাণী দাস, আরতি মুখার্জি, হোসেন আরা বেগম—ফিলিপসের পি কে রায়ের স্ত্রী সান্ত্বনা রায়। শ্রীযুক্তা সান্ত্বনা রায়ের কাছে বুলি প্রকৃত মাতৃস্নেহ লাভ করেছিল। যাই হোক, ওরা বুলিকে নিয়ে লোফালুফি করছে, এবং এখানে ওখানে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাচ্ছে। আমার সর্বাপেক্ষা আনন্দ এই, মা লাবণ্যপ্রভা, দিদি ও শ্রীমতী শোভা বুলিকে যেন সোনার চক্ষে দেখেছেন। বুলি কয়েকদিন থেকে ওঁদের কাছেই রয়েছে। শ্রীমতী শোভার কাছে সেদিনের মতো বিদায় নিয়ে আমি পূর্বপথে হাজরা রোড ধরে সোজা এসে রিচি রোডে পড়লুম। এ রাস্তা আমার চেনা। এই মাত্র কয়েকদিন আগে এই রাস্তারই এক বাড়িতে বরিশালের অবিসম্বাদিত নেতা সতীন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম। সঙ্গে ছিলেন লাবণ্যপ্রভা ও প্রিয়া। সতীন সেন মহাশয় পলাতক অবস্থায় কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর পেশীবহুল স্বাস্থ্য, দীর্ঘাকার চেহারা ও অমায়িক ব্যবহার আমাকে সেই রাত্রে অভিভূত করেছিল। ওঁর পটুয়াখালির সত্যাগ্রহ এবং অনশন ধর্মঘট স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

আজ পার্কে ঢুকলুম ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। গাছের ডালপালা দিয়ে কেয়ারী করা এই পার্কের উত্তর অংশ দেখতে বেশ নতুন ধরনের। তারই মাঝামাঝি এক স্থলে বেঞ্চের উপরে যে তরুণী মহিলা বসেছিলেন, এবার তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি রমলা।

উভয়ে নমস্কার বিনিময় করলুম। উনি যেহেতু আগে এসেছেন সেই হেতু আমাকে বসতে অনুরোধ করলেন। আমি একটু ফাঁক রেখে বসলুম। বললুম, আপনি আমার বাড়িতে গিয়ে মা'র সঙ্গে দিন দুই আলাপ করে এসেছেন শুনলুম। কিন্তু আমি থাকি বাইরে-বাইরে—

রমলা বললেন, আপনাকে আমার খুবই দরকার। আপনি আমাকে সব কাজের মধ্যে টেনে নিন। আমি বাবার ওখান থেকে সব ছেড়ে চলে এসেছি।

অপরাহ্নের আলো তখনও রয়েছে। সেই আলোয় ওঁকে আমি প্রথম দেখলুম। আমার চাহনিতে কোনও কুণ্ঠা বা আড়ষ্টতা ছিল না। আমার ধারণা, মহিলার

বয়স বছর চব্বিশের কম নয়। মাথার মাঝখানে সাদা সিঁথি, দু'দিকের চুল কিছু কুঞ্চিত। চোখ দুটো একটু টানা। মুখখানকে সুশ্রী না বললে আমার নিন্দে হবে। গায়ের বর্ণ অনেকটা মালদহের গঙ্গার মতো। ওঁর বাবা এক বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারী, ইনি তাঁর একই সন্তান—আদরে লালিত। পিতা বদলী হয়েছেন বগুড়ায়, কন্যা সাহিত্য প্রচেষ্টায় কিছুকাল কাটিয়ে পিতার ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে এবার বেরিয়ে পড়েছেন। উনি কলকাতায় এসে লাবণ্যলতা চন্দর ওখানে উঠেছেন।

আমি বললুম, আপনি আপনার বাবার বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। সেসব ছেড়ে আপনি এভাবে চলে এলেন কেন?

রমলা বললেন, আমি এসেছি আপনার কাছে। আপনি আমাকে পথ বলে দিন, আমাকে শক্তি দিন, আমাকে সাহায্য করুন।

আমি হাসলুম। বললুম, আমি সামান্য এক লেখক এবং আমার একমাত্র পরিচয় হ'ল, আমি 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে'!

এবার উনিও ঈষৎ হাসলেন। বললেন, আমাকে কিছু বলেই আপনি বোঝাতে পারবেন না। আপনার পরিচয় আপনার চেয়েও আমি বেশি জানি।

এগুলি আমার কানে অনেকটা যেন চাটুবাক্যের মতো শোনাচ্ছিল। কিন্তু প্রতিবাদ জানালুম না, কারণ ওঁর কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতার আভাস ছিল। আমি নতমুখে চুপ করে রইলুম। পুনরায় উনি বললেন, আমি কি লাবণ্যলতার ওখানে খদ্দর প্রচারের কাজ নিয়েই এখন থাকব?

স্ত্রীলোকের এই প্রকার আত্মসমর্পণের চেহারার সঙ্গে আমার কোন ও কালেই পরিচয় নেই। আমি শুধু বললুম, সেটা আপনারই বিবেচনা, মিস রায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ এইরূপ একটি উপমা দিয়ে বলেছিলেন, নষ্ট মেয়ে যেমন সংসারের সব কাজ করে, কিন্তু উপপতির দিকে তার মন পড়ে থাকে, তেমনি সকল কাজের মধ্যে থেকেও ঈশ্বরের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকবি !

আমি সাবিত্রীর চিঠির জন্য সকল কাজের মধ্যেও ডাকপিওনের দিকে উৎকর্ণ হয়ে দিন কাটাতুম। কথা ছিল, প্রতি শনিবারে যেন একখানা করে চিঠি পাই —এবং উভয়ের চিঠিতে থাকবে তীর্থযাত্রার টুকরো টুকরো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা, পরস্পরের মানসের অভিব্যক্তি—যা অনেক সময় অধ্যাত্ম অনুরাগের রঙে রঞ্জিত। আমি নিজে চিঠির প্রারম্ভে লিখতুম, কল্যাণীয়াসু এবং পরিশেষে লিখতুম, আমার শ্রদ্ধানুরাগ গ্রহণ করো। ইতি 'স্বামীজি'।

উনি একদা আমার গেরুয়া বসনাদি দেখে এই নামটি দিয়েছিলেন। কিন্তু উনি আমাকে যে তিন চারটি বিভিন্ন শব্দের দ্বারা প্রিয়-সম্ভাষণ করতেন, আমি সেগুলির যোগ্য ছিলুম কিনা, এটি অনেকবার বিচার করেছি। ওঁর চিঠি আসতে এক-আধ দিন দেরি হলে আমি বিনিদ্র রাত কাটাতুম। মনে হত আমি যেন সেই উত্তুঙ্গ হিমালয়ের কোনও এক চূড়ার সমগ্র পাইন বনের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিচ্ছি এবং আমার নৈরাশ্যসঞ্জাত অশ্রুর আভাসকে মনে হত গহন হিমালয়ের কোনও সঙ্গোপন গিরিনির্ঝরিণী আমার দুই চোখের ভিতর দিয়ে ছুটে আসতে চাইছে ! যখন তাঁর চিঠি আসত তখন ভাবতুম, এ আমার সুকঠোর সাধনারই সিদ্ধি ! প্রসন্না দেবী যেন সুললিত কণ্ঠে আমাকে উজ্জীবন মন্ত্র দান করেছেন। উনি প্রকৃতই বিদুষী ও বিদ্যাবতী। উনি আধুনিক কালের বিদগ্ধাদের কেউ নন। একবার সাবিত্রী বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক কবিতা আমার কাছে স্তব-পাঠের মতো ! একবার একখানা চিঠিতে আমি বলেছিলুম, সাবিত্রী, প্রথম তোমাকে দেখেছিলুম তুমি তখন জ্ঞানযোগিনী, এখন দেখছি আমার জীবনে তুমি জ্ঞানদায়িনী হয়ে এসেছ। তোমাকে নমস্কার করি।

পুজোর প্রাক্কালেই আমি গিয়েছিলুম কাশীতে। ওঁদের বাড়ি শিবালার দিকে। উনি একটি প্রতিষ্ঠান চালাতেন। দুঃখী গরীব মেয়েরা সেখানে সেলাই-মেসিনে সেলাই ইত্যাদি শিখত, সাবিত্রী তার খরচ যোগাতেন। বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য উনি একটি পাঠাগার তৈরি করেছিলেন এবং তার জন্য কাশীবাসী একটি তরুণ বয়স্ক ছোকরাকে একবার কলকাতায় আমার বাসস্থানে পাঠিয়েছিলেন। ছেলেটির

নাম শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই যুবক পরবর্তীকালে শ্রীময়ী নামক এক উপন্যাস লেখে, সেটি ডি-এম-লাইব্রেরি প্রকাশ করে। ফলে, সাহিত্যে দুটি তারাশঙ্কর হয়। সুতরাং আমাদের বন্ধু 'গণদেবতার' তারাশঙ্করকে তাঁর 'শ্রী' অক্ষরটি পরিত্যাগ করতে হয়!

সাবিত্রীর পাঠাগারের জন্য আমি কিছু বইপত্র দিয়েছিলুম।

যাই হোক, কাশীতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগের অসুবিধা ছিল না। ওঁর অগ্রজ সম্পর্কে ছিলেন আমার এক বন্ধু গঙ্গা ঘোষাল। গঙ্গা থাকতেন হারারবাগে। তিনি অতি নিষ্ঠাবান ও জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন।

সেবার কাশীতে ছিলেন সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সেই তাঁর ফরিদ-পুরার বাড়িতে আমাদের আসর বসে যেত জমজমাট। কিন্তু একদিন ওঁর ঘরে কেউ ছিল না। সকাল তখন দশটা। উনি এক কলসী পানীয় জল সকল সময়েই সামনে রাখতেন। ওঁর ধারণা, যারা অতিশয় মদ্যপানে অভ্যস্ত তাদের পক্ষে প্রচুর ঠাণ্ডা জল পান করা উচিত। উনি কিছু নিউরটিক, সেই কারণে হঠাৎ নাটকীয়ভাবে উঠে এক একবার এখানে-ওখানে ঘুরে নিতেন। দিবারাত্রির অধিকাংশ কাল তিনি রবীন্দ্রকাব্যময় হয়ে থাকতেন এবং বাকি অল্পাংশকাল পৃথিবীর সকল দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসঞ্জাত দর্শনতত্ত্ব নিয়ে একপ্রকার বেহুঁশ অবস্থায় সময় কাটাতেন।

এক কলসী জল ও একটি গেলাস সামনে রেখে সুধাদা বললেন, তুমি যে হিমালয়ে গিয়ে সাড়ে চারশ'-পাঁচশ' মাইল হেঁটে তীর্থযাত্রা করে এলে, বলো তো কেমন লাগল? কী দেখলে? দু'মাস ধরে কীভাবে কাটালে?

সুধাদা সেদিন প্রস্তুত ছিলেন। আজ নিরিবিলিতে তাঁকে পেয়ে আমি আমার তীর্থযাত্রার অভিজ্ঞতার আনুপূর্বিক কাহিনী অকপটে বলে গেলুম। কাহিনীটি শেষ করতে বেলা আড়াইটে বেজে গেল, এবং অবাক হয়ে এবার লক্ষ্য করলুম, সুধাদা অবিচলভাবে এই দীর্ঘ সময় আমার দিকে স্তব্ধ ও নিমেষনিহত চক্ষে চেয়ে স্থির হয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ এক সময়ে তিনি তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, তুমি ঠিক যেভাবে আমাকে আগাগোড়া বললে, ঠিক এইভাবে সবটা লিখে ফেলতে পারবে?

চমকিয়ে উঠলুম। ভ্রমণ করেছি বহু, তার ইতিবৃত্ত লিখব, একথা কখনো ভাবিনি। সাবিত্রীকে অবশ্য লেখবার কথা বলে রেখেছিলুম, এবং তিনি তাঁর নিজের ছদ্মনাম দিয়েছিলেন 'রানী', কিন্তু তার অনেকটাই ছিল আমার স্তোক-বাক্য। হঠাৎ আজ সুধাদার প্রস্তাব শোনামাত্র আমার যেন তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল।

আমি জবাব দিলুম, হ্যাঁ, পারব।

সেবার কলকাতায় ফিরে লিখতে বসে গেলুম। সুধাদাকে বলবার সময় নিজের কাহিনী নিজের কানে নতুন করে শুনে যেন মুখস্থ করে রেখেছিলুম। লেখাটা অনর্গলভাবে চলতে লাগল।

তখন লেখকদের একটা বৈঠক মাঝে মাঝে বসত 'সাহিত্য সেবক সমিতি'তে। এটি ঠিক একটি প্রতিষ্ঠান নয়, এটি ছিল কবিরাজ রমেশচন্দ্র সেনের কবিরাজী বৈঠক। কয়েকজন কবিরাজ তখন সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। তাঁদের মধ্যে 'অবতার' সম্পাদক অমরেন্দ্র রায়, 'পরিচয়' গোষ্ঠীর জীবনময় রায়, এবং সাহিত্য সেবক সমিতির রমেশচন্দ্র। লেখকদের মধ্যে বিনামূল্যে চা বিতরণ করতেন রমেশবাবু। এখানে আসত পবিত্র গাঙ্গুলী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ রায়চৌধুরী, শিবরাম চক্রবর্তী, সুবল মুখুজ্যে, হেম বাগচী, শৈলজানন্দ, হীরেন মুখুজ্যে ও বাঁড়ুয্যে, মধ্যে-মাঝে অচিন্ত্য, এবং আরও অনেকে। কবিরাজ রমেশ-চন্দ্রের একটি চোখ নষ্ট ছিল। তিনিও একজন লেখক হতে চাইছেন এবং সকল লেখককেই তিনি সমাদর করতেন।

রমেশচন্দ্র একদা আমাকে একটি স্বচরিত রচনা পাঠের জন্য 'সাহিত্য সেবক সমিতি'র তরফ থেকে আমন্ত্রণ করলেন। আমি প্রকাশ্যে কখনও স্বচরিত রচনা পাঠের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিনি—যেমন অনেক লেখকই করে। ওটা অনেকটা যেন পরীক্ষা দেবার সামিল মনে করতুম এবং এড়িয়ে যেতুম। কিন্তু এবার আমি ওঁদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম। স্থির করলুম ভবানী মুখুজ্যে আমার সঙ্গে থাকবে।

ইতিমধ্যে ভবানী আমার রচনায় বর্ণিত অনেকগুলি চরিত্রের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচিত হয়েছিল। তারা ছিল আমার তীর্থযাত্রার সঙ্গী—যেমন গোপাল ঘোষ, চারুর মা প্রভৃতি। এরা কলকাতার এখানে ওখানে থাকত।

কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ও মুক্তোরামবাবু স্ট্রীটের মোড়ের কাছাকাছি—কয়েক পা মুক্তোরামের ভিতরে ঢুকে বাঁ হাতি রমেশ কবিরাজের দোকানঘরের আড্ডা। কিন্তু রমেশচন্দ্র জানতেন, আমি আজ আমার হিমালয় ভ্রমণ কথার একটা অংশ তাঁর ওখানে পড়ব। তখন হিমালয় সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান খুবই কম, সেই কারণে ঔৎসুক্য ছিল বেশি। এই ঔৎসুক্যের ফলেই হোক বা আমার ভ্রমণের প্রতি কৌতূহলের জন্যই হোক, সেদিন লেখকরা ছাড়াও বহু বাইরের লোক এসে-ছিল। ফলে, রমেশবাবুকে তাঁর দোকানের বিপরীত দিকে ঘোড়ার গাড়ির আড্ডার গায়ে বড় বাড়িটার একটি হল নিতে হয়েছিল। সেদিন বিস্মিত হয়ে-ছিলুম, 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস, সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ওদেরই

কয়েকজন বন্ধু শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে। সজনী আমাকে বলল, তোর লেখা ভাল না লাগলে কিন্তু গালি দেবো, মনে রাখিস।—আমি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলুম, ভাল লাগলেও তুই গাল দিবি, কারণ ওটাই তোর পেশা!

আমার সমগ্র লেখার মাত্র একটা কিস্তি লিখেছিলুম, সেইটিই সেদিন পাঠ করে সবাইকে শোনালুম। ওদের মধ্যে যারা পরিচিত নিন্দুক, তারা একটু গায়ে পড়েই বলে গেল, মন্দ হয়নি, তবে নতুন ধরনের। সজনী বলে গেল, আমার বেশ ভাল লেগেছে। অ্যাট্‌মসফিয়ারটা করেছিস বটে!

গ্রন্থখানি প্রকাশিত হবার পরে সজনীকান্ত তাঁর 'শনিবারের চিঠিতে' এ বইটিকে বহু ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছিলেন। যাই হোক, পরবর্তী মাঘ মাস থেকে এই ভ্রমণকাহিনীটি 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রে ছাপা হতে থাকে 'মহাপ্রস্থানের পথে' এই শিরোনামায়। এই গ্রন্থের চতুর্থ কিস্তি নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে বসে লিখেছিলুম। মাত্র পাঁচটি কিস্তিতে এই বই বেরোয়। প্রথম কিস্তি থেকেই এই বই যেন পাঠক মহলে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং যে অভিজ্ঞতা আমার কোন দিনই ছিল না—তাই দেখলুম শ্যামবাজার ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। রাস্তার আলোর নিচে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একজন 'ভারতবর্ষ' পড়ছে এবং দশ-পনেরোজন শুনছে!

১৯৩৩-এর মে মাসে গুরুদাস চ্যাটার্জির দোকানে গিয়ে দাঁড়ালুম। ওঁরা বললেন, ও-বই আমরা ছাপতে যাব, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ভ্রমণ-কাহিনী কেউ পয়সা দিয়ে কেনে? ওই যে পাঁচ কিস্তির দরুন পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি, ওই তো যথেষ্ট পেয়েছেন! আমি ফিরে গেলুম। অতঃপর অনেক ভেবে-চিন্তে অনেক হিসেব কষে এবং অনেক সঙ্কোচ কাটিয়ে আর্য পাবলিশিং হাউসের তরফ থেকে বন্ধুবর শশাঙ্ক চৌধুরী বইখানা ছাপল। শরৎ চাটুয্যে মশায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এ বইয়ের ভূমিকা তিনি লিখবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একখানা চিঠি আমাকে লিখে তিনি সরে দাঁড়ালেন। নতুন লেখকদের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ঔদাসীন্য আমাদের অনেকেরই জানা ছিল।

কিন্তু আমি ১৯৩২-এর কথা এখনও শেষ করিনি।

এই বছরেই শরৎচন্দ্রের অনুরাগীরা টাউন হলে 'শরৎ বন্দনা'র আয়োজন করেন এবং বন্দনার আয়োজন নির্দিষ্ট দিনে লণ্ডভণ্ড হয়। এ আলোচনা আগেই আমি করেছি। হিজলী জেলের বন্দীদের উপর অমানুষিক গুলীচালনার ঘটনা ঠিক এক বছর আগে অনুষ্ঠিত হয়। পরের বছরে ঠিক সেই তারিখটিতে 'শরৎ বন্দনা'র আয়োজন গান্ধীপন্থী ছাত্র মহলের ভাল লাগেনি। শরৎচন্দ্র ছিলেন

দেশবন্ধু ও সুভাষপন্থী এবং শরৎ বন্দনার আয়োজনের মধ্যে ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি। যে-ছাত্রমহলটি এই বন্দনাকে ভণ্ডুল করে দিল তারা ছিল সেনগুপ্তপন্থী। যাই হোক, গভর্নমেন্ট হাউসের কাছাকাছি শরৎ-চন্দ্রের গাড়ি যখন এল—দেখলুম সেই গাড়িতে রয়েছেন বেহালার জমিদার মণীন্দ্র রায়। তিনি আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে সেদিন বেহালায় ফিরলেন। শরৎচন্দ্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল।

আমার গলার ভিতরে তখন দুটি কই-মাছের কাঁটা ফুটেছিল। বড় কাঁটাটি হল, সদ্য কারাগারমুক্ত আমার বিধবা ভাগ্নী বুলি এবং ছোট কাঁটাটি হল শ্রীমতী রমলা রায়—যিনি আমার জন্য তাঁর পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করেছেন। এই দুটি বাঁকা ধরনের কাঁটা গলার মধ্যে এমনভাবে বিঁধেছে যে, গলায় আঙুল দিলে বমি বরং হয়, কিন্তু ঢোক গিলতে গেলেই গলার মধ্যে খচখচ করে! সুতরাং এ দুটিকে তুলে না ফেললে উপায় নেই।

আমার উপার্জন কিছু কিছু বেড়েছে বই কি। একজন এম এ পাস করা ভাল ছেলে পঁচিশ টাকা মাসিক মাইনে পেলে বেঁচে যায়, সেই সময় আমার গড়পড়তা রোজগার চল্লিশ পঞ্চাশ টাকায় উঠেছে, এ কি সোজা কথা! ওর মধ্যে থেকে আবার শ্যামবাজার পোস্ট অফিসের সেভিংস-এ কিছু কিছু জমাচ্ছি বই কি। কে জানে, কখন কোথায় যেতে হয়। তখন আমি রাহাখরচ পাব কোথায়? তবে হ্যাঁ, সাহিত্যে মন দিয়ে খাটো, মনোহর ও চিত্রগ্রাহী কথা লেখো মৌলিক এক স্টাইলে—তোমার আখের ভালো! কিন্তু খাটতে হবে! প্রতিভার সঙ্গে কপালের ঘাম জড়িয়ে থাকে। দেখছ না রবি ঠাকুরকে তাঁর এই একাত্তর বছর বয়সে? পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ঘাম, অর্ধাহার, বিনিদ্রা—বড় প্রতিভার পিছনে এরা থাকে লুকিয়ে। ওর সঙ্গে আবার মিলিয়ে থাকে শারীরিক বিকলন এবং যকৃতের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার গণ্ডগোল। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য অনেক দুঃখে সৃষ্টি হয়।

আমি ওই কই-মাছের কাঁটা গলা থেকে বার করে দেবার মতলব আঁটছিলুম। চেষ্টায় ছিলুম বুলির আবার বিয়ে দেবো। তৎকালে গৃহস্থঘরের কুমারী মেয়েরই পাত্র জুটতে চায় না, ঘরে ঘরে তখন আইবুড়ো মেয়েদেরই গাদাগাদি, এর ওপর বুলি আবার বিধবা। বিধবাকে বিয়ে করে কে তার জাত ধর্ম, মান সম্ভ্রম খোয়াতে চায়? মেয়ে সুন্দরী হলে কি হবে, সমাজনীতির শাসন সেখানে অনেক বড়। কোনও মেয়ে যদি কারও হাত ধরে পালিয়ে যায়, সব পরিচয় মুছে দিয়ে

যদি নিরুদ্দেশ হয়, তাহলে মা-বাপের জাতিচ্যুতি ঘটে, টি টি নিন্দা রটে, কারও কোনও শুভকর্মে তাদের ডাক পড়ে না, তারা মুখ দেখায় না ভদ্রসমাজে। এই যে রমলা রায় বাপের বাড়ির অবাধ্য হয়ে বেরিয়ে এসেছেন, ওঁর ভবিষ্যৎ ত অন্ধকার! মেয়েছেলের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যের জন্য রবিঠাকুরকেও ত চিৎকার করে বলতে হয়েছে, "নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার, কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা—"

সুতরাং বুলির দ্বিতীয়বার বিয়ে ছিল আমার পক্ষে স্বপ্নবৎ। তবু আমি আমার বড়দা ও মার সঙ্গে একদিন গোপনে আলোচনায় বসলুম। বুলির স্বাস্থ্যশ্রী ও বয়সোচিত তারুণ্যের সঙ্গে তার হাস্যমুখর প্রাণচাঞ্চল্যই তার শত্রু। তার মা-বাপ তার সম্বন্ধে হাত ধুয়ে বসে আছে। তার বিবাহিত বোনেরা, পিসি ও খুড়িরা, মাসিরা—কেউ তাকে ঠাঁই দিতে চায় না। তার একমাত্র আশ্রয় হল তার এই মামার বাড়ি—যেখানে তাকে এক কোণে শুতে দেবার মতোও জায়গা নেই। এই সব কারণ পরম্পরা বিবেচনা করে আমার মা—যিনি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণকুলের আচারনিষ্ঠ বিধবা এবং আমার সদ্যবিপত্নীক বড়দা, এঁরা দু'জনে বুলির পুনর্বিবাহে রাজি হলেন। বুলি যদি সুখী হয়, যদি তার ভবিষ্যৎ নিরাপদ হয়, এই তাঁদের ইচ্ছা। সেদিন এই প্রকার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অর্থ সমাজবিপ্লবকে ডাক দেবার মতো ছিল। তরুণী বিধবার প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা, দাক্ষিণ্য—এগুলোর কানাকড়িও দাম ছিল না, বরং সেখানে রক্ষণশীল সমাজমন আপন মর্মস্থলে আঘাত পেয়ে বিষধর ফণা তুলে একে একে সকলকে ছোবল মারবে, এই আতঙ্কই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রবল। কিন্তু আমি সেক্ষেত্রে ছিলুম মরিয়া, এবং আমার মা জানতেন আমার মারমুখী শাসন, রুক্ষকণ্ঠের তিরস্কার, প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ী প্রবলতা—যেগুলি অনেকের পক্ষে ভয়ের বস্তু ছিল। সেদিন আমার মা ও বড়দার সম্মতিলাভ করে প্রবল উৎসাহ পেয়েছিলুম। আমি নিজে চাচ্ছিলুম সমস্তটা ভেঙ্গে দিতে। পুরনো আচার বিচার কুসংস্কার কুশিক্ষা অন্ধতা এগুলো চারিদিক থেকে চিরকাল আমাকে যেন বেঁধে রেখেছিল, আমি এদেরই জঞ্জাল ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে যাচ্ছিলুম।

একদিন আমি স্থির করলুম, শ্রীমতী শোভার কাছে এই ব্যাপারটা নিয়ে কেঁদে পড়ি। তিনি আমার ভাবনেত্রী, এবং তাঁর প্রতি আমার মন অনুরাগ-রঞ্জিত। তিনি নিজে তাঁর ব্যবসায়ী স্বামীকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করেছেন, সুতরাং তিনি হয়ত বলতে পারেন বুলি যেমন আছে তেমনি থাক, ওকে বরং কোন সমাজকর্মে লাগিয়ে দিন। কিন্তু তখন সাহিত্যকর্মে যেমন লেখকের ভবিষ্যৎ

অনিশ্চয়তায় ভরা, ঠিক তেমনি সমাজকর্মেও মেয়ে বা পুরুষের ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্ট। প্রকাশকের দরজায় দরজায় লেখকও যেমন ঘুরবে, প্রতিষ্ঠানের দরজায় দরজায় সমাজকর্মী মেয়ে-পুরুষও তেমনি ঘুরবে। দেশের নিয়তি এই।

সেদিন লাবণ্যপ্রভা দেবীর ওখানে গিয়ে দেখি বাড়িটা থমথম করছে। আমার পথ কিন্তু অবারিত। সোজা দোতলায় উঠে শোভারাণীর ঘরে ঢুকলুম। রবিবারের দুপুর। আহারাদির পর যে যার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। মা একা রয়েছেন অন্য ঘরে খান দুই সংবাদপত্র নিয়ে। আমি তাঁর ঘরেই এলুম। আমার সঙ্গে তাঁর মাতা-পুত্র সুবাদ হলেও একটা সম্ভ্রমের সম্পর্ক প্রচলিত। তিনি কারাগার থেকে বেরিয়ে মেয়ে মহলের অন্যতমা নেত্রী বলে স্বীকৃত হচ্ছেন। কোন্‌দিক থেকে তাঁর নেত্রীত্বের যোগ্যতা বিচার করা হচ্ছে অতটা কেউ ভেবে দেখেনি। লেখাপড়া তিনি সামান্যই জানেন, বক্তৃতাদি তাঁর তেমন আসে না, মৌলিক চিন্তাধারার দিক থেকে তাঁর কনট্রিবিউশন তেমন কিছু নেই, রাজনীতির মধ্যে এক গান্ধীবাদ তাঁর আশ্রয়, যেটি তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা শোভা একেবারেই উড়িয়ে দেন। তবু তাঁকে যে নেত্রী বলে মেয়েরা স্বীকার করে নিচ্ছে, তার বড় কারণ হল তাঁর আন্তরিকতা, স্নেহশীলতা, সৌজন্য, স্বভাবমিষ্টতা এবং মধুর ব্যবহার। এর সঙ্গে কাজ করেছে তাঁর শান্তগৌরবর্ণা মূর্তি ও পূজা-অর্চনার প্রতি তাঁর অনুরাগ।

মায়ের কাছে বসে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলছি, এমন সময় পিছন থেকে 'জমাদারনি' হাঁক পাড়লেন, এ ঘরে আসুন।

বারীন ঘোষ মশায় শ্রীমতী শোভার নাম রেখেছিলেন 'জমাদারনি'।

আমি তৎক্ষণাৎ উঠে এ ঘরে এলুম। গত কয়েক দিন আমি এখানে আসিনি, সেই খোঁটা দিয়ে শ্রীমতী শোভা বললেন, মাঝে মাঝে আপনার পায়ে ধরে না আনলে বুঝি আসতে ইচ্ছে হয় না?

বললুম, পায়ে ধরবার আগেই আজ এসে পড়েছি। এখন যদি কেউ পায়ে ধরে খুশী হই!

—ধরছি, ভাল করেই আজ ধরব।—এই বলে শ্রীমতী শোভা ভিতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। শুধু পুবদিকের বাগানের জানলা দুটো খোলা রইল। উত্তরে প্রতিবেশীর দিকের জানলা এমনিতেই বন্ধ থাকে। কিন্তু এই প্রকার নিশুতি দুপুর বেলায় ওঁর এবম্বিধ অভিনব আচরণ লক্ষ্য করে আমি ভয়ে কাঠ! ওঁকে আমি ভয় করি, সম্মানও করি। ওঁর সামনে সিগারেটও খাইনে।

উনি এসে জানলার ধারে বসলেন প্রায় আমার গায়ে-গায়ে। ওঁর মুখে-

চোখে উত্তেজনা। উনি কোনদিন আমার এত নিকটে বসেন না। এবার উনি বললেন, আপনাকে নিয়ে আমার এত জ্বালা কেন বলুন দেখি?

—জ্বালাটা কি প্রকার আগে শুনি?

আমি শোভারানীর মুখের দিকে তাকালুম। তিনি পুনরায় বললেন, আপনি নাকি পরশু দিন কোন্ এক রাস্তার নর্দমার ধারে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন?

এবার আমি হাসলুম। বললুম, আপনি কি সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন?

উনি থমকে গেলেন। বললেন, আমি কেন, আপনারই 'চ্যালাকাঠ' কবিবন্ধু এসে চুপি চুপি বলে গেছেন দিদির কাছে। এটা আশ্চর্য, আপনি আপনার যতগুলো বন্ধুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, সবাই আপনার প্রতি বিদ্বেষে জরোজরো। ওই 'চ্যালাকাঠ' যখন আপনার কথায় কাঠফাটা হাসি হাসেন, সেই হাসির সঙ্গে গলগল করে বিষ বেরোয়! আপনি ত ওদের নিন্দে করেন না কখনও?

হাসিমুখেই আমি বললুম, দাঁড়ান, আগে কথাটা পরিষ্কার হোক। আমার রাস্তার ধারের নর্দমায় গড়াগড়ি দেওয়া আপনারা বিশ্বাস করলে আজ আমার এই গায়ে গায়ে আপনি বসতেন না! দ্বিতীয়, আমার মুখে চোখে সামান্য লোভ বা অশুচিতার ছায়া থাকলে আপনি দরজায় খিল আঁটতেন না! পুরুষের লোভের চক্ষু মেয়েরা ঠিকই চেনে। আরেক কথা, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আর অনুরাগ কি প্রকার, এ নিশ্চয় আপনি জানেন। কিন্তু যেদিন শুনব, আপনারা আমার চরিত্ররক্ষার অভিভাবক, তার পরের দিন থেকে আপনাদের ছায়া মাড়াবো না। ক্ষমা করবেন, যদি নিজের কথা দু-একটা বলি। আমার নৈতিক চরিত্র সব সময় ভাল থাকে না। কিন্তু সব মিলিয়েই আমি। আমি শিব ও শক্তির পুজোও জানি, এবং তন্ত্রসাধনার চেহারাটাও আমার অজানা নয়। আমার প্রবৃত্তির রাশ মাঝে মাঝে যদি আলগা হয়, সেটাকে আমি যথেষ্ট পরিমাণ পাপ বা অপরাধ মনে করিনে। নিন, দরজা খুলুন, আমি বেরোব।

শ্রীমতী বোধ করি একমনে আমার কথা শুনছিলেন। কিন্তু তিনি একটুও নড়লেন না। আমার হাঁটুর ওপর একখানা হাতের ভর দিয়ে উনি একভাবেই বসে রইলেন। এক সময় উনি বললেন, আপনি কাদের কথা বলছেন আমি বেশ জানি, আপনার চোখ যে কিছু এড়ায় না—তাও আমার জানা। কিন্তু তার জন্যে আমি কেন এ বাড়িতে অপমান হই, বলতে পারেন? আমার কোনও উপায় থাকলে আমি কি আজকের এই অপমান মুখ বুজে সইতুম?

বিগত আড়াই বছরকাল ধরে যে বিপ্লববাদিনীর কঠিন ও নির্মম প্রকৃতির সঙ্গে

আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়, ফাঁসি-হত্যা-অপমৃত্যু-পুলিসী উৎপীড়নে যে মেয়ে একের পর এক প্রিয়জনকে ছেড়ে দিয়েছে দ্বিধাহীন মনে, আজ হঠাৎ দেখি তার দুই চোখ জলে ভরো-ভরো। আজ তিনি অকপটে বলতে আরম্ভ করলেন, এ বাড়িতে থাকা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক। তিনি ও তাঁর মা শুধু পরাশ্রিতই নয়, তাঁরা নিঃসম্বল। তাঁদের দিন চলে না, খরচ জোটে না, নানা লোকের সহায়তা না পেলে তাঁদের পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই। তাঁর মা'র সম্মান কিভাবে তিনি এই নিরুপায় অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে রক্ষা করবেন, এটি সমস্যা।

এক সময় উনি চোখ মুছে সোজা হয়ে বসলেন। তারপরেই এই আত্ম-সচেতন নারী আপন সাময়িক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে হাসলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, আপনি বুঝি এতক্ষণ ভাবছিলেন, আপনার পায়ে ধরে কাঁদতে বসেছি?

আমি কিছুই ভাবছিনে। আমি শুধু দেখছিলুম, উত্তেজনায় কথা আরম্ভ হয়েছিল এবং চোখের জলে তার শেষ হল।

উনি উঠে গিয়ে এবার দরজা খুলে গলা বাড়িয়ে বাইরেটা দেখলেন, পরে আবার দরজা একটু ভেজিয়ে রেখে কাছাকাছি বসলেন। আমি এবার বুলির কথা পাড়লুম, এবং শ্রীমতী কল্যাণী দাস সম্প্রতি একটি পাত্রের সন্ধান দিয়েছেন, সেই সংবাদ জানালুম। শোভা বললেন, আমরাও বুলিকে নাড়াচাড়া করে দেখলুম কিছুদিন। আপনি যদি তার বিয়ে দেন, তার আপত্তি হবে না। বাকিটা আমি ব্যবস্থা করে দেবো। যদি কল্যাণী আপনাকে কোনও পাত্রের কথা বলে থাকে, তবে সে পাত্র ভালোই হবে। বুলিকে কল্যাণী খুবই ভালবাসে।

শ্রীমতী শোভার এ কথায় উৎসাহিত হয়ে আমি কল্যাণী দাসের সঙ্গে যোগা-যোগ করেছিলুম। অতঃপর তাঁরই প্রস্তাবিত এক পাত্রকে আমি দেখি। পাত্রের দাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। পাত্র রূপবান, গুণবান এবং উপার্জনশীল। বুলির সঙ্গে বেশ ভালই মানাবে। কল্যাণীর কাছে খবর নিয়ে পাত্র নিজেই আমার বাসস্থানে একদিন আলাপ করতে গেলেন। পাত্র দেখতে চান পাত্রীকে। আমি আমার বন্ধু সাঁতারু শান্তি পালকে বলে শিয়ালদার 'ছবিঘর'-এ ব্যবস্থা করলুম। যতদূর মনে পড়ে, বোধ হয় আমার সঙ্গে ছিলেন, নরেন্দ্র দেব ও রাধারানী। দোতলায় একটি বক্সে বুলি গিয়ে বসল রাধারানীর সঙ্গে। বুলি তখনও জানে না যে, তাকে দেখাবার জন্যই এই আয়োজন। পাত্র সেদিন পাত্রীকে খুবই পছন্দ করে আমাকে এক প্রকার পাকা কথাই দিয়ে গেলেন।

কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যে বুলির ভাগ্যের চাকাটা একটু অন্যদিকে ঘুরে

গেল। হয়তো কেউ ভাংচি দিল, কেউ নিষেধ করল, কেউ ঈর্ষান্বিত হলো, কেউ বা হয়তো সরে দাঁড়াল। আমি জানিনে ঠিক কারণটি কি।

আজ হাওয়া ঘুরেছে, ইতিহাস পালটেছে, সেদিনের সমকালীন জীবনে যাঁরা আমার আশেপাশে নড়াচড়া করতেন তাঁদের অনেকেরই জেল্লা কমে গেছে। কিন্তু জীবনের যেগুলি নির্ভুল সত্য ঘটনা আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা কারও গৌরব এবং কারও অপযশ বহন করছে বইকি।

সেদিন আমার সমস্ত প্রকার অধ্যবসায় কিছুকালের জন্য নষ্ট হতে বসেছিল।

শ্রীমতী শোভা সবই জানতেন, এবং তাঁর অনুচরবর্গের কাছে সব খবরই পেতেন। তিনিও বিশ্বাস করলেন, আমি প্রতারিত হয়েছি। কিন্তু আমার এই অনর্থক হয়রানির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে তিনি একদিন বললেন, আপনাকে বলতে সাহস হয় না, আপনারা যে ব্রাহ্মণ। পাত্র যদি কায়স্থ হয়, আপনাদের আপত্তি আছে কি?

—কি রকম পাত্র?

—পাত্রের বয়স প্রায় আটাশ। গুজরাটে এক টেক্সটাইল মিলে কাজ নিয়ে শীঘ্রই সেখানে চলে যাচ্ছে। পাত্রের বাবা ছিলেন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। অবস্থা মোটামুটি। সম্পত্তি কিছু নেই। আপনারা যদি রাজি থাকেন, আমি কথা বলতে পারি। বুলিকে ওরা পছন্দ করবে।

শ্রীমতীর প্রস্তাবটি নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলুম। সেটি ১৯৩২-এর নবেম্বর। কিন্তু সেদিনকার বিবেক-সঙ্কট ও সমাজ জীবনের সংগ্রাম স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। প্রথমত বুলি ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা, তার পুনরায় বিবাহ দেওয়া সমাজ-বিরোধী কাজ। দ্বিতীয়ত, তৎকালের বিচারে অব্রাহ্মণ পাত্র মানেই শূদ্রজাত! হোক না কেন ভাল চাকরি, হোক না কেন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে এবং সম্ভ্রান্ত পরিবার—শূদ্র ত বটে! এখানে সম্মান, সুনাম, জাতি, ধর্ম, সমাজ, ইহকাল, পরকাল—সমস্তই যে বিপন্ন! এ যে একসঙ্গে অনেকগুলি পরিবারের সাত পুরুষ নরকস্থ হওয়া! এমন কাজ তুই কেন করতে যাচ্ছিস? তার চেয়ে বুলির মৃত্যু হোক, ওকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্। ওকে না হয় বনজঙ্গলে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আয়। ওর যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাক।

বললুম, সেই ভাল, ওকে গুজরাটের জঙ্গলের দিকে ছেড়ে দেওয়া যাক। সেখানে সিংহের জঙ্গলে গিয়ে ও মরুক।

পাত্রটি হল শ্রীমতী শোভার জেঠতুতো ভাই শ্রীমান সুবোধ। শ্রীমতী তাকে সেজদা বলেন, এবং সুবোধ আমার চেয়ে সামান্য বড়। স্থির হলো, এই চলতি

অগ্রহায়ণেই এ বিয়ে হবে। ছেলের পক্ষে শোভা হলেন কর্ত্রী, এবং মেয়ের পক্ষে আমি হলুম কর্তা।

কিন্তু বিয়ের খরচ? কন্যাপক্ষের খরচ কে দিচ্ছে? মেয়েকে ত ত্যাগ করেছে মা-বাপ-ভাই-বোন-মাসি-পিসিরা। তার ওপর জেলখাটা মেয়ে তার জাত খুইয়ে এসেছে। বড় দুই মামার একফোঁটা সঙ্গতি নেই। আমি ছোট মামা, আমার 'টিকে ধরাতে জামিন লাগে'! সুতরাং বিয়ের খরচ কে যোগাচ্ছে? তা ছাড়া এ বিয়ের সবাই বিরোধী। কোনদিকে কোনও উৎসাহ বা সহানুভূতি নেই।

বিয়ের তারিখ নির্দিষ্ট হল বোধ হয় ২৭ অগ্রহায়ণ, অর্থাৎ ডিসেম্বরের বোধ হয় ১২ বা ১৩ তারিখ। আমার তখন 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল'! আমি তখন শুধু ছুটছি পথে পথে। সর্বাগ্রে আমি 'প্রিয়-বান্ধবী'র পাণ্ডুলিপিখানা বগলে নিয়ে গুরুদাসে গিয়ে হাজির হলুম। গুরুদাসের অন্যতম মালিক সুধাংশু চাটুজ্যের মনে ভয় ছিল, এ বই আবার পুলিস ধরবে কিনা। ওঁদের দোকানের ইতিহাসে পুলিস হামলা করল এই প্রথম আমার বই নিয়ে। সুতরাং ওঁরা এবার থেকে খুব সচেতন।

কিন্তু ওঁরা 'প্রকৃত' ব্যবসায়ী। হৃদয়হীন বলব না, কারণ ওঁরা অসময়ে টাকা দিয়ে থাকেন। লেখকরা যখন দুঃসহ দারিদ্র্যে ছটফটিয়ে ওঁদের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ে, ওঁরা তখন নিরাশ করেন না। শুনেছি শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ-বৌ' আর 'বিন্দুর ছেলে' ওঁরা নাকি এক-একশ' টাকায় সর্বস্বত্ব অর্থাৎ সম্পূর্ণ অল্-রাইটস কিনেছেন। শুনেছি কান্ত কবি রজনী সেন যখন হাসপাতালে মুমূর্ষু—ওঁরা তাঁর 'বাণী ও কল্যাণী' নামক সুপ্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ ওইভাবে কিনেছেন মাত্র পঞ্চাশ টাকায়! ওঁরা জেনেছেন, আমার বাজার-মূল্য খারাপ নয়, সুতরাং আমার কাছে ওঁরা একখানির পর একখানি বই-এর অল্-রাইটস কিনতে চান। আজ ওঁরা ভাল করেই জেনেছেন যে, ওঁরা ছাড়া আমার অন্য উপায় নেই, অতএব ওঁরা মাত্র তিনশ' পঁচিশ টাকায় 'প্রিয়-বান্ধবী'র কপি-রাইট কিনে নিলেন। তখনকার দিনে কপি-রাইট বা গ্রন্থের সর্বস্বত্ব বলতে শুধু গ্রন্থস্বত্বই বোঝাতো। তখন সিনেমা চিত্র, বেতার, গ্রামোফোন, নাটক বা ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ প্রভৃতি কোনও কথাই উঠত না। যাই হোক, বহুকাল পরে জেনেছিলুম, 'প্রিয়-বান্ধবী' উপন্যাসের কম-বেশি পঁয়ত্রিশটি সংস্করণ ওঁরা একে একে প্রকাশ করেছেন, এবং সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দিয়েও ওঁরা বহু সহস্র টাকা লাভ করেছেন। আমি তবুও কৃতজ্ঞ, ওঁরা অসময়ে টাকা দিয়েছিলেন!

কাত্যায়নী বুক স্টলের মালিক গিরীন সোমের কাছে অগ্রিম দেড়শ' টাকা

আদায় করতে আমার একজোড়া জুতো ছিঁড়ল। তারপরে রইল দেব সাহিত্য কুটীরের সুবোধ মজুমদার, ওয়েলিংটনের নাথ ব্রাদার্স, সাঁতরাগাছির ভাগ্নী, এবং আমার পোস্ট অফিসের খাতায় তেষট্টি টাকা!

কিন্তু শোভারানীর নির্দেশ মত সম্পূর্ণ হাজার টাকা কোনমতেই যোগাড় করা গেল না। শেষ পর্যন্ত বড়দার কাছে কেঁদে পড়লুম, তোমার আপিস থেকে শ' দেড়েক টাকা ধার করে এনে দাও, বড়দা।

যখন এইভাবে বুলির বিয়ের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে আসছিল তখন বুলির দুর্ভাগ্যবিধাতা আরেকবার বুলির দিকে তাকিয়ে তাঁর গোঁফে তা দিচ্ছিলেন, যেমন তিনি ছ' বছর আগে বুলির প্রথম বিয়ের রাত্রে কৌতুকরঙ্গে হেসেছিলেন!

বুলির বিয়ের আসর বসল একটি মস্ত সামিয়ানার নিচে প্রায় সাড়ে তিনশ' নিমন্ত্রিতের উপস্থিতিতে। আমার বহু সংখ্যক বন্ধুর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কবি-শেখর কালিদাস রায় এবং তাঁরই সহায়তায় আমি পুরোহিতরূপে পেয়েছিলুম তৎকালীন প্রসিদ্ধ আচার্য পণ্ডিত গিরিজাকান্ত সাংখ্যবেদান্ততীর্থকে। আসর বসেছিল কালীঘাটে, অপূর্ব মিত্র রোডের কোণে—শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার বাসস্থানের সংলগ্ন এক প্রাঙ্গণে। আমার পক্ষে বড়দা এই বিবাহের মস্ত সমারোহে উপস্থিত থেকে কন্যা সম্প্রদান করলেন। বিয়ে হয়েছিল গোধূলি লগ্নে।

বাংলার বিপ্লববাদীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি অতিশয় চাঞ্চল্যকর ঘটনা—যার জন্য কলকাতায় তখন উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা ছিল প্রবল। শ্রীমতী শোভা এই বিবাহ বাসরে উপস্থিত ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে কোনও জনসম্মেলনে তিনি যোগদান করেন না। কারণটি রাজনৈতিক। দু বছর আগে ১৯৩০-এ ঠিক এই সময় অর্থাৎ ৮ই ডিসেম্বর তারিখে তিনজন যুবক আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করে। তারা কারাবিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল লেঃ কর্নেল সিমসনকে তাঁর আপিসের মধ্যে গুলী করে হত্যা করে। অতঃপর যুবকদের চেষ্টা ছিল এই, যতগুলি সম্ভব দায়িত্বশীল ইংরেজ কর্মচারীকে তারা একই দিনে শেষ করে যাবে। তারা কঠোর প্রতিজ্ঞা সহ উন্মত্ত উত্তেজনায় যখন প্রত্যেকটি কক্ষ খোঁজাখুঁজি করছে তখন জুডিশিয়াল সেক্রেটারি মিঃ নেলসন ছেলেদেরকে বাধা দিতে এসে তাঁর উরুতে গুলীবিদ্ধ হন। জনৈক আমেরিকান ড্রেন-পাইপের সাহায্যে পালিয়ে বাঁচেন।

প্রবল উত্তেজনা, চিৎকার, হইচই এবং ছুটোছুটির মধ্যে তিনটি যুবক তাদের পলায়ন-পথের নকশায় বোধ করি একটু ভুল করে থাকবে। কিন্তু ওরা ছিল বিপ্লবের নির্ভীক সাধক। ওরা ওই রাইটার্স বিল্ডিং-এর মধ্যেই ধরা পড়ার আগে

আত্মহত্যার চেষ্টা করে। ফলে, তিনজনের মধ্যে বাদল গুপ্ত নামক যুবকটি ওখানেই মারা যায়। বাকি দুজন নিজেরাই পিস্তলের গুলীর দ্বারা নিজেদের মাথার খুলি বিদ্ধ করে। সেই আহত অবস্থায় তাদেরকে পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট কড়া পুলিস পাহারায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। ওই দুই যুবকের নাম বিনয়কৃষ্ণ বসু ও দীনেশ গুপ্ত। বিনয় ছিল ঢাকায় মিঃ লোম্যানের হত্যাকারী এবং পলাতক। ইংরেজ তার ওপর বাজি ধরেছিল প্রচুর। তাকে সুস্থ করে তুলে যথাসময়ে ফাঁসী দেবে, এই ছিল তাদের ঐকান্তিক বাসনা। কিন্তু তখন পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন বা ওই ধরনের 'সিন-ফিন' জাতীয় কোনও ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। ওই দুই যুবকের 'প্রাণরক্ষা'র জন্য বাংলার গভর্নমেণ্ট রাজোচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু দিন চারেক পরে শেষ রাত্রে হাসপাতালেই বিনয়ের মৃত্যু ঘটে! অতঃপর দিনে-দিনে দীনেশ গুপ্ত সুস্থ হয়ে ওঠে এবং বিচারের পর যথাকালে তার ফাঁসী হয়! শ্রীমতী শোভা এই তারিখটিকে দু' বছরেও ভুলতে পারেননি।

যাই হোক, বুলির এই বিধবা-বিবাহ আমার জীবনে তুলেছিল একটা ঝড়। পদে-পদে পথে-পথে আমার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকত অপমান, লাঞ্ছনা, অনাদর এবং দুর্ব্যবহার। অনেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, অনেকে আমার মুখ দেখতে চায়নি, অনেকে বুলির জেলে যাবার জন্য চরিত্রদোষ রটিয়ে বিবাহ বাসরের ঠিকানা খুঁজে বেড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই আমার বন্ধু, আত্মীয়, কুটুম্ব এবং স্বজন।

আমি যখন রাত্রের দিকে ক্লান্তি, অবসাদ ও উপবাসে শীর্ণ সেই সময় বাসর থেকে নবদম্পতি আমার সামনে এসে দাঁড়াল। বুলির সর্বাঙ্গে নতুন স্বর্ণালঙ্কার, মাথায় মুকুট ও টায়রা, গলায় দু' গাছা হারের মধ্যে একটিতে দামী পাথর বসানো। হাতভরা চুড়ি আর বাজুবন্ধ। পরনে অতি মূল্যবান বেনারসী ঝলমল করছে।

এ সব আমি দিইনি। সব দিয়েছেন শোভারানী। আমার টাকা সামান্য, তার বহু গুণ খরচ করেছেন বুলির নতুন শ্বশুরবাড়ি। আমি কেউ না—ওঁরাই সব।

নবদম্পতি আমার পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল। সুবোধ বলল, আজ থেকে আপনার ভাগ্নির নতুন নামকরণ হল, সবিতা।

বুলি কেঁদে বলল, ছোট মামা, এবার বোধ হয় তুমি মুক্তি পেলে, কেমন?

না, মুক্তি আমি পাইনি। বুলির জন্মলগ্নে বোধ হয় সবগুলি দুষ্টগ্রহই কাজ করেছিল। তার ভাগ্যনিয়ন্তা আরেকবার তার উপরে বজ্রাঘাত হানল। কিন্তু

এবার আমি বুলির প্রসঙ্গ শেষ করব।

দ্বিতীয়বার বিবাহের সাড়ে সাত বছর পরে বুলি আরেকবার বিধবা হয়। তখন সে সন্তানের জননী। আমেদাবাদে থাকাকালীন শ্রীমান সুবোধ ডবল নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে একাদশ দিনে মারা যায় এবং তার ছোট ভাই সেখানে গিয়ে বুলিকে ফিরিয়ে আনে। আনন্দের সংসার ছারখার হয়ে যায়। কলকাতায় ফিরে বুলির কোলের শিশুটির মৃত্যু ঘটে। কিছুদিন ছিন্নবাধা হয়ে এখানে ওখানে সেখানে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুমহলে বুলি ঘোরাফেরা করে। তার দুই চোখের বন্য চাহনিতে অশ্রুর আভাস বা বেদনার কারুণ্য দেখা যেত না। মাঝে মাঝে শুধু চোখে পড়ত বাঁকা কটাক্ষের থেকে বজ্রাগ্নির আভাস। অবশেষে একদিন জানা গেল, সে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছে। অতঃপর সে যখন শ্বশুরালয়, পিত্রালয় ও মাতুলালয়—কোথাও আশ্রয় পেলো না, আমি তখন ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। সুন্দরীমোহন ছিলেন একজন বিশিষ্ট জনহিতব্রত", সমাজসেবী ও হৃদয়বান ব্যক্তি। তাঁর 'বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা' নামক গ্রন্থখানি তখন জনসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত। আমার আকুলতা দেখে তিনি কাঁকুড়-গাছিতে 'ন্যাশন্যাল ইন্‌ফার্মারি হাসপাতালে' বুলির থাকা ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করে দেন।

কাঁকুড়গাছি তখন বন-বাগান ও জঙ্গলে আকীর্ণ। ওর বাইরে পূর্ব-কলকাতার অস্তিত্বই কম। যানবাহন কোথাও কিছু নেই। রেলপুলের নিচে দিয়ে নিরিবিল খোয়ার রাস্তা চলে গিয়েছে জঙ্গল-জটলার দিকে। তারই ভিতর দিকে একটি জরাজীর্ণ বাড়ির নিচের তলায় প্রশস্ত এক উঠোনের সামনে দরদালানে আরও কয়েকজন রোগিণীর পাশে বুলি তার শেষ শয্যা পাতলো।

ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ কাটছিল। সেই ধূ ধূ রৌদ্রে আমাকেই নিয়ে যেতে হচ্ছিল ফলমূল, ঔষধপত্র ও বিবিধ খাদ্যসামগ্রী। তখন যক্ষ্মারোগীর ত্রিসীমানায় কেউ যেত না, কিন্তু পাছে বুলি আঘাত পায় এজন্য আমি তার বিছানার একধারে বসে তাকে এটা ওটা খাওয়াতুম এবং বাড়ি ফিরে স্নান করতুম। তখন আমার একমাত্র কামনা, বুলির শেষ হোক!

সেই জ্যৈষ্ঠেরই কোন্ একটা তারিখে মধ্যাহ্নকালে যখন ঘর্মাক্ত অবস্থায় খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে কাঁকুড়গাছির হাসপাতালে পৌছলুম, শুনলুম বুলি গতরাত্রে মারা গেছে!

বুলির এই অপমৃত্যু সেদিন আমার মনে একপ্রকার অস্বাভাবিক স্বস্তিবোধ এনেছিল।

বেদে এবং পুরাণে দেবরাজ ইন্দ্রের লাম্পট্য বহুবার বর্ণিত হয়েছে। তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী শচীদেবী জাজ্জ্বল্যমানা থাকা সত্ত্বেও তাঁর স্বর্গলোকের নৃত্যসভা উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, চিত্রলেখা প্রমুখ বহু অপ্সরার আনন্দের কেন্দ্র ছিল। একই পুরুষ বহু নারীর দ্বারা সমাদৃত, এটি ভারতীয় পুরাণে যেখানে-সেখানে পাই। এ ছাড়া মদ্য, গোমাংস, শূকরভক্ষণ, বহুনারী সম্ভোগ—এগুলি বেদ বা পুরাণে নিষিদ্ধ ছিল না। বরং এগুলোর ঢালাও ব্যবস্থা ছিল।

সুতরাং দেবরাজ একদা স্থির করলেন তাঁর পক্ষে ঋষি গৌতমের গৃহস্থাশ্রমে গিয়ে তাঁর পরম রূপবতী স্ত্রী শ্রীমতী অহল্যার ধর্মনাশ করা দরকার। অতএব শুভস্য শীঘ্রম্। গৌতমের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তিনি রূপবান প্রেমিকের বেশে এসে আশ্রমের উপান্তে অহল্যার কাছে দাঁড়িয়ে নারীপ্রশস্তি আরম্ভ করলেন তাঁর মধুর মায়াবী কণ্ঠে: "কিশোর মন্দার পুষ্প পারিজাত গন্ধ এত মধুর নহে, যে-গন্ধ তোমার অস্ফুট প্রণয়বাণীমিশ্রিত নিঃশ্বাসে। ত্রিদিব ভাণ্ডারে মোর এত সুধা নাই, ও রক্তঅধরে যত—"

কঙ্কাবতী গলে গেলেন, শিশির ভাদুড়ী জয়লাভ করলেন। ডি-এল-রায়ের 'পাষাণী' অভিনীত হচ্ছিল নাট্যমন্দিরে।

আরেকদিন দেখছিলুম ভগ্নকণ্ঠে আর্তনাদ করছে 'জীবানন্দ': অলকা অলকা, আমি ঘর চাই, সংসার চাই, স্ত্রী চাই, সন্তান চাই, মানুষের মধ্যে মানুষের মতন বাঁচতে চাই—"

দর্শকরা আবেগে ও বেদনায় ডুকরিয়ে উঠছিল। শিশিরবাবুর মা দোতলায় তাঁর জন্য সংরক্ষিত 'বক্সটিতে' শান্ত ও অবিচলভাবে উপবিষ্ট। বিপত্নীক শিশির ঘর-ছাড়া সংসার-হারা। যেন অনেকটা ওই জীবানন্দেরই কার্বনকপি!

নাট্যমন্দিরে যে কোনও নাটকের যে কোনও অঙ্কের অভিনয়কালে আমি গুটিগুটি ভিতরে ঢুকে কাছাকাছি কোথাও বসে খানিকটা অভিনয় দেখে চলে যেতুম। সেদিন 'সীতা' হচ্ছিল। অঙ্কের পর অঙ্ক দেখে যাচ্ছিলুম। বাঙ্গলার নাট্যশালার ইতিহাসে 'সীতা'র জুড়ি কম। মুগ্ধচক্ষে চেয়ে ছিলুম মঞ্চের দিকে। "রামচন্দ্র দণ্ডকবনে 'স্বর্ণসীতা' নির্মাণ করে তার স্তবে বিভোর: সীতা, সীতা, সমস্ত দণ্ডকবন আজি সীতাতীর্থ!"

এই 'সীতা' দেখে আমাদের অচিন্ত্য একটি কবিতা লেখে, "দীর্ঘ দুই বাহু

মেলি আর্তকণ্ঠে ডাক দিলে সীতা, সীতা, সীতা—পলাতকা গোধূলি প্রিয়ারে—"

হঠাৎ পিছন থেকে পিঠের ওপর আঙুলের টিপ পড়ল। ফিরে দেখি, দৌবারিক মিঃ ব্যানার্জি। আমাকে বাইরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

বাইরে এসে দেখি মূর্তিমান শ্রীমান ধীরেন চক্রবর্তী। সোজা আমার পায়ের ধুলো নিয়ে হাসিমুখে সে বলল, আপনার বাড়িতে গিয়েছিলুম। শুনলুম আপনাকে হয়ত এখানে পাব। আমি চারদিন হল জেল থেকে বেরিয়েছি।

আমি খুব হাসলুম। হাসতে হাসতে ধীরেনকে নিয়ে বাইরে এলুম। কিন্তু আমার হাসির কারণ ছিল। গত বছর এক রাজনীতিক সভায় ধীরেনকে একটি আবৃত্তি করতে বলা হয়। তার কণ্ঠস্বর ছিল দরাজ। কিন্তু আমাকে সে তার মুরুব্বি ঠাউরিয়েছিল, এবং আমাকে দিয়ে সে তিন-চারবার রবীন্দ্রনাথের 'সুপ্রভাত' কবিতাটি আবৃত্তি করিয়ে নেয়। অতঃপর তার সেই আবেগমিশ্রিত উচ্চকণ্ঠের তেজোব্যঞ্জক 'সুপ্রভাত' আবৃত্তি কর্তৃপক্ষ বরদাস্ত করেনি! সেই রাত্রেই ধীরেনকে টেনে নিয়ে যায়! বিচারে তার জেল হয় এক বছর।

—ব্যাপার কি শুনি? রাত দশটা বাজে—!

ধীরেন বলল, শোভাদি পাঠালেন। আপনি সাত আট দিন ওদিকে যাননি। আপনাকে বিশেষ দরকার—কথা আছে অনেক—

ধীরেন একখানা ছোট্ট চিঠি আমার হাতে দিল। চিঠিখানা একটি কাগজের টুকরো মাত্র। নিচে নামসই নেই, উপরে সম্ভাষণ নেই! শুধু তাঁর হাতের দু' লাইন লেখা: 'বামুন উপস্থিত না হলে ষষ্ঠী, শেতলা, মনসা—কোনও পূজোই হয় না!'

হাসিখুশি মুখে ধীরেন বিদায় নিয়ে চলে গেল। ওকে বলে দিলুম, বলো সামনের মঙ্গলবারে যাব।

আমি অতিশয় দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলুম। বিশেষ করে বুলির বিয়ে দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি। তার ওপর কোনও কোনও প্রকাশকের কাছে অগ্রিম নিয়েছি, উপন্যাস লিখে সেই দেনা শোধ করতে হবে। এ ছাড়া বড়দা আমার কথায় তাঁর আপিসে দেনা করেছেন, সে-দেনা আমারই। এর আগে পর্যন্ত দিনে চার-পাঁচটা সিগারেট খাচ্ছিলুম পানের দোকানে দড়ির আগুনে ধরিয়ে, কিন্তু এখন বিড়ির পয়সাও জুটছে না। আমি এখন আশাহত, ভাগ্যবিড়ম্বিত এবং অনেকটা তিতবিরক্ত। আমার ঔদাসীন্যের অন্যতম কারণ, সাবিত্রী আমার হৃৎপিণ্ডের রক্ত-চলাচলের মধ্যে নিত্য সঞ্চালিত রয়েছেন, —বিষয় বৈভব, অর্থচিন্তা, সামাজিকতা বা অন্য কোনও পার্থিব কিছু আমার

কাছে আর প্রিয় মনে হচ্ছে না। সাবিত্রী আমার মধ্যে এনেছেন একপ্রকার অধ্যাত্ম পিপাসা, যেটি আমাকে আর স্থির থাকতে দিচ্ছে না ঘরের মধ্যে। আমাকে ডাকছে হিমালয় অহর্নিশি, ডাকছে সেই রামগঙ্গা আর মেহলচৌরি, ডাকছে কর্ণপ্রয়াগ আর সিরোলি চটি, ডাকছে যোশীমঠ, ভিকিয়াসেন আর বিরহী নদীর কোলে ব্যাসগুহা। আমি সেই বিরাট হিমালয়ের গহনলোকে কীটানুকীটের মতো মিলিয়ে যেতে চাই! কিন্তু জানিনে, এ আমার একপ্রকার শ্মশান-বৈরাগ্য কিনা।

অনিচ্ছুক মন নিয়ে যাচ্ছিলুম হাজরা রোডের দিকে। অনিচ্ছার অন্যতম কারণ, সম্প্রতি পর-পর দু' তিনটে 'স্বদেশী' ডাকাতি হয়ে গেছে বিপ্লববাদী ছেলেদের খরচপত্র চালাবার জন্য। একটি ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে প্রায় হাজার তিরিশেক টাকার। তাই নিয়ে হইচই চলছে প্রচুর। এর সঙ্গে একাধিক মহিলা যাঁরা জড়িত রয়েছেন, তাঁরা অনেকে আমার বিশেষ পরিচিত। আমার অনিচ্ছার আর এক কারণ, মহিলা সমাজের ফাইফরমাশ খাটতে যাওয়া সকল সময়েই কিছু ব্যয়সাপেক্ষ।

শ্রীমতী শোভা পাছে তাঁর দিদির মতো মোটা হন্ বা তাঁর মেদবৃদ্ধি ঘটে এজন্য সতর্ক থাকেন। তাঁর আহার্যের পরিমাণ কম। একটি বাটি নিয়ে নিজের হাতে সামান্য ভাত-তরকারিসহ একটুকরো মাছ—এই তাঁর মধ্যাহ্নভোজন। ওই ভোজনটি সেরে দুপুর দুটো নাগাদ তিনি সেদিন উপরে উঠছিলেন, এমন সময় আমি গিয়ে হাজির। উনি এখন আমার কুটুম্ব—আমার ভাগ্নির খুড়তুতো ননদ। আমি এখন ওঁর নমস্য।

আমাকে দেখামাত্রই উনি চোখ বেঁকিয়ে কূটনৈতিক হাসি হাসলেন। বললেন, রমলা রায় কে বলুন ত?

থমকিয়ে গেলুম। বললুম, নাম শুনে মনে হচ্ছে এক মহিলা!

—আপনাকে তিনি এত খুঁজছেন কেন?

তৎক্ষণাৎ মুখে জবাব এল, মেয়েরা প্রাণের দায়ে পুরুষকে খোঁজে।

শোভা আমার মুখের দিকে তাকালেন। পরে বললেন, চালাকি হচ্ছে, কেমন? ওপরে চলুন—

—আপনি আগে উঠুন—

ওঁর পিছনে-পিছনে দোতলায় উঠলুম। উনি আমাকে সোজা ডেকে নিয়ে গেলেন পশ্চিমের ছোট ঘরে। শীতের দুপুরে উনি চুল এলিয়ে বসলেন পশ্চিমের জানলায়। পরে হাসিমুখে বললেন, আপনাকে নিয়ে আজ পার্কে যাব। এখন

শুনি, রমলা রায় আপনার এত খোঁজ করছেন কেন? আপনার বাড়িতে উনি যাচ্ছেন, আপনার মার সঙ্গে ভাব করছেন,—ব্যাপারটা কি? আপনি আমাদের এখানে আসেন, উনি জানলেন কেমন করে?

আমি অকপটে রমলা দেবীর ব্যাপারটা বলে গেলুম শোভার কাছে। আমার বিশ্বাস, উনি আমাকে অবিশ্বাস করলেন না। আমার পক্ষে গোপন করার মতো কিছু ছিল না। রমলা চান একটা অর্থকরী কোনও কাজ। তিনি চান আমাকে সামনে দাঁড় করিয়ে তাঁর জীবনব্যবস্থা গুছিয়ে নিতে। তাঁর আরেকটি চেহারা লক্ষ্য করার মতো। তাঁর মধ্যে স্বভাব-চটুলতা বা প্রজাপতি-বৃত্তি নেই। তিনি সংযত প্রকৃতির মেয়ে এবং কতকটা রক্ষণশীলও বটে। আমার মা বোধ করি এই কারণেই রমলার প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। রমলা প্রণয়, ভালোবাসা বা প্রেম—এসবের খেলায় মেতে উঠতে চান না। পুরুষের সঙ্গ নিয়ে যৌবনচাঞ্চল্যে মেতে ওঠা বা পুরুষের সংসর্গে জরোজরো হওয়া—এসব তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়। সেদিকে তাঁর রুচি, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও শালীনতা—সমস্তই আভিজাত্যের পরিচয় দেয়। তিনি এক সম্ভ্রান্ত সমাজের কন্যা। মালদহে তাঁর পিতার অবহেলা ও ঔদাসীন্য বরদাস্ত করতে না পেরে তিনি কলকাতায় এসে মরীচিকার পিছনে ছুটছেন।

শোভা তাকালেন আমার দিকে—মরীচিকা কেন?

জবাব দিলুম, উনি আমাকে সমগ্রভাবে পেতে চান। ওঁর একমাত্র কাম্য, আমি ওঁকে বিবাহ করি। উনি আমাকে নিয়ে ঘরকন্না গড়ে তুলতে চান।

—আপনি রাজি হচ্ছেন না কেন?—শোভা একপ্রকার অনুযোগ জানালেন।

—খুব সহজ কথা। আমি বললুম—আমি লেখক, সাহিত্যের কাজ করি। আমার ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। আশা, আশ্বাস, সংস্থান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা—কিছু নেই আমার। প্রতিদিনের অন্ন মুখে তোলার সময় পরের দিনের অন্নসংস্থান আছে কিনা আমাকে ভাবতে হয়। আমি দেখতে দেখতে এসেছি দারিদ্র্য দৈন্য দুঃখ দুর্দশা দুর্গতি কাকে বলে। আমি জানি গরীব-গেরস্থ ঘরের বউ-ঝিরা পুরুষের থালা সাজিয়ে দিয়ে নিজেরা কী খায়। লেখক হওয়াটা এ দেশে অভিশাপ। চেষ্টা করলে এক আধটা অর্থকরী কাজ পেতে পারিনে তা নয়। কিন্তু সাহিত্যের কাজ ছেড়ে ভিন্ন ধর্মে আমার মন যাবে না। অনেক লেখকই চাকরি করে, তাই সাহিত্য তাদের কাছে গৌণ, অনেকটা অবসর-বিনোদনের ক্ষেত্র।

শ্রীমতী শোভা স্তব্ধ চক্ষে আমার দিকে চেয়ে বসেছিলেন। এবার তিনি বললেন, তাহলে কি আপনি কোনদিনই বিয়ে করবেন না?

এবার আমি হো হো করে হেসে উঠলুম। বললুম, আসল কথায় এবার এসেছেন দেখছি। তাহলে শুনে রাখুন—আমি বরং উচ্ছন্নে যাব, বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরবো—কিন্তু কোনও ভদ্র পরিবারের মেয়েকে কেবলমাত্র দুঃখ-দুর্গতিতে ডুবিয়ে দেবার জন্য ঘরে এনে তুলব না! এদেশে সাহিত্যের পথ আজও কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি।

—কিন্তু রমলা যদি আপনাকে চেপে ধরেন?

—তাহলে তিনি পাথরেই মাথা ঠুকবেন, পাথর ভাঙবে না!

ও ঘর থেকে এতক্ষণ মাঝে মাঝে মেয়েদের কলরব শুনতে পাচ্ছিলুম। এবার দিদির ছোট মেয়েটি দরজার কাছে এসে বলল, মাসিমণি, ওরা ডাকছে।

—হ্যাঁ যাচ্ছি।—শোভা বললেন, শুনুন, ওরা এসেছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। বসে আছে সেই বেলা বারোটা থেকে। হেমপ্রভা মজুমদারের মেয়ে দুটিকে আপনি চেনেন। ওদের সঙ্গে 'পুণ্যাশ্রম'-এর আরেকটি মেয়ে এসেছে। কিন্তু মনে রাখবেন, মেয়েটার একটু মাথার ছিট আছে, একটু লক্ষীছাড়া টাইপ। আপনার ভাগ্নির সঙ্গেই জেল খেটেছিল। কল্যাণী ওকে পুণ্যাশ্রমে রেখেছে। মেয়েটা গান গায় ভাল। চলুন, কিন্তু একটু সাবধানে কথা বলবেন।

ফিরে দাঁড়ালুম—সাবধানে কেন?

—চলুন না, নিজেই দেখবেন।—শোভা এগিয়ে গেলেন।

এ ঘরে তখন মস্ত আসর। দিদি, প্রিয়া, কমলা, অরুণার পাশে বরুণা এবং ওই নতুন মেয়েটি। অরুণা প্রথমেই বলল, একে আপনি দেখেছেন আপনার ভাগ্নির বিয়ের দিন। এর নাম সাধনা সেন।

হঠাৎ মেয়েটা সঙ্কোচ কাটিয়ে সহজ গলায় বলে উঠল, মহারাজ, সেদিন বিয়ের ভিড়ে তোমার পায়ের ধুলো নিতে গেলুম, তুমি হাত ধরে সরিয়ে দিলে!

সবাই হেসে উঠল ওর 'মহারাজ' সম্ভাষণ শুনে। শ্রীমতী শোভা একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন, পাগলামি করিসনে। আমরা সবাই ওঁকে আপনি বলি, মা পর্যন্ত বলেন! আর তুই বললি, তুমি? ছি—

তাই বটে—সাধনা বলল, তোমরা ওঁকে কেউ ছাখোনি চোখ খুলে। আমি দেখলুম সেইদিন। কাছের মানুষকে তোমরা কাছে ডাকতে চাও না, তাই আপনি-আজ্ঞে বলে দূরে সরাতে চাও! মহারাজ, আজ তোমাকে আমি গান শোনাতে এসেছি!

আমি হাসছিলুম। কিন্তু লক্ষ্য করছি, সবাই ওকে পাগল-ছাগল বলেই ধরে নিয়েছে। সকলের মুখেই কৌতুক পরিহাসের হাসি। সাধনা ওদের ওই হাসি

গ্রাহ্যও করল না। নিজের মনেই সে গান ধরল।

"তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ ওগো ঘুমভাঙানিয়া/ বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক, ওগো দুখ জাগানিয়া—"

আমি অবাক হয়ে মেয়েটার কণ্ঠের আশ্চর্য সুরমাধুর্যের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। ঘরসুদ্ধ এবার সবাই চুপ। মেয়েটার বয়স হবে বছর কুড়ি-একুশ। অরুণা-বরুণার চেয়ে বয়সে বড়। গায়ের রং মাঝারি, চোখ দুটো একটু যেন বন্যভাবের আভাস দেয়। সর্বাঙ্গে কণামাত্র অলঙ্কার নেই। স্বাস্থ্যটা সাঁওতাল মেয়ের মতো কঠিন। আমি হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলুম। আমার মন ছুটে গিয়েছিল কোনও এক দিনান্তকালের হিমালয়ে—যেখানে পাইনবনের তলায় তলায় সাবিত্রী আর আমার চিরবিচ্ছেদের বেদনা ফুঁপিয়ে উঠেছিল।

"আমায় পরশ করে প্রাণ সুধায় ভরে তুমি যাও যে সরে/বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাক ওগো দুখ জাগানিয়া।"

সন্দেহ নেই, সেদিন মেয়েটার গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। ওর মুখে পর পর তিন-চারটি গান শুনে মনে হয়েছিল, ওর মন দেহতত্ত্বের দিকে ঘেঁষা। ও যখন একটি গানের অন্তরাতে ধরল, "ডাকিলে তারে যায় না পাওয়া, ভাবিলে বোঝা যায় না তারে/শুধু কাঁদিলে তারে মিলিতে পারে/তেমন করে কাঁদতে পারে গো কজন—"

আমি ওর কণ্ঠের সুরলহরী শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। বরুণা বলল, সাধনাদি কিন্তু হারমোনিয়ম বাজাতে জানে না, ও এমনিই গায়।

এতক্ষণ পরে আমি কথা বললুম, তুমি গান শিখেছ কার কাছে?

কে শেখাবে, মহারাজ?—সাধনা বলে উঠল, সব শুনে-শুনে শেখা। জেলে ছিলুম এক বছর তিন মাস, সবাই সেখানে গান গাইতে বলত। আমিও গলাটা শানিয়ে নিতুম।

জেলে গিয়েছিলে কেন?

হেসে উঠল সাধনা। বলল, ওই শুনুন না শোভাদির মুখে। ওঁদের দলের টেররিস্টদের পাল্লায় পড়ে হ্যাণ্ডবিল বিলি করছিলুম হাজরা পার্কে। আর যাবি কোথা? রেলিং টপ্‌কিয়ে পালাতে গেলুম কিন্তু গ্যাঁক করে পুলিস গলা টিপে ধরল। কী ছিল হ্যাণ্ডবিলে, নিজেও পড়িনি। কিন্তু ওতেই বিচার হল—ছ'মাস জেল।

তারপর?

এবার কিন্তু সবাই হেসে উঠল। শোভা বললেন, ওর কোনও গুণে ঘাট

নেই। জেলের মেট্রনকে মেরে জঞ্জালের বালতির মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল! তাইতে ওকে 'সলিটারি সেল'-এ রাখে ন' মাস!

সাধনা হেসে বলল, মেট্রন-মেয়েছেলেটাকে মেরেছিলুম কেন বললে না ত শোভাদি? আমার ওপর কি ধরনের অত্যাচার করেছিল ভুলে গেছ?

এই, চুপ কর,—তোর কি লজ্জাশরম কিছু নেই?—শোভা ওকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, ওর কথা ধরবেন না। ওর এতটুকু জ্ঞানগম্যি হয়নি!

দিদির সঙ্গে অন্য মেয়েরা হাসি চেপে উঠে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ অল্পবিস্তর সবাই জানে। সাধনা বলল, বাঃ শাস্তি পেলুম আমি আর লজ্জা পেলে তোমরা? শোন মহারাজ, আমি দুদিন ছট্‌ফট করেছিলাম যন্ত্রণায়—। পেটে লঙ্কাবাটা ঘষে দিয়েছিল!

শ্রীমতী শোভা রাগ করে উঠে গেলেন। ওঁরা বোধ হয় ভয় পাচ্ছিলেন, সাধনার মুখে কিছু আটকায় না। মেয়েটা না জানে সামাজিক ভব্যতা, না জানে পালিশ-করা কথালাপ। ওর সমস্ত আচরণটাই অমার্জিত।

পুণ্যাশ্রমে তুমি কতদিন আছ?

বোধ হয় মাস দুই হবে—সাধনা বলল, কিন্তু আমি কল্যাণীদিকে বলেছি, ওখানে আমার মস্ত অসুবিধে। আমি ওদের কেউ না। ওরা শুধু মেয়ে। আমি মেয়ে নই, মহারাজ।

সাধনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। সে আবার বলল, বিশ্বাস করো মহারাজ, আমি মেয়ে নয়, মেয়ে হতে চাইনে! আমি তোমার মতন ছেলেই থেকে যেতে চাই—

কিন্তু তোমার দৈহিক লক্ষণগুলি আগাগোড়া যে মেয়ের! ওগুলো বাদ দেবে কেমন করে?

হেসে উঠল সাধনা। বলল, মহারাজ, এসব একটাও আমার নয়, এ হ'ল সেই কারিগরের! আমার মধ্যে আমি, সেই ত আসল আমি! তোমার ওই চোখ দুটোর মধ্যে দেখছি এক মেয়েকে, বলো ত সত্যি কিনা? তুমি তখন শোভাদির পেছনে-পেছনে ঘরে ঢুকলে, দেখলুম পা থেকে মাথা পর্যন্ত তুমি কোথাও পুরুষ নও! নিজেকে তুমি কতটুকু জানো মহারাজ?

মেয়েটা এসব কী বলে রে? আমি ওর কথায় যেন খোঁচা খাচ্ছিলুম। কিন্তু প্রথম আলাপ, সেজন্য আমি সতর্ক ছিলুম। শুধু বললুম, তোমার গান খুব ভাল লাগল। আরেকদিন শোনবার ইচ্ছে রইল।

না, মহারাজ—সাধনা বলল, পাঁচজনের পাঁচালির মধ্যে গান শুনতে চেয়ো না! তুমি একা শুনবে, আমি একা গাইব! দল বেঁধে দরবারী গান হয়। কিন্তু কাঁদতে গেলে একা বসে কাঁদো! সে-কান্না অনেক দূর পৌঁছয়!

সে-গান কোথায় বসে শুনব?

সাধনা বলল, চুপ করে থাকো, আমি তোমায় খুঁজে বার করে নেবো।

ওদিক থেকে শ্রীমতী শোভা তাড়া দিচ্ছিলেন। উনি এদের জলযোগের আয়োজন করেছিলেন। শীতের বেলা পড়ে এসেছে।

এক সময় অরুণা-বরুণাকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েটা চলে গেল।

একদা বিজলী আপিসে যাঁরা আমার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলেন সেই দত্তবংশীয়রা এখন বৈবাহিক সূত্রে আমার কুটুম্ব মহলে পরিণত। এখন আমি এখানে মামাশ্বশুর এবং লাবণ্যপ্রভা এখন আমার বেয়ান। সুতরাং আমার আচার-ব্যবহার ও সর্বপ্রকার কথায় ও কাজে শালীনতা, শোভনতা ও সংযম থাকা দরকার। এখানে হাসি-পরিহাস বা চটুল বাক্যালাপ অনেকটাই ইদানীং কমিয়ে দিয়েছি এবং আমার আনাগোনাও কতকটা কমেছে। আমার বিশ্বাস, এসব ব্যাপারে আমি ঈষৎ প্রাচীনপন্থী। কিন্তু আমার জীবন-বিধাতার বোধ হয় ইচ্ছা নয়, কারও প্রতি আমার অনুসন্ধিৎসু মন স্থির হয়ে থাকে! সেই কারণে আমার মন ছিন্নশৃঙ্খল হয়ে বেরিয়ে পড়ে একের মন থেকে অন্যের মনে। আমার দরকার, মন নিয়ে জানাজানি। আজ আমি উপলব্ধি করছি আমার মন, আমার চিন্তাধারা—সব সরে গিয়েছে সাবিত্রীর দিকে! আমি যেন তদ্ভাবে ভাবিতম্। তিনি আমাকে দেখিয়ে গেলেন শান্ত-শুচিতার পথ। তিনি যেন বলে গেলেন, নীল পদ্মের সন্ধান তুমি পাবে, যদি তুমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাকাশলোকে ভ্রমরের মতো অন্বেষণ করে বেড়াও!

সন্ধ্যার সময় শ্রীমতী শোভা পার্কে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং আমাকে নিয়ে উনি বেরিয়ে এলেন। আমি চললুম পিছু পিছু। নিচে নেমে সদর দরজার বাইরে সরু গলিতে পড়ে উনি বললেন, গোয়েন্দার নজর থাকে, সাবধান। আমি আগে আগে যাব, আপনি হাঁটবেন খানিকটা ফাঁক রেখে। উনি আমাকে দেখাতে চান্ আধুনিক স্বাস্থ্যবতীরা কেমন করে হাঁটে।

লান্সডাউন রোডে পড়ে উনি বাঁ হাতি বেঁকলেন। এ পথ নিরিবিলি এবং আলোকসজ্জা কম। শীতের শেষ দিক, রাত তখনও ঠাণ্ডা। কিন্তু ওঁর পরনে সুন্দর বাসন্তী রংয়ের খদ্দরের শাড়ি, ওতে ঠাণ্ডা লাগে না। উনি হাঁটতে হাঁটতে এসে বাঁ হাতি ছোট্ট পার্কে ঢুকলেন, তারপর আমাকে ডেকে বললেন, আসুন,

এখানে একটু বসি।

মুখোমুখি আমরা বসলুম। উনি গায়ে ঢাকা দিলেন। পরে বললেন, এ শাড়ি আপনারই উপহার দেওয়া—বুলির বিয়ের নমস্কারী! এবার শুনুন, রমলা দেবী আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে গেছেন, আপনি অ্যাডভোকেট গিরিজানাথ মুখার্জির সঙ্গে একবারটি কথা বলবেন। তিনি কি এক প্রতিষ্ঠান গড়ছেন, সেখানে রমলা কাজ নিতে চান। ওঁর জন্যে আপনি নিশ্চয় চেষ্টা করবেন।

বেশ, কথা দিলুম।

শোভা বললেন, আচ্ছা, আপনার সেই হৃষীকেশে গিয়ে আশ্রম গড়বার আইডিয়া কোথায় গেল? সেই যে আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সেখানে?

হাসি মুখে বললুম, না, আমি শূন্যে ফানুস ওড়াবার কথা ভেবেছিলুম! বরং আপনি যদি পারেন আপনার সেই পুরীর আশ্রম-জীবনে ফিরে যান।

আপনার এ কথার মানে কি?

মানে আমার কাছে স্পষ্ট, আপনি হয়ত স্বীকার করবেন না।

কী শুনি?

আমি এই রক্তবিপ্লবের ভবিষ্যৎ বিশেষ কিছু খুঁজে পাচ্ছিনে। কোথায় যেন অঙ্কের ভুল থেকে যাচ্ছে। কয়েকজন ইংরেজকে খুন করলে ভয়ে তারা দেশ ছেড়ে পালাবে, এ আমার মনে হচ্ছে না।

শ্রীমতী শোভা হেসে উঠলেন। তাঁর দেশাত্মবোধের বৈপ্লবিক আদর্শে তিনি শুধু অবিচলই নন, ইস্পাতের ফলার মতো তিনি কঠিন। পরিত্রাণায় সাধুনাং এবং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং—এই ধর্মনীতিবোধ তাঁকে সর্বক্ষণ অনুপ্রাণিত করে চলেছে। আমার সামান্য দু'একটা কথায় তাঁর তিলমাত্র বিচলিত ভাব আসবে না। বলা বাহুল্য, ওঁর ওই অটলতাই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে! আমাকে উনি বার বার খোঁটা দিয়ে সেই একই কথা বলেন, বারীনদা ঠিকই বলেছিলেন! আপনি মনে মনে গান্ধীর চেলা!

আমি রাগ করে বললুম, তা হতে পারে। কিন্তু গান্ধীর পথে বরং কিছু আলো পাই, আপনাদের পথ অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে।

শ্রীমতী শোভা চুপ করে কি যেন ভাবলেন। পরে বললেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, স্পষ্ট জবাব দেবেন। দেবেন ত?

বলুন—

কম-বেশি মাস ছয়েক হতে চলল, আপনার মনোভাব একটু বিগড়েছে, এ কি সত্যি?

এর জন্যে আপনিই দায়ী।—আমি বললুম, আপনাদের বাড়ির কয়েকটি অপ্রিয় ঘটনার কথা আপনিই আমাকে বলেছেন।

উনি বললেন, এই সব কারণেই আমরা শীগগিরই বাড়ি বদলাচ্ছি, আপনি কি জানেন?

জানি—আমি বললুম, আপনারা অনেক বড় বাড়ি ভাড়া নিচ্ছেন এবং আপনাদের অবস্থা ফিরে যাচ্ছে! আপনারা কোন্ কোন্ দোকানে ফার্নিচার অর্ডার দিয়েছেন, তাও আমার জানা! চলুন, এবার উঠি—

আপনি ত সাংঘাতিক লোক?—এই বলে উনি হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন।

এবার উনি প্রায় আমার গা ঘেঁষে চললেন, কারণ সন্ধ্যার পর থেকে এ পাড়ার চেহারাটা খারাপ হতে থাকে। আমি যখন ওঁকে ওঁর বাড়ির গলিতে ছেড়ে চলে যাচ্ছিলুম, উনি বললেন, না, এখন যাওয়া হবে না। ওপরে চলুন—

কথায় কথায় চিঠি চালাচালি করা আমার ধাতে নেই। ও আমি পারিনে। রমলা দেবীর চিঠি একের পর এক পাচ্ছিলুম, কিন্তু প্রতি চিঠির জবাব দেবার দায় আমি স্বীকার করিনে। সুতরাং শ্রীমতী শোভার নির্দেশমতো এবং আমার সুবিধামতো ভবানীপুরের বকুলবাগানের ওদিকে একদিন বিকালের দিকে শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দর বাসস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। এখানে থাকেন রমলা।

শ্রীমতী লাবণ্যলতা একজন প্রসিদ্ধ সমাজসেবিকা। তাঁকে এবং রমলা দেবীকে বাড়ির নিচের তলাতেই পাওয়া গেল। লাবণ্যলতা আমার চেয়ে কিছু বয়োজ্যেষ্ঠা এবং আমাকে উনি নামে চেনেন। উনি অবিবাহিতা, এবং ওদিক থেকে সম্ভবত তিনি ব্রতচারিণী। কিন্তু আমি ঠিক জানিনে, সম্ভবত রমলা ওঁকে আমার সম্বন্ধে এমন কিছু বলে থাকবেন, যার জন্য লাবণ্যলতা প্রথমেই আমাকে বললেন, রমলাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করা আপনারই দায়িত্ব এবং আপনারই কর্তব্য।

লাবণ্যলতা একজন বিশেষ শ্রদ্ধেয়া মহিলা। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে একপ্রকার প্রচ্ছন্ন উপদেশ শোনবার জন্য আমি আসিনি, সেজন্য আমি দুঃখিত বোধ করলুম। ওঁর সঙ্গে এই আমার প্রথম আলাপ। কিন্তু এইটুকুতেই আমার মনে হল উনি কতকটা 'প্রেজুডিস্ট' হয়ে আছেন। আমি হাসিমুখে বললুম, ক্ষমা করবেন, আপনার তুলনায় আমি সামান্য ব্যক্তি। কিন্তু আমি আমার কর্তব্য ও দায়িত্বের শিক্ষা নেবার জন্য গাড়িভাড়া খরচ করে এতদূর আসিনি। আমার অন্য কাজ ছিল।

রমলা দেবী নতমুখে বসে ছিলেন। বুঝতেই পারছিলুম আমাকে জড়িয়ে

এই অপ্রিয় পরিস্থিতি তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

লাবণ্যলতা ঈষৎ জোর দিয়েই বললেন, আপনার সঙ্গে রমলার তিন বছরের ঘনিষ্ঠতা। অথচ উনি যখন আজ এইভাবে বিপন্ন বোধ করছেন, তখন আপনার নিশ্চয়ই উচিত ওর পাশে দাঁড়ানো।

ক্ষমা করবেন, শ্রীমতী চন্দ—আমি বললুম, ঘনিষ্ঠতার কথা একেবারেই সত্য নয়। কিন্তু আপনার বাড়িতে বসে আপনাকে কঠিন বাক্য বলে যাওয়া আমার রুচিতে বাধে। আমাকে না জেনে আমার প্রতি আপনি অহেতুক বিরক্তি পোষণ করছেন এ আমি জানতুম না। আচ্ছা, আজ উঠি।

না না, বসুন, রাগ করবেন না—আমি আপনাদের ভালোর জন্যই বলছি—

কে আমরা?—ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আমি বললুম, কতটুকু আমাদের চেনা-জানা? ওঁর প্রতি আমার কিসের কর্তব্য? কেনই বা দায়িত্ব পালনের কথা ওঠে? আমাকে ওঁর সমস্যায় জড়াবারই বা এ চেষ্টা কেন? এ সব তুর্বোধ্য প্রশ্ন রয়েছে আমার সামনে! ইংরেজী 'ব্ল্যাক-মেইল' কথাটার বাংলা আমি জানিনে, কিন্তু ওটা যদি আমার মনে আসে, ক্ষমা করবেন। আচ্ছা নমস্কার—

আমি উঠে দাঁড়ালুম। আমার গায়ে জ্বালা ধরেছিল। পুনরায় বললুম, আর একবার ক্ষমা করবেন, মিস চন্দ। শুনেছি আপনি একজন বিশিষ্ট সমাজসেবিকা। তা হবে। তবে মেয়ে-সমাজে এ ধরণের লেকচার আপনি দিতে পারেন যে, বেশি বয়স পর্যন্ত কুমারী হয়ে থাকলে মেয়েরা অনেকে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে! —নমস্কার—

আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলুম।

সোজা হাঁটতে হাঁটতে এসে ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে ভবানীপুর থানায় দাঁড়িয়ে যখন বাসের জন্য অপেক্ষা করছি, দেখি রমলা দেবী আমাকে একপ্রকার দ্রুতপদে অনুসরণ করে বড় রাস্তা পেরিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমি বললুম, দেখুন, এ সব বাজে বিতর্কের মধ্যে আমাকে টানাটানি করবেন না! আপনাকে আবার বলছি, আপনি মরীচিকার পেছনে ছুটছেন। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি মালদায় বা বগুড়ায় আপনার বাবার কাছে ফিরে যান।

সেই লোক-চলাচলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রমলা বললেন, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকলে আমার অনেক সমস্যার সুরাহা হয়ে যায়।

আমি অপ্রসন্ন কে বললে? কিন্তু আমি জড়িত হতে পারব না আপনার সমস্যায়। আমি স্পষ্টই বলি, কোনও মহিলা আমার পিছু নেন, এ আমার পছন্দ নয়। আপনার এবং আমার পথ এক নয়।

রমলা কি যেন ভাবলেন, পরে বললেন, আপনি দয়া করে আমাকে গিরিজা মুখার্জির ওখানে একবারটি নিয়ে চলুন, তিনি আপনাকে ভালোই চেনেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানে আমি হয়ত একটা কাজ পেতে পারি। আপনার একটু সময় হবে কি?

চলুন দেখি—। আমার মনে বিশেষ বিরক্তি ছিল।

চক্রবেড়িয়ায় এসে গিরিজাবাবুর বাড়িতে ঢুকলুম। উনি বোধ হয় জানতেন আমি আসব। তখন সন্ধ্যাকাল। এক প্রবীণ বয়সী ভদ্রলোক সামনে এসে বিশেষ সমাদর সহকারে আমাদেরকে অভ্যর্থনা করে বসালেন। উনি আমার কিছু কিছু রচনার সঙ্গে পরিচিত এবং একটা বিশেষ সূত্র ধরে এইভাবে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটবে, এ তিনি আশা করেননি। উনি ওঁর স্ত্রীকে ডাকলেন এবং আমাদের জলযোগের আয়োজন করলেন।

শ্রীমতী রমলা গিরিজাবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই আলাপ আলোচনা করতে বসলেন। আমি পাশেই বসেছিলুম। কিন্তু ওই মহিলা প্রথম থেকেই যেভাবে আমাদের উভয়কে নিরীক্ষণ করছিলেন, সেটি আমার পক্ষে যথেষ্ট আনন্দদায়ক হচ্ছিল না! ওঁর চোখের মধ্যে বিশেষ এক অনুমানের আভাস ছিল।

গিরিজাবাবুরা মেদিনীপুর জেলায় একটি প্রতিষ্ঠান গড়তে যাচ্ছেন, যার প্রধান উদ্দেশ্য যে-সমস্ত শিশু-বালক-বালিকা মানসিক পঙ্গুতায় জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, তাদেরকে ওই প্রতিষ্ঠানে রেখে প্রতিপালন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। তিনি নিজে হাজার কয়েক টাকা নিয়ে নামছেন এবং সরকারী সাহায্যের জন্য ইতিমধ্যেই আবেদন করেছেন। প্রতিষ্ঠানটির নাম হবে 'বোধনা নিকেতন'!

আমি উৎসাহ বোধ করলুম এবং গিরিজাবাবুর নিকট আবেদন জানালুম, শ্রীমতী রমলা রায়কে যদি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গভর্ণেস বা মেট্রন নিযুক্ত করেন, তবে আপনাদের পরিচালনা ব্যবস্থার সুবিধা হয় কিনা।

গিরিজাবাবু খুশী হয়ে বললেন, আপনার প্রস্তাব উত্তম। তা ছাড়া আপনি নিজে যখন রমলা দেবীকে সঙ্গে করে এনেছেন, তখন ওঁকে অবশ্যই নেবো 'বোধনা নিকেতন'-এ।

১৯৩২ সাল শেষ হল। এই বছরটাকে কাবার করতে আমার হাড়ে দুর্বো গজিয়ে গেল। ইংরেজিতে বলে, যে পাথর গড়িয়ে যেতে থাকে, তার গায়ে শ্যাওলা ধরে না! কিন্তু আমি যখনই কলকাতায় স্থাণু হয়ে যাই, তখনই আমার পায়ে-পায়ে জঞ্জাল জমে ওঠে। আমি একদম বেকার, তাই আমাকে দিয়ে নানান কাজের টানাটানি। আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলুম।

কনকনে ঠাণ্ডায় দার্জিলিঙে কেমন বরফ পড়ে, এ দৃশ্য আমার দেখা দরকার। দার্জিলিঙে আসল ঠাণ্ডা জানুয়ারীতে আরম্ভ। কিন্তু দার্জিলিঙ আমার অতি পরিচিত। বছরে দুবার প্রায়ই আসি। ওখানে আমার কুটুম্ব মন্মথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের একচেটিয়া মোটর যানবাহনের কারবার। তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম 'দার্জিলিঙ মোটর সার্ভিস।' নানা ধরণের মোটর কার, প্রাইভেট ট্যাক্সি, লরী ও ও ট্রাক, মোটর বাস ইত্যাদির সামগ্রিক মালিক তিনি। বাংলার বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকেই চেনেন। দার্জিলিঙে তাঁর তিন-চারখানা বাড়ি, কয়েকটি গ্যারেজ একটি অতিথি ভবন ইত্যাদি। তিনি ফিটফাট সাহেব। কয়েকটি নাবালক ছেলেমেয়ে তাঁর। তারা সবাই আমার নাতি-নাতনী সুবাদে। চৌধুরী সাহেবের বাড়ি চাঁদমারি বাজারের সামান্য একটু নিচে—লাইব্রেরি আর থিয়েটার হলের সামনে। উনি আমার জামাই সুবাদ হলে কি হবে,—আমার বাপ-খুড়োর বয়সী উনি। এমন সজ্জন, মিষ্টভাষী, অমায়িক এবং অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি তখন দার্জিলিঙে কমই ছিল। আমার বাঁধা বরাত ছিল ওঁর বাড়িতে। এর ওপর উনি ছিলেন বিলেতী চালচলনের একনিষ্ঠ অনুরাগী। সাহেবী লাঞ্চ বা ডিনারে যখন তখন তাঁর ডাক পড়ত।

জলাপাহাড় ও বার্চ হিলের ডগায় তখন জুঁই ফুলের মতো তুষারপাত হচ্ছিল। টাইগার হিল তখন বনময় পথ। ঘুম-শহরে ঠাণ্ডা প্রচুরতরো। দার্জিলিঙে তখন আমাদের তরুণ কবিবন্ধু ও সৌম্যদর্শন অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় ওকালতি প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছে কিনা আমার মনে পড়ছে না।

আমার চেষ্টা ছিল দার্জিলিং দিয়ে নেপালের কাঠমাণ্ডু শহরে পৌছানোর সহজ পথ আছে কিনা এটির খোঁজ-খবর নেওয়া। তখন কোনও মতে থার্ড ক্লাসের টিকিট কেটে শিয়ালদা থেকে রওনা হওয়া! ট্রেন যেত তখন কুষ্টিয়ার ভিতর দিয়ে সাঁড়া ব্রিজ পেরিয়ে পার্বতীপুর হয়ে সোজা শিলিগুড়ি। যাতায়াত মিলিয়ে টাকা

পনেরোর মধ্যে দার্জিলিঙ ভ্রমণ আমার হয়ে যেত। তখন আর্থিক দারিদ্র্য ছিল প্রচুর, কিন্তু খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্যে দেশ ভরে থাকত। দৈনিক জীবনযাত্রা কোথাও জটিল সমস্যায় কণ্টকাকীর্ণ ছিল না। ছিল শুধু অনড় অবিচল অর্থাভাব।

দিন দশের মধ্যে ফিরে এলুম কলকাতায়। পরবর্তী কয়েক দিনের ভিতরে তিন-চারটে ছোট গল্প লিখে ফেললুম। ওগুলো হাতে থাক। ওরই ভিতরে হঠাৎ একদিন এক যুবক এসে হাজির। তাঁর নাম অক্ষয়কুমার সরকার। তিনি এক সাপ্তাহিক বার করেছেন বা করছেন। নাম খেয়ালী। তাঁর কণ্ঠস্বর একটু মেয়েলী ধরনের। আমার কাছে তাঁর আসবার খেয়াল কেন চাপলো—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বিশদভাবে তাঁর বক্তব্য বর্ণনা করলেন। তাঁর সম্পর্কে মামা হলেন সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁরই রাজনীতিক আদর্শের অনুপন্থী হল এই 'খেয়ালী'। সম্প্রতি সুভাষচন্দ্র বন্দী অবস্থায় ভাগিনেয়কে এক পত্রে জানিয়েছেন, অমুক অমুক লেখকের কাছ থেকে লেখা নাও, এবং তাদেরকে পারিশ্রমিক দাও—সে যত সামান্যই হোক। আমি নাকি সেই প্রস্তাবিত লেখকদের অন্যতম। বলা বাহুল্য, আমি অক্ষয়বাবুর অনুরোধ স্বীকার করে নিলুম এবং কথা দিলুম, প্রতি সপ্তাহের 'খেয়ালী' সাপ্তাহিকে আমি ছোট ছোট ভ্রমণ-কাহিনী লিখব এবং প্রতি কিস্তির জন্য ওঁরা আমাকে দশটি করে টাকা দেবেন। মন্দ নয়, সুভাষবাবুর একখানা চিঠিতে আমার অবস্থা ফিরে গেল। পরবর্তীকালে এই ছোট ছোট লেখা একত্র করে যে বইখানা ছাপা হয়, তার নাম 'দেশ-দেশান্তর'। যাই হোক, অক্ষয়বাবুকে কথা দিলুম, নেপাল থেকে ফিরে আপনাকে জানাব, কবে থেকে আমি লিখতে আরম্ভ করব।

সুভাষবাবু সম্বন্ধে এখানে দু-এক কথা বলি। তিনি দীর্ঘকাল ধরে ব্রিটিশ ভারত গভর্নমেণ্টকে 'জ্বালিয়ে পুড়িয়ে' খাচ্ছিলেন! এই সম্প্রতি কিছুকাল আগে ( ১৯৩০ ) তিনি কলকাতার জেলে আমরণ উপবাস আরম্ভ করেছিলেন। চারিদিকে হই-চই, ইট-পাটকেল, লাঠি চার্জ, ১৪৪ ধারা! তখন কাঁদানে গ্যাস জন্মায়নি। কিন্তু এত বড় স্পর্ধা 'ব্রিটিশ কুকুরের' যে, নব্য বাঙ্গলার তারুণ্যের প্রতীক সুভাষচন্দ্র তাদের অত্যাচারে না খেয়ে মরবেন? সুতরাং আলীপুরে সেণ্ট্রাল আর প্রেসিডেন্সী জেলের চারিদিক ঘিরে নব্য বাঙ্গলা দিবারাত্র চিৎকার করতে লাগল, বন্-দে-এ মাতরম্!

১৯৩০-এ সুভাষচন্দ্রের অনশনকালে অনেকের সঙ্গে একে একে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী শোভা জেলে গিয়ে সুভাষবাবুকে খাদ্যগ্রহণে রাজি করানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ভিন্ন ধাতুর তৈরি, ওঁরা বুঝতে পারেননি। শ্রীমতী শোভা সেদিন সুভাষচন্দ্রের সামনে খুব কান্নাকাটি করে-

ছিলেন। কিন্তু মোমবাতির আগুনে লোহা গলেনি! অতঃপর সম্পূর্ণ নয় মাস পরে সুভাষচন্দ্র মুক্তিলাভ করেন।

আমি জানতুম, তৎকালীন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ একটি নিগূঢ় কারণে বিপ্লববাদিনী শোভাকে জেলের মধ্যে ঢুকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একান্তে দেখা-সাক্ষাতের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সেই চাতুরী ব্যর্থ হয়! শ্রীমতী শোভার ওখানেই এ কথাটি শুনেছিলুম।

আমার সঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় সেটি ১৯৩১, যখন বাঙ্গলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদে সুভাষচন্দ্রকে বসাবার জন্য তুমুল হই-চই ওঠে। বাঙ্গলা কংগ্রেস হবে গান্ধীপন্থী, না সুভাষচন্দ্রের কর্মধারাপন্থী? সুতরাং আত্ম-কলহ ও উত্তেজনাপ্রিয় বাঙ্গালী সেদিন কাগজে কাগজে উভয়পক্ষের প্রচারকার্যে রস পেতে লাগল। সুভাষচন্দ্রকে ভোটে জিতিয়ে দেবার জন্য শ্রীমতী শোভা প্রচুর সংখ্যক কংগ্রেস সভ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সেই আমি প্রথম কংগ্রেসের চার-আনার প্রাথমিক সভ্য হই। সেই বছরেই প্রথম বুঝতে পারি, সাহিত্যকর্মীর পক্ষে রাজনীতি স্বাস্থ্যকর নয়। সেবার সুভাষচন্দ্রই জয়লাভ করেন।

আমার পক্ষে তখন স্বস্তির কারণ ছিল এই, শ্রীমতী রমলা আমাকে মুক্তি দিয়ে 'বোধনা নিকেতন'-এ কাজ নিয়ে চলে গেছেন। সেখানে তিনি মাসিক হাতখরচ তিরিশ টাকা করে পাবেন। গিরিজা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে আমাকে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ওঁদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে হয়েছিল। কিন্তু আসলে অনুরোধটি ছিল রমলার—ওটা গিরিজাবাবুর মুখ দিয়ে এসেছিল।

ওঁরা যে-অঞ্চলে গিয়ে 'বোধনা নিকেতন' প্রতিষ্ঠা করলেন, সে অঞ্চল আমার বিশেষ পরিচিত। এটি ঝাড়গ্রামের কাছাকাছি। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে আমি স্থির করেছিলুম, কলকাতা থেকে দূরে কোথাও গিয়ে নিরিবিলি কোনও বনপ্রান্ত খুঁজে নিয়ে এক আশ্রম বানাবো! পাশে থাকবে জলাশয়, সেখানে ফুটে থাকবে রক্তকমলের দল। আশ্রমের উপান্তে হরিণ ছুটবে, ময়ূর চরবে পেখম মেলে এবং 'কোকিলের কুহু রবে আতুর হবে মধ্যাহ্ন।'

সুতরাং আমার এই আশ্রম রচনার সহায়কস্বরূপ সাঁতরাগাছি থেকে আমার ভাগিনেয় সম্পর্কে বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীমান ধনুকে সঙ্গে নিয়েছিলুম। ধনুরা লৌহ ব্যবসায়ী এবং ধনাঢ্য। কিন্তু সে মামার উপযুক্ত ভাগ্নে। সে বলল, আমি দেবো তোমার আশ্রম রচনায় উপযুক্ত জমি। মেদিনীপুর জেলায় আমাদের অনেক জমি আছে। আগে চলো ঝাড়গ্রামে। সুতরাং ধনুর প্রস্তাবে সেই প্রথম

গেলুম ঝাড়গ্রামে। তখন ঝাড়গ্রামে অন্ধকারের যুগ। স্টেশনের পাশে বড় বড় শালগুঁড়ির আড়ৎ। চারিদিক জুড়ে আছে অরণ্য। জনবসতি অতি সামান্য। আদিবাসী, সাঁওতালী আর জংলীদের দেখা যায় এখানে ওখানে। পুবদিক ধরে একটি পথ গিয়েছে রাজবাড়ির দিকে। রাজার নাম নরসিংহ মল্লদেব 'উগলষণ্ড'। রাজ-এস্টেটের ম্যানেজার হলেন দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। সেইকালে আমি দেবেনবাবুর সঙ্গে গিয়ে রাজার সঙ্গে আলাপ করি এবং আমার মনের কথা বলি। রাজা অতি অমায়িক, সুভদ্র, বন্ধুবৎসল এবং হাস্যপ্রিয়। লক্ষ্য করলুম তিনি প্রায় আমারই সমবয়সী। তিনি আমাকে এই কাছাকাছি একশ' বিঘা শালবন বিনামূল্যে দিতে চাইলেন। তবে দেবেনবাবু জানালেন, প্রতি বিঘায় আমাকে মাত্র তিন টাকা বাৎসরিক খাজনা দিতে হবে। বন্দোবস্ত হবে চিরস্থায়ী। আমরা জল-যোগ সেরে উঠে এলুম।

আমি তখন সর্বহারা। বছরে তিনশ' টাকা খাজনা জোগাব কোত্থেকে? সুতরাং সেলাম ঠুকে সেবার পালিয়ে বাঁচলুম। মাথায় থাক আমার আশ্রম!

যাই হোক, এই ঝাড়গ্রামেরই কাছাকাছি রেলপথের নিকটবর্তী জঙ্গলের ধারে গিরিজাবাবু তাঁর 'বোধনা নিকেতন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ওখানেই 'বোধনা হল্ট' নামক একটি স্টেশনও কালক্রমে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু গিরিজাবাবুর ভাগ্য ছিল বিরূপ। একদা সেই 'বোধনা নিকেতন' ও 'বোধনা হল্ট' কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। একালে ওটার নাম হয়েছে 'বাঁশতলা'। ওটা রাজ-এস্টেটেরই অন্তর্গত। আমার সেদিনের রোমান্টিক রসকল্পনাও ওই শালবনের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে!

'চিত্রমন্দির'-এর রতিকান্ত পালিতকে সঙ্গে নিয়ে যখন শিবরাত্রি উপলক্ষে পশুপতিনাথ তীর্থে যাব স্থির করেছি এবং এই তীর্থযাত্রায় যাতায়াতের রাহাখরচ ও খাইখরচ সব মিলিয়ে মোট টাকা তিরিশেকের বেশি লাগবে কিনা—এই সব নিয়ে যখন তাঁর ফটোগ্রাফির কেন্দ্র দোতলায় ক'দিন ধরে আলোচনায় বসেছি, তখন একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন শ্রীমতী কল্যাণী দাস এবং তাঁর সঙ্গে সেই সুগায়িকা মেয়েটি যার নাম সাধনা। স্পষ্টত, আমার এই আড্ডার ঠিকানাটা কল্যাণী পেয়েছেন শ্রীমতী শোভার কাছে। কল্যাণী দাস তখনও 'ভট্টাচার্য' হয়ে ওঠেননি।

সাধনা আমাকে দেখামাত্রই উদ্দীপ্ত হয়ে বলল, মহারাজ, মনে আছে? সেই প্রথম দিন যে বলেছিলুম, তোমাকে আমিই খুঁজে নেবো—সে কথা কি ভুলেছ?

আমাকে একপ্রকার নিকট-সম্ভাষণ করে 'তুমি' বলছে একজন মেয়ে, এটি

কল্যাণী বা রতিবাবুর পক্ষে অভাবনীয় ছিল। ওঁরা দুজনেই অবাক হলেন। কিন্তু আমি হাসিমুখে বললুম, না, ভুলিনি। তোমার সেই প্রথম গানটিও ভুলিনি।

মিষ্টভাষিণী ও শান্তমুখী কল্যাণী সহাস্যে বললেন, আপনি কিছু মনে করবেন না, সাধনা অমনি করেই কথা বলে। ও একটু পাগল!

কিন্তু গানগুলো তো ঠিক পাগলের গাওয়া নয়?

উচ্চকণ্ঠে হেসে আনন্দে ও উল্লাসে সাধনা আমাদেরকে যেন প্রাণবন্ত করে তুলল। রতিবাবু এমন নতুন ধরনের মেয়ে দেখে ঈষৎ হতচকিত। এবার আমি বললুম, হঠাৎ এলেন যে? কিছু বলবার আছে?

হ্যাঁ, বিশেষ জরুরী—কল্যাণী তাকালেন রতিবাবুর দিকে।

ইঙ্গিতটি বুঝে আমি রতিবাবুকে বললুম, আপনার কাজ রয়েছে অনেক ডার্করুমে। মিনিট পনেরো সময় দিচ্ছি, কাজ সারুন গে।

ইঙ্গিত রতিবাবুও বুঝলেন, এবং তিনি ডার্ক-রুমের দিকে চলে গেলেন।

এবার কল্যাণী বললেন, ধরুন, কল্পনা করুন, আপনাদের এই হলটায় প্রায়ই লেখকরা আসেন! অন্নদাশঙ্কর, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, শৈলজাবাবু— সবাই আসেন! আমরা কেউ কেউ যদি এখানে আনাগোনা করি, সে শুধুমাত্র আপনাদেরকেই দেখবার জন্যে। সুতরাং পুলিস যদি কিছু জানতে চায়, এইটিই জানবে! আপনারাও সেটি মনে রাখতে পারবেন।

বেশ, তারপর?

আপনাদের ঠিক সামনে ট্রাম রাস্তার ওপারে 'চিত্রা' সিনেমার ঠিক অপোজিটে যে উঁচু বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন, ওর টপ ফ্লোরে একটি ছেলে এসে থাকবে, আপনি তাকে জানেন।

আমার গা একটু রোমাঞ্চ হল। উনি না বললেও বুঝতে পারছি, উনি দীনেশ মজুমদারের কথা বলছেন। সে এখনও পলাতক অবস্থায় টালিগঞ্জে রয়েছে, এবং যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

বললুম, সে দক্ষিণ ছেড়ে উত্তরে আসতে চায় কেন?

সে চায় না—কল্যাণী বললেন, আমরা চাইছি! ওখানে ডাক্তার আর ওষুধপত্র আনা-নেওয়ার জন্য একটু জানাজানি হয়েছে আশেপাশে। ওকে শীঘ্রই সরানো দরকার, দিনের বেলায় ওর খাবারের বন্দোবস্ত হয়েছে এই নতুন জায়গায়। কিন্তু ওর রাত্রের খাবারটা পৌঁছিয়ে দিয়ে যাবে সাধনা। টিফিন ক্যারিয়ারে আনবে, আবার ওটা খালি করে ফেরত নিয়ে যাবে। সাধনা হয়ত

মাঝে মাঝে আপনাদের এখানে আসতে পারে। রান্না করা খাবার আমাদের বালীগঞ্জের বাড়ী থেকেই পাঠাবো।

বললুম, কিন্তু রতিবাবু আর আমি দুজনে শীঘ্রই যাচ্ছি নেপালে—কিছুদিন আমরা এখানে থাকব না—

সাধনা বলল, নেপালে যাচ্ছ? কেন মহারাজ?

আমি হাসলুম—মাঝে মাঝে আমাকে ভূতে পায়! ভূত ছাড়াতে যাচ্ছি।

কিভাবে যাবে?

হাসিমুখে বললুম, ভাগ্যবিধাতা দুখানা ঠ্যাং দিয়েছেন, এরই ভরসা। লোটা-কম্বল নিয়ে তীর্থে বেরিয়ে পড়ব।

কল্যাণী বললেন, আবার যাচ্ছেন পাহাড়ের দেশে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটা আমার নেশা। সে যাই হোক, আপনারা যা ব্যবস্থা করবেন তাই হবে। এখানে অবশ্য কেউ-না-কেউ থাকবে। সাধনা মাঝে মাঝে এসে দু-এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে যেতে পারবে।

অসুস্থ দীনেশ সম্বন্ধে কথাবার্তা স্থির হবার পর আমি ধরে বসলুম, সাধনা, তোমার সেই সেদিনের গানের কথা আমি ভুলিনি। আজ একটা গান গেয়ে শুনিয়ে যাও না কেন?

হেসে উঠল সাধনা। বলল, মহারাজ, তুমি আমাকে খুনী মেয়ে বলেই ধরে নিয়েছ। কিন্তু সেদিন তোমার চোখের মধ্যেই আমার গানের সুখ্যাতি দেখেছিলুম। আচ্ছা, আজ পুরনো একটা গান শোন—বলতে বলতে সাধনা গুনগুনিয়ে একটা গান ধরল—"নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে/তারই মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না—।"

গান শুনে রতি পালিত এসে অদূরে দাঁড়ালেন। কল্যাণী নতমুখে চুপ করে রইলেন। আমি গায়িকার কণ্ঠে আন্তরিক ব্যাকুলতার আর্তকণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিলুম। মেয়েটা যখন উচ্চতানে ধরল, "বিশ্বকমল ফুটে চরণ চুম্বনে/সে যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে/আমার চিত্তকমলটিরে সেই রসে কেন তোমার পানে নিত্য চাওয়া চাওয়াও না?"

সবাই বলবে মেয়েটা জাত আর্টিস্ট, তা বলুক। আমি নিজে সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু আমার দুই কানের মধ্য দিয়ে মেয়েটার সুরমাধুর্যের আকুলতা যেন মর্মের মধ্যে ঠাঁই নিল। ওর গানের সঙ্গে নামটিও মেলে।

এবার আমি বললুম, কল্যাণী দেবী, পুণ্যাশ্রমে এত মেয়ে থাকতে আপনি একে নিলেন কেন আপনাদের এই কঠিন কাজে? অথচ সেদিন শুনে এলুম, সাধনাকে

অনেকে পাগল ঠাওরায় ?

শ্রীমতী কল্যাণী সস্নেহে সাধনার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, ওকে পাগল বললে ও খুশী থাকে ! আমি জানি সাধনা আমার সবচেয়ে বিশ্বাসী আর সবচেয়ে দুঃসাহসী !

সাধনা এবার খুব হেসে উঠল। বলল, আমিই বলছি মহারাজ। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো ? আমার মধ্যে পুরুষের পরিমাণ বেশি !

রতিবাবু পর্যন্ত হেসে উঠলেন। বললেন, কিন্তু গানে যে আপনি এক দুর্লভ মেয়ে, আপনি মহাবিদ্যা ! আপনার তুলনা আমি দেখিনি।

ওঁরা দু'জন সেদিন বিদায় নেবার আগে আমি বলে দিলুম, আমাদের যাবার এখনও দিন কয়েক দেরি। তবে ফিরে আসতে আমাদের হপ্তা তিনেক লাগবে।

অতঃপর কয়েকদিন আমি লেখাপড়ার কাজ নিয়ে বসে গিয়েছিলুম। 'ভারতবর্ষ'-এ এ মাস থেকে আমার কেদার-বদরী নিয়ে লেখা ভ্রমণকাহিনী ছাপা হচ্ছে। ওটার নাম দিয়েছি 'মহাপ্রস্থানের পথে'। ওটা যেন আমার আগাগোড়া মুখস্থ, সেজন্য অনর্গল ঝরঝরিয়ে লিখে যাচ্ছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তিও 'ভারতবর্ষ' আপিসে গচ্ছিত করে দিয়ে যাবার চেষ্টা রয়েছে। ওর উপরে আরও গোটা দুই ছোট গল্প লেখার ফরমাস আছে। টাকাকড়ি কিছু পাব নিশ্চয়ই। কিন্তু যাবার আগে অনেক রকমের খরচা চালিয়ে হয়ত দশ-পনেরো টাকা হাতে থাকবে। ওতে দু'পিঠের রাহাখরচই কুলোবে না, খাইখরচ ত দূরের কথা। মোকামায় গিয়ে গঙ্গা পার হবো, তারপর উত্তর বিহারের ভিতর দিয়ে সগৌলি। সেখান থেকে আবার রক্সৌল। তারপর বীরগঞ্জ, অমলেকগঞ্জ, ভীমপেড়ি। অতঃপর পাহাড়ের পর পাহাড়।—লিখতে লিখতে আমি ভাবছিলুম, হয় পথেঘাটে অর্থাভাবে না খেয়ে মরব, আর নয়ত বাগমতার ঠাণ্ডা জল খেয়ে বাঁচব ! কিন্তু যেতে আমাকে হবেই। হিমালয় টানলে অন্য কিছু আর আমাকে টানে না !

শিবরাত্রির আর কয়েকদিন মাত্র বাকি। সুতরাং দিন আষ্টেক পরে রতিবাবুকে একবারটি তালিম দিতে গেলুম। আজ মঙ্গলবার, সামনের শুক্রবারে আমাদের যাত্রা। এবার তৈরি হোন, মশাই।

রতিবাবু দেখি হাসিখুশীতে গদগদ। বললেন, বলি ওহে মশাই, ওই গাইয়ে মেয়েটার কানে আপনি কী বীজমন্তর ফুঁকেছেন বলুন দেখি ?

বললুম, কেন, কি হয়েছে ?

কাল পর্যন্ত মেয়েটি তিনবার আপনার খোঁজে এল। হয়ত আজও আসতে পারে।

কারণ কি ?

তাই যদি জানব তা হলে তো হাত গোনা শিখতুম !—রতিবাবু বললেন, প্রথম দিন এসেই আপনার কথা তুলল। বলল, লোটা-কম্বল নিয়ে ত সন্নিসিরা যায় চিমটে বাজিয়ে। ওঁর সম্বল বুঝি কিছু নেই ? আমি হেসে বললুম, লেখকরা ত দিনভিখিরি ! তাদের আবার সম্বল কিসের ? ওঁর ওসব পথেঘাটে উপোস করার অভ্যেস আছে !

বললুম, কিন্তু এতবার খোঁজ করছে কেন আমার ? কাজের কথা কিছু বলে গেছে ?—আমার ঔৎসুক্য ছিল অন্য কারণে।

আহ্লাদে-আমোদে রতিবাবু যেন গলে পড়ছিলেন। বললেন, কথাই ত তাই, মশাই। আপনি পথেঘাটে না খেয়ে মরবেন, একি তার সহ্য হয় ? আমার কাছে গতকাল কেঁদে-কেটে,—এই দেখুন না, আপনার সব ব্যবস্থা করে গেছে ! এই দেখুন—

রতিবাবু নিজের গলা থেকে এক ছড়া সোনার সরু বিছে-হার খুলে আমার সামনে ধরলেন। ওজনে হয়ত দেড় বা দু'ভরি হতে পারে।

এ আবার কি ?—আমি বললুম, সোনার হার নিয়ে আমার কি হবে ? আপনি ওটা নিতে গেলেন কেন ?

নিলুম কি মশাই ?—রতিবাবু আবার বললেন গদগদ কণ্ঠে, নাঃ আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না ! আপনি একেবারে কাঠখোট্টা। বুঝলেন মশাই, 'রমণীর মন সহস্র বর্ষের সখা, সাধনার ধন'। উনি কাকুতিমিনতি করে এটি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে গেলেন,—আপনার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য ! গরীব লেখক আপনি, কপাল আপনার ফিরে গেল। তা বেশ, এটা এখন আমিই রেখে দিই। পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা ত বটে। এ আপনারই সাধনার ধন !

রতিবাবু সযত্নে ও সানন্দে হারগাছটা নিজের গলায় প'রে নিলেন।

যাই হোক, যথানির্দিষ্ট দিনে আমরা দুজন নেপালের উদ্দেশে রওনা হই এবং পথঘাট তৎকালে আদিম অবস্থায় থাকার জন্য অনেক দুঃখ দুর্যোগ পরিশ্রম ও অর্ধাহারের মধ্য দিয়ে কাঠমাণ্ডুতে গিয়ে পৌঁছই। তখন শিবরাত্রির কাল, এবং পশুপতিনাথ দর্শনের হুড়োহুড়ি। দেবদর্শনান্তে সেখানে দিন দুই থাকার পর আমি বোধ করি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হই। আমার রোগের অবস্থার ক্রমশ খারাপ লক্ষণ দেখে তখনকার কাঠমাণ্ডু হাসপাতালের ডাঃ সুধীন্দ্রলাল দাশগুপ্ত ও নরেন্দ্রনাথ মুস্তফী—এঁরা দু'জন আমাকে কুড়ি টাকা ধার দিয়ে এক 'ঝাম্পানে' তুলে দেন। সেটা প্রায় মড়ার খাটের মতো। আমি অর্ধচেতন অবস্থায় চিত হয়ে শুয়ে যখন

'শিশাগড়ি' ও 'চন্দ্রাগড়ি' পাহাড় পেরোচ্ছিলুম, তখন আকাশ থেকে ঈশ্বর আমার চিদানন্দময় মূর্তি দর্শন করে পুণ্যসঞ্চয় করছিলেন! রতিবাবু কাঠমাণ্ডুতে থেকে গেলেন তাঁর গলায় ওই হারগাছটা ঝুলিয়ে।

ভীমপেড়িতে আমাকে বাগমতীর ঘাটে নামিয়ে কুড়িটা টাকা আমার মাথার তলা থেকে নিয়ে কুলীরা চলে গেল। আমি বেপরোয়ার মতো বাগমতীর বরফ-গলা জলে স্নান করে নিউমোনিয়া সারালুম এবং উক্ত ডাঃ দাশগুপ্ত ও মুস্তফী—যাঁরা আমার আরোগ্যলাভ কল্পনাও করেননি—কলকাতায় ফিরে তাঁদের টাকা মনি অর্ডার যোগে পাঠিয়ে দিলুম। অতঃপর কিছুকাল পরে সেই হারটি গলায় পরেই রতিবাবু দেশে ফিরলেন। শ্রীমতী সাধনা বহু হয়রানির পর সেই হারগাছটি কিভাবে রতিবাবুর হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন, সে এক হাস্যকর কাহিনী। যাই হোক, এর আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত আমি 'দেবতাত্মা হিমালয়' গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

নেপাল থেকে ফিরে লেখাপড়ায় যখন মনঃসংযোগ করছিলুম তখন কানে এল, আমার ওই কেদার-বদরীর ভ্রমণকাহিনীর প্রথম কিস্তি তার নতুনত্বের জন্য একটা সাড়া তুলেছে! ভ্রমণকাহিনী তখন বাঙ্গলা সাহিত্যে খুবই কম এবং কতকটা গতানুগতিক। তবু ওর মধ্যে জলধর সেনের 'হিমালয়' এবং প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক 'হিমালয়ের পারে কৈলাস ও মানস সরোবর'—এ দুটি বই খুবই মূল্যবান। ওঁরা দু'জন পথিকৃৎ সন্দেহ নেই। সেক্ষেত্রে আমি আমার বাহাদুরি একেবারেই স্বীকার করিনে। তবে এটি লক্ষ্য করছিলুম, 'মহাপ্রস্থানের পথে' ভারতবর্ষে প্রতি মাসে এক-এক কিস্তি বেরোয়, আর পাঠক-মহলে যেন ঝড় ওঠে। বইখানা বোধ হয় গতানুগতিকতার পথ ধরে চলেনি, তাই সম্ভবত সাহিত্য-সমাজপতিদের তন্দ্রা ছুটে গিয়েছিল। এই সময়ে বাঙ্গলা সাহিত্যের 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আমাকে একখানি সুদীর্ঘ প্রশস্তিপত্র লেখেন, যেটি আমার পক্ষে তখন অভাবনীয় ছিল।

আমি আমার আশ্রম-রচনার চিন্তা কতকটা ছেড়েছি, কিন্তু বাগান-বাড়ি বানাবার কল্পনা আমাকে পেয়ে বসেছিল। পাখি আকাশে উড়ুক, তার ডানায় যত জোর আছে তাই নিয়ে ঘুরুক শূন্যে-শূন্যে। কিন্তু কোথাও কোনও অরণ্যে, কান্তারে, কোথাও এক বৃক্ষচূড়ায় তার একটি নীড় বাঁধা থাক্। এই রসকল্পনা মনে নিয়ে যখন নিঃসম্বল অবস্থায় এখানে-ওখানে ঘুরছি তখন আমার সাংবাদিক বন্ধু বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত একটি খবর দিলেন। বরিশালের হরিদাস মজুমদার মহাশয়—যিনি কোনও একটি স্টেটের ম্যানেজার—তাঁর বাড়ি আছে দমদম বিমান ঘাঁটির

গায়ে পূর্বদিকে—ওটার নাম নারায়ণপুর। ওখানে তিনি আমাকে কিছু জায়গা দিতে পারেন। খবর শুনে পরদিনই বিজয়বাবুকে নিয়ে পাতিপুকুর স্টেশন থেকে ছোট ট্রেন ধ'রে মাত্র কয়েক মাইল গিয়ে নারায়ণপুরে নামলুম। নিঝুম সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন গ্রাম। মশা, ডোবা, ম্যালেরিয়া—এসব নেই। সাদা শালুক ফুটে রয়েছে বড় বড় স্বচ্ছ দীঘিতে। কলকাতার অতি সন্নিকট। ওখানে হরিদাসবাবু সাদর অভ্যর্থনা করে তাঁর সুবৃহৎ অট্টালিকায় তুললেন। তিনি অতি ভদ্র, সৌম্যদর্শন এবং মিষ্ট-ভাষী। 'অমৃত সমাজ' এবং 'গীতাভবন'-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরই 'অমৃত' নামক সাময়িক পত্রের সম্পাদক হলেন বিজয়বাবু। এ ছাড়া হরিদাসবাবু কড়েয়া-রাসমণি বাজারের ওদিকে একটি মহিলা-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন—সেখানে সহায়-সম্বলহীনা মহিলারা থাকতে পারেন। হরিদাসবাবু উচ্চশিক্ষিত এবং এম-এ, বি-এল। তিনি যখন সামান্য অবস্থার মানুষ তখন কলকাতায় এসে পূর্বোক্ত স্টেটে চাকরি নেন।

এখানে নারায়ণপুরে তিনি আমাকে একটি চমৎকার তিন বিঘার প্লট বিনামূল্যে দিতে চাইলেন এবং একটি বাংলো তৈরির সর্বপ্রকার উপকরণ ও মালমসলা তিনি সরবরাহ করবেন ও তাঁরই মিস্তিরি মজুর আমার সব কাজ করে দেবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি আমাকে জমিটি দেখালেন। বাংলোটি নির্মাণের জন্য আমার যে ঋণ হবে, হয়ত হাজার দুই আড়াইয়ের মতো—সেটা ধীরে-সুস্থে পরিশোধ করলেই চলবে। এমন লোভনীয় প্রস্তাব তিনি করছেন কেন—আমার এই সোজাসুজি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, আপনাকে এখানে এনে বসাতে পারলে আমি আট-দশটি পার্টিকে প্রভাবিত করে এই গ্রামে এনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। আপনি রাজি হয়ে যান। বলা বাহুল্য, আমি হরিদাসবাবুর তিনতলা অট্টালিকার উপরে উঠে ওরই গায়ে বিস্তীর্ণ বিমানঘাঁটির সুন্দর দৃশ্য দেখে তখনই রাজি হয়ে গেলুম। যদি কখনও এদেশে যুদ্ধ বাধে এবং এই বিমানঘাঁটি আক্রান্ত হয়, তবে প্রথম মৃত্যু হবে আমার। ইংরেজসাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আমার সেই গৌরবজনক অপমৃত্যুর সম্ভাবনা স্মরণ ক'রে আমার রোমাঞ্চ পুলক হচ্ছিল!

যাই হোক আমার এই রাজি হবার সংবাদটি পেয়েছিলেন আমার বন্ধু রবি রায়—যিনি নাট্যমন্দিরের এক বিশিষ্ট অভিনেতা। তিনি ও তাঁর ভাই গিয়ে নারায়ণপুরে জমি নিয়ে ঘর তুলে বসবাস আরম্ভ করেন। আমার কপাল পোড়া, হরিদাসবাবুর স্নেহের দান আমি নিতে পারিনি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে এই সূত্রে আমার বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়ে গেল। আমার মধ্যে বৈরাগ্য ও বিষয়াসক্তি একই সঙ্গে কাজ করছিল। আজ যেটা পরম আসক্তির সঙ্গে প্রাণপণে আঁকড়িয়ে ধরি,

আগামীকাল সেটা আমার কাছে তার সব অর্থ হারায়! আমি সম্ভোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসের কথা ভাবি।

যতদূর মনে পড়ছে এমনি একটা সময়ে দার্জিলিঙে লেবং-এর রেসকোর্সে বাঙ্গলার তদানীন্তন গভর্নর স্যার জন অ্যাণ্ডারসনকে গুলী করে হত্যা করার চেষ্টা করতে গিয়ে দুটি তরুণ যুবক ধরা পড়ে যায়। তাদের মধ্যে একটি ছেলের নাম রবীন ব্যানার্জি। ওদের সঙ্গে একটি মেয়েও জড়িত ছিল। তার নাম উজ্জ্বলা মজুমদার। এই সংবাদটি শোনার পর আমি আপাতত আমার নতুন কুটুম্ব শ্রীমতী শোভার ওখানে যাতায়াত বন্ধ করেছিলুম।

এর মধ্যে কিছুকাল আগে আমার দু'খানা নবপ্রকাশিত বই 'নিশিপদ্ম' ও 'কলরব' অসীম সাহসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলুম—যেমন অনেকেই তখন পাঠাতো। তখনকার দিনে কালিকলম, কল্লোল ও প্রগতির লেখকগোষ্ঠীর রচনাকে 'তরুণ সাহিত্য' বলা হত। এই সাহিত্যের তথাকথিত 'দুর্নাম' ছিল প্রচুর। কিন্তু সম্প্রতি নব্যলেখক ও কবিদের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ ও গল্প-উপন্যাস প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করার ফলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছিল।

কবিকে বই পাঠিয়েছি বেশ কিছুদিন হয়ে গেল। প্রথমটা আমার বুক দুরু দুরু করছিল, এখন সে অস্বস্তি সয়ে গেছে। বই নিশ্চয় তাঁর হাতে পড়েনি, নয়ত তাঁর আশেপাশের লোক তাঁকে পড়তে মানা করেছে। আর নয়ত তাঁর বিশ্বজোড়া কাজের মধ্যে আমার সামান্য বই কোথায় তলিয়ে গেছে। আমি ভাবছিলুম, কবিকে বই না পাঠালেই হত!

এমনি সময় বৈশাখের প্রারম্ভে একদিন হঠাৎ একখানা খামের চিঠি এল। উত্তরায়ণ, শান্তিনিকেতন থেকে লিখেছেন শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী। চিঠিখানা এই প্রকার: সবিনয় নিবেদন, কবি মনে করেছিলেন আপনাকে কিছু না জানিয়ে প্রথমেই আপনার বই সম্বন্ধে তাঁর প্রশংসা-বাক্য কাগজে বার করবেন। "পরিচয়" পত্রিকা কি আপনার হাতে পৌঁছয়নি? তাতে উনি অন্য প্রসঙ্গে আপনার বই সম্বন্ধে বলেচেন। আপনার লেখা তাঁর বিশেষ রকম ভালো লেগেচে। আমার প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করুন। ভবদীয়..." ১৯।৪।৩৩।

কবি অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তখন রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি। খামের চিঠিতে তখন ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ মার্কা এক আনা অথবা এক আনা তিন পাই দামের স্টাম্প মারা হ'ত। সে সময়ে কলকাতার সরকারী আপিসে খাঁটি তামার পাই-পয়সা চলত। বারো পাই হলে এক আনা হ'ত।

সে যাই হোক, তৎকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তরুণ সাহিত্যের মানসপ্রকৃতি ও

সাহিত্যনীতি নিয়ে এখানে-সেখানে আভাস-ইঙ্গিতে একটু-আধটু মন্তব্য করেছেন মাত্র। কিন্তু সেদিন অবধি কোনও তরুণ লেখকের কোনও বিশেষ বই নিয়ে তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোথাও সমালোচনা বা আলোচনা করেছেন কিনা আমার মনে পড়ছে না। সেই কারণে আমার বই দুখানাকে কেন্দ্র করে তরুণ সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ওই 'প্রথম প্রত্যক্ষ অভিমত একটি ছোটখাটো ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, তাই জন্য তাঁর সমালোচনার ওই অংশটা এখানে তুলে দিচ্ছি :

"ঠিক এই সময়েই প্রবোধ সান্যালের 'কলরব' আর 'নিশিপদ্ম' বই দুটি আমার হাতে পড়ল। এরা সম্পূর্ণ অন্য জাতের। এরা নিছক আধুনিক।

"রিয়ালিজম এবং আইডিয়ালিজমকে প্রাকৃতিকতা এবং ভাবিকতা নাম দেওয়া যেতে পারে। এই দুটোকে নিয়েই মানুষের কারবার। প্রকৃতিকেও সে স্বীকার করতে বাধ্য, তার সঙ্গে তার আপন ভাবের সৃষ্টিও আপনি এসে মেশে। দুইয়ে মিলেই তার রিয়ালিটি। কোনো একটা সাহিত্যিক মতবাদ নিয়ে বলা চলবে না যে মহাভারতের শকুনিই সত্য আর অর্জুন তা নয়, কিম্বা কর্ণের মধ্যে যে অংশে নীচতা সেই অংশে তা রিয়ল, যে অংশে মহত্ত্ব সেই অংশটাই বানানো।

"মহাভারতে প্রাকৃতিক এবং ভাবিক অনায়াসে মিশে গেছে, এমন কি অপ্রাকৃতও আপন জায়গা নিয়েচে বিনা কৈফিয়তে। অত বড় সর্বগ্রাহী গল্প জগতের আর কোনো সাহিত্যে লেখা হয়নি। ওর মধ্যে সাহসের সীমা নেই।

"কিন্তু নবীন মতবাদওয়ালাদের সাহিত্যে ভীরুতা আছে যথেষ্ট। এরা সুন্দরকে ভয় করে পাছে কেউ গাল দিয়ে বসে এসব মন ভোলাবার ছল, ভালোকে সরিয়ে ফেলে পাছে সেটাতে গুরুগিরির অপবাদ লাগে। এমনি করে এরা কিছুতেই অসঙ্কোচে সহজ হতে পারে না। সাহিত্যে ভালোটা মন্দর চেয়ে ভালো এমন কথা যদি বা অশ্রদ্ধেয় হয় তবু সাহিত্যে ভালোমন্দর একই দর অন্তত এও তো মানতে হবে। কিন্তু এমন ব্যবহার করলে তো চলবে না যে মন্দটার দর ভালোর চেয়ে বেশি—যেহেতু মন্দটাই রিয়ল। সাহিত্যে এরা এমন একটা জাল পাততে চায়, যে জালে চুনোপুঁটি পড়ে, এড়িয়ে যায় রুই কাৎলা। রুই কাৎলাকে গাল দিয়ে বলে ওগুলো উঁচ-কপালে সৌখীনদের মাছ। কোনো কারণে কোনো ভোজে বা কোনো তরকারিতে চুনোপুঁটির যদি বিশেষ ফরমাস থাকে তাহলে আপত্তি করব না কিন্তু কুলবন্ধনের নতুন নিয়মে বড়ো মাছকে যদি একঘরে করা হয় তা হলে বলতেই হবে খাঁটি রিয়ালিজম্ এ নয়, এটা বিশেষ দলের ঘরগড়া রীতি, অর্থাৎ কনভেনশন্ নীচতাকেই কৌলীন্যের একমাত্র মর্যাদা দেওয়া। এটাকে বাইরে দেখতে মনে হয় সাহসিকতা কিন্তু বস্তুতই এটা ভীরুতা। এটা বাঁধা রাস্তার আধুনিকতাগিরি।

"প্রবোধ সান্যালের 'কলরব' পড়লুম। পড়ে তাঁর রচনা ও কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হোলো। এই বইয়ে নানা চরিত্র ও নানা ঘটনার ভিড়। কোন-টাকেই মনে হয় না যে বেঠিক। এতগুলো মেয়ে পুরুষকে স্পষ্ট করে গড়ে তুলতে ক্ষমতা দরকার। সে ক্ষমতা আছে লেখকের।

"লেখক ইচ্ছে করেই এই বইয়ে দেখাতে চেয়েছেন, একটা বাড়িতে অত্যন্ত সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার একটা ঘোলা আবর্ত! তারা পরস্পর কাছাকাছি আছে এই পর্যন্ত, কিন্তু তার চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাদের নেই। যেমন অনাদৃত গলি যত রকম আবর্জনায় নোংরা দুর্গন্ধ এবং অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে এ বাড়িতে তেমনি বহুলোকের চিত্তদৈন্য ও অবস্থাদৈন্যের যত কিছু উচ্ছিষ্ট স্তূপাকার হয়ে বাতাসকে মলিন করে তুলেচে। এর মধ্যে অসামান্যতা কোনো চরিত্রে কিছুমাত্র নেই তা নয়—কিন্তু সে কেমন, হাসপাতালে মাঝে মাঝে যেমন দেখা যায় নার্স কিম্বা ডাক্তার কিম্বা ছাত্র। তারা মুখ্য নয় তারা গৌণ।

"হাসপাতালটা সাধারণ সংসারের প্রতিরূপ নয়। সাধারণ সংসার স্বাস্থ্যে অস্বাস্থ্যে মেলানো; সেইটাকেই বলা যেতে পারে রিয়ল। হাসপাতাল রিয়ল নয়, অর্থাৎ স্বাভাবিক নয়, ও একটা ছেঁকে আনা জিনিস। তবু ওর স্বীকৃতির দাবী আছে, কেবল প্রয়োজনের দিক থেকে নয়, অস্তিত্বের দিক থেকে। ওটা একটা-কিছু হয়ে দাঁড়িয়েচে অতএব সেই মূল্য তাকে দেওয়া চাই। 'কলরবে'র বাসাখানাও নিছক অসুস্থদেরই বাসা। সংসারে তারা এ-গলিতে ও-গলিতে ছড়িয়ে থাকে। তাদের ছেঁকে এনে একটা জায়গায় সংহত রূপ দেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ যা ছিল ক্ষেতের মধ্যে তাকে টিনের মধ্যে বিশেষ জারক রসে ডুবিয়ে প্যাক করা হলো। আচ্ছা তাই সই।

"হাসপাতাল সংসার থেকে দূরের জিনিস, স্বতন্ত্র করা তার সত্তা। সেই দূরের দৃশ্য বিশেষ দিনে দেখতে যাওয়া চলে, রোগীরূপে নয়, ডাক্তাররূপে নয়, নিরাসক্ত দর্শকরূপে। সেই হিসাবে এই হাসপাতালী গল্পটাকেও কি রোমান্স বলব না। কিন্তু যদি বলি রোমান্টিক তাহলে আধুনিক মতওয়ালারা লজ্জা পাবেন, কেননা ও শব্দটাকে তাঁরা পছন্দ করেন না। উপায় নেই, পাঠক গল্প শুনতে চেয়েচে, লেখক গল্প জুগিয়েচে নিত্যনৈমিত্তিক সংসার থেকে দূরের দৃশ্যে। মনটা ছুটিতে দূরে যেতেই চায়—গল্প ছুটির জন্যেই। এই দূরের হাওয়া বিচিত্রবর্ণ বসন্তের হতে পারে, হতে পারে ফ্যাকাশে রঙের দরিদ্র শীতের।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৪০

রাজনীতির দিক থেকে এই সময়টা তখন খুব ঘোরালো।

বাঙ্গলার বিপ্লববাদকে শুধু দমন নয়, ওটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য বাঙ্গলার বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছে ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়। বস্তুত তৎকালে বাঙ্গলার লাট, বাঙ্গলার গভর্ণমেণ্ট, লালবাজারের পুলিস ঘাঁটি, ফোর্ট উইলিয়মের বৃটিশ সামরিক অফিসার, বৃটিশ ব্যবসায়ী সমাজ এবং ইলিশিয়ম রো-র গোয়েন্দা বিভাগ—এরা সবাই একযোগে বাঙ্গলার বিপ্লববাদকে শায়েস্তা করার জন্য সর্বপ্রকার কৌশলকর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন। এঁদের গোপন বৈঠক বসত রাত্রের দিকে গভর্ণমেণ্ট হাউসের নিভৃত অংশে। এঁরা বিশ্বাস করতেন বাংলার এই বিপ্লববাদী এবং বৃটিশ-বিরোধী চিন্তাধারাকে যদি উচ্ছেদ করা যায় তবে সর্ব ভারতকে মুঠোর মধ্যে আনা সহজ হবে। বাঙ্গলা হল নাটের গুরু। বাঙ্গালীকে ঠাণ্ডা করে দিতে পারলে ভারত নিজের থেকেই জুড়িয়ে যাবে।

সেই কারণে বাঙ্গলায় দমননীতির চেহারা এ বছরে ছিল প্রচণ্ড। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, রাজনৈতিক সম্মেলনের উপর কড়াকড়ি, বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার সংবাদ কাগজে না বেরোয় তার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারী, কাগজের জামানত কথায় কথায় বাজেয়াপ্ত করা, সামান্য সন্দেহে যে কোনও ছেলেকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা বিভাগে নিয়ে যাওয়া এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক বন্দীদের উপর নির্দয় উৎপীড়ন। এগুলি সব একত্র করে যা দাঁড়ায়, সে হল একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব। বিপ্লববাদীরা যখন হাসিমুখে জেলে ও দ্বীপান্তরে যাচ্ছে, যখন হাসিমুখে ফাঁসীর দড়ি গলায় নিচ্ছে, ইংরেজের চক্ষু তখন প্রতিহিংসায় রক্তবর্ণ!

একদিকে এইভাবে সমগ্র বঙ্গভূমি যখন রক্তে, আগুনে, আত্মবিসর্জনে, দেশাত্মবোধের উন্মাদনায়, জাতীয় ভাবাবেগে এবং নির্দয় উৎপীড়নে আলোড়িত তখন অন্যদিকে দেখি একই কালে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জয়যাত্রা। রবীন্দ্রনাথের নবতম রসের চিত্রকলা, সংগীত ও নাট্যাভিনয়, শশী অধিকারীর যাত্রা, অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী, নিউ থিয়েটার্সের এক-একটি সাফল্যমণ্ডিত সবাক চিত্র, নাট্যমন্দির ও আর্ট থিয়েটারের যুগান্তকারী এক-একখানি নাটক, উদয়শঙ্করের অপরূপ নৃত্যসভা, শরৎচন্দ্রের একটির পর একটি মনোরম উপন্যাস, নজরুলের চিত্তাকর্ষক শ্যামাসঙ্গীত, এবং কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির প্রত্যেক লেখকের কবিতায়, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, নব নব সাহিত্য ও জীবনচিন্তার মৌলিক অভিব্যক্তি —সমগ্র বিদগ্ধ বাঙ্গালীর মনকে অভিভূত করে তুলেছে।

এই বছরটি ছিল রাজা রামমোহনের মৃত্যুশতবার্ষিকী উদযাপনের বছর। শুধু বাঙ্গলায় নয়, ভারতের বহু অঞ্চলে এবং বিলাতের ব্রিস্টল নগরের উপান্তে যেখানে

রামমোহনের সমাধিক্ষেত্র—সেখানেও রাজা রামমোহনের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দানের আয়োজন করা হয়। যতদূর মনে পড়ছে, রবীন্দ্রনাথ বোধ করি এই উপলক্ষে 'ভারত পথিক রামমোহন' নামক তাঁর প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ রচনা করেন। কলিকাতা নগরী রামমোহনের প্রসঙ্গে সর্বত্র মুখরিত হয়েছিল। চারিদিকে রামমোহনের উদ্দেশে ওই শ্রদ্ধাঞ্জলির মধ্যে আমারও শ্রদ্ধা যোগ করেছিলুম একটি বেতার ভাষণে। লেখাটি ছাপা হয়েছিল দু'একটি কাগজে।

অন্য দিকে এই বছরের প্রারম্ভে ব্রিটিশ শক্তির উৎপীড়ন যখন চরমে ওঠে সেই সময় কংগ্রেস ঘোষণা করে কলকাতায় এই জাতীয় মহাসভার ৪৭তম অধিবেশন বসবে এপ্রিলের প্রথমে। তখন গান্ধীজী প্রমুখ বহু সর্বভারতীয় নেতা কারাগারে এবং বাঙ্গলার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বন্দী অবস্থায় এবং অসুস্থ দেহে পুলিস পাহারায় রয়েছেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বলা বাহুল্য, ১৯৩৩-এর এই কংগ্রেস অধিবেশনকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। তৎকালীন পুলিসের সর্বোচ্চ কর্তা ছিলেন মিঃ রবার্টসন এবং তাঁর খ্যাতি ছিল এই, তিনি নাকি দুর্ধর্ষ। তাঁর নির্দেশ ছিল, এই অধিবেশন উপলক্ষে কোথাও প্যাণ্ডাল বা আটচালা বাঁধা চলবে না।

এইপ্রকার জাতীয় সঙ্কটকালে তৎকালীন নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মেলনের অসম-সাহসিক কর্মীরা অগ্রসর হয়ে এসেছিল, কিন্তু প্রথমেই তাদের অনেককে 'বঙ্গীয় নিরাপত্তা আইনে' গ্রেপ্তার করা হয়। এই ছাত্র সম্মেলন ও 'ছাত্রী সঙ্ঘের' প্রথম জন্ম ঘটে ১৯২৮ সালে এবং তাদের মুখপত্রটির নাম দেওয়া হয় 'ছাত্র'। এদের উভয়ের সম্মিলিত প্রথম অধিবেশনে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ও সুভাষ-চন্দ্র যোগদান করেন—এই খবরটি পেয়েছিলুম আমি যখন রাওয়ালপিণ্ডি জেলার পার্বত্য শহর মারী পাহাড়ে বাস করছিলুম। এই ছাত্র সম্মেলন ও 'ছাত্র' কাগজের সঙ্গে লিপ্ত ছিল আমাদের তরুণ কবিবন্ধু গিরিজা মুখোপাধ্যায়। সে ছাত্রদলের অন্যতম নেতা। ১৯৩১ সালে সে লণ্ডনে যায় এবং সেই থেকে একপ্রকার নিরুদ্দেশ জীবনযাপন করে। তার নাটকীয় জীবনকথা পরে আলোচনা করব। যাই হোক, ছাত্র সম্মেলনের প্রথম সভাপতি ও জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন যথাক্রমে প্রমোদকুমার ঘোষাল, শচীন্দ্রনাথ মিত্র ও বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। অতঃপর 'ছাত্রী সঙ্ঘে'র সভানেত্রী ও সেক্রেটারি নির্বাচিত হন যথাক্রমে শ্রীমতী সুরমা মিত্র, কল্যাণী দাস এবং তাঁদেরই সঙ্গে যুক্ত হন বীণা দাস, ইলা সেনগুপ্ত, রেণুকা সেনগুপ্ত প্রভৃতি। কালক্রমে এই দুই সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠান জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিপুল কর্মশক্তির পরিচয় দেয়।

ইংরেজ পুলিস ১৯৩২ সালের দিল্লীর কংগ্রেস ভেঙ্গে দেয়। প্রত্যেক নেতাকে জেলে ঢোকায়। অর্থাৎ বিগত ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারিতে যখন লাহোর কংগ্রেসে প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করা হয় এবং করাচীতে সেই বছরের ছোট কংগ্রেসে সেই দাবি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন থেকেই ব্রিটিশ রাজশক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা দুই নির্দয় বড়লাট ও ছোটলাটকে পাঠায় দিল্লীতে ও কলকাতায়। একজনের নাম লর্ড উইলিংডন, অন্যজনের নাম স্যার জন অ্যাণ্ডারসন। রবীন্দ্রনাথ এই সময় বোধ হয় তাঁর কালান্তর নামক প্রবন্ধে একটু তামাশা করেছিলেন, "দিল্লীশ্বরোবা উইলিংডনেশ্বরো বা"।

যাই হোক এটি ১৯৩৩। এ বছরে দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ শাসকদের হাতে একটির পর একটি অর্ডিনান্স, একটির পর একটি জনবিরোধী আইন। তারা এখন প্রবল পরাক্রান্ত, নির্মম, দানবীয়, মারমুখী ও হত্যাগ্রহী। তারা ২৬শে জানুয়ারির প্রতিটি মিছিল, সভাসমিতি, জনসমাবেশ ইত্যাদিকে বলপ্রয়োগের দ্বারা ছারখার করেছে এবং রক্ত ঝরিয়েছে অনেক। আবার দু মাস পরে এই কংগ্রেস অধিবেশন। কথা ছিল, এই অধিবেশনের মূল সভাপতি হবেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। ওঁরা সবাই ট্রেন-যোগে আসছিলেন কলকাতায়। এম-এস-আনে, জওয়াহরলালের জননী স্বরূপরানী, ডাঃ সইয়েদ মাহমুদ, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, রফি আহমেদ কিদোয়াই, কে ডি মালবীয়, চন্দ্রভান গুপ্ত এবং আরও অনেকে। তাঁদের সবাইকে মাঝপথেই গ্রেপ্তার করা হয়। অন্য দিক থেকে হাজারে-হাজারে প্রতিনিধি কলকাতায় বিভিন্ন প্রকার যানবাহন, এমন কি পায়ে হেঁটেও জড়ো হতে থাকেন। এই অগণিত সংখ্যক প্রতিনিধিদের জন্য বাঙ্গলার ছাত্র ও ছাত্রী সমাজ কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ৪৫ খানা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। বলা বাহুল্য, ভারতের মধ্যে গোয়েন্দা পুলিসের সর্বপ্রধান কেন্দ্র হল কলকাতার ইলিসিয়ম রো ওরফে লর্ড সিংহ রোড এবং ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দারা হলেন বাঙ্গালী! বাঙ্গালীর অপরাজেয় প্রতিভা এদিকেও সর্বজন-স্বীকৃত। কিন্তু এদের চক্ষুকেও ফাঁকি দিয়ে ছাত্রসমাজ সংগোপনে এই অধিবেশনটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার চেষ্টা পেয়েছিল। -

ব্রিটিশ প্রশাসন অনেক আগে থেকে এই কংগ্রেস বা যে কোনও স্থলের জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করেছিল। দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ চতুর, গোয়েন্দা-বিভাগ চতুরতর, কিন্তু কংগ্রেসী ছাত্রসমাজ চতুরতম! ইতিমধ্যে তারা সেনগুপ্তের পত্নী নেলী সেনগুপ্তাকে মূল সভাপতির পদে নির্বাচিত করে রাখে। স্বনাম-ধন্যা অ্যানি বেসান্ত সকল জাতি ও সমাজের উর্ধ্বে ছিলেন—যেমন ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয়া মাদাম ব্লাভাটস্কি। আজ এক ইংরেজ মহিলা সকলের মাঝখানে

এসে উপস্থিত হলেন এই জাতীয় সঙ্কট-মুহূর্তে।

আজ এই নাটকটি বিয়োগান্ত হবে কিনা, অথবা কি প্রকারে শেষ হবে এই উৎকণ্ঠায় ধর্মতলা ও চৌরঙ্গীর মোড়ে ব্রিস্টল হোটেলের দোতলায় উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। এটা নিরাপদ, তবে এটি পুলিস কর্তৃক আক্রান্ত হবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

আমার ঠিক সামনে চৌরঙ্গীর মোড়ের কাছেই তখন ট্রামওয়ে কোম্পানীর ছয়-চালা গুমটি। ওর ঠিক পাশেই বসবে কংগ্রেসের অধিবেশন—এই সংবাদটি গোপন রাখা হয়েছিল। ঠিক বেলা তিনটার সময় তারস্বরে এক বিউগল বেজে উঠল এবং তারই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে হাজারে-হাজারে প্রতিনিধি ও শত শত ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক পিলপিল করে ছুটে চলল গুমটির দিকে এবং দেখতে দেখতে আশে-পাশে লাখ দুই জনসাধারণ! ট্রাম, মোটর, ট্যাক্সি, ট্রাক—সমস্ত আটকিয়ে গেল। শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল মতি শীলের গলিতে। তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন ট্রাম-গুমটির দিকে। 'বন্‌দে-এ-এ মাতরম!'

সেই ক্ষণের মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ও চারিদিকের জাতীয় পতাকার শোভা পুলিস কমিশনার মিঃ কলসনের কম্পিত হৃৎপিণ্ডে প্রচণ্ড রক্তের পিপাসা জাগিয়ে তুলেছিল। মেয়েরা গিয়েছিল কোলে-কাঁকালে শিশুকে নিয়ে। পুলিস তখনই বক্তৃতারতা নেলী সেনগুপ্তা ও গোপিকাবিলাস সেনকে গ্রেপ্তার করে গাড়িতে তুলে নিল। অতঃপর প্রহার-নাট্যের আরম্ভ। যখন এক-একজন প্রতিনিধি প্রস্তাব-বাক্য পাঠকালে পুলিসের লাঠির আঘাত খাচ্ছিলেন এবং লাঠির ঘায়ে কপাল বেয়ে রক্তধারা নামছিল, তখন দেখা যাচ্ছিল একখানা হাত ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে অসীম যন্ত্রণার মধ্যেও অন্য হাতে কাগজ ধরে তাঁরা শপথ-বাক্য পাঠ করছিলেন। এ দৃশ্য দুর্লভ। অমন একটির পর একটি। অবিমিশ্র অহিংসার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড হিংসার সেই আক্রমণের ফলে সেদিন যে-রক্তস্রোত বয়েছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সেটি স্মরণীয়।

ফরাসী চন্দননগরে মতিলাল রায় মহাশয় 'প্রবর্তক সঙ্ঘ' নামক এক সর্বার্থসাধক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী হয়ে উঠেছিল। খাদ্য বস্ত্র কুটীরশিল্প ইত্যাদি সকল বিষয়ে এঁরা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বনির্ভর ছিলেন। চন্দননগরে ওঁদের এক আশ্রম ছিল, হয়ত এখনও আছে, সেখানে বহু অধ্যাত্মসাধক এবং বোধ করি সাধিকারাও থাকতেন। কর্মীরা কেউ বেতনাদি নিতেন না, তাঁদের সর্বপ্রকার ব্যয়ভার বহন করেন 'প্রবর্তক সঙ্ঘ'।

এই সঙ্ঘেরই জনৈক সাধক কর্মীর হাতে ছিল 'প্রবর্তক' মাসিকপত্র। এঁর নাম রাধারমণ চৌধুরী। চৌধুরীমশায় আমাকে প্রবর্তকের নিয়মিত লেখক করে তোলেন এবং সেই সূত্রে ওঁদের বহুবাজারের আপিসে আমার যাতায়াত ছিল। ওই যাতায়াতের কালেই এক তরুণ সুদর্শন যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তার নাম প্রতুল। সে তখন সবেমাত্র এসেছে ময়মনসিংহ থেকে। সে আমাকে প্রথম দিনেই নিজের আঙ্গুলে লম্বা এক টুকরো দড়ি বেঁধে দেশলাই জ্বেলে দড়ির মাঝখানটা পুড়িয়ে দিতে বলল। আগুনে পুড়ে দড়িখানা দু খণ্ড হয়ে গেল। কিন্তু ভোজবাজির কৌশলে সেই দড়ি আবার জোড়া লেগে একখানাই হয়ে উঠল! আমি চমৎকৃত হলুম। যুবকটি পকেট থেকে একটি নোটবই বার করে বলল, আপনার ভালো লেগেছে, এটুকু লিখে দিন? চৌধুরীমশায়ের সামনেই আমি সোৎসাহে প্রতুলের খাতায় আমার স্তুতিবাদ লিখলুম।

এই যুবক পরবর্তীকালে আপন যোগ্যতা ও প্রতিভায় হয়ে ওঠে যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার! যাদুবিদ্যার প্রচারকার্যে প্রতুল সিদ্ধহস্ত ছিল। সে কালক্রমে পৃথিবীর সকল দেশে তার যাদুবিদ্যার প্রতিভা প্রকাশ করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিল।

যাই হোক, আমি প্রবর্তকের নিয়মিত লেখক হয়ে উঠেছিলুম। ওই একটা সময়ে মতিলাল রায় মহাশয়ের সঙ্গে আমি পরিচিত হই। তিনি তখন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে একপ্রকার কঠোর ব্রতচারণে ব্যাপৃত থাকতেন এবং আমার বিদ্যা সামান্যই—আমি শুনতুম উভয়ে বিভিন্নরূপ তন্ত্রসাধনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। শুনেছি একদা রায় মহাশয় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে একত্র বসবাস করেছেন এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর থেকেই পণ্ডিচেরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মতিলাল রায় মহাশয় আমার প্রতি স্নেহশীল

হয়ে উঠেছিলেন এবং আমার সাহিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে সেটি প্রবর্তকে প্রকাশ করেন।

শুধু প্রবর্তক নয়, আমি তখন নিয়মিত লিখি ভারতবর্ষে এবং প্রায়ই প্রবাসীতে। ভারতবর্ষে তখন আমার উপন্যাস 'নবীন যুবক' বেরোচ্ছে এবং তার মধ্যে স্বদেশীয়ানার গন্ধ থাকার জন্য পাবলিক প্রসিকিউটর লাল-নীল পেন্সিলের দাগ দিয়ে বিশেষ বিশেষ সংখ্যার 'ভারতবর্ষ' গুরুদাসে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন।

এমনি একটা সময়ে আমার সঙ্গে হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা ঘটে দুটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং অন্যজন হলেন কবি স্থরেন্দ্রনাথ মৈত্র। এঁরা উভয়েই তখন থাকতেন আলিপুরের 'পশ' অঞ্চলে—যাঁদের বাড়ির চাকর বা বাবুর্চিদের বাজার-হাট করার জন্য দ্বিতীয় মোটরকার মোতায়েন থাকত এবং তারা আলিপুরের ব্রিজ পেরিয়ে ময়দানের ভিতর দিয়ে গিয়ে হগ-মার্কেট থেকে রসদ কেনাকাটা করে আনত।

রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় তখন প্রবীণবয়স্ক এবং পক্ককেশ। তিনি অতিশয় ভদ্র, অমায়িক ও মিষ্টভাষী। তাঁর আচার-আচরণ ও আপ্যায়নে অভিজাত বাঙ্গালীর সহজাত সংস্কৃতির স্বাদ পেতুম। যে স্থবৃহৎ বাগান-ঘেরা বাড়িতে তিনি বাস করতেন, সেটিকে অট্টালিকা না বলে একটি প্রাসাদপুরী বললেই মানায়। স্যার আশুতোষ চৌধুরীর পুত্র স্থপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী আর্যকুমার চৌধুরী রণেন্দ্রমোহনের কন্যা কবি শ্রীমতী লীলাকে বিবাহ করেন। তৎকালে শ্রীমতী লীলা দেবী কলকাতায় অভিজাত মহলে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থন্দরী ও স্থদর্শনা হিসাবে বর্ণিতা ছিলেন। আর্যকুমার চৌধুরী মহাশয় তৎকালে নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্র 'মানসী ও মর্মবাণী'তে শ্রীমতী লীলা দেবীর বহু 'মুড' সম্বলিত একটির পর একটি ছবি প্রকাশ করে বাঙ্গলার পাঠক সমাজকে আনন্দে অভিভূত করতেন। তাঁর মুখশ্রী ও সৌন্দর্যের সঙ্গে একটি অনৈসর্গিক লাবণ্য দেখতে পেতুম।

এই পরিণত-যৌবনা মহিলা তখন আমার চেয়ে প্রায় বছর দশেকের বড় ছিলেন। তাঁর অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'কিশলয়' থেকে আমি একেকটি কবিতা আবৃত্তি করে যখন তাঁকে শোনাতুম, তিনি অনুপ্রাণিত কণ্ঠে বলতেন, এ কবিতা আমার নয়, আপনার!

তাঁর এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লেখেন ডাঃ স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়। তিনি 'মানসী ও মর্মবাণী'র যুগে বঙ্গ-সাহিত্যের একজন কেউ-কেটা ছিলেন এবং এই ভূমিকায় তিনি ঠারে-ঠোরে রবীন্দ্রনাথকে ঈষৎ খোঁটা

দিয়েছিলেন। এটি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের কথা। এই সময় সর্বাধিকারী মহাশয় একটি ভ্রমণকাহিনী লিখছিলেন 'ভারতবর্ষ'-এ—"ইউরোপে তিন মাস"। কিন্তু তাঁর এই ভ্রমণকাহিনী যখন পরবর্তী তিন বছরেও শেষ হচ্ছিল না, তখন একটি ঠোঁট-কাটা কুমারী মেয়ে সম্পাদক জলধর সেনের নিকট একটি চিঠি পাঠিয়ে প্রশ্ন করে, "সর্বাধিকারী মহাশয় কি গোরুর গাড়িতে চড়ে ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন?"

অতঃপর মাস দুয়েকের মধ্যে এই ভ্রমণবৃত্তান্তটি বন্ধ হয়ে যায়।

কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় আমাকে প্রায়ই আমন্ত্রণ জানাতেন তাঁর আলিপুরের বাড়িতে। তাঁর ধারণা আমি কাব্যচর্চার অধিকারী এবং আমার ধারণা এর বিপরীত। তিনি একদা বাঙ্গলার শিক্ষাবিভাগের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ছিলেন, এখন অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর সংসারটি ছোট। স্বামী, স্ত্রী ও একটিমাত্র কন্যা—এই নিয়ে পরিবার। তরুণী ও সুশ্রী মেয়েটির নাম নোটন। সুরেনবাবু আপাতত কোন্ এক স্টেটের ট্রাস্টির চেয়ারম্যান।

'বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগ'-এর কর্তা দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় হলেন সুরেনবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর। তিনি আমার বিশেষ পরিচিত। ভদ্রলোক শৌখীন, প্রবীণ ও সুপুরুষ। কিন্তু তাঁর একটি চোখ ছিল কাঁচের তৈরি।

আমার মুখ থেকে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর মতো সুরেনবাবুও তাঁর কবিতার আবৃত্তি শুনে আনন্দ পেতেন। তিনিই বোধ করি ব্রাউনিং দম্পতির কবিতা প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করেন,—কিন্তু এটি আমার সঠিক মনে নেই। আমি নিজে রবার্ট ব্রাউনিং বা ইলিজাবেথ ব্রাউনিং-এর কবিতা যথেষ্ট অনুরাগ নিয়ে পড়তুম না। ওঁদের কাব্যভাবনা ও গুরুভার ভাষার জটিলতা আমাকে পীড়া দিত। যেমন মাঝে মাঝে পীড়া দিত আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্তর কবিতা। সুরেনবাবু ব্রাউনিং দম্পতির প্রতি শ্রদ্ধানুরাগে মুখর হয়ে যখন তাঁদের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর তুলনা করতেন, তখন আমার সঙ্গে তাঁর বচসা বেধে যেত! আমার জ্ঞান ও বিদ্যা কম। কিন্তু একথা জানতুম, ইংরেজ আমলে ইংরেজ শিক্ষাবিদ্‌দের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কলকাতার এক শ্রেণীর ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ইংরেজ কবি চসার, কারলাইল, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন, শেলী, বায়রণ প্রভৃতির সমাদর করতে গিয়ে এমনই লালাসিক্ত হতেন যে, আমাদের পাশের বাড়ির রবি ঠাকুর তাঁদের কাছে আমলই পেতেন না। এক রবি ঠাকুর সব ইংরেজ কবিদেরকে যে গিলে খেয়ে বসে আছেন, এটি সেই অধ্যাপকরা কতকটা স্বীকার করলেন যখন তাঁরা 'দয়া করে' বাঙ্গলা সাহিত্য

পড়তে আরম্ভ করলেন। 'কল্লোল'-এ একদা রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট চিঠি ছাপা হয়েছিল, তা'তে তিনি এই মর্মে বলেছিলেন, আমার কবিতা বুঝবার জন্য ইংরেজি সাহিত্যের কোনও অধ্যাপকের দরজায় যেয়ো না। নিজে নিজেই প'ড়ো!

যাই হোক, কবি সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন কাব্য ও রসসাহিত্যের একজন পরম রসিক। তিনি মাঝে মাঝে তাঁর ওখানে নজরুলকে নিয়ে যেতেন। হাস্যে পরিহাসে গানে গল্পে আমোদে নজরুল ওঁদেরকে মাতিয়ে তুলতো।

এমনি একটা সময়ে হঠাৎ একদিন একখানা চিঠির সঙ্গে এক ছাপা আবেদন-পত্র পেলুম। আবেদনপত্র বললে একটু ভুল হবে, ওটা অনেকটা যেন সাহিত্য-নীতির একটি 'ম্যানিফেস্টো'। দুটোতেই নাম সই রয়েছে শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য। আগে এঁর নাম আমি শুনিনি। পরম্পরায় জানলুম ইনি প্রসিদ্ধ এক ব্যবসায়ী এবং কর্মবীর। গৌহাটি-শিলং বাস সার্ভিসের ইনিই মালিক,—ওটি তাঁর একচেটিয়া ব্যবসায়। যেমন শিলিগুড়ি-দার্জিলিঙ মোটর সার্ভিসের একচেটিয়া ব্যবসায়ের মালিক মন্মথ চৌধুরী। এছাড়া শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মেট্রোপলি-টান ব্যাঙ্ক ও ইনস্যুওরেন্সের সর্বাধিনায়ক। সুতরাং এ হেন বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্যের ক্রমোন্নতির সহায়ক হন্ তাহলে আনন্দেরই কথা। রামায়ণ-মহাভারত ও সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ সামনে রেখে সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ নৈতিক শুচিতা নাকি সকলের কাম্য। আধুনিক বা তরুণ সাহিত্যের যথেচ্ছাচার থেকে সৎসাহিত্যকে বাঁচানো প্রয়োজন। যে দেশে বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছেন সেই দেশে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভট্টাচার্য মহাশয় 'বঙ্গশ্রী' নামক মাসিকপত্র বার করলেন। সম্পাদক হলেন সজনীকান্ত দাস। সজনীর জায়গায় 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক হলেন চিরনিরীহ রসিক শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী। বঙ্গশ্রীতে গিয়ে উপস্থিত হল সরোজ, কিরণ রায় এবং ওদের সঙ্গে দুই বিভূতিভূষণ ও তৎকালে স্বল্পখ্যাত তারাশঙ্কর। আশেপাশে যারা এসে দাঁড়াল তাদের মধ্যে শক্তিমান নব্যলেখক মানিক ও সাহিত্য-বিদূষক প্রমথ বিশী। ভাগলপুরবাসী বনফুল বা বলাইচাঁদের নামও ওদের সঙ্গে যুক্ত হল। বঙ্গশ্রী আপিসটি বসল এম্পায়ার রেস্তোরাঁর পাশেই।

'বঙ্গশ্রী'র আসর জমে উঠল শক্তিমান লেখকদের সমাগমে।

বাঙলাদেশে তখন শিশুমৃত্যুর হার হল দেড় মিনিটে একটি। ওরই সঙ্গে সমান তাল রেখে মরেছে এক-একখানি সাময়িক পত্র। চোখের সামনেই দেখলুম

রূপ ও রঙ্গ, বসুন্ধরা, অভ্যুদয়, নবযুগ, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, ধূপছায়া, বাঁশরী, উদয়ন, দুন্দুভি, উপাসনা, বিজলী, স্বদেশ প্রভৃতি একে একে মারা পড়ল। একালের কোনও কাগজই বাঁচবে না, কেননা সামনে আসছে নতুন কাল, অভিনব একটা যুগ। সে যুগের চেহারা কেমন কেউ জানে না, আমিও না। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সামনে এগিয়ে আসছে দেশজোড়া অসন্তোষ ও নৈরাজ্যবাদ। দেখতে পাচ্ছি অদূরবর্তী সমাজবিপ্লবের চেহারা—আসছে যেন আমাদের দিকে সে এক অশ্বারোহীর মতো ঘোড়া ছুটিয়ে আর ধুলো উড়িয়ে। চোখের সামনে ভেঙ্গে পড়ছে যৌথ পরিবার আর সমবায় পরিবার। দেখতে পাচ্ছি মেয়ে সমাজে বারুদ জমছে, ওরা শৃঙ্খল ছিঁড়ছে, পুরনো নীতিকে ওরা মানতে চাইছে না, পুরুষ শাসিত সমাজকে ভাঙ্গতে চাইছে ওরা। ছেলেরা ঘুষি পাকাচ্ছে, চোখ লাল করছে, শাসন-বাঁধন পরোয়া করছে না, প্রতিবাদ জানাচ্ছে চলতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। ওদের সামনে পথ নেই, প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা নেই, উপযুক্ত অন্ন নেই ওদের মুখে, নিজদেরকে বড় করে তুলবার সম্ভাবনা ওরা দেখতে পাচ্ছে না। ওদেরকে শুধু রক্তচক্ষু আর উপদেশের দ্বারা ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছে ইস্কুল, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক কন্‌ভোকেশনে ওরা শুনে আসছে অর্থহীন অপদার্থ আদর্শের বুলি, এবং গাউন পরে সঙ সেজে গিয়ে চান্সেলারের কাছে হিতোপদেশ শুনে পথে গিয়ে নামছে! যাও, এবার চাকরি খোঁজোগে—যেখানে খুশি যেদিকে খুশি। সংস্কৃত শিখেছ, লজিক ফিলজফি পড়েছ, ইংরেজি ভাষায় রপ্ত হয়েছ,—এবার যাও মেসোপিসেকে ধরো, মামা বা ভগ্নীপতির পায়ে পড়ো, সদাগরি আপিসের দরজায়-দরজায় কেঁদে বেড়াও—যদি কুড়ি-পঁচিশ টাকার গোলামী জোটে! এই নৈরাশ্যবাদ আর অসন্তোষের তলায় বিপ্লবের বীজ লুকিয়ে রয়েছে—যথাসময়ে সেটি অঙ্কুরিত হবে এই ধারণা অনেককে পেয়ে বসেছে!

'প্রিয়-বান্ধবী' উপন্যাসটি এই মনোভাব থেকে লেখা হয়েছিল এবং বইটির বিক্রি বাজার দেখে প্রকাশক গুরুদাস খুশি হয়ে উঠল। ওঁরা যখন এ-বই বিক্রি আরম্ভ করলেন আমি তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি! কেননা ওঁদের কাছে ও-বইয়ের কপিরাইট বিক্রি করেছি তিনশ পঁচিশ টাকায়—সেই টাকা বিধবা বুলির বিয়ের খরচে গেছে! হিমসাগর আমের সমস্ত শাঁস খেয়ে খোসা পর্যন্ত চুষছে গুরুদাস আর আমি শুধু ওর খ্যাতির শুক্‌নো আঁটিটার দিকে চেয়ে রয়েছি।

সর্বাপেক্ষা বিস্মিত হলুম একটি কারণে। 'প্রিয়-বান্ধবী' উৎসর্গ করেছিলুম

শ্রীমতী শোভারানী দত্তকে—তাঁর প্রতি আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধানুরাগের চিহ্নস্বরূপ। তিনি উপন্যাসটি মন দিয়ে পড়ে বললেন, অসম্ভব, এরকম মেয়ে হয় না! এ মেয়ে সমাজেও নেই, দেশেও নেই। 'এমন মেয়ে দেখেছেন কোথাও?

আমি হাসলুম। বললুম, অদূর ভবিষ্যতে এ মেয়ে আসছে! তারই সম্ভাবনা নিয়ে লেখক লেখে। হাতের কাছেই নমুনা,—আপনি নিজে কী?

উনি আর কথা বাড়াননি।

আমি যখন অক্ষয় সরকারের সাপ্তাহিক 'খেয়ালী'র জন্য প্রতি সপ্তাহে দশ টাকার বিনিময়ে একেকটি লেখা লিখছি, তখন একদা সাহিত্যক্ষেত্রের সংবাদদাতা শ্রীমান্ ভবানী মুখুজ্যে জানাল, 'বঙ্গশ্রী'তে নানা মতবাদ ও আদর্শের লেখকরা এসে জড়ো হয়েছে যাদের মধ্যে পারস্পরিক মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে। সুতরাং এই কাগজের অদূর ভবিষ্যতের কথা আলোচনা করে আমরা দু'জনেই হাসছিলুম। কিন্তু তেল আর জলে মিশ খায়, যখন তরকারিটা রান্না হয় ভালো! বঙ্গশ্রীতে যে-তরকারি রান্না হচ্ছিল, নেহাৎ কুস্বাদ নয়। আমি নিজে বিভূতিভূষণ আর তারাশঙ্কর সম্বন্ধে উৎসাহিত ছিলুম। তারাশঙ্কর সাহিত্যের ঐতিহ্যবাহী, পরিশ্রমী এবং নিজের রচনাদিতে সে সামাজিক ও নৈতিক শুচিতাবোধ মেনে চলে। সজনীকান্ত আমার সর্বাপেক্ষা পুরনো বন্ধু। সে বন্ধুবৎসল। দেখতে পাচ্ছিলুম, সে তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণকে যত্নে লালন করছে। খবর পাচ্ছিলুম সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মশায় ওকে বিশ্বাস করেন।

এমনি একটা সময়ে অনেকদিন পরে একখানা চিঠি এল শ্রীমতী নীলিমা চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। সেই আমাদের 'বিজলী ও স্বদেশ'-এর আমলে ইনি মধ্যে মাঝে লেখা পাঠাতেন এবং চিঠি দিতেন। এবার অনেককাল পরে ওঁর খবর পাওয়া গেল। চিঠিখানা বড় কিন্তু পড়ে আমি একটু দুঃখিতই হলুম। উনি ঠাউরিয়ে নিয়েছেন আমি হয়ত ওঁর দুর্দশার কালে ওঁর কোনও কাজে আসতে পারি। ওঁর স্বামী বিহার সরকারের অধীনে কাজ করতেন ফরেস্ট অফিসে—চক্রধরপুর ডিভিশনে। কিন্তু বিগত দেড় বছর থেকে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে একপ্রকার পঙ্গু। ওঁর শিশুপুত্র সন্তানটি মারা যায় প্রায় এক বছর আগে। ওঁর বাবা পাটনার উকীল। ওঁর স্বামীর সরকারী মাসোহারা কিছু থাকলেও ওঁর বাবা কন্যা-জামাতার সাংসারিক খরচপত্র অধিকাংশই চালান। এটি ওঁর পক্ষে সঙ্কোচের কারণ। এখন উনি স্বনির্ভর হতে চান। উনি যদিও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাইভেট পরীক্ষা-দেওয়া গ্রাজুয়েট কিন্তু রাঁচী শহর বাঙ্গালীপ্রধান হলেও এখানে

বাঙ্গালী সমাজের কোনও মহিলা বাড়ির বাইরে গিয়ে বিশেষ কাজকর্ম করেন না। উনি প্রায়ই দরখাস্ত পাঠান্, কিন্তু জবাব আসে না। শেষকালে উনি লিখেছেন, এখন আমার সংসারে আমরা মোট চার জন। স্বামী, বিধবা ননদ, একটি চাকর ও আমি। আমি কলকাতায় গিয়ে যদি কোনও অর্থকরী কাজ পাই, তাহলে খুবই উপকৃত হই।

চিঠিখানা নিয়ে আমি শোভার কাছে গেলুম। তিনি প'ড়ে বললেন, পুণ্যাশ্রমের বাসিন্দা রয়েছে অনেক মেয়ে গ্রাজুয়েট, কিন্তু কাজ কই? সরকারী আপিসে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, ব্যাঙ্ক-পোস্টাপিসে—কোথাও মেয়েদের জায়গা নেই। তবে শুনছি নাকি রেলওয়েতে মেয়ে-ইন্‌সপেক্টর নিচ্ছে আজকাল,—দেখুন না চেষ্টা করে। অনেক জায়গায় মেয়েরা চরকাও কাটছে। তা ছাড়া উনিও ত গ্রাজুয়েট।

শোভার কথাবার্তার ধরণে যথেষ্ট উৎসাহ পাওয়া গেল না, এবং শ্রীমতী নীলিমাকে চিঠির জবাব কি দেবো তাও বুঝতে পারলুম না। সুতরাং আমি একপ্রকার চুপ করেই যাচ্ছিলুম।

সিমলা-কাঁসারিপাড়ার ওদিকে তখন থাকতেন ডাঃ বি. সি. ঘোষ। তিনি সৌম্যদর্শন সুপুরুষ এবং অমায়িক ও ভদ্রব্যক্তি। তিনি বিলাতে প্রবাসকালে এক ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের একমাত্র পুত্রসন্তানের নাম ছিল 'হ্যারি ঘোষ'। বস্তুত আমাদের বাল্যকালে স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ডাঃ বি. সি. ঘোষ—এঁরা থাকতেন খুবই কাছাকাছি। ডাঃ ঘোষের নিকট-আত্মীয় ও স্নেহভাজন সরোজ মিত্র তখন আমার বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও খুবই পরিচিত। ঠিক মনে পড়ছে না, সরোজবাবু বোধ হয় ছিলেন একজন 'জে-পি', অর্থাৎ 'জাস্টিস অফ দি পীস'। তাঁকে বোধ হয় জুরীতেও গিয়ে বসতে হত। তিনি দু'একটি প্রতিষ্ঠানেরও পরিচালক ছিলেন। তাদের মধ্যে একটি মহিলা-সেবা-প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'সরযূ-সদন'। সরোজ মিত্র তখন একজন পরিণত বয়সের যুবা। আমার সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল, আমি নাকি একজন সমাজসেবক। সুতরাং আমি একদিন শ্রীমতী নীলিমা চট্টোপাধ্যায়ের চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে তাঁকে দেখালুম।

সেই প্রথম জানলুম, ডাঃ বি সি ঘোষ মহাশয় বিদ্যাসাগর কলেজ ও তার হস্টেলগুলির একজন পরিচালক। অতটা আনুপূর্বিক জানা না থাকলেও এটি জানতুম মেয়েদের জন্য ছিল তখন বেথুন হস্টেল এবং স্কটিশ মিশনের অধীনে ডাগুাস হস্টেল। এখন শুনলুম বিদ্যাসাগর কলেজের অধীনে রয়েছে দুটি ছাত্রী

হস্টেল। তার একটি রয়েছে বোধ হয় সুকিয়া স্ট্রীটের কোথায় যেন, অন্যটি আমার পুস্তক প্রকাশক বরেন্দ্র লাইব্রেরীর উপর তলায়।

সরোজবাবু নীলিমা দেবীর সম্বন্ধে খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন। আমি বললুম, কয়েকখানা মাত্র চিঠির বাইরে তাঁর সম্বন্ধে আর কিছুই জানিনে, এবং অদ্যাবধি গত তিন বছরের মধ্যে তাঁকে আমি চোখেও দেখিনি। তবে চিঠিপত্রাদি পড়ে মনে হয়েছে তিনি সুশিক্ষিতা এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা।

সরোজবাবু জানালেন, সুকিয়া স্ট্রীটের ওদিকে তাঁদের ছাত্রী-হস্টেলের জন্য জনৈক মেট্রনের দরকার। আহারাদি ও বাসস্থান ছাড়া টাকা পঁচিশেক হয়ত হাতখরচ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই মেট্রনের পক্ষে দরকার কঠোর ব্যক্তিত্ব, গাম্ভীর্য ও আত্মপ্রত্যয়। তাঁকে হতে হবে নিরপেক্ষ, মিষ্টভাষী ও স্নেহশীল। হস্টেল প্রশাসনের সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা তাঁর হাতেই থাকবে। আজকালকার ছাত্রীরা কড়াকড়ি বিশেষ মানতে চায় না, সেদিকেও তাঁকে সতর্ক-সচেতন থাকতে হবে। তিনি রান্না-ভাঁড়ার ইত্যাদি দেখাশোনা করবেন এবং তিনিই হবেন সর্ববিষয়ের পরিচালিকা। আপনি তাঁকে এ বিষয়ে লিখতে পারেন।

সেদিন বাড়ি ফিরে এসে আমি সবিস্তারে একখানা চিঠি লিখলুম নীলিমা দেবীকে এবং ওই সঙ্গে সরোজ মিত্র মহাশয়ের ঠিকানাও দিয়ে দিলুম। আমার কর্তব্য ওখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

বোধহয় দশ-বারো দিন পরে নীলিমা দেবী আরেকখানা চিঠি দিলেন। আমাকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, সরোজ মিত্র মহাশয় তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেছেন এবং পঁচিশ টাকার পরিবর্তে তাঁকে তিরিশ টাকাই দিতে চেয়েছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি কলকাতায় আসছেন। তবে যেহেতু তাঁদের পরিবারে মেয়েছেলের পক্ষে একা যাতায়াতের রেওয়াজ নেই, সেই কারণে তিনি একজন উপযুক্ত সঙ্গীর জন্য চেষ্টাচরিত্র করছেন।

এমনি একটা সময়ে একদিন সকালে 'চিত্রমন্দির' থেকে রতিবাবু তাঁর সহকারীর মারফৎ একখানা চিঠি পাঠিয়ে আমাকে ডাকলেন। রতিবাবুর দাদা থাকেন পণ্ডিচেরীতে এবং আমার ধারণা, রতিবাবু তাঁর ফটোগ্রাফির কাজের ফাঁকে তাঁর ডার্করুমের পাশের ঘরটিতে বসে জপতপ বা ধ্যানধারণা করেন। তিনি ঈষৎ খর্বকায়, গুম্ফশোভিত ও শুষ্কদর্শন। তাঁকে নিয়ে আমি নেপালে গিয়েছিলুম এবং তাঁর সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আনন্দদায়ক হয়নি।

আমি গিয়ে ওঁর দোতলায় উঠে সামনে হাজির হলুম।—ডেকেছেন কেন? কি হুকুম, বলুন?

রতিবাবু খুব হাসলেন। বললেন, একদম ডুব মেরেছেন, দেখাসাক্ষাৎ নেই। দাঁড়ান, আগে একটু চা খান, তারপর বলছি সব।

আমি হাসিমুখে বললুম, বলুন, আপনার যোগাযোগ কেমন চলছে!

মিনিট কয়েকের মধ্যে ওঁর সহকারী ছু'পেয়ালা চা এনে রাখল এবং আমি কাঁচি-সিগারেটের প্যাকেট বার করলুম।

সিগারেট ধরিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে রতিবাবু হাসিমুখে বললেন, আরে মশাই, আপনারা যে আমার এখানে এক কেউটে সাপ ছেড়ে দিয়ে গেছেন, এ কি আগে আমি জানতুম?

কেন, হয়েছে কি?

সেই ত সেবার কল্যাণী দেবী আর আপনি মিলে ব্যবস্থা করে গেলেন যে, শ্রীমতী সাধনা টিফিন-ক্যারিয়ারে করে রোজ বিকেলের দিকে কোন এক বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেবে, আর যদি দরকার হয়, আমার এখানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে যাবে, এই তো? যাই হোক, নেপাল থেকে ফিরে দেখছিলুম, মেয়েটা ওই কাজ নিয়েই রয়েছে। আমার কাছ থেকে যেমন করেই হোক আপনার ওই শ্রীমতী সাধনা হারগাছটা আদায় করে নিল!

আমি হাসছিলুম,—শ্রীমতী সাধনা আমার নয়, রতিবাবু।

নয়ত কি মশাই?—রতিবাবু হাস্যমুখর হয়ে বললেন, আপনি হলেন তার মহারাজ, আমরা সব অপোগণ্ড প্রজা! সে যাই হোক, একদিন আমি বললুম, সাধনা দেবী, তুমি তো ঘটা করে সেদিন হারগাছটা ফেরত নিয়ে গেলে! আজ আমাকে একটা ভজন গান শুনিয়ে যাও দেখি?

মেয়েটি প্রথমে বলল, রতিবাবু, আজ আমি ভয়ে-ভয়ে এসেছি। বোধহয় পুলিস ইন্‌ফরমার আমাকে কদিন থেকে লক্ষ্য করছে। আজ আমার গলা খুলবে না। আপনি এই চিঠিটা মহারাজকে পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে।

রতিবাবু আমার হাতে ছোট একখানা চিঠি দিলেন। চিঠিখানার তারিখ পুরনো। অনেকটা যেন অনিচ্ছার সঙ্গেই তিনি চিঠিটা দিলেন।

হাসিমুখে বললুম, কিন্তু কেউটে সাপের কাহিনীটি কি প্রকার?

হো হো করে হাসলেন রতিবাবু। বললেন, আরে সেই কথাই বলছি, মশাই। উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে। উনিও গাইবেন না, আমিও তেমনি নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত ভজন একটা গাইয়ে ছাড়লুম! মেয়েটার গলা কিন্তু চমৎকার!

আমারও তাই ধারণা।

কিন্তু আমার বোধ হয় একটু ভুলই হয়েছিল। ঠিক অতটা ভাবিনি।—

রতিবাবু বললেন, আমার একটু 'ফিলিংস' হয়েছিল, মশাই। মেয়েটার কাঁধে দুখানা হাত রেখে আমি একটু আদর জানাতে গিয়েছিলুম—

আমার মুখে ঈষৎ গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ছিল।

তবে হ্যাঁ, মেয়েটি খুব নরম নয়—রতিবাবু বললেন, ওদিকেও বেশ হিসেবী। বললে, রতিবাবু, আমি একটা মিশন নিয়ে এ পাড়ায় আনাগোনা করি। আমাকে অন্য কিছু মনে করবেন না। আমার গায়ে কেউ হাত দেয় এ আমি পছন্দ করিনে। আপনি সরে দাঁড়ান—

রতিবাবু তেমনিই হেসে বললেন, ভাবলুম মেয়েরা অমন বলেই থাকে! কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ে তো আর নেহাৎ অজ্ঞান নয়। কিন্তু এখানেই আমার ভুল হয়ে গেল। মেয়েটি হঠাৎ আমাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ছিটকিয়ে দিল। একেবারে পপাত ধরণীতলে।

বললুম, তারপর?

খুব হাসলেন রতিবাবু। পরে বললেন, মেয়েটা কিন্তু যাবার আগে আবার শাসিয়েও গেল! বললে, মনে রাখবেন রতিবাবু, আমি এমনিভাবেই আবার আসব। রোজই আসব—যতদিন আমার আসার দরকার। আমি ভয় পাবার মেয়ে নয়, মনে রাখবেন।

আমি আসবার সময় সহাস্যে বলে এলুম, রতিবাবু, আমাদের সকলের পক্ষেই একথা মনে রাখা দরকার, বিপ্লবী মেয়েরা ভিন্ন ধাতুতে গড়া। যারা জীবনের পরোয়া করে না, বিপদে ভয় পায় না, সামাজিক জীবনের প্রতি যারা মোহ রাখে না—তাদের সঙ্গে বিশেষ সতর্ক হয়ে আদান-প্রদান করতে হয়! স্বয়ং ইংরেজও এই কেউটে সাপকে সমীহ করে চলে।

বাড়ি এসে চিঠিখানা খুলে দেখি, সামান্য তিনটে কথা। কিন্তু চিঠির তারিখটা পেরিয়ে গেছে পাঁচ-ছ'দিন আগে। সাধনা লিখেছে, আমার এক দিদিকে বলে রেখেছি আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। আপনি এলে দু'একখানা গানও শোনাতুম। ইতি—

তারিখ পেরিয়ে গেছে, তবু গেলুম। ঠিকানাটা ভবানীপুরের প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের। বিকেলের দিকে গেলুম। গলিঘুঁজির মধ্যে ঢুকে বাড়ি খুঁজে বার করতে সময় নিল অনেক।

শেষ পর্যন্ত একটা ডাঙ্গাল ছোট মাঠ পেরিয়ে গলির ভিতরে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের পল্লী ঘেঁষে যেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম সেটা দোতলা পাকাবাড়ি। ডাঙ্গাল মাঠের কাছাকাছি রয়েছে ট্যাক্সি ও ট্রাকচালক কয়েকজন পাঞ্জাবী শিখের

আড্ডা। তখনকার ট্যাক্সির আকার ছিল অনেক বড়। একালের বেবি ট্যাক্সি তখন জন্মায়নি।

যাই হোক, এখন প্রায় সন্ধ্যা। এর মধ্যে এক ছাট পাতলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। ওখানে দাঁড়িয়ে নম্বর মিলিয়ে দেখলুম—হ্যাঁ, এই বাড়িই তো বটে। একটি মেয়েকে খুঁজতে এসেছি, এজন্য আমার আড়ষ্টতা ছিল প্রচুর। তবু কড়া নাড়ানাড়ি করলুম। একটু পরে ভিতর থেকে যে দরজা খুলল, সেও একটি মেয়ে এবং প্রায় সাধনার সমবয়সী। সঙ্কোচ কাটিয়ে আমি সাধনার কথা জানতে চাইলুম। মেয়েটি বলল, দাঁড়ান, আমি ডেকে দিই।

মিনিট তিন-চার পরে যিনি এলেন তিনি এক বয়স্কা মহিলা। তিনি আমাকে দেখেই কি জানি কেন হাসিখুশী মুখে বললেন, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন। কদিন আগেই আপনার আসার কথা, সাধনা বলে রেখেছিল। আমিই তার সেই দিদি। আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করবেন আসুন—

মহিলা আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন দোতলায় একেবারে ওঁদের শয়নকক্ষে। এক প্রবীণ ভদ্রলোক আমাকে অভ্যর্থনা করলেন হাসিমুখে। বললেন, শুনুন মশাই, আমার নাম মৃত্যুঞ্জয়, কিন্তু আমাকে সবাই ডাকে কেষ্টবাবু। কারণ আমার গায়ের রং কালো! আর আমিও কি ছেড়ে কথা কই? ওই দেখুন না আমার স্ত্রীর রং ফর্সা, কিন্তু নাম মলিনা। আমি ওঁকে ডাকি, ময়লাবাবু।

ভদ্রলোকের হালকা চালের পরিহাসে সাহস পেয়ে এবার বসলুম।

মলিনা দেবী বললেন, সাধনা থাকে পুণ্যাশ্রমে। গতকালও সে এসেছিল আমাদের এখানে। আসছে কাল আবার আসবে। ওর গান নাকি আপনার ভালো লেগেছে—বলছিল। আজ আপনার সঙ্গে আলাপ হল, এই আমাদের লাভ। কাল আসবেন আপনি?

বললুম, কাল আর বোধ হয় পারব না, আমি সামনের সপ্তাহে বুধবারে আসব।

বেশ আমিও তাকে বলে রাখব। সাধনা আসে বেলা ঠিক তিনটের পর। আমিও সেই সময় হাসপাতাল থেকে ফিরি। আপনি চারটের সময় এলে আমাদের ঠিকই পাবেন।

যে মেয়েটিকে প্রথম দেখেছিলুম দরজার সামনে সে এবার একটি কাঁচের গেলাসে করে চা এনে হাজির করল। কেষ্টবাবু এই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, একে দেখে রাখুন, এর নাম অমিতবাবু।

মেয়েটা হেসে উঠে বোধ করি নিজের ভরন্ত স্বাস্থ্যটাকে একটু লুকোবার জন্য

মলিনা দেবীর আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। বুঝলুম, এ মেয়ে অন্যপ্রকার।

মলিনা দেবী বললেন, এর নাম অমিতা। এদের বাড়ি ফরিদপুর। এও এসেছিল কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে। ছ' মাস জেল খেটে ফিরেছে। পুণ্যাশ্রমে ওর জায়গা হয়নি। সাধনা ওকে রেখে গেছে আমার এখানে। বছর দুই আগে ওর স্বামীটি মারা গেছে।

সেদিন বিদায় নেবার আগে দেখলুম বছর দুয়েকের একটি শিশুপুত্র এখানে ওখানে গুট্‌গুট্‌ করে ঘুরছে এবং তাকে সামাল দিচ্ছে বছর দশ-বারো বয়সের একটি ঘাগরাপরা রোগাটে বালিকা ঝি। কিন্তু সকলের সৌজন্য ও মিষ্ট ব্যবহারে সেদিন খুবই আনন্দ পেয়ে ফিরেছিলুম।

পূজা সংখ্যার লেখার জন্য তাগাদা আসছিল একটির পর একটি। বলা বাহুল্য, ছোট গল্প লিখতে হবে অনেকগুলি এবং দু-তিনটি ভ্রমণকথা। এদের সঙ্গে আছে বেতার কেন্দ্রের দুই-একটি ফরমাস। আমি এখন নিঃস্ব বটে, কিন্তু আগামী মাস দুই যদি নিয়মিত পরিশ্রম করি তবে পুজোর ঠিক আগে ও পরে আমি ধনাঢ্য ব্যক্তি!

আমি যখন কোমর বেঁধে কাজ করতে বসে গিয়েছি, সেই সময় একদিন শ্রীমতী শোভা তাঁর জেঠতুতো ছোট ভাইকে হঠাৎ আমার কাছে পাঠালেন। তখন প্রায় মধ্যাহ্নকাল। ভাইটি বলল, ছোড়দি বলে দিয়েছে এক্ষুনি আপনাকে নিয়ে যেতে। দুদিন ধরে ছোড়দি অপেক্ষা করছে। আমার সঙ্গেই চলুন।

বললুম, কী এমন জরুরী দরকার? আমাকে তৈরি হতে হবে তো? তাঁকে গিয়ে বলো আমার একটা বিশেষ কাজ আছে আজ। সেটা সেরে তবে যাব।

ছেলেটি একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই চলে গেল। ওরা এখন আমার কুটুম্ব, সুতরাং আমার ধমক দেবার অধিকার আছে।

একটা ছোট গল্প শেষ করছিলুম। তাইতে গেল প্রায় ঘণ্টা দুই। স্নানাহার সেরে যখন বেরোলুম তখন প্রায় তিনটে বাজে। সোজা গিয়ে শ্যামবাজারের মোড়ে বাস ধরলুম। আমি যাচ্ছিলুম জনৈক ছোটখাটো প্রকাশকের কাছে। তিনি আমাকে অত্যন্ত কড়া একখানা চিঠি দিয়েছেন রেজেস্টারী যোগে। তাঁর কাছে আমি থেপে-থেপে কমবেশি তিনশ টাকা নিয়েছি। হয় এবার পুজোর মধ্যে তাঁর টাকা ফেরত দেবো নয়ত উপন্যাস লিখে দেবো—এই হল চুক্তি। তাঁর চিঠিতে প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল। তাঁর সঙ্গে তারিখের উল্লেখ করে চুক্তি হয়েছিল।

যাই হোক, ঘণ্টাখানেক ধরে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করা সত্ত্বেও তিনি আরও মাস ছয়েক সময় দিতে চাইলেন না। তখন শুধু বেগতিক নয়, অন্ধকার

দেখলুম। আমার সাহিত্য-জীবনে বড় একটা কথার খেলাপ হয় না। প্রতিশ্রুতি দিলে পালন করি, নির্দিষ্ট তারিখ মেনে চলি এবং সম্পাদক বা প্রকাশককে কখনও হয়রান করিনে। সামান্য একটা কলম আর একখানা খাতা—এই তো আমার মূলধন! এর ওপরে শুধু আমি নয়, প্রত্যেক লেখকই দাঁড়িয়ে থাকে। সুতরাং অসময়ে যে প্রকাশক বা কাগজের মালিক অগ্রিম টাকা দিয়ে তোমাকে বিপদের থেকে উত্তীর্ণ করে দেয়, তার বিশ্বাসকে তুমি নষ্ট করবে? তুমি লেখক, নিত্য-অভাবগ্রস্ত, তোমার অসময় কি আর আসবে না বলতে চাও?

সুতরাং আমি বললুম, গিরীনবাবু, রাগ করবেন না। আগামী একমাসের মধ্যে হয় আপনার নগদ তিনশ টাকা, আর নয়ত একখানা নতুন লেখা উপন্যাস আপনার হাতে দিয়ে যাব। আমার ভাগ্নির বিয়েতে যে অসময়ে আপনি টাকা দিয়েছিলেন সে আমি ভুলিনি।

গিরীনবাবুর লম্বা মুখখানা লম্বাই হয়ে রইল। আমি চলে গেলুম।

সুকিয়া স্ট্রীটের মোড় থেকে আবার বাসে উঠলুম। এখান থেকেও কালীঘাট দু আনা। যেতে যেতে পটলডাঙ্গার মোড়ে একটা সিগারেট ধরালুম। তখন চলন্ত বাসের মধ্যে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ নয়। পথের দিকে চেয়ে নিজের মনে ধূমপান করা মানে দুশ্চিন্তার মধ্যে ডুবে যাওয়া। তিনশ টাকা! বস্তুত, তিনশ টাকা একসঙ্গে জীবনে কবারই বা দেখেছি? সুতরাং চৌরঙ্গী দিয়ে যাবার সময় আরেকটা সিগারেট ধরিয়েছিলুম!

হাজরা রোডের মোড়ে নেমে যখন শ্রীমতী শোভার ওখানে গিয়ে পৌঁছলুম তখন সন্ধ্যা ছ'টা বাজে। আমার মেজাজটা ভাল ছিল না।

আমি যখন ওঁদের বাড়ির দোতলায় উঠে এলুম শ্রীমতী শোভা আমাকে একবার নিরীক্ষণ করলেন। পরে বললেন, এত দেরি করলেন যে? সেই পাগল মেয়েটার ওখান থেকে হয়ে এলেন বুঝি?

ওঁর দিকে ফিরে দাঁড়ালুম। ওঁর কথায় শ্লেষের আওয়াজ ছিল। সুতরাং আমার মুখে এসে পড়ল—সেখানে গেলে কি আর এত সকাল-সকাল ছেড়ে দিত? বসে বসে তার গান শুনতুম।

শ্রীমতী শোভা উঠে আমার সঙ্গে তাঁর ঘরে এসে ঢুকলেন।

মেয়েদের মধ্যে প্রকৃত বিপ্লববাদিনীর সংখ্যা তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে ছিল প্রচুর। যে যুগে সামাজিক অনুশাসনে ও বহুপ্রকার কুসংস্কারে বৃহত্তর নারীসমাজের বন্ধন-জর্জর মন মুক্তির পিপাসায় আকুলি-বিকুলি করত, সেইকালে বিপ্লববাদিনী মেয়েরা বিশেষ এক দেশাত্মবোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভিতরে ভিতরে কাজ করে গেছে। এই অসমসাহসিকা ও শিক্ষিতা মেয়েরা আপন আপন কর্মব্যস্ততার মধ্যে বোধ হয় অতটা তলিয়ে দেখেনি যে, তারা তাদের অজ্ঞাতে ভবিষ্যৎ কালের নারী-সমাজের সামনে কি বিপুলাকার সমাজবিপ্লবের অবদান রেখে যাচ্ছিল। তাদের আত্মত্যাগ, দুঃখবরণ, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিমুখতা, গৃহজীবনের প্রতি অনাসক্তি —এগুলি তাদেরকে এক মহৎ জীবনে উন্নীত করেছিল। তাদের সেই নিঃস্বার্থ কর্মজীবন একদা অনুপ্রেরণার বস্তু ছিল। নারীসমাজ উদ্দীপ্ত হয়েছিল তাদের উদাহরণে।

তারা দেশ বলতে জানত দেশমাতৃকা—যাঁর কোটি কোটি সন্তান পরাধীনতায় পঙ্গু। তারা বিপ্লবী ছেলেদের মতোই পরাধীনতার জ্বালার মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল। তারা ভাবতো শৃঙ্খলিতা, উৎপীড়িতা দেশজননীকে রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করাই তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। সেই কারণে ছেলেই হোক বা মেয়েই হোক—বিপ্লববাদের মধ্যে খুঁজে পেত আত্মোৎসর্গের এক অপার মহিমা।

যাই হোক, এবার আগের কথায় ফিরে আসি। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই সময়ে একটা চিন্তাসঙ্কট দেখা যাচ্ছিল। বাঙ্গলায় অহিংসা ও গান্ধীবাদ তখন কতকটা মন্দীভূত, অন্য দিকে বাঙ্গলার বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তার প্রচণ্ড আসুরিক শক্তির দ্বারা তাদের বর্ণিত 'সন্ত্রাসবাদের' মূলোচ্ছেদ করতে সচেষ্ট। এক দিকে তাদের বলদর্প ও হিংস্রতা, অন্য দিকে বিভিন্ন নবপ্রবর্তিত আইনের কঠিন কড়াকড়ি এবং সংবাদ-পত্রাদির কণ্ঠরোধ। এই সমস্ত একত্র মিলে বাঙ্গালীর মানসলোকে কেমন একটা বিভ্রান্তি দেখা যাচ্ছিল, এবং এই হিংসাবাদ ও অহিংসাবাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে আরেকবার আত্মবিচার করছিল। এই আত্মবিচারের স্থিতিশীলতার মাঝখানে যখন মেয়ে ও পুরুষ বিপ্লববাদীদের দীর্ঘবিলম্বিত বিচার-প্রহসন চলছে, তখন বাঙ্গালীর মনে আরেক দুর্ভাবনা দেখা দেয়—বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বিপ্লবী মহিলা-দেরকে আন্দামান দ্বীপান্তরে নির্বাসিত করতে যাচ্ছেন কিনা! বোধ হয় যাচ্ছেন—এইরূপ একটা সিদ্ধান্তের কথাই শোনা যাচ্ছিল। তখনকার দিনে

আন্দামান 'সেলুলর' জেলের একটা আন্তর্জাতিক অখ্যাতি ও কলঙ্ক প্রচলিত ছিল। সেখানে যে কোনও শ্রেণীর কয়েদীই হোক না কেন, তাদের মানইজ্জত, মনুষ্যত্ব, মর্যাদা, সংস্কৃতি—সমস্তই ধ্বংস হয়ে যায়। সেখানকার প্রশাসন ব্যবস্থা এইপ্রকার যে, কয়েদীকে দিনে দিনে তিলে-তিলে পশুপ্রকৃতিতে পরিণত করা হয়। শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির বিভিন্ন রচনায় ও গ্রন্থে আন্দামান সেলুলর জেলের বীভৎস চিত্র বর্ণিত ছিল এবং এই জেলের সম্বন্ধে সকলের মনে একটা স্বাভাবিক আতঙ্ক দেখা যেত।

বোধ হয় এই সময়েই বাংলার গভর্নর স্যার জন এণ্ডারসন শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। এই আলাপ আলোচনার আগে মহাকবি তাঁর অপূর্ব উপন্যাস 'চার অধ্যায়' রচনা করেছিলেন। এই উপন্যাসটি রচনার ফলে কেউ কেউ কবির কাছে অনুযোগ জানিয়েছিলেন বলে শুনেছি, কিন্তু এই বইটির ভিতরে যে মনোরম বাক্যবিন্যাস ও কাব্যচ্ছটা প্রকাশ পেয়েছিল, সেটির জন্য কাব্য ও সাহিত্যরসিক পাঠক মহলে এ বইটি তখন মুখে মুখে ফিরত। প্রকৃতপক্ষে 'শেষের কবিতা' ও 'চার অধ্যায়' বাংলা সাহিত্যে গদ্য রচনায় একটি নতুন রীতির প্রবর্তন করেছিল।

যাই হোক, ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত সমাজের কয়েকজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা বিপ্লবীকে আন্দামানে নির্বাসিত করার খবরটি যখন প্রচারিত হয়েছে, তখন মাতৃপূজারী বাঙ্গালীর মনে প্রবল উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কাছে যান। রবীন্দ্রনাথও তখন এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি বোধ করি বৃটিশ গভর্নমেণ্টের এই অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়ে অবিলম্বেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

পরবর্তীকালে দেশবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল—যখন শুনল মহিলা-বন্দীর কারোকে আন্দামানে পাঠানো হচ্ছে না!

তখন উপমহাদেশ ভারতবর্ষের ভৌগোলিক আকার অতি বৃহৎ ছিল। তার এই সুবৃহৎ আয়তনের সঙ্গে বর্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর, সিংহল, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, সম্পূর্ণ কাশ্মীর ও চিত্রল এবং উত্তর-পূর্ব দিকে বর্মার প্রান্তে চীন সীমান্ত—এই বিস্তৃত ভূভাগকে মিলিয়ে তখন বলা হত ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার বা ভারত সাম্রাজ্য! এই সাম্রাজ্যের মধ্যে শুধু ছিল কয়েকটি ফরাসী ও পর্তুগীজের ছোট ছোট উপনিবেশ—যারা ইংরেজের সঙ্গে মন মিলিয়ে থাকত! ইংরেজ আঠারো শতকে খুইয়েছিল আমেরিকাকে, কিন্তু উনিশ শতকে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর থেকে পৃথিবীব্যাপী ক্রমবর্ধমান বৃটিশ সাম্রাজ্যের আকাশপথে নাকি

সূর্য অস্ত যেত না!

কিন্তু এই ভারত সাম্রাজ্যের ভিতরেই ছিল দু-তিনটে ভাগ। তার একটা ভাগ হল বৃটিশ ভারত, দ্বিতীয় ভাগ সামন্ত ভারত, তৃতীয় ভাগে পড়ত কাশ্মীর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি। কিন্তু ইংরেজদের বশংবদ না হয়ে তাদের গত্যন্তর ছিল না। যাই হোক, এই ব্রিটিশ ভারতে তখন গান্ধীজীর অহিংসাবাদী রাজনীতি আপন প্রভাব ও আদর্শকে চারিদিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং তারই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে খান আবদুল গফুর খান সীমান্তের প্রদেশ ও উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে অহিংসাবাদে প্রভাবিত করেন। তাঁর নাম হয় 'সীমান্ত গান্ধী'।

একমাত্র বাঙ্গলা ছিল এর কিছু ব্যতিক্রম। এই প্রদেশে সাধারণভাবে গান্ধী-বাদ বা অহিংসা কতকটা যেন দুর্বল ছিল এবং এই নিয়ে সর্বভারতের সঙ্গে বাঙ্গলার চিন্তাধারার মাঝে মাঝে সংঘর্ষ বেধে উঠত। বাঙ্গালী মার খেলে শান্ত থাকে না এবং আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত হানতে চায়—তার এই স্বভাবধর্মের সঙ্গে গান্ধীর রাজনীতির অমিল ঘটত পদে পদে। তখন কেবলমাত্র পাঞ্জাব বাঙ্গালীর বীরোচিত চরিত্রের তারিফ করত। অত বড় আত্মত্যাগী, সর্বদেশের মাননীয় নেতা, বিরাট পুরুষ জে এম সেনগুপ্ত—বাঙ্গালী তাঁকে প্রণাম জানালো বটে, কিন্তু যাঁকে মাথায় তুলে নিয়ে বাঙ্গালী সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসল তিনি সুভাষচন্দ্র বসু! ভালবাসা সকল যুক্তি-তর্কের অতীত। সেই ভালবাসা যুগে যুগে বেড়েই চলেছে।

এই সব কথা নিয়ে যখন তোলপাড় হচ্ছিল তখন একদিন শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভার ওখানে কয়েকজন বিপ্লববাদীর সমাবেশ হয়েছিল। ওঁদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয়েই ছিলেন। যত দূর মনে পড়ছে—সেদিন উপস্থিত ছিলেন বিপিন গাঙ্গুলী মহাশয়। তিনি দীর্ঘকায়, বলবান ও সৌম্যদর্শন পুরুষ। চোখে মোটা চশমা এবং প্রসন্ন মুখ ও স্বল্পভাষী ব্যক্তি। তাঁর সম্বন্ধে তখন বহু রকমের রোমাঞ্চ-কর কাহিনী প্রচলিত। তাঁর অসমসাহসিক বিপ্লবী অভিযান নাকি সুদূর দক্ষিণ প্রাচ্যেও প্রসারিত। তিনি নানাবিধ ছদ্মবেশ ধারণ করে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে নিঃশব্দে ভিতরে ভিতরে বহু কাজ করে যান—এই ধরনের অসংখ্য জনশ্রুতি রয়ে গেছে তাঁর সম্বন্ধে। তিনি বোধ করি সকল সময় প্রকাশ্য রাজনীতিতে এসে পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়াতে চাইতেন না এবং তাঁর মুখ থেকে তাঁর আত্মকাহিনী সম্পূর্ণভাবে কেউ কখনও শোনেনি। তিনি কখনই যেখানে সেখানে মুখ খুলতে প্রস্তুত হতেন না। তাঁকে সেই প্রথম দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলুম।

বিপিনবাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতুল সম্পর্কীয় ছিলেন এবং

সেদিন অনেকের মুখেই শোনা যেত শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসের 'সব্যসাচী' চরিত্রে বিপিন গাঙ্গুলী মহাশয়ের ছায়া পড়েছে! যাই হোক, তখন বিপিনবাবু বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের চোখে একজন অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

প্রকৃত বিপ্লববাদ নিত্য নবীন জীবনের প্রগতিকে বরণ করে চলে, যেটি বৃহত্তর মানবসমাজের কল্যাণের অনুকূল। সেই বিপ্লববাদ যে-কোনও স্বাধীন দেশেও মাথা তুলতে পারে। কিন্তু পরাধীন দেশের প্রথম বিপ্লব হল রক্তমুখী, কেননা বিদেশীর শৃঙ্খল-ছেদন করে সর্বাগ্রে তার মুক্তি পাওয়া দরকার। বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় হল প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা—যেটির অপর নাম হল অন্তর্দ্বন্দ্ব! তৃতীয় পর্যায়ের বিপ্লব শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে—যার প্রভাবে জাতির মূঢ়তা, কুসংস্কার, অজ্ঞান, নিরক্ষরতা এবং পুরনো চিন্তাভ্যাসকে দূর করা যায়। চতুর্থ পর্যায়ের বিপ্লব, দেশজোড়া সংগঠন ও অর্থনীতির সর্বাধুনিক প্রয়োগ ও বণ্টন ব্যবস্থা।

সেদিনের আলোচনা ছিল এই, আমরা এখন বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে রয়েছি। এখন আমাদের জীবন বিসর্জন দেওয়ার গৌরবময় যুগ চলছে!

এই বছরেই জুলাই মাসে রাঁচিতে বন্দীদশার মধ্যে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের মৃত্যু ঘটে। তিনি তৎকালে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জে এম সেনগুপ্ত নামে পরিচিত এবং ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এই সৌম্যদর্শন, দীর্ঘাকার ও নির্ভীক দেশনেতার আকস্মিক মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জওয়াহরলাল নেহরু প্রভৃতি অতিশয় মর্মাহত হয়েছিলেন। সেই দেশনেতার শোকযাত্রায় প্রায় দশ মাইল দীর্ঘ পথে বন্ধুবর সুধীন্দ্র নিয়োগীর সঙ্গে আমিও হেঁটেছিলুম।

বোধ হয় ওই দিনই অপরাহ্নকালে সুধীন্দ্রর আমন্ত্রণে শ্রীমতী সাধনা এসেছিল ওঁদের মোহনলাল স্ট্রীটের বাড়িতে। এই বিপ্লববাদিনী মেয়েটিকে আমরা দেখছি প্রায় কয়েক মাস ধরে। এ মেয়ের ভয়-ডর, স্বাভাবিক কুণ্ঠা, কথাবার্তা ও আচার-আচরণে মেয়েলী জড়তা ইত্যাদি দেখা যায় না। সাধনা নিজের পোশাকী নামটি আর ব্যবহার করছে না। 'সাধনা' বলেই চলছে! তাদের গ্রামে এই নামেই সে পরিচিত। সে যাই হোক, ওর প্রথম দিনের সেই কণ্ঠসঙ্গীত আমার পক্ষে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

সাধনার আরেকটি গুণ, সে তার জানা-জগতের ভিতর থেকে একেকটি চিত্তাকর্ষক সত্য কাহিনী যখন বলতে থাকে, আমরা অবাক হয়ে শুনি। সেদিন সুধীন্দ্র ধরে বসল, না আজ গান নয়। আমরা শুনব বলে বসে আছি। বলুন আপনার

সেই কেষ্টবাবু আর মলিনাদির খবরটা।

সাধনা আমার দিকে তাকাল। আমি বললুম, ওঁরা স্বামী-স্ত্রী আমার বিশেষ পরিচিত। তবে কাল রাত্রের ঘটনাটা খুবই মর্মান্তিক। তোমার বলার মধ্যে পরনিন্দার ছোঁয়াচ না থাকলেই আমি খুশী হবো।

সাধনা সংক্ষেপেই বলতে আরম্ভ করল,—শুনুন সুধীনবাবু, মলিনাদি হলেন চেৎলার এক গরীব গৃহস্থের মেয়ে। তিনি প্রথমবার বিধবা হন একটি ছেলেকে নিয়ে। পরে আবার বিয়ে করেন। দ্বিতীয়বার মলিনাদি বিধবা হন একটি মেয়েকে নিয়ে। কিন্তু ওই দুটি সহোদর ছেলেমেয়েকে মানুষ করে তোলার জন্য তিনি চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে নার্সের কাজ নেন। এর আগে আমার সঙ্গে মলিনাদির জেলে আলাপ হয়। যাই হোক, সেবাসদনে একবার এক ভদ্রলোক রোগী হয়ে আসেন। তাঁর গায়ের রং খুব কালো তাই তাঁকে সবাই বলত কেষ্টবাবু। মলিনাদির সঙ্গে কেষ্টবাবুর আলাপ পরিচয় হয় ওই সেবাসদনেই। কেষ্টবাবুর তখনও বিয়ে হয়নি। তিনি তখন চাকরি করেন বার্ড কোম্পানিতে। কেষ্টবাবু কেঁদে-কেটে রাজী করান মলিনাদিকে। দুজনের বিয়ে হয়। কিন্তু মলিনাদি চেপে যান তাঁর প্রথম বিয়ে আর ওই ছেলে! ছেলেটার বয়স এখন চোদ্দ, আর ওই দশ বছরের মেয়েটা—যাকে তুমি সেবার দেখেছ মহারাজ, ওর নাম বুনি। এর পর বছর দুয়েকের মধ্যে মলিনাদির তৃতীয় সন্তান হল আরেকটি ছেলে। ছেলেটি এখন বছর দুয়েকের—তুমি তাকেও দেখেছ। কেষ্টবাবু বুনিকে ভাত-কাপড় দিতে রাজী হলেন এই শর্তে যে, সে বাচ্চা ছেলেটার ঝি হয়ে থাকবে আর ঘরদোরের কাজ করবে। মলিনাদির চাকরি আছে সেবাসদনে। তিনি বাড়ি আসেন বেলা তিনটের মধ্যে, কেষ্টবাবু আপিস থেকে ফেরেন বেলা সাড়ে পাঁচটা ছটায়। এরই ফাঁকে ফাঁকে বড় ছেলেটা সেই চেৎলা থেকে ছটকিয়ে আসে মাকে দেখতে মাঝে মাঝে। ছেলেটা খুব মিষ্টি, খুবই ভদ্র। কিন্তু মাকে আর বোনকে না দেখে সে থাকতে পারে না। অনেক সময় লুকিয়ে এসে মলিনাদির কাছে কান্নাকাটি করে যায়। ছোট বোন বুনি তার বড়ই প্রিয়। কিন্তু কেষ্টবাবুকে সে বাঘের মতন ভয় করে।

সুধীনবাবু, এইবার শুনুন শেষটুকু। আজ দিন পনেরো হতে চলল বুনির টাইফয়েড হয়েছে। ওর চিকিৎসা বোধ হয় কিছু নেই। তিন-চার দিন হল বুনির অবস্থা ভাল নয়। ওর ভাইটাকে দু-এক দিন ও-বাড়ির আশেপাশে দেখে কেষ্টবাবুর সন্দেহ হয়, বোধ হয় ছেলেটা ছিঁচকে চোর! আর বুনির অবস্থা দেখে মলিনাদি কেঁদেকেটে কেষ্টবাবুকে দিন তিনেক আপিস যেতে দেয়নি। আমিও

জানিনে গত কয়েক দিনের ঘটনা।

আমরা দুই বন্ধু চুপ করে তাকিয়েছিলুম সাধনার মুখের দিকে। সাধনা বলল, আজ সকালে খবর নিতে গিয়ে দেখি, পুলিস ঘেরাও করেছে ওদের বাড়ি। ওখানে দাঁড়িয়েই সবটা শুনে এলুম। কাল মাঝরাত্তিরে বড় ছেলেটা আর থাকতে পারেনি! রাত বারোটার পর ওর দিদিমাকে লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সেই চেৎলা থেকে এসেছে! ছোট বোনটা বোধ হয় বাঁচবে না সে শুনেছে। তখন অনেক রাত। কেষ্টবাবু ছিঁচকে চোরের ভয়ে লাঠি নিয়ে সজাগ হয়ে থাকবেন কে জানত? ছেলেটা রেন-পাইপ বেয়ে দোতলার বারান্দার ধার পর্যন্ত যখন প্রায় উঠেছে, এমন সময় পিছন থেকে তার মাথার উপর দড়াম করে পড়ল লাঠির ঘা! ছেলেটা দোতলার উঁচু থেকে পড়ল নিচের শান বাঁধানো গলিতে। একেবারে রক্তগঙ্গা। চারদিকে হইহই। চোরকে মেরেছে কেষ্টবাবু! মলিনাদি তখনও কিছু বুঝতে পারেনি। তারপর পুলিস এল, ছেলেটাকে তুলল। নিচে নেমে এসে মলিনাদি পুলিসের টর্চের আলোয় দেখল নিজের ছেলেকে! চিৎকার করে মলিনাদি ছেলেটার ওপর পড়ল বটে, কিন্তু ওর সাড়া না পেয়ে ওখানেই জ্ঞান হারালো। আজ ভোররাত্রে ছেলেটা মারা গেছে। বুনি আজও আছে, আসছে কাল বোধ হয় আর থাকবে না।

পুলিসের কাছে আজ সকালে মলিনাদি বলেছে, যে ছেলে মারা গেল সেই ছেলেই আমার! কোলের ছেলেটা আমার কেউ নয়! ওটা ওই রাক্ষসের,—হাসপাতাল থেকে ওটাকে কুড়িয়ে এনেছে!

সকালবেলা আমি গিয়ে ঢুকতেই কেষ্টবাবু চেঁচিয়ে বলল, তোমাকে বলে রাখলুম সাধনা, মলিনাকে আমি তাড়াবো! আমার বাচ্চাটাকে মানুষ করবার জন্যে আবার আমি সেবাসদনের একটা ঝিকে বিয়ে করে আনব। এ-কথা জানিয়ে দেবো, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নেই!

সুধীনবাবু, জীবনটা স্বর্গে-নরকে মেলানো।

ঘটনাটা আমাদের সামনে একটি করুণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ওঁরা সকলেই আমার পরিচিত। বুনি ও বুনির ভাই, মলিনাদি ও কেষ্টবাবু—এদের সকলের মধ্যে সম্পর্কের এই জটিলতাটা কেবল আমার জানা ছিল না।

এই মর্মন্তুদ ঘটনাটি আমার পক্ষে এমনি অবিস্মরণীয় ছিল যে, এর কুড়ি-একুশ বছর পরে একদা বোম্বাইতে বসে চিত্রনির্মাতা নীতীন বসু মহাশয়কে এই কাহিনীটি কথায় কথায় বলি এবং তিনি এই গল্পটির নাম রেখেছিলেন, 'রেন পাইপ'।

যাই হোক, আরেকদিন এখানেই সুধীনের সঙ্গে সাধনার বিতর্ক বেধেছিল।

সাধনা বলেছিল, কিছু মনে করবেন না, কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ সম্পর্কে আপনাদের চোখে ঠুলি বাঁধা আছে!

কাদের কথা বলছেন?—সুধীন প্রশ্ন করল।

সাধনা তৎক্ষণাৎ তিন-চারজনের নাম করল, এবং আমার দিকে ফিরে বলল, তুমি জান না মহারাজ, চোরাবালির ওপর দিয়ে তুমি হেঁটে যাচ্ছ! সত্য কথাটা নিন্দে নয়, মহারাজ। শুনতে অপ্রিয়, কিন্তু সত্যটা সত্যই থাকে।

সুধীন্দ্র বলল, সব সময় সত্যি বলতে আপনার ভয় করে না?

ভয়!—সাধনা যেন দপ করে উঠল,—চৌদ্দ বছর বয়সে দেশ-গাঁ ছেড়ে পালিয়ে আসি। রাত্তিরে নৌকোয় নদী পেরোই একা। অন্ধকারে পথ চিনে চার মাইল হেঁটে একা যাই রেল-স্টেশনে। সঙ্গে ছিল একটা পুঁটলি। তাই নিয়ে অত রাত্তিরে বিনা টিকিটে কলকাতার ট্রেনে উঠি। সেই মেয়েকে ভয়ের কথা বলছেন, সুধীনবাবু?

সুধীন্দ্র বোধ করি ঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে এল এক বেপরোয়া তেজস্বিনী মেয়ে। সাধনা পুনরায় বলল, তোমার মধ্যে বিশ্বাসের জোর নেই, মহারাজ। এবার তুমি সব বাঁধন কেটে বাইরে এসে দাঁড়াও।

বেশ, তাহলে একটু সৎ পরামর্শ দাও দেখি!

আমার পরিহাসের ভঙ্গী দেখে সাধনা হেসে উঠল। তবুও বলল, তোমরা লেখক, সাহিত্য নিয়ে তোমাদের কাজ। তোমরা হয়তো অনেক জানো। কিন্তু বাইরের রঙ্গীন খোসা দেখে ভেতরের শাঁসের বিচার নাই করলে। আমাকে তোমরা দেখেছ অনেকবার কিন্তু জানতে চেয়েছ কি—জেল-খাটা বিপ্লবী মেয়ে ছাড়া আমার আরো কিছু ইতিহাস আছে?

আমি চুপ করে রইলুম। সুধীন বলল, কিসের ইতিহাস? আপনি দেশ-গাঁ ছেড়ে এসেছেন ছোটবেলায়,—এ ছাড়া অন্য কিছু?

সাধনা এবার হেসে উঠল। আমার দিকে ফিরে বলল, মহারাজ, তুমি একদিন বলেছিলে তোমার সাহিত্যের কারবার কল্পনা বা স্বপ্ন নিয়ে নয়, প্রত্যক্ষ জীবন নিয়ে। সেদিন থেকে আমি ভেবে এসেছি আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আর অভিজ্ঞতা একদিন হয়তো তোমার কাজেও লাগতে পারে। দেড় বছর না-হয় জেল খেটেছি, কিন্তু পাঁচ-ছ' বছর ধরে এই অচেনা কলকাতায় একা মেয়ের জীবন ঠিক সোজা পথে হাঁটেনি, মহারাজ।

সাধনা হাসছিল।

সুধীন্দ্র বলল, বাঁকা পথ কত দূর পর্যন্ত গিয়েছিল, একটু না-হয় বলেই যান্?

সাধনা বলল, যত দূর পর্যন্ত আপনাদের কল্পনার দৌড়। তবে মনে রাখবেন, নিরুপায় ছেলে পথে-পথে ভিক্ষে করে, রাস্তার কলে চান করে নেয়, রাত্তিরে ফুটপাথে শোয়, দরকার হলে পকেট মারে, নয়তো ছিঁচকে চোর হয়। কিন্তু চোদ্দ-পনেরো বছরের নিরুপায় মেয়ে,—তার কোন্ পথ খোলা ছিল সেদিন? কলকাতার হালচাল কতটুকু সে জানত? ছেলেদের দায় শুধু প্রাণ বাঁচানো, মেয়েদের দায় প্রাণ বাঁচানোর সঙ্গে মান বাঁচানো! বলুন না সুধীনবাবু, সেই সেদিনের মেয়েটার মানসম্ভ্রম কিছু বাঁচলো কি?

আমরা চুপ করে সাধনার দিকে চেয়ে রইলুম।

হাসিমুখে সাধনা বলল, না মহারাজ, বোধ হয় বাঁচেনি, বাঁচানো যায়নি। তাকে কেউ একজন হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল অন্ধকার পাতালের নিচে, যেখানে অচেনা জন্তুরা চার পাশে কিলবিল করে!

ক্ষমা করবেন—সুধীন বলল, ঠিক বুঝতে পারছিনে। আপনার কথায় আমাদের মনে নানা প্রশ্ন আসছে। পাতালের নিচে কারা সেই জন্তু?

আবার হেসে উঠল এই বিপ্লববাদিনী। বলল, সেই জন্তুদের দুটো হাত আর দুটো পা। তারা রোগে-দুঃখে কাঁদে, ভাত-কাপড়ের জন্যে কাঁদে, দুর্দশায় আর অপমানে কাঁদে, অবাঞ্ছিত সন্তানরা যখন কোলের মধ্যে শুয়ে না খেয়ে মরে—তখন কাঁদে ঘরের কোণে বসে। সে ঘরে আলো জ্বলে না, ডাক্তার আসে না, ওষুধ-পথ্যি পৌছয় না। সেই ঘর কি আপনারা দেখেছেন কখনো, সুধীনবাবু? কিন্তু আমি সেই মেয়ে-জন্তুদের মধ্যে এক মাস বাস করে এসেছি। মেয়েদের অপমানের জগৎ একটু অন্য রকম, মহারাজ! বলো তো সত্যি করে, মেয়েরা কবে স্বাধীন হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে? এই যে আমি পড়াশুনো ছাড়তে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু আমি তো একেবারে মুখ্যু নই,—তবু আমার বাঁচবার কি কোনও পথ কোথাও খোলা আছে?

বললুম, তুমি একটা ভাল দেখে বিয়ে করো, সাধনা।

বিয়ে!—সাধনা বলল, বিয়ে যারা করবে না, তাদের কি বাঁচবার কোনও অধিকার নেই? আর বিয়ে যারা করবে তারাও কি পুরুষের পায়ে ধরে চিরকাল ভাতকাপড় আদায় করে চলবে? কথার জবাব দাও, মহারাজ!

সুধীন্দ্র তর্ক করতে গেল, সাধনা থামিয়ে দিল। বলল, ভদ্রঘরের মেয়েদের কথা রাখুন, সুধীনবাবু। তারা পরের খায়, পরের আশ্রয়ে থাকে, পরের পয়সায় নবাবি করে, পরের পায়ে ধরে বাঁচে! হয় বাপ, নয় ভাই, নয় স্বামী, নয়তো মাসী-পিসী, আর নয়তো বোন ভগ্নিপতির ঘরকন্না—এই তাদের ভরসা। কিন্তু

এরা সবাই যদি তাড়িয়ে দেয় তবে বাড়ির মেয়ে বেরিয়ে পড়ে ঝি-গিরি কিংবা রাঁধুনীগিরির কাজ খুঁজতে। আবার কাঁচা বয়সের নিরক্ষর মেয়ে যদি স্বাধীন-ভাবে হাতের কোনও কাজ নিয়ে বাঁচতে চায়, তবে কোন্ কাজের যোগ্য হবে সে? সে চাইছে ভদ্রজীবন। কিন্তু পথের কুকুরের কামড় কথায় কথায় সামলাতে গিয়ে সে কি কখনো নিরাপদ জীবন খুঁজে পায়? সুতরাং তখন শুধু থাকে তার ওই কাঁচা বয়সের দেহখানা!—ওই দিয়েই সে বাঁচতে চায়, ওইটেই তার মূলধন! মহারাজ, আমি বহু ভাল মেয়ে দেখেছি, বহু আদর্শবাদী বেকার মেয়ের মধ্যে বাস করেছি। তাদের অধিকাংশ মেয়ের স্বভাব চরিত্র শুচিশুদ্ধ। এরা দেশের কল্যাণে জীবন দিতে প্রস্তুত। তারা শিক্ষিত, ভদ্র—কিন্তু তাদের একজনও কেউ আমার এই গল্প শুনলে নাক সিঁট্‌কোয় না। কারণ তারা জানে মেয়েদের অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের বিশেষ কোনো পথ কোথাও খোলা নেই।

অবাক হয়ে সাধনার অকুণ্ঠ আলাপ শুনছিলুম। এবার বললুম, আচ্ছা সাধনা, তুমি কি ঝগড়াঝাঁটি করে দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলে?

হাসিমুখে এবার সাধনা বলল, না, ঝগড়া কেন করব? হঠাৎ একদিন আমি সন্ধ্যের পর নিরুদ্দেশ হয়েছিলুম।

তোমাকে সাহস দিয়েছিল কেউ?

সাধনা সোজা তাকালো আমার দিকে। বলল, না কেউ না। নিজের মধ্যেই সাহস খুঁজে পেয়েছিলাম মহারাজ! তাছাড়া আমি ভেবে দেখেছি, আমার মধ্যে আধখান হ'ল ছেলে!

সুধীন হেসে উঠল। তারপর তার এক প্রশ্নের উত্তরে সাধনা বলল, না, গয়না আমি ছুঁইনে! সঙ সাজিনে। যে-হাতে খাঁড়া থাকার কথা, সে-হাতে চুড়ি বেমানান সুধীনবাবু। চুড়ি হ'ল বাঁধন, বশ মানা, দাসীপনা! আচ্ছা সুধীনবাবু, এবার দেখুন না কত বাজলো!

সুধীন তার হাতের দিকে তাকিয়ে বলল, প্রায় সাতটা।

সাধনা উঠে দাঁড়াল। আর নয়, এবার তাকে যেতে হবে। হাসিমুখে সুধীন বলল, একটা কথা কিন্তু বাকি থেকে গেল।

কি বলুন?

আপনি যে মাসখানেকের জন্য পাতালবাসিনী হয়েছিলেন, সেই ইতিবৃত্তটি কবে শোনাচ্ছেন?

ওঃ, সেই গল্প?—সাধনা বলল, সে প্রায় সাত-আট বছর হতে চলল। বেশ তো, বলব একদিন!

সাধনা সেদিনের মতো চলে গেল।

আমরা কতক্ষণ চুপ করে রইলুম। এই ছন্নছাড়া মেয়েটিকে যতবারই দেখেছি এবং ওর মুখ থেকে যতবারই ব্রহ্মসঙ্গীত বা দেহতত্ত্বের গান শুনেছি,—আমাদের শ্রদ্ধানুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ওর সংযম, চরিত্রবল ও সকল বিষয়ে নিরাসক্তি সেদিন অনেককেই মুগ্ধ করেছিল।

সেদিন আমি যাচ্ছিলুম আমার ভ্রমণকাহিনীতে বর্ণিত "রাধারানী"র সঙ্গে দেখা করতে—যিনি নিজেকে "বেশ্যা" বলে অভিহিত করে আমাকে তাঁর ঠিকানা দিয়েছিলেন, এবং মাথার দিব্যি দিয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন।

তাঁর সঙ্গে যখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে, তখন আমার পরনে ছিল গেরুয়া, সেই গেরুয়ার সম্মানরক্ষার্থে তাঁর সংসর্গ এড়িয়ে গিয়েছিলুম। তিনি আমার বিদায়কালে সাশ্রুচক্ষে তাঁর পরলোকগত সহোদরকে স্মরণ করে তাঁর জননীর সম্মুখেই আমার সঙ্গে ভাই-ভগ্নীর পবিত্র সম্পর্ক পাতিয়ে ছিলেন। আজ ওঁদের সকলের সঙ্গেই দেখা হবে।

বেলা তিনটে সাড়ে-তিনটে। কুমোরটুলি ছাড়িয়ে উত্তরে চিৎপুর রোডের পশ্চিম ফুটপাথে এক পুরনো আমলের বাড়ি—বেশী বৃষ্টিতে জল জমলে যে-বাড়িতে জল ঢুকতে পারে! ভিতরে পা বাড়াতেই দেখি দুই তিনটি মেয়েছেলে অবেলায় তাঁদের কাজকর্ম সারতে ব্যস্ত। আমার দিকে চেয়ে তারা থমকিয়ে গেল। এখনও রোদ পড়েনি এমন অসময়ে 'বাবুরা' তো আসে না! ওদের মধ্যে একটি মেয়েকে প্রশ্ন করলুম, এখানে রাধারানী বলে কোনও মেয়ে থাকে?

মেয়েটা তৎক্ষণাৎ ঈষৎ উদাসীন হয়ে গেল। বলল, ও হ্যাঁ, এখানেই থাকে! ওই পশ্চিম দিকের মহলে!

অন্যজন বলল, তার তো বাঁধা বাবু আছে!

আমি ভিতরের দিকে ঢুকে গেলুম।

রাধারানীর বিধবা জননী সামনেই ছিলেন। কিন্তু আজ আমার পরনে গেরুয়া পোশাক নেই দেখে আমাকে চিনতে তাঁর ক্ষণকাল দেরি হল। পরে হাসলেন—আমাদের কথা মনে ছিল?

আমিও হাসলুম, বললুম, তীর্থযাত্রার সঙ্গীকে কেউ ভোলে না, মা।

এসো বাবা, এসো।—মা বললেন, ওপরে চলো। আমরা থাকি এই মহলে। মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে দিলে আমাদের সব আলাদা।

অঘোরবাবু কোথায়?

অঘোর আসবে সন্ধ্যের পরেই—তাঁকে তো আবার দু দিক সামলাতে হয়।

উপরে উঠে এলুম। আমাকে দেখামাত্র চমকিয়ে হেসে উঠল সেই সুদূর পার্বত্যালোকে আমাদের অন্যতম সঙ্গিনী রাধারানী। আমরা কত আপন, আমাদের কতদিনের নিবিড় আত্মীয়তা, আজ যেন উভয়ের দেখা যুগযুগান্ত পরে, যেন জন্মান্তরে! রাধারানী বলল, মনে আছে আমি তোমার হাত ধরে বলেছিলুম, ঠিক তোমার মতন ছোট ভাইটিকে আমি হারিয়েছি? সেই থেকে মা রয়েছেন নিরুপায় হয়ে আমার কাছে।

মেঝের উপর আসর পেতে মায়ের সঙ্গে আমরা বসলুম।

রাধারানীর চেহারায় এখন আর সেদিনের সেই রুক্ষ ধুলিধুসরতা নেই। আজ নতুন করে চেয়ে দেখলুম তার দিকে। ক্লান্ত পথচারিণীর সেই নির্জীবতা নেই, পা খুঁড়িয়ে সেই পাহাড়ের চড়াই উৎরাইয়ের কষ্টকর হাঁটা নেই, আহারাদির সেই কৃচ্ছ্রসাধনাও নেই। আজ সে সতেজ, জীবন্ত, উৎসাহে উজ্জ্বল। বয়স কত আর, বছর তিরিশেক হবে। তার পরনে কেবল একখানা চওড়া শান্তিপুরী শাড়ি। আমরা উভয়ে ভাই-বোন পাতানো, সুতরাং এই সুশ্রী নারীর অন্যান্য বর্ণনা আমার পক্ষে বেমানান। আমাদের গল্প ঘনিয়ে উঠল সেই দুঃসাধ্য তীর্থপথের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে। আমরা ফিরে গেলুম সেই হিমালয়ে। সেই যেন আমাদের প্রতিদিনের চলমান সংসার, সেই আমাদের আপন জগৎ। সেই দুঃখে দুর্যোগে, দুর্গতিতে—আমরা পরস্পরের পরমাত্মীয়। এই বেশ্যাবাড়ি আর এই চিৎপুর রোড—এসব আমাদের চোখে অলীক।

মা আনালেন গরম-গরম কচুরি আর মিষ্টান্ন। অতঃপর তিনি যখন রাত্রিকালের রান্নাবান্নার কাজে গেলেন, আমরা দুজনে তখন গুছিয়ে বসলুম।

রাধারানী অসঙ্কোচে বলল, আমার মা কিন্তু সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। আমার মামারা মস্ত লোক। বাবা কিন্তু মদ আর মেয়েছেলে ছাড়া থাকতে পারতেন না। আমার ভাইটি মারা যায় বছর পাঁচেক আগে। সেই ভাই ছিল মায়ের ভরসা। আমি ছোটবেলা থেকে বাবার খেয়াল অনুযায়ী গান-বাজনা-কীর্তনে খুব পটু ছিলুম। ভাই মারা যাবার প্রায় ছ বছর আগে কি যে খেয়াল হয়েছিল, দুটো ছেলের সঙ্গে আমি পালিয়ে যাই। তারা আমাকে নিয়ে কিছু দিন নাড়াচাড়া করে আমাকে ফেলে পালালো। তখন আমি তিন মাসের পোয়াতি। সেই বিপদের মধ্যে খোঁজখবর করে আমি এক বেশ্যার কাছে উঠলুম। তারই সাহায্যে পেটের বাচ্চাটাকে নষ্ট করে বেঁচে গেলুম। তখন থাকতুম নাথের বাগানে।

তারপর?

হাসিমুখে রাধারানী বলল, তখন থেকেই পাকাপাকি এই লাইনে। সুবিধে ছিল, আমার গান-বাজনা। ওতে আমার বেশ নাম হয়েছিল। আমি ভাবলুম, রোজ রোজ পাঁচজনের সঙ্গে মাতামাতি এ যেন অরুচি আনে! সবাই বলল, তোমার চেহারায় খোলতাই আছে। পাঁচালি করলে তোমার পয়সা খায় কে? কথাটা মন্দ লাগল না। সেবার পুজোর সময় শোভাবাজারের রাজবাড়িতে পাঁচালির ডাক পেয়ে গেলুম। সেজেগুজে গয়নাগাঁটি চড়িয়ে সেখানে গিয়ে গান করতে বসলুম। ওরা তবল্‌চিদের আনল, খোল-করতাল আনালো,—আসর বসল নবমীতে দিনদুপুরে। খুব গান করলুম। আমার তালজ্ঞান, ঘরানা, আমার রেওয়াজ—এসব দেখেশুনে অনেক লোক ভাল বলল। প্যালা পড়ল অনেক। চিকের আড়ালে বসে মেয়েরা আমার জন্য ভাল ভাল শাড়ি পাঠালো। আমি একশ' টাকায় গান গাইতে গিয়েছিলুম, কিন্তু কামিয়ে এলুম প্রায় চারশ টাকা। বাড়িতে এসে পৌঁছল রাশি রাশি মিষ্টি, দু-একটা রূপোর বাসন, পুরনো আমলের সব চীনা পুতুল ঘর সাজাবার। আমার মাথুর শুনে নাকি অনেকে কেঁদেছিল। তারপর থেকে আমি মুজরো করতে যেতুম অনেক জায়গায়।

রাধারানীর আত্মকথা শুনছিলুম মনোযোগ দিয়ে।

রাধারানী বলতে লাগল, অমনি একটা সময় ভাই এক ভদ্রলোক এসে সামনে দাঁড়াল আমাদের নাথের বাগানের বাড়িতে। দেখলুম ভদ্রলোকের খালি পা, হাতে আসন, পরনে সাদা থান, চাদর, কাছা গলায়, মাথায় রুক্ষ চুল—উনি অশৌচে আছেন, ওঁর বাবা মারা গেছেন.। ওঁর ইচ্ছে আমি ওঁর বাবার শ্রাদ্ধে কীর্তন গান করি। আমি রাজী হয়ে গেলুম। তখন তো আমার জলজ্বলাট অবস্থা, যেখানে সেখানে ডাক।

দুজন খোল, দুজন করতাল—এই নিয়ে গেলুম শ্রাদ্ধবাড়ি। ওদের বাড়ি কাঁসারি-পাড়ায়। বেশ ভাল ওদের অবস্থা। ওদের চকমেলানো বাড়ির দুর্গা-দালানের নিচে মস্ত উঠোনে চাঁদোয়ার তলায় কীর্তনের আসর বসল। আমার সঙ্গে চুক্তি ছিল শ্রাদ্ধ আর কীর্তন একসঙ্গেই চলবে। ওদের নাকি 'বৃষোৎসর্গ দানসাগর' হবে। আমার গামলায় সেদিন অনেক টাকা পড়ল। আমাকে দেখবার জন্য পাড়াসুদ্ধ সব মেয়েপুরুষ এসেছিল। দশটায় কীর্তন আরম্ভ, বেলা দেড়টায় শেষ। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বিদ্যাপতি—তখন সব আমার মুখস্থ।

রাধারানীর কথার মাঝখানে ওর মা এসে আবার হাসিমুখে বসলেন।

রাধারানী বলছিল, কীর্তনের শেষে বহু লোক আমাকে ধরল, যদি আমি একটু ভেতর-বাড়িতে মহিলাদের মধ্যে যাই। চিকের আড়ালে যত মেয়েরা বসে কীর্তন

শুনছিল, এটি তাদেরই অনুরোধ। কিন্তু আমি তো অশুচি! শুধু অশুচি নয়, সকলের চোখেই আমি অদ্ভুত এক জীব! বেশ্যাকে কাছাকাছি এনে চোখে দেখছে অনেকে এই প্রথম। ওরা দেখছে আমার জড়তা নেই, চলাফেরা কথাবার্তা সবই আমার সহজ। আমি হাসছি, কথা বলছি, পাঁচজনের কথার জবাব দিচ্ছি,—এ দেখে ওরা অবাক। ওরা বড়লোক, কিন্তু পুরনো কালের লোক। মনে হচ্ছিল, মেয়ে মহলে আমরা তো সেই একই পাখি! কিন্তু আমি হলুম বনের পাখি আর ওরা থাকে খাঁচার মধ্যে।

ভদ্রলোক সেদিন আমাকে খুবই আদর-অভ্যর্থনা করেছিলেন। আমাকে মেয়েরা ধরল একটু মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে।

আমি যখন খাচ্ছিলুম, মেয়েরা তখন আমাকে ঘিরে ছিল। সেই সময় ভদ্র-লোকের স্ত্রী বেরিয়ে এসে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চেয়ে চেয়ে দেখে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, ওর সঙ্গে তোমার কোথায় ভাব হয়েছিল? ওর বাড়িতে?

স্বামী বললেন, ওঁর বাড়িতে গিয়েই তো ওঁকে পেয়েছিলুম।

ওঁর স্ত্রী রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তখন আমরা একটু আড়ষ্ট হয়েছিলুম বটে, কিন্তু একটুও সন্দেহ করিনি যে, এমন কাজ কখনও উনি করতে পারেন! রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে উনি আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি কবে থেকে আমার ঘর ভাঙ্গতে বসেছ শুনি?

অবাক হয়ে বললুম, আমি? আপনার ঘর ভাঙবো? কেন?

ওঁর কথা শুনে আমি হাসতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু আমাকে সময় না দিয়ে উনি হঠাৎ এক তাল লঙ্কা বাটা আমার মুখখানায় মাখিয়ে দিলেন।

চারিদিকে সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল। সবাই চেঁচামেচি ঠেলাঠেলি। মেয়েরা তাদের বউদিদিকে কড়া কথা শোনাতে লাগল। গিন্নীরা ছুটে এলেন। উনি বললেন, বেশ করেছি!

আমি ততক্ষণে বসে পড়েছি জ্বালাযন্ত্রণায়। আমার দুই চোখের মধ্যে লঙ্কা-বাটা গিয়ে যন্ত্রণায় বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তো অশুচি মেয়েছেলে! কোন্ মেয়ে আমাকে ধরে তুলবে? কে করবে সাহায্য? যে ছোঁবে তার জাত মান সম্ভ্রম সবই তো ঘুচবে! এমনি সময় ঐ ভদ্রলোক ছুটে গিয়ে এক বালতি জল এনে আমার মুখ চোখ সব ধোয়াতে বসলেন। দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে কারা যেন কি সব ওষুধপত্র নিয়ে এল। ও-বাড়ির একজন ঝি এসে আমার মুখে ওষুধ মাখাতে লাগল। আমি যখন যন্ত্রণায় কাঁদছিলুম তখন চোখের ডাক্তার কালী বাগচীকে আনা হল। ওষুধ দিয়ে সেদিন আমার চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

সেদিন বেলা চারটের সময় ওই ভদ্রলোকই আমাকে নাথের বাগানের বাড়িতে নিয়ে এলেন। মা তখন ছিল না আমার কাছে। ওই বাড়িরই অন্য মেয়েরা আমাকে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামাল। আমি তখনও মুখ-চোখের যন্ত্রণায় কান্নাকাটি করছিলুম।

এতক্ষণ স্তব্ধ সমবেদনার সঙ্গে আমি ভগ্নীর কথা শুনছিলুম। মা চুপ করে নত মুখে আমার পাশে বসেছিলেন। আমি মনে মনে রাধারানীকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছিলুম।

সেদিন রাত যখন এগারোটা বেজে গেছে তখন চোখের যন্ত্রণা যেন একটু কমল।—রাধারানী বলছিলেন, তোমাকে সত্যি বলছি ভাই, আমার মন তখন খুব খারাপ। ওই ভদ্রলোক বসে বসে আমার মাথায় হাত বুলোচ্ছিলেন। আমি বললুম, এবার আপনি যান, অনেক রাত হয়েছে। সেই প্রথম জানলুম ভদ্রলোকের নাম অঘোরবাবু। উনি বললেন, হ্যাঁ বাড়ি যাব। সেখানে আমার ছোট ছোট দুটি ছেলেমেয়ে আছে। কিন্তু আমি আমার স্ত্রীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই—।

অঘোরবাবু কথাটা পরিষ্কার করলেন না। আমি বললুম, স্ত্রীর ওপরে রাগ করলে তো আপনার চলবে না। তিনি যদি একটা ভুল হঠাৎ করে ফেলে থাকেন, আপনি কেন তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে যাবেন? তা ছাড়া তাঁর ধারণা, আপনার সঙ্গে আমার নাকি অনেক দিনের চেনা-পরিচয়!

রাধারানী আবার বললেন, তোমাকে বলব কি ভাই, অঘোরবাবুর স্ত্রীর ওপর আমার রাগ আর রইল না। মনে হচ্ছিল, এ শাস্তি আমার যেন পাওনাই ছিল। গেরস্থ ঘরের গিন্নীরা কেনই বা আমাকে সহ্য করবে?

কেন? তুমি তো কোনও দোষ করোনি!

করেছি ভাই করেছি—রাধারানী ঈষৎ হেসে বললেন, সকলের পায়ের নিচেও যে-মেয়ের জায়গা নেই, তাকেই তো পতিতা বলে! কেন আমি পতিত হলুম কে শোনে সে কথা! আমি মেয়ে নই, আমি কারোর স্ত্রী নই, মা নই, বোন নই—আমি নাকি 'পতিতা'! তা হবে! নিজের পরিচয় তলিয়ে আমি ভাববো তেমন বিদ্যেবুদ্ধিও তো নেই আমার। আমি সামান্য মেয়ে!

আমি রাধারানীর দিকে চেয়েছিলুম। আমার মনে হচ্ছিল তার মন যেন সর্বক্ষমাশীল। কারও মধ্যেই সে দোষ খুঁজে পায় না। তার জীবনে কোনও নালিশ নেই। সমস্ত জীবনের মধ্যে তার যেন একটি বাণীই নিহিত রয়েছে, সে সামান্য, সে নগণ্য!

আমি হেসে বললুম, তারপর? অঘোরবাবু কি প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করলেন?

বুঝতেই পারছ—রাধারানী হাসিমুখেই বললেন, সেই প্রথম রাত্তিরে উনি বাড়ি গেলেন তখন রাত একটা। পরদিন সকাল এগারোটায় উনি গাড়ি করে নিয়ে এলেন আমার আগের দিনের সব মজুরি। ভাল ভাল শাড়ি, বাসনপত্র, দুখানা গিনি, নগদ প্রায় পাঁচশ' টাকা। তার ওপর অঘোরবাবু দিলেন আরও এক হাজার টাকা—আমার ঘরদোর সব ভরে উঠল। আর অঘোরবাবু নিজে? উনি এক মাস ধরে আমার মাথার কাছে বসে আমার সব দায়িত্ব নিয়ে আমায় সুস্থ করে তুললেন। আজ পাঁচ বছর হতে চলল উনি কোন দিন নিজের বাড়িতে রাত কাটাননি। আমি যদি বলি, এ তুমি কি করছ? স্ত্রী না হয় রাগের মাথায় একবার অন্যায় করেছেন, সেজন্য তিনি ক্ষমা পাবেন না? উনি বলেন, আমি দিনের বেলায় বাড়ি ফিরে সব কর্তব্য করে আসব, কিন্তু রাত্রে কোন দিন বাড়িতে থাকব না। উনিই আমার মাকে এখানে আনিয়ে রেখেছেন। মায়েরও তো আর কেউ নেই!

আর নয়। এবার আমি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। রাধারানী হাসিমুখে বললেন, গান-বাজনা, কের্তন-মুজরো—সব ছেড়ে দিয়েছি, ভাই। উনি আমাদের প্রতি-বছরে নানান্ তীর্থে ঘুরিয়ে আনেন। সামনের বছরে যাব পশুপতিনাথে। উনি আমাদের কোন অভাব রাখেননি!

রাধারানী নিচে পর্যন্ত এলেন। বললেন, বড় বোনকে ভুলে যাবে না তো ভাই? আবার কবে আসবে বলো, আমি ওঁকে বলে রাখব। উনি খুব খুশী হবেন।

নমস্কার জানিয়ে হাসিমুখে আমি চলে যাচ্ছিলুম, রাধারানী আরও দু পা এগিয়ে এসে বললেন, কি জানো ভাই, আগে নিজেই নিজেকে বেশ্যা বলে জানতুম, এখন মনে হচ্ছে ওটা যেন একটা গালাগাল! ওটা শুনতে ভাবতে এখন যেন খারাপ লাগে।

আমি বললুম, তুমি কোন দিনই বেশ্যা ছিলে না, কোন দিনই তোমার গায় কোনও কাদা লাগেনি। তোমার মনের শুচিতাই তোমার আসল পরিচয়।

হাসিমুখে আমি বাইরে চলে গেলুম।

আমাদের তরুণ বয়সের চোখে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তি। তিনি এমন এক রহস্যে আচ্ছাদিত থাকতেন যার সব সময় হদিস পাওয়া যেত না। এর ফলে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তব, এবং বিভিন্ন প্রকার আজগুবী গল্প নানা মহলে ছড়িয়ে থাকত। প্রথম দিকে কেউ বলত তিনি সন্ন্যাসী, তাঁর মাথায় জটাজুট। কেউ বলত তিনি লুঙ্গি পরে একটি নেড়ি কুকুর সঙ্গে নিয়ে কলকাতার এখানে ওখানে ঘোরেন! অনেকে জানত তিনি থাকেন শিবপুরের ওদিকে কোথায় যেন এবং কোনও ভক্ত যদি তাঁর বাড়ি চিনে যেতে পারে তবে তিনি নাকি তার সঙ্গে দেখা না করেই তাড়িয়ে দেন! কতকগুলো নিন্দুক রটনা করে বেড়াত, তিনি নাকি নেশাভাঙ নিয়ে থাকেন। তিনি সংসারধর্ম পালন করেন কিনা, বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত, তাঁর নৈতিক জীবন কি প্রকার—এগুলি নিয়ে লেখক ও পাঠক সমাজ যখন তোলপাড় হয়ে উঠত, তখন তাঁর এক-একটি যুগান্তকারী গল্প বা উপন্যাস সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবল ঝড় বইয়ে দিত। বাঙ্গালীর অতি পরিচিত ঘরোয়া ও প্রত্যক্ষ জীবনের ভিতর থেকে এক মহৎ শিল্পীর মতো তিনি একেকটি ছিলেকাটা হীরকখণ্ডের মতো চরিত্র নির্মাণ করে তুলতেন—ভারতীয় কোনও সাহিত্যে যার তুলনা পাওয়া যেত না। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে অল্পকালের মধ্যে অত্যাশ্চর্য জনপ্রিয়তা লাভ করেন শরৎচন্দ্র এবং তাঁর সঙ্গে নজরুল ইসলাম—এবং উভয়ে প্রায় একই কালের। স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের মনে শরৎচন্দ্র যেরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন—সেটি যে কোনও দেশের লেখকের পক্ষেই দুর্লভ সৌভাগ্য।

প্রথম দিকে শরৎচন্দ্র তাঁর ছোট বা বড় উপন্যাসগুলির পাণ্ডুলিপি একটানা লিখে সম্পূর্ণ করে দিতেন একই সঙ্গে। কিন্তু তাঁর 'চরিত্রহীন' বা 'গৃহদাহ' সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। তাঁর অনেক ছোট বা বড় গল্প বেরিয়েছে নানা সময়ে নানা সাময়িকপত্রে। অতঃপর তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে 'ভারতবর্ষে'। তিনি সাধারণত কোনও সম্পাদকের চিঠির জবাব দিতেন না এবং লেখা চেয়ে পাঠালে সে-অনুরোধ এড়িয়ে যেতেন। কোনও সভা সমিতিতে তাঁকে সচরাচর পাওয়া যেত না। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র রাজার মতো তিনি যেন একটা জালের আড়ালে বাস করতেন!

ইদানীং তাঁর কাছে কোনও লেখা বা উপন্যাসের পরবর্তী কিস্তি আদায় করা ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তিনি বলতেন, পাঁচজনকে পাঁচরকম কথা না হয় 'দিতেই' পারি, কিন্তু সব রকম কথাই যে 'রাখতে' হবে এ কথা কে বললে?

যে দু'একজন সম্পাদক তাঁর প্রিয়পাত্র ছিলেন তাঁদের মধ্যে 'ভারতবর্ষে'র বৃদ্ধ জলধর সেন ও 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকার তরুণ-বয়স্ক পরিচালক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রথমেই মনে আসে। উমাপ্রসাদ এবং বিশেষ করে রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' নামক বিপ্লবমতি উপন্যাসটি তাঁদের বঙ্গবাণীতে প্রকাশ করে তৎকালে অসমসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। বিপ্লববাদীরা এ বইটি সাদরে গ্রহণ করে। কিন্তু এই বইটি প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই বৃটিশ সরকার এটিকে নিষিদ্ধ করেন। এই সময়টুকুর মধ্যেই বইগুলি নানা কেন্দ্রে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এরই সাত-আট বছর পরে নতুন ভারত শাসন আইন প্রবর্তনের ফলে মৌলভী ফজলুল হক সাহেব বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং তিনি অতঃপর 'পথের দাবী'র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। ঘটনাটা আমার মনে আছে এই কারণে যে, এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যাপারে সিটি কলেজের এক মস্ত সভায় আমি আমার এক বৃটিশ-বিরোধী বক্তৃতায় 'তুবড়িবাজি' করেছিলুম!

যাই হোক, শরৎচন্দ্র শিবপুরে কোথায় থাকতেন সেটি আমার জানা ছিল। ও-অঞ্চলটার নাম ছিল বাজে-শিবপুর। ওখানে নীলকমল কুণ্ডু লেনে পণ্ডিতপ্রবর শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের পৌত্র এবং আমার সহপাঠী বলাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়রা যে-বাড়িতে থাকতেন, তার পাশের বাড়িতে থাকতেন শরৎচন্দ্র। বলাই তখন নতুন কলেজের ছাত্র। শরৎচন্দ্রের বহু ফাইফরমাশ বলাই সানন্দে খেটে দিত এবং শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন রচনার পাণ্ডুলিপি সযত্নে পকেটে নিয়ে কলকাতায় সম্পাদকের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসত। বয়সে অল্প হলেও বলাই ছিল শরৎচন্দ্রের খুবই প্রিয় এবং অন্তরঙ্গ। পরবর্তীকালে বলাই হাওড়ার একজন বিশিষ্ট আইনজীবী হয়ে ওঠে এবং সে তার বংশের ঐতিহ্যের ধারানুসারে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে প্রচুর প্রতিষ্ঠালাভ করে। একদা কিশোর বয়সে বলাই আর আমি সারাদিন বড়বাজারের ঘাট থেকে সেই দূর শিবতলার ঘাট পর্যন্ত গঙ্গায় নিয়মিত ভেসে বেড়াতুম স্টীমারে!

রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যের মধ্যগগনে দেদীপ্যমান তখন তাঁর বইয়ের কাটতি ছিল না বললেই হয়। উচ্চবিত্ত সমাজের যাঁরা উচ্চশিক্ষিত তাঁরা ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের ভক্ত। যাঁরা বাঙ্গলা কাব্য সাহিত্যের রসিক, তাঁরা

বিশেষ বই কিনতেন না। গৃহস্থঘরের স্বল্পশিক্ষিত বউ-ঝিরা সস্তারসের সহজ-বোধ্য উপন্যাস পড়ত, রবীন্দ্রসাহিত্যের দিকে ঘেঁষতো না। সে-সময়ে সুরেন্দ্র-মোহন ভট্টাচার্য, নারায়ণ ভট্টাচার্য, ফণীন্দ্র-যতীন্দ্র-ধীরেন্দ্রনাথ পাল, দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি প্রিয় ছিলেন মেয়েমহলে। কিন্তু ভারতী গোষ্ঠীর লেখকরা—যাঁরা কবি ও ঔপন্যাসিক—তাঁদের মধ্যে কৃতী ও প্রতিভাবান ছিলেন অনেকেই। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবক্ষেত্রকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। শরৎচন্দ্রের অনন্যসাধারণ লিখনভঙ্গী, গল্পের বাঁধুনি, তাঁর অভিনব ধরনের নারী-চরিত্র সৃষ্টি, তাঁর ছোট ছোট পার্শ্বচরিত্র, তাঁর কৌতুক-পরিহাসের পাশেপাশে হৃদয়াবেগের আকুলতা—এগুলি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মনকে নিঃসংশয়ে জয় করেছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশার মধ্যেই শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় ও অন্তর্ধান ঘটে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের গল্পসাহিত্য ওই বাইশ-চব্বিশ বছরের মধ্যে যে দুর্লভ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল সেটি সগৌরবে অদ্যাবধি অম্লান হয়ে রয়েছে!

সঠিক জানিনে, শিবপুরে বোধ হয় তিনি ঘরভাড়া নিয়ে থাকতেন। ওখানে তিনি একা থাকতেন কিনা, অথবা তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর প্রকাশচন্দ্র ও সন্ন্যাসী 'বেদানন্দ' তাঁর সঙ্গে বসবাস করতেন কিনা তাও আমি জানিনে। শুধু নরেন্দ্র দেব মহাশয়ের কাছে শুনেছি, শরৎচন্দ্র বর্মা থেকে কলকাতায় ফিরে বড়বাজারের মোড়ে এমন একটি বাড়িতে ওঠেন, যেটির তৎকালে কিছু কুখ্যাতি ছিল। নরেন্দ্র দেব সেই বাড়িতেই প্রথম শরৎচন্দ্রকে দেখেন। যাই হোক, অবস্থা বিবর্তনের ফলে শরৎচন্দ্র শিবপুর ছেড়ে হাওড়া জেলার অন্তর্গত শামতাবেড়-পানিত্রাসে একটি পল্লীভবন নির্মাণ করেন এবং সেখানে তিনি তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী হিরন্ময়ীকে নিয়ে ওঠেন। এই পল্লীভবনটি রূপনারায়ণের পাড়ের ধারে অবস্থিত, এবং এটি দেখে শরৎচন্দ্রকে একদা আমি বলেছিলুম, এমন 'তটস্থ' হয়ে এখানে কত কাল থাকবেন?

'তটস্থ' শব্দটা শুনে শরৎচন্দ্র রস পেয়েছিলেন!

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের উপার্জন প্রচুর পরিমাণে এই সময়ে বেড়ে ওঠে। তাঁর বই থেকে সিনেমা-চিত্র ও রঙ্গালয়ে তাঁর নাটকের পর নাটক হতে থাকে। তখন তিনি দক্ষিণ কলকাতায় অশ্বিনী দত্ত রোডে একখণ্ড জমি কেনেন এবং একটি দোতলা বাড়ি নির্মাণ করান। তাঁর গাড়ি বা টেলিফোন ছিল কিনা, অতটা আমার মনে পড়ছে না। তবে তাঁর গল্পগুজবের কেন্দ্র ছিল দুটি জায়গায়। একটি হল নরেন্দ্র দেব মহাশয়ের বাসস্থান, অন্যটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'রসচক্র'। কবি রাধারানী বা নরেন্দ্র দেবের ওখানে প্রমথ চৌধুরী ও শরৎচন্দ্র নিয়মিত

অভ্যাগত ছিলেন। আমাদের বন্ধু ও 'বাতায়ন'-সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল ওই আড্ডার আনন্দদায়ক সংবাদগুলি আমাদের অনেকের কাছে পৌঁছিয়ে দিত!

লেখকদের আড্ডা সাধারণত বসে দৈনিক বা সাময়িকপত্রের আপিসে, সম্পাদকের ঘরে অথবা প্রকাশকের দোকানে। এইপ্রকার আড্ডার প্রথম মধুর স্বাদ আমি পেয়েছিলুম বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে ফরোয়ার্ড ও বাঙ্গলার কথা আপিসে—যেখানে প্রিয়দর্শন তরুণ সম্পাদক গোপাললাল সান্যাল ছিলেন অনেকটা মধ্যমণির মতো। তাঁর মিষ্ট ব্যবহার আকর্ষণের বস্তু ছিল।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক ছিল 'রসচক্রের' মজলিস। এটি কবিশেখর কালিদাস রায় ও তাঁর সহোদর রাধেশ রায়ের বাসস্থান। তখন কালিদাস রায়ের বৃদ্ধ পিতা জীবিত, এবং তাঁদের একতলা নতুন বাড়িটি ছিল রাজা বসন্ত রায় রোডের দক্ষিণ প্রান্তে—যার পরেই অনুন্নত বনবাঁদাড়। ওই মজলিসের যাঁরা প্রধান আকর্ষণ, তাঁদের মধ্যে তৎকালীন প্রসিদ্ধ গল্পলেখক বিশ্বপতি চৌধুরী হলেন সকলের প্রিয়। তখন বিশ্বপতি ও মণীন্দ্রলাল বসু 'প্রবাসী'র লেখক হিসাবে খুবই খ্যাতিমান। ওই মজলিসে এসে বসতেন শরৎচন্দ্র, শিল্পী সতীশ চন্দ্র সিংহ, কুমুদ রায়চৌধুরী, মুটবিহারী মুখুজ্যে, 'সম্মিলনী'র সম্পাদক কালীমোহন বসু এবং আরও অনেকে। কবিশেখর তখন খুবই জনপ্রিয়, মজলিসী ও মধুরস্বভাব ছিলেন। শরৎচন্দ্র নিয়মিত আসেন না, তবে যখনই আসেন,—তাঁকে ঘিরে সরস খোশগল্প আরম্ভ হয়ে যায়। একবার ওঁর খোশগল্পের ফাঁদে আমি ধরা পড়েছিলুম। উনি আমাকে দেখেই বললেন, তুমি এত দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াও, অথচ রানাঘাটের সেই বিখ্যাত পাঁচিলটা তোমার চোখে পড়েনি?

বললুম, পাঁচিল? সে আবার কি?

ওই ছাখো! বাঙ্গলা দেশের কিছুই জানো না তুমি! 'চাইনীজ ওয়াল' ত শুনেছ? তেমনি রানাঘাটের সেই পাঁচিল চার মাইল লম্বা—একেবারে গঙ্গার ধার পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। আমারই মামার গুষ্টির ক্যাদার গাঙ্গুলীর পাঁচিল—সেখানে সবাই জানে। হাজার হাজার লোক দেখতে যায়।

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে পরদিনই আমি রানাঘাট রওনা হই। কিন্তু সেখানে একশ' বর্গমাইল চৌহদ্দির মধ্যে কেদার গাঙ্গুলী নামধারী কোনও ব্যক্তিকে কেউ চেনে না এবং পাঁচিল দূরের কথা, একটি ইটের পাঁজাও আমার চোখে পড়েনি। ওটা যে 'রসচক্রে'র খোশ গল্প, সেটা আগে ভাবিনি। কিন্তু আমি যে হদ্দ বোকা বনে গিয়েছিলুম, সেটা অন্য কারোকে আর বলিনি। 'সেয়ান ঠকলে বাপকেও বলে না!'

শরৎচন্দ্র আরেকদিন আরেকটা গল্প বলেছিলেন।—বুঝলে ভাই কালিদাস, আমি যে সামান্য একটু-আধটু লেখাপড়া জানি, এটি শিবপুরের পাড়াপল্লীতে কেউ বিশ্বাস করত না। একদিন আমার সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় বুড়ি ক্ষেত্তরমণি আমার সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। আমি তাকালুম পিছন থেকে।

অ বুড়িমা, হন্তদন্ত ছুটছ কোন্ বাগে ?

থামো বাছা, পেছন থেকে ডেকো না—বুড়ি বলল, জামাইবাড়ি থেকে টেলিগেরাম এসেছে, তাই পড়াতে যাচ্ছি—

দাও না বুড়িমা, আমি পড়ে দিচ্ছি—

তুমি ?—বুড়ি থমকিয়ে দাঁড়াল। বলল, পোড়াকপাল, তুমি আবার লেখাপড়া শিখলে কবে ?

বুড়ি চলে গেল।

সমগ্র 'রসচক্র' হইচই করে হেসে উঠল। শরৎচন্দ্র হাসিমুখে আবার বললেন, ওখানেই শেষ নয় রে ভাই, আরও আছে। সেই যে আমাদের মতি ময়রার কথা বলেছিলুম, মনে আছে ত ? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরই সেই মোটাসোটা কাঁদলা-কোঁদলা গিন্নি বিনোদিনী। একদিন ওর ঘরে গিয়ে ঢুকেছি, দেখি মতি ময়রা ছোট ছেলেটাকে ঠেঙ্গাচ্ছে—তার পড়াশুনোয় মনোযোগ নেই বলে। আমি হাঁ হাঁ করে উঠলুম। ওদিকে বিনোদিনীও চেঁচিয়ে উঠল,—ছেলেটাকে আধমরা করে ছাড়ছে দেখেছ ত দা'ঠাকুর ? আমি বলি লেখাপড়া কি সকলেরই হয়, তুমিই বলো ত ? এই ত চোখের সামনেই দেখেছ দাদাঠাকুরকে ! আমি বলি ছেলেটার যদি লেখাপড়া কিছু না হয় নাই হোক, আখেরে দা'ঠাকুরের মতন দুখান বই লিখেও ত খেতে পারবে।

'রসচক্রে' সেদিন তুমুল হাস্যধ্বনি উঠেছিল।

হুটবিহারীকে শরৎচন্দ্র 'মুরারি' বলে ডাকতেন। অপর কোনও একদিন শরৎচন্দ্র বললেন, তা হলে শোন্ ভাই মুরারি, মনে আছে ত পাঁচকড়ির সেই যে বোনটা—সেই যে তোমার সরলা ! সে যেদিন বিধবা হল, কী আছড়িয়ে কান্না ! সে কান্না যে শোনেনি সে বিধবার দুঃখ বুঝবে না। তিন দিন সরলা মুখে জল দিল না, কেঁদে কেঁদে একেবারে পাগল ! বলব কি ভাই, বনের পশুপক্ষীও তার দুঃখে কেঁদে যায় !

তারপর দাদা ?

তারপর যেমন হামেশা হয় !—শরৎচন্দ্র বললেন, বোধ হয় মাস তিনেক হবে। হঠাৎ একদিন শুনলুম সরলা তার স্বামীর বয়সী আইবুড়ো সেই বোনপোটাকে

নিয়ে কোথায় যেন পালিয়েছে আবার ঘর বাঁধবে বলে।

সে কি দাদা, এ ত ঠিক মিলছে না? এত কান্নাকাটি, এত—

হাসিমুখে শরৎবাবু বললেন, মিলছে ভাই, মিলছে! ও দুটোই সত্যি। সরলার কান্নাটাও সত্যি, বোনপোকে নিয়ে পালানোটাও সত্যি। কাব্যের সত্যি আর জীবনের সত্যি—এরা দুটো এক বস্তু নয় রে ভাই!

বিশ্বপতির অনর্গল পরিহাস এবং কৌতুক বাক্যবাণে হাসির ফোয়ারা ছুটত 'রসচক্রে'। সেই তামাশার ফলে কারও মুণ্ড কাটা যাচ্ছে, কেউ লজ্জায় মুখ লুকোচ্ছে, কারও সাহিত্যিক খ্যাতির সর্বনাশ ঘটছে এবং কালীদার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বিপর্যস্ত হচ্ছে! কিন্তু কেউ রাগ করছে না, কারও মানহানি ঘটছে না, কেউ মামলা তুলছে না—যে যার বাড়ি চলে যাচ্ছে রাত্রে হাসিমুখে।

'রবিবাসর' সাহিত্য সভা কিন্তু একটু অন্যরকম ছিল। এর সভাপতি ছিলেন জলধর সেন মহাশয়। এই সভায় গুরুগাম্ভীর্য বজায় থাকত, এবং এখানে গল্প কবিতা প্রবন্ধাদি পাঠ করা হত। 'বাঁশরী' মাসিকপত্রের সম্পাদক ও সুলেখক নরেন্দ্রনাথ বসু 'রবিবাসরের' স্থায়ী পরিচালক ছিলেন। এর বৈঠক বসত একপক্ষকাল পর পর রবিবারে। সাহিত্যের এই আসরে বহু লেখক সাংবাদিক সম্পাদক চিত্রশিল্পী কবি অধ্যাপক, এমন কি জজ-ব্যারিস্টার পর্যন্ত 'রবিবাসরে' এসে সাহিত্য আলোচনায় যোগ দিতেন। এই সভার একান্তে এসে বসতেন ভদ্রচিত্ত ও মিষ্টভাষী প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়। আসতেন অনেক নামকরা ব্যক্তি। এই বৈঠকের নিয়ম ছিল এক এক ব্যক্তি পালাক্রমে তাঁর নিজের বাড়িতে বৈঠক ডাকবেন এবং আহারাদির আয়োজন করবেন। রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, নরেন্দ্র দেব, নরেন্দ্রনাথ বসু এবং তৎকালে প্রবীণ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই একে একে রবিবাসরের বৈঠক ডেকেছেন। একবার শরৎচন্দ্র তাঁর নতুন বাড়িতে 'রবিবাসর' ডেকে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করলেন। সেই আসরে মহাকবি যে মনোজ্ঞ ভাষণটি দিলেন সেটি স্মরণীয়। যতদূর মনে পড়ছে, শরৎচন্দ্র সেই দিনটিকে তাঁর নতুন বাড়ির একটি বিশেষ উৎসব বলে অনেককেই ভূরিভোজের দ্বারা আপ্যায়ন করেছিলেন।

সেই ভোজের আসরে আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং শরৎচন্দ্রের পরম অনুগত সেবক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল,—আমরা দুজন পাশাপাশি লুচি-মাংস গোগ্রাসে গিলছিলুম। শরৎচন্দ্র ঘুরে-ঘুরে পরিবেশনের তদ্বির-তদারক করছিলেন। সেই সময় আমাদের তরুণ সাহিত্যকে 'ছাগ-সাহিত্য' বলে বর্ণনা করা হত! কেন

জানিনে, শরৎচন্দ্রকে হঠাৎ কৌতুকবুদ্ধি পেয়ে বসল। তিনি একসময়ে এসে আমাদের কলাপাতের সামনে উবু হয়ে বসলেন, তারপর সহাস্যে ঈষৎ মুখ ফিরিয়ে তামাশা করে বললেন, ওহে অবিনাশ, 'স্বজাতি'র মাংস কেমন খাচ্ছ?

তৎক্ষণাৎ বুঝলুম তাঁর পরিহাসের লক্ষ্য কে! আমি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বলে ফেললুম, বড় চমৎকার রান্না হয়েছে আজ আপনার মাংস!

শরৎচন্দ্র একবার অপাঙ্গে আমাকে লক্ষ্য করে হাসিখুশী মুখে উঠে অন্যত্র গেলেন। তামাশায়, পরিহাসে ও রসবোধে তিনি অনন্য ছিলেন।

পালাক্রমে একবার আমার উপর এসে চাপল 'রবিবাসর'। নব্যতরুণ বিশু মুখোপাধ্যায় শাসালো, এবার আর তোমার নিস্তার নেই। সাহিত্য ইত্যাদি ওসব পরের কথা। আপাতত তোমার খরচে এবার চল্লিশ-পঞ্চাশজন রাজসিকভাবে আহারাদি করবেন। তবে খরচের একটা অংশ তুমি পেয়ে যেতে পারো!

সেদিন আমি অন্ধকার দেখেছিলুম। তখন কোথাও কিছু নেই আমার। তৎকালে একটি নতুন আমদানি-করা শব্দ অনুযায়ী আমি 'প্রোলেটেরিয়েট্'। তবুও যা হোক করে সেবার দায়োদ্ধার হয়ে কাশী রওনা হয়েছিলুম।

পুজোর মরসুম বাঙ্গালীর মনে চিরকাল উদ্দীপনা আনে। আমিও তার ব্যতিক্রম নয়। আশ্বিনের দুর্গাপূজার গন্ধে-গন্ধে সমগ্র ভারতের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালীর ডানায় আসে চাঞ্চল্য। শাদা মেঘ আর নীল আকাশ দেখে বাঙ্গালীই বলে ওঠে, "ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী—"

মহালয়ার ঠিক পর থেকেই তখন হাজার হাজার বাঙ্গালী পরিবার ছুটত কলকাতার কর্মস্থল থেকে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপন আপন গ্রাম ও শহরের বাস্তুভূমিতে। তখন কেবল একটা কথাই শোনা যেত: 'বাড়ি যাচ্ছি'। সেই অধিকাংশ 'বাড়ি'র পুজোর উৎসবে জাতিবর্ণের কোনও ভেদ ছিল না। পুজো সকলেরই। প্রতিমা গড়া, চালচিত্র বানানো, ডাকের সাজ তৈরি, কাঠামো নির্মাণ—সব কাজের মধ্যে সবাই। সমস্ত উৎসবটা সকল সম্প্রদায় মিলে ভাগ করে নিত।

সেই যুগে বাঙ্গালীর সর্বপ্রধান শত্রু ছিল ম্যালেরিয়া। শরৎকালে যখন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোনার বাঙ্গলার সৌন্দর্য দেখে সবাই মুগ্ধ হচ্ছে তখন দেখা দিত ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, নিউমোনিয়া, আমাশয় বা টাইফয়েড। ওগুলো আবার বিশেষভাবে বেড়ে উঠত, যখন শরৎকালের পর থেকে জল কমতে আরম্ভ করত—অর্থাৎ কার্তিক-অগ্রহায়ণে ওর প্রকোপ দেখা দিত বেশি। তৎকালে প্রায়

প্রত্যেক পোস্ট অফিস থেকে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে কুইনিনের শাদা গুঁড়ো বিলি করা হত, এবং এই রোগের হাত থেকে জেলাকর্তৃপক্ষেরও রেহাই ছিল না। এই সব কারণে ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর মন ছুটতে লাগল সাঁওতাল পরগনার মধুপুর, দেওঘর, মিহিজাম, গিরিডি প্রভৃতি অঞ্চলে। ওদিকে জলকাদা, পচা-ডোবা, পানাপুকুর, ম্যালেরিয়াবাহী মশা, নদীনালার সোঁতা—এগুলো কম এবং জল হাওয়া স্বাস্থ্যের অনুকূল। বিংশ শতকের প্রারম্ভে শুধু নয়, সাঁওতাল পরগনা যেহেতু বাঙ্গলার মধ্যেই ছিল—সেই হেতু এই ভূভাগে বাঙ্গালীর বসবাস চিরকালই চলে এসেছে। সুতরাং পূজোর মরসুমে সাঁওতাল পরগনাও মুখরিত হয়ে উঠত।

এর পরে দেখছি স্বাস্থ্যোন্নতি লাভের আশায় বাঙ্গালী যেতে আরম্ভ করল আরও এগিয়ে পশ্চিমের দিকে। পশ্চিমকে মন দিয়ে ওরা চিনতে লাগল। বায়ু বদলের জন্য ওরা প্রথম বেছে নিল যুক্তপ্রদেশ। এখানে হাওয়া শুষ্ক, জল স্বাস্থ্যদায়ক, খাদ্যসামগ্রী সস্তা—এর ওপর উপরি পাওনা হল কতকগুলি তীর্থস্থান এবং মোগল পাঠানের বিভিন্ন স্থাপত্যসৌধ। বাঙ্গালী যতদুর গেল, দুর্গাপুজোকে সঙ্গে নিয়ে গেল। সমস্ত শরৎ ও হেমন্তকালটাকে ওখানে এখনও বলা হয়, 'বাঙ্গালী সিজন্'।

কাশীতে বাঙ্গালীর প্রাধান্য রানী ভবানীর আমল থেকে। কিন্তু পুজোর মরসুম থেকে 'বাঙ্গালী সিজন্' আরম্ভ। ইদানীং এই 'বাঙ্গালী সিজন্' দেখা যাচ্ছে কাশ্মীরে, হিমাচলে, রাজস্থানে এবং কতকটা পাঞ্জাবেও। একশ্রেণীর বাঙ্গালী এখন সমস্ত হেমন্তকাল ধরে উত্তর ভারতের সর্বত্র টাকাপয়সা ছড়িয়ে দিয়ে আসে। ভারতীয় রেলওয়ে বাঙ্গালীর উপার্জনের অনেকটা অংশ পেয়ে যায়।

যাই হোক, পূজোর মরসুম অনেকটা আমার মধ্যেও কাজ করছে। আমি সেবার গিয়ে গণেশমহল্লার গলিতে আমাদের 'কমিউনে' উঠলুম। হ্যাঁ, 'কমিউন' বইকি। ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের পর আমাদের নিকট-বন্ধু সারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই বাসস্থানে বোধ করি দ্বিতীয় কমিউন পরিচালনা করছেন! কিন্তু এটি একটু ভিন্ন ধরনের। এই দোতলা বাড়ির যে কোনও ঘরে কম্বল বিছিয়ে আশ্রয় নিলে কেউ প্রশ্ন করে না। কেউ কাজ করতে বলে না বা কেউ খরচের কথা তোলে না। বন্ধুদের যে কেউ এসে মধ্যাহ্নে ভোজের আসরে বসে যাও, পেট ভরে গরম-গরম ডাল, ভাত, মাংস বা রুই মাছের কালিয়া, দই বা চাটনি খেয়ে যাও। অমুক-অমুক বন্ধু, অমুকের চেনা

অমুক বন্ধু—ভাল কথা, পাত পেড়ে বসো। আজ কি রান্না হয়েছে হে?—হ্যাঁ, 'গরম গরম'—ভুনি-খিঁচুড়ি নতুন ওঠা ফুলকপি দিয়ে, আর গঙ্গার ইলিশ—চার-পাঁচ আনা জোড়া! টক দইয়ের সঙ্গে কাশীর চিনি। হাপুস-হুপুস করে খাও!

বন্ধুবর সারনাথ ওরফে শটাই তাঁর চারটি ছোট ভাই—শিশু, নাবালক ও কিশোর—এদেরকে খাইয়ে ধুইয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে প্রতিপালন করেন। কলকাতা থেকে বড় ভাই টাকা পাঠান। ওদের পিতামাতা কেউ জীবিত নেই। শটাই আমাদের কর্মবীর। তার এক হাতে রান্না, বাট্‌না, জল তোলা, বাসন মাজা, এঁটো পাড়া, বাজারহাট করা, ঘর-দোর ঝাড়া—এবং আরও কি কি, সেই শুধু জানে। অন্যদিকে সে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। পাড়ার লোক এবং বন্ধু-মহলে সে বিনামূল্যে ঔষধপত্র দিয়ে আসে। অসহায় রোগীদের জন্য আবার সযত্নে দুধ-বার্লি তৈরি করে তাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। এদিকে সে নাকি একজন 'কমিউনিস্ট'। কিন্তু তার বাড়ির ভিতরকার মস্ত কালীমন্দিরের পুজোর জন্য তাকে নৈবেদ্য ও ভোগ সাজাতে হয়। সম্প্রতি সেই চতুর্ভুজা কালীমূর্তির একটি হাতে সে কাস্তে-হাতুড়ি মার্কা একটি ফ্ল্যাগ আটকিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যার আগে সে নতুন পার্টি আপিসে গিয়ে 'স্টাডি সার্কলে' যোগ দেয়।

'কমিউনিস্ট' শটাই দেবদ্বিজ বা পূজা-অর্চনায় পরম ভক্তিমান। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও গান্ধীজীর প্রতি সে অতিশয় শ্রদ্ধাশীল। ওদিকে লেনিন, ট্রটস্কি, স্টালিন এবং মার্কস এঙ্গেলের প্রতিটি রচনা তার মুখস্থ। রুশ বিপ্লবের আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত, তার ব্যাখ্যা, প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত, লেনিনের আগাগোড়া ইতিহাস এগুলি ১৯৩৩-এ প্রথম আনুপূর্বিক শুনি এই কমিউনে। কিন্তু শটাই বাঙ্‌মুখর নয়। সে শান্ত স্বল্পভাষী, সংযত ও সেবাপরায়ণ। কিন্তু আরেক দিকে সে অত্যন্ত ঠাণ্ডা। তার কোনও দুঃখ, ভাবাবেগ, বেদনাবোধ, শোকতাপ, স্নেহপ্রীতির উচ্ছ্বাস—কিছু নেই। রোগীর সেবা করবে সে অক্লান্ত, কিন্তু রোগীর মৃত্যু ঘটলে সে মৃত ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে শুধু ভাববে, অন্তিমকালের কোন্ কোন্ উপসর্গে কি-কি ওষুধ কাজ দিতে পারত! তার একপ্রকার মিশনারি করুণা দেখতে পাই—যেটা শীতল. নিরুদ্বেগ, নির্মোহ, কিন্তু অকৃত্রিম সেবাপরায়ণ। শটাইয়ের চোখে কখনও জল দেখিনি, এবং সর্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুতেও তার চোখ ঝাপসা হয়নি। স্ত্রীলোক এবং পুরুষ তার কাছে একই 'মেসিন', শুধু 'অর্গানিক' পার্থক্য মাত্র। কাব্য-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে তার কোনও ঔৎসুক্য নেই, কিন্তু শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথির গ্রন্থগুলি সে রাত জেগে পড়াশুনা করে। আমাদের সকল কাজে ও সকল প্রয়োজনে শটাই ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দুঃসময়ে শটাইকে ডাকে, হিন্দু মহাসভার লোকরা তাকে সালিশী মানে, মদনপুরার মুসলমান কর্তারা তার সাহায্য চায় এবং পাড়ায় পাড়ায় কোথাও ঝগড়াঝাঁটি হলে সকলের আগে শটাইয়েরই ডাক পড়ে। সে নিজে নিঃস্ব, তার একটি পয়সাও পুঁজি বা উপার্জন নেই, অথচ তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও কিছু নেই। না উপার্জন, না সংস্থান—শুধু তার বড় ভাই তাকে কলকাতা থেকে প্রায়ই মনিঅর্ডার করেন।

সুতরাং শ্রীমান সারনাথের ওই বাড়িটিকে তার প্রত্যেক বন্ধুবান্ধব নিজের বাড়ি মনে করে এবং ওখানে আমাদের জন্য বিনামূল্যে ডাল-ভাত, মাছ-মাংস বাঁধা থাকে। তখনও কাশীতে কাটা রুই মাছ ও খাসির মাংস চার-পাঁচ আনা সের। শটাইয়ের রান্না উপাদেয়।

ওর ওখানেই শতরঞ্জি বালিশ নিয়ে থেকে গেলুম। না, এবার আর বড় বাড়িতে উঠব না। খবরটা কানে উঠলে আমার ভাই প্রভাস রাগ করবে জানি, কিন্তু ভাই-বোন, মাসী-পিসি এখন আর ভাল লাগছে না।

সেই বছর অর্থাৎ ১৯৩৩এ ন্যাশনাল সোসালিজমের স্লোগান তুলে এডলফ্ হিটলার বিশাল জার্মানির অধিনায়করূপে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সমগ্র ইউরোপ, ইংল্যাণ্ড ও সোভিয়েট ইউনিয়ন তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখছে। আমরা আদার ব্যাপারী, ইংরেজের পদপীড়িত, আমাদের বিদ্যে খবরের কাগজ পর্যন্ত। শুধু জওয়াহরলাল একটু-আধটু বিদেশী রাষ্ট্রের কথা বলেন, এই মাত্র। এই বছরেই আমি নেহরুর দুই-একটি প্রবন্ধের তর্জমা করে বাঙ্গলা সাময়িকপত্রে ছাপি। তাঁর রচনাগুলি সাহিত্যপ্রধান, সেজন্য রস পেতুম। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় এই সময়টায় তিনি তাঁর কিশোরী কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরাকে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে রাখেন।

যাই হোক, এবার বড় বাড়িতে উঠিনি বটে, কিন্তু সকলের সঙ্গে আমার প্রায় প্রতিদিনের যোগাযোগ ছিল। কিশোরদা তখন বাঙ্গালীটোলা স্কুলের হেড মাস্টার। তাঁর বড় ছেলে ভোমল বোধ হয় এবার ম্যাট্রিক দেবে। একদিন কিশোরদা আমাকে বললেন, আমাদের ইস্কুলে এবার ঘটা করে বিজয়া সম্মেলনী হবে। তুই নিশ্চয় আসবি। তোকে অনেকে দেখতে চায়। এবারেও কোজাগরীর দিনেই হবে।

পুজোর দিন সকালে গেলুম হারারবাগের দিকে। ওই দিকেই গঙ্গা ঘোষালের বাড়ি। তার মাথাটা অকালপক্ব, এরই মধ্যে চুল পেকেছে। কিন্তু সে ছেলেমহলের প্রিয়। তার স্নেহমধুর আচরণ ও কথাবার্তা এবং হাসি-হাসি

ভাবের জন্য অনেকেই তার সুখ্যাতি করে। সে কাঁধে হাত রেখে অন্তরঙ্গের মতো আলাপ করতে জানে। ইদানীং তার সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা। সাবিত্রীদের বাড়িতে সে আত্মীয়েরই মতো। কিন্তু সাবিত্রীই যে আমার ভ্রমণ-কাহিনী গ্রন্থে 'রানী' নামে পরিচিত, গঙ্গা এটি জানেও না, এবং বইটিও পড়েনি। আমাকে দেখেই গঙ্গা বলল, তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি যে সেই একগাদা বই পাঠিয়েছিলে, তাই দিয়ে টুনু এক লাইব্রেরি আরম্ভ করেছে। সে তোমার সব বই পড়ে। তুমি কি যেন এক ভ্রমণকাহিনী লিখেছ 'ভারতবর্ষে', টুনু তাই নিয়ে সারাদিন কাটায়।

আমি হাসছিলুম। সাবিত্রীর ডাক নাম টুনু। আমার 'জলকল্লোল' গ্রন্থে এই নামটিই ব্যবহার করেছি।

গঙ্গা বলল, শিবালার ওদিকে টুনুর এখন খুব নাম। ওর খরচে অনেক মেয়ে লেখাপড়া করে, শেলাইয়ের কল্ চালায়, অনেকে আবার কাপড়-চোপড় আর মাসোহারাও পায়। টুনুর নিজের অবস্থা বেশ ভাল। ওর স্বামীর ইনস্যুওরেন্স-এর দরুন অনেক টাকা পেয়েছে। তাছাড়া জানো ত—

কেউ কোথাও আমাদের কথা শুনছে না, তবু গঙ্গা আমার কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলল, টুনুর বাবাকে গুলী করে মেরেছে বাঙ্গলার বিপ্লবীরা, তিনি পুলিসের ইনসপেক্টর ছিলেন ত।—সেইজন্য তাঁর বিধবা মেয়েকে গভর্নমেণ্ট মাসোহারা দেয়! যাক্, খুব খুশী হলুম তুমি এসেছ। টুনুও শুনলে খুশী হবে। তুমি আছ কদ্দিন?

কয়েকদিন আছি এখন।

বেশ, আবার দেখা হবে। শোন, কোজাগরীর দিনে এবার 'বিজয়া সম্মেলনী' হবে ঘটা করে। আমি অরগানাইজ্ করছি—এসো। তোমার নেমন্তন্নর চিঠি যাবে প্রভাসদের ওখানে। আচ্ছা, এখন আসি।

গঙ্গা চলে গেল চৌমহানির দিকে। আমি ঢুকলুম সোনারপুরার গলিতে। এ গলি দিয়ে কিছু দূর এগিয়ে গেলেই বাঁ-হাতি ফরিদপুরার গলি। ফরিদপুরার বাড়িতে সুধাংশু মুখুজ্যে মশায় এখন নেই। তিনি আছেন কলকাতায়। সকাল দশটায় তিনি যান ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন কার্জন পার্কে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি এখন এসপ্লানেড নর্থের বড় অট্টালিকায় স্থানান্তরিত। ওই কার্জন পার্কের একটি বিশেষ গাছতলায় সুধাদা প্রায়ই সন্ধ্যা কাটান আমার সঙ্গে। ছেলেদের পড়াশুনোর ব্যাপার নিয়ে এখন তিনি পাইকপাড়ায় তাঁর ছোট ভাইয়ের ওখানে থাকেন—সেখানে তিনি

পূজ্য ও আরাধ্য। এখনও তাঁর আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভাল। কিন্তু তাঁর ধুতি, পাঞ্জাবি, বেনিয়ান, পায়ের চটি—সব ছেঁড়া। চোখের চশমার একটা ডাঁটিতে সুতো বাঁধা। তিনি চট করে নতুন সামগ্রী গ্রহণ করতে পারেন না,—পুরনোর সঙ্গে তাঁর মন মেলানো থাকে। ওঁর কাশীর বাড়িতে ঘরের কড়িকাঠ থেকে যে ঝুলটি ঝোলে, সেটি ওঁর কল্পনার একটা আশ্রয়! ভাঙ্গা পেয়ালা ও কুঁজো, নস্যের পুরনো টিনের কৌটো, পায়াভাঙ্গা টুল, ছেঁড়া মশারি, সীট-ছেঁড়া বেতের চেয়ার, নড়বড়ে তক্তা—এগুলি তাঁর অতি পরিচিত বলেই অতি প্রিয়।—এগুলি হঠাৎ বদলিয়ে দিতে গেলে তাঁর মন উৎকেন্দ্রিক হয়ে যায়, এবং নিজকে বাস্তুচ্যুত মনে করেন। তিনি দরিদ্র এবং সর্বহারা—এই চিন্তাবিলাসটি তাঁর একান্তই দরকার।

কোজাগরীর আগের দিন প্রভাস আমার হাতে আমন্ত্রণপত্র দিল। আমার তরুণ বয়সে সেদিন আমার পক্ষে এটি অভাবনীয় ছিল যে, ওই বাঙ্গালীটোলা ইস্কুলে আমার জন্য একটি নাটকীয় পরিস্থিতি অপেক্ষা করে রয়েছে! আমার যাবার উৎসাহ ছিল কম। কারণ ওই বিজয়া সম্মেলনীতে যাঁরা আসেন, তাঁরা সাধারণত প্রবীণ-বয়স্ক এবং কাশীস্থ পণ্ডিত সমাজ। সেখানে আমি অনেকটাই বেমানান। তাছাড়া দু'চারজন এমনও আসেন, যাঁরা তরুণ লেখকদের প্রতি যথেষ্ট প্রসন্ন নন। শুনেছি আমার ভাই প্রভাস আমার প্রতি স্নেহশীলতাবশত ওঁদের কোন-কোনও ব্যক্তিকে দু'চারটে কড়া কথাও শুনিয়ে দেয়। সেদিন প্রভাসের অপ্রিয় সত্য ভাষণ অনেকের পক্ষেই ভীতিজনক ছিল। কিন্তু লক্ষ্য করেছি কাশীতে প্রভাস বোধহয় কিশোরদার চেয়েও জনপ্রিয়।

যাই হোক, আমার উৎসাহের অভাব থাকা সত্ত্বেও গেলুম বিকালের দিকে বাঙ্গালীটোলা স্কুলে এবং সভাস্থলের পিছন দিকে একান্তে গিয়ে একখানা চেয়ারে বসলুম। সভাপতির আসনে দেখছি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণকে। উনি আমাদের সকলের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন এবং পথে-ঘাটে কোথাও ওকে দেখলে আমরা নত নমস্কার জানিয়ে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াই। সভাপতিকে ঘিরে আশেপাশে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ছাড়াও তিনজন মহামহোপাধ্যায়—পঞ্চানন তর্করত্ন, ফণীভূষণ তর্কবাগীশ ও যাদবেশ্বর তর্করত্ন। রয়েছেন পণ্ডিত বটুকনাথ ভট্টাচার্য, কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি, হরিহর শাস্ত্রী, ফণীন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এবং আরও বিশিষ্ট কয়েকজন, যাঁদের অনেককে আমি সেদিন চিনিনে।

এক-একজন বক্তা সুন্দরভাবে কাশীর বাঙ্গালী-সংস্কৃতি এবং বিজয়া সম্মেলনার তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করছিলেন, এমন সময় গঙ্গা তার স্বভাবসিদ্ধ হুজুগ নিয়ে কাছে এসে আমার কানে কানে বলল, টুনুকে এনেছি আমার সঙ্গে। ও তোমাকে দেখবে। তোমার বক্তৃতা শুনবে। ওই যে, ওই কোণের দিকে বসেছে।

বক্তৃতা! আমি অবাক—আমি কেন বক্তৃতা দেবো?

বাঃ তুমি হলে টুনুর প্রিয় লেখক! তোমার কথা শুনবে না সে একটু?

এমন সময় কে যেন উঠে গিয়ে সভাপতি মহাশয়কে কি যেন বলল। তৎক্ষণাৎ বক্তৃতারত এক পণ্ডিতকে থামিয়ে সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করলেন, আপনাদের কাছে আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, এখানে এমন এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছেন, যাঁর পুণ্য লেখনী হিমালয়ের দুর্গম ও দুঃসাধ্য তীর্থ কেদারনাথ ও বদরিনাথকে আমাদের সম্মুখে মূর্ত করে তুলেছে!

সভায় কেমন একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। এপাশে ওপাশে সবাই খুঁজতে লাগল সেই ব্যক্তিকে! আমি আড়ষ্ট হয়ে উঠলুম।

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ বলছিলেন, এই তরুণ লেখক প্রকৃতই সংসার-বিরাগী, নিষ্কাম নিরাসক্ত ব্রহ্মচারী। তিনি তাঁর তীর্থযাত্রায় দেখা পেয়েছিলেন এক আচারনিষ্ঠা পরম পুণ্যবতী রমণীকে—যাঁর তপশ্চর্যা, সংযম, শালীনতা—সমগ্র হিমালয়কে প্রাণবন্ত করেছিল। গ্রন্থকার জানিয়েছেন, এই সদাচারপরায়ণা বিধবা যুবতীটি নাকি কাশীবাসিনী! তিনি কোথায় থাকেন লেখক তা জানেন না, কিন্তু আমরা সেই দেবকন্যাকে আশীর্বাদ করি। আপনাদের সকলের অনুমতি-ক্রমে আমি 'মহাপ্রস্থানের পথে'র লেখককে স্বাগত সম্বর্ধনা জানিয়ে অনুরোধ করি, তিনি আমাদের সামনে এসে দু'একটি কথা বলুন।

ভাগ্যবিধাতার সেই নাটকীয় কৌতুক সেদিন আমাকে মেনে নিতে হয়েছিল। শ্রীমতী সাবিত্রী সভার শেষ প্রান্ত থেকে শান্ত চক্ষে আমার দিকে চেয়েছিলেন। আমি যেন বিবশ, অসাড় এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত বোধ করছিলুম।

এক সময়ে কলের পুতুলের মতো উঠে গিয়ে সভাপতিকে নত নমস্কার জানিয়ে মুখ খুললুম। আমার বক্তৃতার মাঝে মাঝে শ্রীমতী সাবিত্রীর সেই সম্মোহিত কালো দুটো চোখের দিকে তাকাচ্ছিলুম। তিনিই আমার অনুপ্রেরণা! আমার ভাষণে এনে হাজির করেছিলুম বিশ্বপতি ব্রহ্মাকে, সপ্তর্ষিমণ্ডলকে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের আদিম নিয়মকে, মানুষের চিরকালীন তীর্থযাত্রার ঐশ্বরিক পিপাসাকে, জীবন-ধারণের মূল ব্যঞ্জনাকে—অর্থাৎ হাতের কাছে যা পেয়েছিলুম তাই নিয়েই পেশাদার বক্তার মতো কথার মালা গেঁথে যাচ্ছিলুম।

এর পরে আমার ভাষণে এলো তিনটি নারী। একটি স্খলিতচরিত্রা কিন্তু স্নেহধর্মপরায়ণা 'রাধারানী', দ্বিতীয়টি অন্ধকার পার্বত্য নদী-সঙ্গমে পথপ্রদর্শিকা ঈশ্বর-প্রেরিতা ভগবতী 'ভৈরবী', তৃতীয়টি হলেন শুচিশুদ্ধা, নিষ্ঠাবতী ও কল্যাণময়ী 'রানী'—যাঁর চরিত্রগৌরবের মহৎ সান্নিধ্য সকল তীর্থযাত্রাপথের ক্লান্তি, অবসাদ, দুঃখ-দুর্যোগ—সব ভুলিয়ে দেয়। শ্রীমতী 'রানী' হলেন সেই প্রজাপতি ব্রহ্মার নিত্যসৃজনের আনন্দ রূপ—যে আনন্দে বিষ্ণুগঙ্গা তার ধারাস্রোতে মুখর হয়, উত্তুঙ্গ তুষারশৃঙ্গ দেবাদিদেবের চূড়ায় পরিণত হয়, যে-আনন্দে চিড় আর পাইনের অরণ্য মহৎ বেদনায় আর ঈশ্বরলাভের অনন্ত পিপাসায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে!

আরও কত কি বলে যাচ্ছিলুম। অদূরে একান্তে বসে রয়েছেন সেই আমার ইষ্টমন্ত্রদাত্রী ভাবাপ্লুতা শ্রীমতী সাবিত্রী—আজ যিনি শুধু 'রানী' নন, যিনি সর্বাণী—যাঁর চোখ দিয়ে এবার ঝরঝরিয়ে জল নেমেছে, এবং যাঁর তিন-চারজন সঙ্গিনী অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। সাবিত্রীর সত্য পরিচয় সম্বন্ধে আমি অতিশয় সতর্ক ছিলুম।

পেন্‌সনভোগী বৃদ্ধরা এবং পণ্ডিত মহল সেদিন 'সাধু সাধু' বলে আমার ভাষণকে অভিনন্দিত করেছিলেন। এর ফলে হল এই, 'তরুণ সাহিত্য' রচনার জন্য আমার যে অপযশের পরিচয় কাশীতে চলে আসছিল, তার অনেকটাই সেদিন বাষ্পের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল।

সভাশেষে কোলাকুলির পালা। আমার সমবয়স্কের সংখ্যা কম—চারদিকে চেয়ে দেখি আমার 'বাবারা'! একসময় গঙ্গা এসে আমাকে ধরল—সে হবে না, টুনুকে ওই বারান্দায় দাঁড়াতে বলেছি। সে তোমার ভক্ত পাঠিকা, একবার গিয়ে দাঁড়াবে চলো!

গঙ্গা একপ্রকার হিঁচড়িয়ে আমাকে টেনে নিয়ে গেল ইস্কুলের দক্ষিণ-পশ্চিম বারান্দার কাছে। তিন-চারজন বয়স্কা সঙ্গিনীর মধ্যে সাবিত্রী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। গায়ে তাঁর রেশমী চাদর, মাথায় ঈষৎ ঘোমটা। না, আমি তাঁকে চিনিনে, জীবনেও তাঁকে দেখিনি! আমি কাঠের পুতুলের মতন হাত জোড় করে দাঁড়ালুম স্মিত মুখে। তখন রক্ষণশীল কাল, অপরিচিতা কোনও তরুণী বিধবার সঙ্গে কথা বলার রেওয়াজ হয়নি। গঙ্গা মাঝখানে দাঁড়াল। সে ওঁদের ঘরের লোক। গঙ্গার কাছে অনুরোধ পেয়ে এবার শ্রীমতী সাবিত্রী মৃদু বিনীত স্বরে বললেন, গঙ্গাদার অনুরোধে আপনি কতগুলি বই দিয়েছিলেন, সেগুলি আমাদের লাইব্রেরীতে সাজিয়ে রেখেছি।

আমি নিজে নিশ্চল কাঠের পুতুল এবং অপর তিনজন মহিলা হলেন মিশরের

রমি! শুধু গঙ্গা একসময় ছট্‌ফটিয়ে বলল, টুনু, তুমি যে বলছিলে ওঁর সঙ্গে কখনও দেখা হলে তুমি কি যেন জানতে চাইবে? এবার ওঁকে জিজ্ঞেস করো?

সাবিত্রী আমার দিকে তাকাতে পারছিলেন না। কারণ সুস্পষ্ট। কিন্তু উনি সেই সন্ধ্যার কোজাগরী পূর্ণিমার আলোয় আমার দিকে বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে মধুর মিহি কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, আপনি ওই বইতে যে সব লিখেছেন, সে সব কি সত্যি?

নারীর সহজাত সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবার আমাকে নাড়া দিল। গলা পরিষ্কার করে বললুম, ওই বইতে যাঁর নাম 'রানী', তিনিই সব জানেন!

রানী কে? কাশীতে তিনি কোথায় থাকেন? তাঁর আসল নাম কি?

ক্ষমা করবেন, আমি কোনটাই জানিনে। তিনি ত বিদায় নেবার সময়ে আমাকে ঠিকানা দিয়ে যাননি!

গঙ্গা একসময় বলল, টুনু, এমন একজন লেখকের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিলুম, কই—পায়ের ধুলো নিলে না?

এবার প্রবীণা এক সঙ্গিনী বাধা দিয়ে বললেন, না গঙ্গা, টুনু যে এবার চাতুর্মাস্য ব্রত করছে, কারও পা ছুঁতে নেই!

টুনু বোধ হয় হাত বাড়াচ্ছিল, কিন্তু চাদর দিয়ে ডান হাতখানা আবার ঢেকে নিল। ওঁর উপরে এইপ্রকার পারিবারিক শাসনের কথা আমি সবই জানতুম।

গঙ্গার সঙ্গে একসময়ে ওঁরা বিদায় নিলেন।

প্রসঙ্গত বলি, বিজয়া সম্মেলনীর এই সূত্রে আমার প্রতি স্নেহশীল হয়ে উঠেছিলেন দুইজন ব্যক্তি—পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' নামক গ্রন্থের লেখক রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ। রক্ষণশীল সমাজ কি প্রকার দৃষ্টিতে তৎকালে সাহিত্যের আদর্শ বিশ্লেষণ করত, এবং কি প্রকার সাহিত্য সৃষ্টি করে এই নীতিজ্ঞানহীন আধুনিক যুগকে সৎপথে আনা যায়—এরই মোটামুটি আলোচনা ওই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ছিল।

সিংহ মহাশয় থাকতেন হায়ারবাগে আমারই এক কুটুম্ব ডাঃ জগবন্ধু চৌধুরীর বাড়িতে। ওখানে তিনি আমাকে বার বার আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। পরবর্তীকালে এই বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁর দেশ ফরিদপুরের বাড়িতেও আমাকে সমাদরে আহ্বান করেছিলেন।

শটাইয়ের 'কমিউনে' সেবার বড় আনন্দে কয়েক দিন কাটিয়ে বাড়ি ফিরেছিলুম।

বাড়ি ফিরে দেখি, কয়েকখানা চিঠি আমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। প্রথম চিঠিখানা আনন্দদায়ক। শান্তিনিকেতন থেকে লিখেছেন অনিলকুমার চন্দ— তিনি তখন রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি। তিনি লিখছেন, "কবি কিছু দিন নদীর উপরে বাস করবেন। বোধ হয় পড়াশুনোর দিকে এখন মন নেই। তবে জানতে পারলুম একখানা মাত্র বই নিয়েই তিনি নৌকায় উঠেছেন। সে বইটি আপনার " 'মহাপ্রস্থানের পথে' ।"

দ্বিতীয় চিঠি লিখেছেন, শ্রীমতী নীলিমা চট্টোপাধ্যায়। তিনি লিখছেন, সবিনয় নিবেদন, আপনার নির্দেশমতো সরোজ মিত্র মহাশয়ের কাছে আমার আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলুম। ডাঃ বি সি ঘোষ মহাশয় আবেদনপত্র মঞ্জুর করেন এবং ত্রিশ টাকা বেতন ধার্য করেন। আমি গত দশ দিন আগে মেট্রনের কাজ নিয়ে কলকাতায় এসে কাজে যোগদান করেছি। যে ব্যক্তি আমাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, সে আবার রাচিতে ফিরে গেছে। আমি ভালই আছি। তবে স্বামী অসুস্থ হয়ে রয়েছেন সেজন্য মনে দুশ্চিন্তা আছে। আমার এই কর্মসংস্থান আপনার জন্যই হয়েছে। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। ইতি—

তৃতীয় চিঠি কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি লিখছেন, তুমি পুজোর আগে 'আনন্দবাজার' আপিসে বসে প্রফুল্লবাবুর কাছে জেনেই গিয়েছিলে আমাদের এখান থেকে নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দেশ' শীঘ্রই বেরোবে। কিন্তু তুমি সেই থেকে চুপচাপ। আশা করি তোমার লেখাটা শেষ হয়েছে। আসছে শনিবার সকালে বাড়ি থেকো, আমি যাব। ইতি—বিজয়দা।

'দেশ' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় বাঙ্গলা সন ১৩৪০ এবং ইংরেজি ১৯৩৩-এ। কালীপুজোর দিন প্রথম সংখ্যা বেরোয়। আমরা ভেবেছিলুম স্থিরবুদ্ধি ও শান্তপ্রকৃতি প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় সম্পাদক হবেন। কিন্তু তাঁর বদলে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারই হলেন 'দেশ'-এর প্রথম সম্পাদক।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় প্রথম প্রবন্ধে কথায় কথায় তখন বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় তুলতেন। তাঁর কাব্যময় বাঙ্গলা ভাষার প্রচণ্ডতা, তেজোব্যঞ্জনা, অগ্ন্যুদ্গার এবং যাকে বলে রেটরিক—এগুলির জন্য কলকাতার ইংরেজ ঘাঁটি রাইটার্স বিল্ডিং, গভর্নমেণ্ট হাউস, ব্রিটিশ ব্যবসায়িক সমিতি প্রভৃতি মহলে হৃৎকম্প দেখা দিত। বাঙ্গালী জাতি তাঁর রচনায় খুঁজে পেতো শৌর্য, বিক্রম, আবেগ-প্রবণতা, আত্মোৎসর্গের উদ্দীপনা, জাতীয়তাবাদের প্রতি একাগ্র নিষ্ঠা ও দেশপ্রেম। আমাদের কাছে তিনি ছিলেন অতিপ্রিয় সত্যেনদা। কিন্তু ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রবল বিরোধী এবং স্বামী বিবেকানন্দের অভয়মন্ত্রের সাধক এই রণোন্মত্ত তুরঙ্গকে যিনি প্রতিদিন রাশ টেনে সংযত রাখতেন, তিনি প্রফুল্লকুমার সরকার স্বয়ং। বাঙ্গলার সাংবাদিক সমাজে সত্যেন্দ্রনাথ এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব!

এই সময় কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—যিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে বোধ হয় সেই প্রথম 'সর্বহারা' শব্দটি ব্যবহার করে 'সর্বহারার গান' নামক কাব্যগ্রন্থ এবং 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' লিখে খ্যাতি অর্জন করেন, তিনি 'দেশ' পত্রিকা দেখাশোনার ভার নেন্। তাঁর সহযোগী ছিলেন আমাদের পরম সুহৃদ্ ও চিরনিরীহ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুপণ্ডিত যোগেশচন্দ্র বাগল। এঁরা আমাদের বন্ধু। কিন্তু ওঁদের মধ্যে বিজয়লাল হলেন একান্তই আদর্শনিষ্ঠ। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, পরমহংস, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ,—এঁদের পূজা করতে করতে তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন এবং বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ঘুষি পাকিয়ে পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করেন। আমার ঠিক মনে নেই, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বিজয়লালের তেজস্বী ও অগ্নিগর্ভ বক্তৃতায় ক্রুদ্ধ হয়ে কয়েকবার তাঁকে জেলে পাঠিয়েছিলেন। আমরা বিজয়লালের প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলুম। তিনি যখন 'বাঙ্গলার কথা' বা 'বঙ্গবাণী'তে ছিলেন, তখন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-দুর্যোগ অভাব-অনটন কোনও কিছুর পরোয়া করতেন না। তিনি বলতেন, দেশের জন্য, জাতির জন্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এই

ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে।

'দেশ'-এর প্রথম সংখ্যায় আমার একটি ছোট উপন্যাস আরম্ভ হবে—বিজয়দা এটি আমাকে বলে রেখেছেন। কিন্তু অতি দ্রুত কলম চালিয়েও সেটি শেষ হল না, দুই তিন দিন বুঝি দেরি হয়ে গেল। দ্বিতীয় সংখ্যায় আমার একটি গল্প বেরুল—নাম 'চিতার আলোয়'। এর ঠিক পরেই 'জয়ন্ত' নামক একটি ছোট উপন্যাস ছাপা হয়।

প্রথম সংখ্যা 'দেশ' বেরোবার আগে বিজয়দা শুধু বলেছিলেন, তোমার জন্য একটি সু-খবর আছে! সেটি ব্যক্তিগত হ'লেও সবিনয়ে বলি, সেই বছরের পূজা সংখ্যা 'প্রবাসী'তে আমার 'অবিকল' নামক একটি গল্প ছাপা হয় এবং সেটি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবি তাই নিয়ে 'কোষ্ঠীর ফলাফল' 'ভাদুড়ী মশায়' প্রভৃতি রসোপন্যাসের লেখক শ্রদ্ধেয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একখানি পত্র লেখেন। কেদারবাবু সেই চিঠিকে কেন্দ্র করে একটি প্রবন্ধ পাঠান 'দেশ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার জন্য। কিন্তু সেটি ছাপা হয়নি কি কারণে আমার জানার কথা নয়। বিজয়লালও আর কিছু বলেননি।

ওই সময়েই আমার মন উল্লসিত হয়ে ওঠে একটি বিশেষ কারণে। শান্তিনিকেতনে কবির সচিব অনিলকুমার চন্দ মহাশয়ের চিঠিখানি যখন আমার অধীরতার মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছিল, সেই সময় রবীন্দ্রনাথের একখানা চিঠি পেলুম। চিঠিটা এই:

"কল্যাণীয়েষু,

আজকাল বসে বসে বই পড়ার মতো অবকাশও পাইনে, উদ্যমেরও অভাব—মনটা উড়ো পথে চলতে চায়, শরীরটা কর্মবিমুখ। কিন্তু তোমার 'মহাপ্রস্থানের পথে' বইখানি অনুরোধের দায়ে নয়, পড়ার গরজেই পড়েচি—কিছু তাতে কাজেরও ক্ষতি ঘটেচে। এই বইয়ে তোমার দৃষ্টি, তোমার মন, তোমার ভাষা সমস্তই পথ-চলিয়ে পাঠকের মনকে রাস্তায় বের করে আনে। তোমার লেখা চলেছে শাস্ত্রিক পথ দিয়ে নয়, ভৌগোলিক পথ দিয়ে নয়, মানুষের পথ দিয়ে।

"কত শতাব্দী ধরে দুঃসাধ্য সাধনরত দুর্গম যাত্রার প্রয়াস নিরবচ্ছিন্ন বয়ে চলেছে।—এই তীর্থযাত্রা তারই প্রতীক। কিছুদিন সেই টানে তুমি চলেছিলে। ঘরে ঘরে সকল মানুষই পূর্বমানুষ পরম্পরার নিরবচ্ছিন্ন অনুবৃত্তি; ছড়িয়ে আছে বলে তার সূত্রটা ধরতে পারা যায় না, কিন্তু ঐ সঙ্কীর্ণ গিরিপথে সঙ্কীর্ণ লক্ষ্যের আকর্ষণে এই চিরকালীন মানবপ্রবাহের বেগটা সুপ্রত্যক্ষ। একই বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠতায় তারা সুদূর অতীত ও অনাগত যুগের সঙ্গে নিবিড় সংশ্লিষ্ট।

এরা নানা প্রদেশের নানা ঘরের, এরা বহু বিচিত্র অথচ এক—এদের সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে সুখ ও দুঃখ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, জীবন ও মৃত্যুর ঘাত সংঘাত,—এই যুগযুগান্তর পথের পথিক মানবচিত্ত আপন অশ্রান্ত ঔৎসুক্যের স্পর্শ সঞ্চার করেছে তোমার লেখায়—তার কৌতুক ও কৌতূহল পাঠককে স্থির থাকতে দেয় না।

"তোমার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে যে সকল ঘটনা তুমি বিবৃত করেছ তার মধ্যে একটিতে তোমার স্বভাবকে ক্ষুণ্ন করেছে। এই তীর্থপথে তুমি যে লোকযাত্রায় যোগ দেবার সুযোগ পেয়েছিলে তার মধ্যে শিক্ষিত, মূর্খ, সাধু, অসাধু সকল রকম মানুষেরই সমাগম ছিল—মানুষকে এত কাছে এত বিচিত্রভাবে স্বীকার করে নেওয়া কম কথা নয়। তবে কেন বেশ্যাকে বেশ্যা জানবামাত্র এক দৌড়ে দূরে চলে গেলে? কেন সাহিত্যিকের উপযোগী বৃহৎ নিরাসক্তির সঙ্গে নির্বিকার কৌতূহলে তাকে দেখে নিলে না? যেসব নিষ্ঠাবতী বুড়ি তোমার ভক্তি ও আচারের শৈথিল্য দেখে তোমাকে মানুষ বলে আর গণ্যই করলে না, তুমি কেমন ক'রে নিজেকে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত করতে পারলে? এমন করুণা আছে যা পবিত্র, এমন কৌতূহল আছে যা সর্বত্রই শুচি—সাহিত্যিক হয়ে তোমার ব্যবহারে কেন অশুচিতা প্রকাশ পেলে? তোমার বর্ণনা পড়ে স্পষ্টই বোধ হলো অধিকাংশ ধার্মিক যাত্রীর চেয়ে এই মেয়েটির মধ্যে স্নেহসিক্ত মানবধর্ম পূর্ণতর ছিল, এ নিজে সকলের চেয়ে নীচে পড়ে গিয়েছে বলেই কোনো মানুষকেই অশ্রদ্ধা করতে পারেনি—যে মানুষ সকলের উপরে তারো এই স্বভাব। আমার এক এক সময় সন্দেহ হয় তুমি সব কথা স্পষ্ট করে লেখোনি, লিখলে তোমার ব্যবহারের কৈফিয়ৎ ঠিক মতো পাওয়া যেত।

"আর একটি ছোট্ট কথা বলব। দেখলুম তুমি বাংলা খবরের কাগজের সুতিকাগারে সদ্যোজাত "কৃষ্টি" শব্দটা অসঙ্কোচে ব্যবহার করেচ। বাংলা ছাড়া আর কোনো প্রদেশে ভাষায় এমন কুশ্রী অপজনন ঘটেনি। অন্যত্র "সংস্কৃতি" শব্দটাই প্রচলিত—এটা ভদ্র সমাজের যোগ্য।

"যাই হোক, তোমার এ বইখানি নানা লোকের কাছেই সমাদর পেয়েছে, আমারও সাধুবাদ তার সঙ্গে যোগ করে দিলেম। ইতি ৫ নবেম্বর, ১৯৩৩।

শুভাকাঙ্ক্ষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

কবির এই পত্রখানি 'ভারতবর্ষে' (পৌষ, ১৩৪০) প্রকাশিত হবার পর থেকে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যে 'সংস্কৃতি' শব্দটার প্রচলন বেড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু এ চিঠি পড়ে আমি একটু বিমর্ষ হয়েছিলুম এই কারণে যে, কবি "রাধারানীকে"

তারিফ করেছেন, কিন্তু তিনি রবীন্দ্রানুরাগিণী শ্রীমতী "রানী"-ওরফে সাবিত্রীর সম্বন্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি।

দাঁড়াও! কয়েকদিনের মধ্যেই কোমর বেঁধে কবিকে একখানা চিঠি দিলুম এবং যথাসময়ে তা'র জবাব এল—"তোমার সঙ্গে দেখা হলে সুখী হব। পথে যদি বাধা পাও তবুও চলে এসো।"

পর পর কবির সেই দুখানি চিঠি পেয়ে সেদিনকার হর্ষরোমাঞ্চর কথা আজও ভুলিনি। যাই হোক, প্রথম বড় চিঠিখানা পকেটে নিয়ে সেইদিনই দুপুরবেলায় ভবানীপুরের দিকে বেরিয়ে পড়েছিলুম।

ট্রামে যাচ্ছিলুম। কিন্তু এসপ্লানেড থেকে ভবানীপুরের পথ যেন আর ফুরোতেই চায় না। লিণ্ডসে স্ট্রীট, মিউজিয়ম, পার্ক স্ট্রীট, আর্মি-নেভি—কতক্ষণ পরে এলগিন রোড পার হয়ে আবার ট্রাম চলল। কিন্তু জগুবাবুর বাজারের ওখানটা পেরোতে গিয়ে হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িখানা থামল! সামনের সমস্ত পথ জুড়ে রয়েছে অসংখ্য লাল-পাগড়ি ও শ্বেতকায় সার্জেণ্টরা। আমি গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম। দেখি চারদিকে লোকে লোকারণ্য। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ফুটপাথের ভিড়ের ভিতর থেকে যে ব্যক্তি খপ করে আমার হাত ধরল সে শ্রীমান শিবু। তখনই আমাকে বাজারের দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে শিবু বলল, না, ওদিকে আর এগোবেন না, এখান থেকেই ফিরুন। ···'আনন্দমঠ' সার্চ হচ্ছে! আপনার নাম সই করা বহু বই রয়েছে আনন্দমঠে···শীগগির পালান।

পালিয়ে যাবো কোন্ চুলোয়?

শিবু হেসেই অস্থির। বলল, সোজা বাড়ি ফিরে যান।

পথের দু-দিকেই তখন যানবাহন বন্ধ। শিবু নিজেই আগেভাগে গা-ঢাকা দিল। ও নিজে 'আনন্দমঠে'র একজন কর্মী।

আমার আর অন্য উপায় নেই। বড় রাস্তাটা ছেড়ে মোহিনীমোহন রোড ধরে সোজা গিয়ে এলেনবি রোডের ভিতর দিয়ে আমি হনহনিয়ে চললুম। কোথায় যাচ্ছিলুম তা জানিনে, কিন্তু দক্ষিণে, আর নয়, এবার সোজা উত্তরে। ওদিকে তখন মোটর বাস হয়নি, সুতরাং প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটতে হাঁটতে মল্লিকবাজারের মোড়ে এলুম। সেখান থেকে ট্রামে শিয়ালদা এবং শিয়ালদা থেকে ৩নং বাসে শ্যামবাজার। হেমন্তের অপরাহ্ণ, তখনও চারটে বাজেনি। আমি বাড়ি যাচ্ছিলুম। কিন্তু আর-জি-কর হাসপাতালের সামনে পুলের পথ যখন পার হচ্ছি,

হঠাৎ দেখি বড়দা হন্তদন্ত হয়ে আসছেন। আমাকে দেখেই ক্রুদ্ধ স্খলিত কণ্ঠে বললেন, তুমি এখুনি রাত্তিরের গাড়িতে কোথাও চলে যাও— !

কেন বড়দা ?

কেন, চল বলছি।—কয়েক পা এগিয়ে বড়দা রক্তচক্ষে বললেন, তোমার জন্যে কাল আমাদের দুই ভাইয়েরই চাকরি যাবে তা জানো ? দশ-বারোজন পুলিস এসে এতক্ষণ আমাদের বাড়ি ঘেরাও করে ছিল···তোমার ঘর তচনচ করল··· আমি আপিস থেকে ফিরে অবাক! এখন বাজারে যাচ্ছি—রান্নাবান্না চড়েনি। ওরা আবার আসবে তোমার জন্যে! তুমি নাকি কোন্ লাইব্রেরীতে 'স্বদেশী' বই দিয়েছ ? যাও, এখন বাড়িতে ঢুকো না। আমি বলেছি সে ভুবনেশ্বরে গেছে—

বড়দা হাঁপাচ্ছিলেন। আমি পালালে তিনি বাঁচেন!

তাড়াতাড়ি আমার পকেট থেকে রবিঠাকুরের চিঠিখানা বের ক'রে বড়দার হাতে দিয়ে বললুম, এখানা তোমার দেরাজে তুলে রেখো। দামী চিঠি, সাবধান। তোমাদের কোনও ভয় নেই, বড়দা। আমি ঠিক সময়ে ফিরব।— এই বলে আমি দ্রুতপদে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের দিকে হনহনিয়ে চললুম।

পুলিস বা গোয়েন্দারা ভাল করেই বোধ হয় জেনে এসেছে, আমি অপদার্থ। কিন্তু আনন্দমঠের বইয়ের গাদা ঘেঁটে-ঘুঁটে তারা এতক্ষণে বুঝেই নিয়েছে আমার বাসস্থান থেকে সাত-আট মাইল দূরে আনন্দমঠেই বা আমার এত বইপত্র যায় কেন ? তারা দেখতেই পাবে, অনেকগুলো নিষিদ্ধ রাজনীতিক বই, পুরনো বিপ্লবীদের ইতিহাস, নিষিদ্ধ বই 'পথের দাবী', রজনী গুপ্তর সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, বলশেভিক যুদ্ধ ও বিপ্লব, ডি ভ্যালেরার রাজনীতিক সংগ্রাম, মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসী, কাজীর লেখা দু'একখানা নিষিদ্ধ বই ও 'ধূমকেতু'র ফাইল ইত্যাদি আরও অনেক। যত ভাবছি ততই ভয় পাচ্ছিলুম।

কিন্তু ভয়ের মধ্যেও একটা ভরসা ছিল এই, রাজপুরুষেরা লেখকদেরকে গ্রাহ্য করে না এবং মানুষ বলে ধরে না। নব্যকালের লেখকদের কোনও সামাজিক পরিচয় আছে, এ তারা স্বীকার করে না। সাহিত্যের কাগজ তারা ওলটায় না। বড় বড় সরকারী কর্মচারী প্রায় সবাই উন্নাসিক। বাঙ্গলা ভাষা পড়বার সময় বা রুচি তাদের নেই। তবে হ্যাঁ, তাদের কোন-কোনও বাড়ির মেয়েমহলে নাকি এক-আধখানা বাঙ্গলা সাময়িক পত্রপত্রিকা দেখা যায়। রবি ঠাকুরের কথা উঠলে তারা ডিনারের টেবিলে বসে প্রশ্ন করে, তিনি কি মিলটন, শেক্সপীয়র, থ্যাকারে— এসব কিছু পড়েছেন ? হ্যাঁ, তার অবশ্য ইংরেজি গীতাঞ্জলি একখানা আছে বুঝি। সে যাই হোক, তাদের ধারণা লেখকরা হল পরগাছা। তাদের না আছে

সামাজিক মর্যাদা, না অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা, না কিছু। অন্য দিকে রাজনৈতিক মহলেও নতুন লেখকরা কলকে পায় না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্য একদা দেশবন্ধুর খুবই প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। শুনেছি সেই পরিবেশের মধ্যে খোসগল্পেরও একটা আড্ডা ছিল। সেখানে থাকতেন কিরণশঙ্কর রায়, কুমুদশঙ্কর রায়, হেমন্তকুমার সরকার এবং আরও অনেকে। সে যাই হোক, শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা অপেক্ষা সাহিত্যকর্মের জনপ্রিয়তাই ছিল বেশি। তিনি ঠিক রাজনৈতিক নন, আসলে তিনি ছিলেন বৈঠকী লোক।

গৌরীবেড়ের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছিলুম। কিন্তু যাচ্ছি কোথায় আমি জানিনে। অন্ততপক্ষে তিন-চারটে রাত আমাকে কোথাও-না-কোথাও কাটিয়ে যেতে হবে, নচেৎ 'ভুবনেশ্বরে' যাবার কৈফিয়ত পাওয়া যায় না। আত্মীয়-কুটুম্বের দিক থেকে বরাহনগর, বালি-উত্তরপাড়া, বহুবাজার, গড়পার, এমন কি হাতের কাছে হাতিবাগানও আছে। কিন্তু না, ওসব ক্ষেত্রে সুখের দিনে যাব, সঙ্কটকালে ওসব পথ মাড়াব না। ওদিক থেকে আমি একটু আত্মাভিমানী। আমি অসময়ে, দুর্দিনে, বিপাকে, বিপদে, অভাব-অভিযোগে—অদ্যাবধি আত্মীয়দের কারও সাহায্য নিইনি! সেখানে আমি সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও সরিয়ে রাখি।

অনেককাল পরে বিডন স্ট্রীটে হুটু বসাকের সেই পান-বিড়ি আর মনিহারীর দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালুম। অনেকগুলি বছর এর মধ্যে পেরিয়ে গেছে আমার জীবনের নানা ঘাত-সংঘাতের উপর দিয়ে। হুটুর সেই দোকান এখন মস্ত বড় হয়েছে। সরু গলিটা এখন শান-বাঁধানো। মুখের কাছে সেই সুস্বাদু তেলে-ভাজার দোকানটা আর দেখতে পাচ্ছিনে। সেই যুগ অনেকটা বদলিয়ে গেছে। হুটুর এই বড় দোকানের নাম হয়েছে "বসাক স্টোরস"।

মস্ত বড় দোকানে চার-পাঁচজন লোক বেনে-মশলা ও মুদি-মনোহারি সামগ্রী বেচা-কেনায় ব্যস্ত। তখন সন্ধ্যার আলো জ্বলছে। ধূপ-ধুনো দিচ্ছে গণেশ ও গৌরাঙ্গর পটের নিচে। দোকানে দেখছি অনেক খদ্দের। ইলেকট্রিকের আলোয় চোখে পড়ছে একখানা সরু বোর্ডে লেখা, 'ধার চাহিয়া লজ্জা দিবেন না'।

দোকানের ভেতরে ঢুকে দেখি, ছোট একখানা চৌকির ওপর বড় ক্যাশ বাক্স নিয়ে হুটু হিসাব মেলাতে ব্যস্ত। আমি হাসিমুখে তাকে ডাকলুম। হুটু মুখ তুলে সহসা আমাকে দেখে চট্ করে চিনতে পারল না। কিন্তু কতক্ষণ আমাকে নিরীক্ষণ করে বলে উঠল, আরে, মামাবাবু যে?

হুটু তাড়াতাড়ি চৌকি থেকে নেমে আমার পায়ের ধুলো নিল। আমি

বললুম, হুটু, তোমাকে সেই রোগাটে দেখেছিলুম। এত মোটা হলে কোত্থেকে ?

আপনাকেও আর চেনা যায় না, মামাবাবু।—হুটু বলল, আপনার সেই চেহারা একদম বদলে গেছে। আসুন, আসুন—বসুন—আজ কী সৌভাগ্য আমার, ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো পড়ল—

হুটুর গায়ে খদ্দরের চাদর, গলায় বৈষ্ণবের পাঁচনরী কণ্ঠী। মনে হচ্ছে তার কারবারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেবদ্বিজের প্রতি সে অধিকতর ভক্তিমান হয়েছে !

বিয়ে-থা করেছ, হুটু ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মামাবাবু, মাসী ধরে বেঁধে ও-কাজটাও করিয়ে নিয়েছে ! মাসীর আশীর্বাদেই তো দাঁড়িয়ে গেছি।

এবার একটু ভরসা পেয়ে বললুম, ওপরের সেই ঘরটায় মাসী তোমার আছেন ত ?

হুটু আমার মুখের দিকে তাকালো। কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, তা আপনিই বা কেমন করে জানবেন ! ওরে কানাই, আমি একবারটি ওপরে যাচ্ছি মামাবাবুকে নিয়ে—এই বলে সে ক্যাশের চাবি বন্ধ করে আমাকে বলল, আসুন, দু-দণ্ড আপনাকে নিয়ে বসি। কতকাল পরে দেখা—

বহুদিন পরে আজ কেস্টদাসীর সঙ্গে আমার দেখা হবে। কেমন করে সে আমাকে সম্ভাষণ ও আপ্যায়ন করবে, এটি ভেবে কৌতুক বোধ করছিলুম। মুখে বললুম, তোমার ভেতরবাড়ির চেহারাও যে ফিরিয়ে দিয়েছ দেখছি। একেবারে ঝকঝকে নতুন। দোতলা করলে কবে ?

সবই আপনাদের আশীর্বাদে, মামাবাবু।

দোতলায় উঠে হকচকিয়ে গেলুম। সেই ছাদ, কলতলা, কেষ্টদাসীর সেই রান্নার চালা, শোবার ঘর—সব ভোজবাজীর মতন মিলিয়ে গেছে। এখন বড় বড় ঘর, বারান্দা, স্নানাগার ইত্যাদি চোখে পড়ছে। হুটু আগে আগে গিয়ে ভিতর দিকে খবর দিল। ভেবেছিলুম আমার খবর শোনামাত্র কেষ্টদাসী দৌড়ে আসবে, কিন্তু এসে দাঁড়াল হুটুর বউ আর বছর চারেকের একটি ছেলে। মেয়েটির দিকে চেয়ে আমি বললুম, মামা সুবাদে তুমি আমার বউমা হও ! বেশ, বেশ, বড় খুশী হলুম। তোমার নামটি কি বউমা ?

বউমার বয়স বছর কুড়ি-একুশ। হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিল বটে, কিন্তু ঈষৎ শ্যামবর্ণ মুখখানা কিছু অপ্রসন্ন। তার দিকে অলক্ষ্যে তাকিয়ে হুটুই বলল, আপনার বউমার নাম সুমতি !

বেশ চমৎকার নাম। কই, দাসীদিকে দেখছিনে যে?

এবার বউমাই জবাব দিল, তিনি এখানে থাকেন না!

ও, নেই এখানে? কিন্তু তিনি তো এখানেই থাকবেন জানতুম?

হুটু বলল, নিশ্চয়, এখানেই মাসীর থাকার কথা বইকি। সবই আমার ভাগ্য।

ও-ঘর থেকে হঠাৎ এক বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক এবার এসে দাঁড়ালেন। স্পষ্টত, হুটুর শাশুড়ী। তিনি ঈষৎ কর্কশ কণ্ঠেই বললেন, ভাগ্য বলছ কেন, হুটু? সতাতো বোনপোর ঘরকন্নায় অত ঝগড়াঝাঁটি, দিনরাত মন-কষাকষি—আমার মেয়ে কেনই বা অত সহ্য করবে!

হুটু ফস করে বলল, মাসীর একলা দোষ নয়!

এবার হঠাৎ ফণা তুলল বউমা। ঝাঁঝিয়ে বলল, তুমি থামো দেখি। তোমার আস্কারাতেই তো তোমার মাসীর মাথা বিগড়েছে! নতুন মানুষ এসেছে বাড়িতে, বলব নাকি সব খুলে?

শাশুড়ী বললেন, দুধকলা দিয়ে তুমি সাপ পুষেছিলে, হুটু!

উত্তেজিত হয়ে হুটু বলল, আপনি আমাদের সব কথায় থাকছেন কেন? বলো, কী খুলে বলবে বলো! মাসী ছিলেন আমার অন্নপূর্ণা, তাঁর আশীর্বাদেই আমি করে খাচ্ছি! তোমরাই তাঁকে তিষ্ঠোতে দাওনি! বুঝলেন মামাবাবু, জামাইয়ের সংসারে শাশুড়ীর আধিপত্য হলে সে-সংসারের শান্তি থাকে না! আসুন, নিচে যাই—

পিছন থেকে বউমা চেঁচিয়ে উঠল, মুখ সামলে কথা বলো!

শাশুড়ী তৎক্ষণাৎ করুণ কণ্ঠে বললেন, মেয়ের মুখ চেয়েই এসব অপমান সহ্য করছি!

দোকানে ঢুকে বিক্ষুব্ধচিত্ত হুটু আবার ক্যাশে বসল। পরে বলল, আপনি কি মাসীর সঙ্গে দেখা করে যেতে চান?

হাসিমুখে আমি বললুম, এতদূর যখন এসেছি, একবার দেখেই যাই! কতকাল তোমাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই!

ভিতর মহলের দোতলায় তখনও ঝড় চলছে। হুটু চিন্তিত কণ্ঠে বলল, আপনি যাবেন বটে, তবে শুনেছি সেটা এক বস্তির কোথায় যেন। বুঝলেন মামাবাবু, এদেরই জন্যে মাসীর মানসম্ভ্রম বাঁচলো না! ওহে বিন্দাবন, ভেতর থেকে রাসমণিকে একবার ডাকো তো?

বৃন্দাবন ভিতরে গিয়ে ওদের ঝিকে ডেকে নিয়ে এল। হুটু বলল, রাসমণি,

একবারটি মামাবাবুকে নিয়ে মাসীর ওখানে যাও তো। আমি চিনিনে, নইলে আমিই যেতুম।—তারপর গলা নামিয়ে সে পুনরায় বলল, বুঝলেন মামাবাবু, মাসী যাই করুক যেখানেই থাকুক, আমি মাস-মাস তিরিশটে টাকা তাঁকে ঠিকই পাঠিয়ে দিই। ওদের গায়ের জ্বালা ওই জন্যেই!

আমি রাসমণির পিছনে পিছনে চললুম। কালোয়ারদের গদি পেরিয়ে উল্টোডিঙ্গির কাছাকাছি এক বস্তিতে ঢুকলুম। পথে আলো নেই। নালা-নর্দমা পেরিয়ে এক চালাঘরের উঠোনে ঢুকে আধাবয়সী রাসমণি একটু দূরের থেকেই কেষ্টদাসীর ঘরখানা দেখিয়ে দিল।

চারিদিকের চেহারা দেখে আমি একটু অবাকই হয়েছিলুম।

রাসমণি চলে যাবার পর ওই অন্ধকারে অভাবনীয় পরিবেশের মাঝখানে মিনিট খানেকের জন্য দাঁড়ালুম। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে আর আমার কিছু বাকি নেই। উঠোনের চারদিকে তিন-চারখানা গোলপাতার চালাঘর। কিন্তু কোন ঘরই জনশূন্য নয়। আমি ওই উঠোনেই একান্তে প্রেতচ্ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে ওরই মধ্যে লক্ষ্য করলুম, দুজন জোয়ান পুরুষ দুটো ঘরে এসে ঢুকল এবং দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কেষ্টদাসীর দরজা এতক্ষণ বন্ধ ছিল, এবার খুলল। দূর থেকে লক্ষ্য করলুম, একটি লোক নতমুখে নিরীহ প্রকৃতির মতো বেরিয়ে গেল। লক্ষ্যপথের বাইরে দাঁড়িয়ে আমি সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলুম। আমার বিশ্বাস, নুটু এতটা জানে না। জানলে কখনোই সে আমাকে এখানে পাঠাতো না। এতক্ষণ পরে আগাগোড়া ব্যাপারটার জটিলতা আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিল, এবং আমি ফিরে যাবার কথাই ভাবছিলুম। পা দুখানা আমার ভারি হয়ে উঠেছিল।

এবার আমি এক এক পা করে কেষ্টদাসীর দরজার কাছে এসে একবারটি থমকিয়ে গেলুম। তাকালুম এদিক ওদিক—কিন্তু চারিদিকই যেন ভৌতিক চেহারায় নিঃসাড়। ঘরের ভিতরের আলোটা মৃদু। কিন্তু ওই অস্পষ্ট আলোয় লক্ষ্য করলুম, কেষ্টদাসী দরজার দিকে পেছন ফিরে বোধ হয় হিসেব মেলাচ্ছে এবং পিঠের দিকটা তার ঢাকা নয়।

আমি সাড়া দিলুম।

মুখ ফিরিয়ে কেষ্টদাসী তাকাল এবং অন্যমনস্কভাবে নবাগতর উদ্দেশে কতকটা বিরক্তির সঙ্গে বলল, ওদিকে যান, এ ঘর নয়।

বোধ হয় সে দরজাটা বন্ধ করতেই হাত বাড়িয়েছিল, কিন্তু তাকে সেই সুযোগ না দিয়ে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকলুম এবং ওইভাবেই ওই অতি মৃদু আলোয়

নিজেই ভিতর থেকে দরজাটা একটু ভেজিয়ে বললুম, আমি দাসীদি, চিনতে পারছ না ?

কে ?—চট করে কেষ্টদাসী ল্যাম্পের আলোটা বাড়িয়ে আমার দিকে এমন ভয়ার্ত চোখে আপাদমস্তক তাকালো যেন আমি এক ডাকাত! কিন্তু সে ক্ষণকাল মাত্র, তারপরেই এই আতঙ্কিতা ও বজ্রাহতা মোহিনী মায়া আঁচল দিয়ে নিজকে ঢাকবার চেষ্টা করে চেঁচিয়ে উঠল, রাম! তুই ?

এক পলকে কেষ্টদাসী আলোটা নিবিয়ে দিল এবং সেই অন্ধকারে তাকে নড়াচড়া করতে দেখে বুঝতে পারলুম, নিজকে সে গুছিয়ে নিচ্ছে! আজ ওকে কতদিন পরে দেখছি আমার আর মনে পড়ছে না।

আবেগ এবং উত্তেজনায় মুখ ঢেকে কেষ্টদাসী কাঁদছিল। এক সময় আমি বললুম, কিছু মনে করো না দাসীদি, কান্না তোমাকে মানাচ্ছে না!

কেষ্টদাসী বলল, তুই হারিয়ে গিয়েছিলি সেই ভাল ছিল। আবার কেন সামনে এলি ? কে ডেকেছিল তোকে ? আমাকে কি অপমান করতে এলি ?

হাসিমুখে আমি বললুম, ছিঃ দাসীদি, আমি কেন তোমাকে অপমান করব ? ও'কথা যদি ভাবো তা হলে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি এখনই চলে যাচ্ছি!

কেষ্টদাসী কিছু বলল না, শুধু আমার হাতখানা ছেড়ে দু পা এগিয়ে ভেজানো দরজাটায় খিল এঁটে দিয়ে আবার ফিরে এলো। তারপর চোখ-মুখ মুছে বলল, আমাকে এ অবস্থায় দেখে ঘেন্না হচ্ছে না তোর ?

ঘেন্না ? সে কি ? ছোটবেলা থেকে তোমাকে দেখে আসছি! কখনও দেখেছ ঘেন্না করেছি তোমাকে ?—আমি বললুম, তুমি যা ভাল বুঝেছ তাই করেছ, আমি কেন তোমাকে ঘেন্না করতে যাব ? তুমি যদি এইভাবে জীবন কাটাতে চাও—আমার বলবার কী আছে ? অনেককাল পরে আজ আমি শুধু তোমার খোঁজ নিতে এসেছিলুম।

কেষ্টদাসী বলল, তোকে না দেখলে আমার হয়ত মনেই পড়ত না যে, লোকসমাজে মুখ দেখাবার আর কিছু আছে আমার। প্রায় তিন মাস হতে চলল এই ঘরটায় আছি। এখানেও আমি স্থায়ী হয়ে থাকব না। একবার ভাসলে ভেসেই যেতে হয়, রাম!

ঘরটা ঝুপসি, কতকটা যেন শ্বাসরোধী। কেষ্টদাসী এই পরিবেশের মধ্যে এমন নোংরা জীবন যাপন করতে পারে, এ আমার পক্ষে অভাবনীয় ছিল। আমি কতক্ষণ মাথা হেঁট করে ভাবছিলুম, কেষ্টদাসীর এই পরিণামের জন্য সবাই

যেন আমরা অপরাধী! কিন্তু আমার ওই ধরনের বিক্ষুব্ধ চিন্তার মধ্যেই কেষ্টদাসী এবার যেন কতকটা নিজকে সামলিয়ে শান্ত হয়ে বসলো। সে আমার চেয়ে বয়সে বড়। ধমকিয়ে কিছু বললে আমাকে মেনেই নিতে হয়। আমার কৈশোর জীবনে তার মধুর স্নেহচ্ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকতুম।

কেষ্টদাসী বলল, এ ঘরটা অন্য এক মেয়ের। কিন্তু সে আমাকে বড় অসময়ে ঠাঁই দিয়েছিল।

আমি ওর মুখের দিকে কি জানি কেন তাকাতে পারছিলুম না। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সে আবার বলল, প্রথম মাসটা শুধু কেঁদেই কেটে গেছে হুটুদের জন্য। ওর ওই বাচ্চা ছেলেটাকে আমি সেই আঁতুড় থেকে কোলে পিঠে নিয়ে বড় করেছিলুম। কিন্তু ছেলেটাকে ওরা একদিন কোল থেকে কেড়ে নিয়ে গেল! মনে আছে তোর, তুই একদিন বলে গিয়েছিলি, হুটুর বিয়ে দিতে চাইছ বটে, কিন্তু ভাল ঘর বেছে মেয়ে এনো। এখন দেখছি বিয়ে শুধু জুয়াখেলা! আগে থেকে কে কতটুকু জানে! বউটা ঘরে এলো, কিন্তু আমাকে প্রথম দিনেই বিষ নজরে দেখল!

এবার মুখ তুলে বললুম, তোমার চেহারাই তোমার শত্রু, দাসীদি।

তা জানিনে, হয়তো তা হতেও পারে। কেষ্টদাসী করুণ কণ্ঠে বলল, ওই বোনপো হুটুকেও ছোটর থেকে বড় করেছি, জানিস তো? আমাকে ছাড়া হুটুর চলত না। কিন্তু ওর শাশুড়ী যেদিন থেকে ওর নতুন দোতলায় জাঁতা হয়ে বসল, সেদিন থেকেই আমার দুর্গতি আরম্ভ। গঙ্গায় চান করতে গিয়ে আমি বসে বসে শুধু কাঁদতুম। গোয়াবাগানে শেতলার মন্দিরে গিয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিতুম। আমি নিরুপায়। শুধু আমার এক মাসী আছে নবদ্বীপে, কিন্তু হুটুর বাচ্চাটাকে ফেলে সেখানে যেতে মন ওঠে না। চেয়ে দেখছি আমার পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই! এ অবস্থায় হুটুর শাশুড়ী দিনরাত আমার গায়ে কাদা ছিটিয়ে যাচ্ছে। আমি নাকি হুটুকে কি যেন খাইয়ে বশীকরণ করেছি! রাম, সেই সব নোংরা কথা বছরের পর বছর ধরে সহ্য করে যাচ্ছিলুম!

আমি চুপ করে ছিলুম।

হঠাৎ দরজায় গোটা দুই টোকা পড়তেই আমি চমকিয়ে উঠলুম। কেষ্টদাসী তক্তা ছেড়ে নেমে গিয়ে কান পাতলো ভিতর থেকে। আমি আড়ষ্ট।

দরজায় আবার আওয়াজ হল। চেয়ে দেখলুম, কেষ্টদাসীর মুখেচোখে ভয় বা আড়ষ্টতার একটুও চিহ্ন নেই! সে যেন জেনেই নিয়েছে তার এইপ্রকার জীবনের আনুষঙ্গিক রীতিনীতি ওইরূপই। সুতরাং সে এবার আলোটা কমিয়ে দিয়ে

আবার ফিরে এল এবং দরজায় আরও দু-একবার টোকা পড়ে একসময় থেমে গেল।

সে যখন কাছে বসল তখন আমি মুখ খুললুম। বললুম, দাসীদি, তবে শোন। বিশেষ একটা কারণে আমার পক্ষে তিন-চার দিন বাইরে-বাইরে কাটানো দরকার। ভাবতে ভাবতে তোমার কথাই মনে এল। মন্দ কি, যদি তোমার আর হুটুর অতিথি হই তিন-চার দিনের জন্যে? তাই তোমাদের খোঁজখবর নিতে এসেছিলুম। কিন্তু তোমার এই পরিণাম স্বপ্নেও ভাবিনি, দাসীদি! আর—তোমার ওপর রাগ করব, সে কোন্ অধিকারে? যাই হোক, একটা কথা আমার মনে আসছে, শুনবে তুমি?

কেষ্টদাসী নতমুখে বসেছিল, এবার মুখ তুলল।

আমি বললুম, রাগ করো না, দাসীদি—তোমার মনে চিরকাল একটা অতৃপ্তি ছিল। আমার সেই অল্প বয়সেও তোমার হাবভাবে টের পেতুম। তোমার স্বামী সেই নিবারণ বোরেগী মানুষ ছিল না। তুমি তোমার সেই অসন্তুষ্ট জীবন নিয়ে শুধু তার অনাচারই সয়ে এসেছ। কিন্তু আমি কি ভাবছি জানো? কতকাল ধরে তুমি দিনের পর দিন এই জীবন যাপন করবে! এ কি চিরকাল ভাল লাগবে? বুড়ো হলে সবই ত ঘুচবে! তখন ত আখের ছিবড়ে! কেউ তোমার খোঁজ নেবে না, কেউ ডাকবে না, কোথাও ঠাঁই পাবে না! ধরো, তুমি যদি গান-বাজনা জানতে, কিছু হাতের কারিগরি কাজ শিখতে, কিম্বা ধরো কিছু লেখাপড়া—তুমি ত কোনটাই জানো না দাসীদি! শুধু একখানা দেহ? হঠাৎ যদি বসন্ত রোগ হয়, যদি তাতে তুমি বাঁচো—এই দেহের কী চেহারা হবে, সে ত ভাবতেও ভয় করে!

এ সব ভাবিনি, রাম! আমার ভাববার সময়ও ছিল না।

আমি শান্ত কণ্ঠে বললুম, কি জানো দাসীদি, অনেক মেয়ে মরে গিয়ে বাঁচে, কিন্তু বেঁচে থেকে প্রতিদিনের মৃত্যু—সে ভয়ঙ্কর!

অন্ধকারে কেষ্টদাসী তক্তাখানার এ কোণে মুখ গুঁজে আবার বোধ হয় কাঁদছিল। সে নিরুপায়, এ আমি গত ষোল বছর থেকে তাকে দেখে আসছি। আজ রাত্রে তার এই কান্না দেখে মনে হচ্ছিল, ঝড়ের ঝাপটায় বিপর্যস্ত এক ভীরু পাখি যেন সকল আকাশপথ পরিক্রমা করে কোনও এক বৃক্ষনীড়ে নিরাপদ একটি কোটর খুঁজছে!

এক সময় সে ভাবাবেগে ফুলে উঠল—তুই বিশ্বাস কর রাম, আমি বেশ্যা নই! আমাকে কোন দিক থেকে কেউ বাঁচতে দিচ্ছে না, আমি তাই—

সে আর বলতে পারল না, ফুঁপিয়ে উঠল। একটু থেমে বলল, এ ঘর আমার নয়, অন্য মেয়ের। আমি কেবল খরচের টাকা দিই—তাও ওই হুটু পাঠিয়ে দেয় রাসমণির হাত দিয়ে। আমি যদি এখান থেকে চলে যাই, পাশের ঘরের মেয়েগুলো খুশী হয়! আমার জন্যে ওদের নাকি ক্ষতি হচ্ছে!

আমি বললুম, কোথাও যাবার সুবিধে আছে তোমার? বেশ ত চল না কেন নবদ্বীপে তোমার মাসীমার কাছে? আছেন তিনি সেখানে?

কেষ্টদাসী বলল, হ্যাঁ, এখনও আছেন। কিন্তু আমি কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াব তার কাছে?

কেন?—আমি বললুম, তুমি পাঁচজনের অন্যায়ে মুখ থুবড়ে পড়েছ, এই ত? এবার যদি নিজের শক্তিতে মাটির ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াও, কে রোখে তোমাকে? তুমি নিজের জীবনের সব জঞ্জাল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে যদি আবার নতুন ক'রে মাথা তোল, তবে বাধা দিচ্ছে কে? তুমিই তোমার পথ কেটে চলবে, দাসীদি।

আমি নিজেও ভাবাপ্লুত হচ্ছিলুম। কেষ্টদাসীর চোখের জল, আকুলতা, তার জীবনের নিত্য গ্লানি আর দ্বন্দ্ব—সব মিলিয়ে এই মধ্যরাত্রে যেন গোলপাতার ঘরখানা রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে উঠেছিল!

একসময় হঠাৎ মাথা তুলে গলা পরিষ্কার করে কেষ্টদাসী বলল, যদি আমি নবদ্বীপে যাই, তুই নিয়ে যাবি আমাকে?

যাব, নিশ্চয় যাব। তুমি এই নরক থেকে শুধু মুক্তি নাও, দাসীদি।

কিন্তু মাসীমা যদি জানতে চান তোর পরিচয়?

এবার আমি হাসলুম—তুমি কিচ্ছু ভেবো না। তার জবাব আমিই দেবো। আমি না হয় নবদ্বীপে থেকেও যাব দু-একদিন।

মনে হল কেষ্টদাসী অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে চুপ করে গেল।

*  *  *

শেষ রাত্রের ঠাণ্ডায় দুজনে বেরিয়ে পড়েছিলুম। কেষ্টদাসী সঙ্গে নিল শুধু একটা গামছা-বাঁধা পুঁটলি। ওকে সঙ্গে নিয়ে সকালের গাড়িতে কেষ্টনগর যাব। সেখান থেকে আবার ট্রেনে স্বরূপগঞ্জের ঘাট। তারপর গঙ্গা পেরোলেই নবদ্বীপ। ওসব আমার চেনা পথ।

পথে পথে তখনও আলো জ্বলছে।

গৌরীবেড়ের মোড়ে এসে এক ঘুমন্ত রিক্সাওলাকে ডেকে তুলে দু'জনে তার গাড়িতে উঠলুম। আমরা সকলের আগে আহিরিটোলার ঘাটে গঙ্গাস্নান সেরে নিতে চাই।

কেষ্টদাসীকে আমি বোঝাতে বোঝাতে যাচ্ছিলুম—তুমি চিরকাল এক ভক্তিমতী মেয়ে। তোমার পূজো-আর্চা, স্তবপাঠ, ঠাকুর-সেবা—কতদিন ধরে দেখে এসেছি! সেই হল তোমার আসল পথ, দাসীদি। তুমি দেখে নিয়ো, ওই পথেই তুমি একদিন মনের মানুষ খুঁজে পাবে। সেইদিন তুমি আবার তোমার সিঁথিতে সিঁদুর তুলে নিয়ো!

কেষ্টদাসী প্রসন্ন মুখে আমার প্রস্তাবে সম্মতি জানাচ্ছিল।

রবীন্দ্রনাথের অনুমতিপত্র পেয়ে তাঁর সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা করতে যাচ্ছিলুম—সেই দিনটি আমার জীবনের পক্ষে একটি লাল তারিখ! যাবার আগে কত ভয়-ভাবনা আনন্দ সঙ্কোচ উদ্দীপনা—সবগুলো একই সঙ্গে যেন মনের ভিতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছিল! অল্পবয়স্কা নবোঢ়া মেয়ের মনের চেহারা কবির ভাষায় যেমন "প্রথম প্রণয়-ভয়ভীতা—।" আমার সেই অবস্থা দেখা দিয়েছিল!

তবু যাচ্ছিলুম জড়িত পদক্ষেপে।

তখনকার জোড়াসাঁকো বলতে অনেক ধনাঢ্য গোষ্ঠীকে বোঝাতো। যেমন ছিল জোড়াসাঁকোর রাজবাড়ি, শীল ও মল্লিকদের বহু পরিবার, নতুন বাজারের গায়ে টেগোর কাস্‌ল্, এপাশে ডি গুপ্ত, আরেকটু এগোলে রমানাথ ঠাকুর আর পাথুরেঘাটার জমিদারবাবুরা, ওপাড়ার এদিকে কোম্পানি বাগানের ( অধুনা রবীন্দ্র কানন ) এপাশে ওপাশে রামবাগানের দত্তরা, চাষাধোবাপাড়ার গায়ে চোর বাগানের মিত্তিররা, ওদিকে সেই হাটখোলার দত্তরা—এমনি আরও অনেক। এই প্রায় দুই বর্গমাইলের মধ্যে এই অঞ্চল প্রাচীন কলকাতার বহু ক্রোড়পতির অগণিত সংখ্যক অট্টালিকা ও প্রাসাদে পরিপূর্ণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে মধ্যোত্তর কলকাতা ছিল আদি সভ্যতা ও সাংস্কৃতির নাভিকেন্দ্র। অন্য দিকে দেখা যায় এই সুবৃহৎ অঞ্চল সর্বাপেক্ষা নোংরা, ঘিঞ্জি, জনবহুল, ঘন বিপণিবেসাতিপূর্ণ এবং সর্বপ্রকার যান-বাহনে হাটে-বাজারে দিবারাত্র পরিকীর্ণ। আবার যতগুলি অঞ্চলের নাম করলুম এদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে থাকত অগণিত সংখ্যক বারবনিতালয়। ওরা চিরকাল ধনী সমাজের দ্বারা পুষ্টিলাভ করে এসেছে। আদি কলকাতার কাহিনীর মধ্যে দেখি বড় বড় দেবস্থান, দান-খয়রাতের বড় বড় কেন্দ্র, মস্ত এক-একটি জন-কল্যাণের প্রতিষ্ঠান, আবার তাদেরই আশেপাশে অভিজাতশ্রেণীর বারবনিতাদের বসবাসের সুব্যবস্থা—যেগুলি বহু বিত্তশালীর অবদান! সে যাই হোক, এই সুবৃহৎ একটি জনসমাজের মধ্যস্থলকে চিরে সুদূর উত্তর থেকে দক্ষিণে লালবাজার পর্যন্ত যে অপ্রশস্ত ও দুর্গত রাজপথটি চলেছে, তার নাম চিৎপুর রোড। সমগ্র কলকাতার মধ্যে এটি সর্বাপেক্ষা অনধিগম্য পথ!

স্থানীয় অধিবাসী যারা তারা জানে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি মানে পুরনো আমলের বড় জমিদার বাড়ি। ওই বিশেষ বৃহৎ অট্টালিকাগুলি যে জগৎপ্রসিদ্ধ কবি শিল্পী দার্শনিক ধর্মপ্রচারক সমাজ-সংস্কারক শিক্ষাবিদ প্রভৃতির একটা বড় পীঠস্থান

—এ সম্বন্ধে তাদের উদ্বেগ ও ঔৎসুক্য কম। বাঙ্গলা ও ভারতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও-বাড়িতে আসে যায়, পৃথিবীর বহু দেশের বহু মনীষী ওখানে যখন-তখন আনাগোনা করে—কিন্তু স্থানীয় সাধারণের ধারণা, ওটা জমিদার বাড়ি ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু নয়। কারণ সেই বিশেষ অন্য পরিচয় তাদের কাছে পৌঁছয় না। ওই বাড়ি থেকে সেই প্রথম স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ পায়ে হেঁটে যখন কলকাতার নানা অঞ্চলে যেতেন তখনকার দিনের কথা ভাবতেও অবাক লাগে। তাঁর মনের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াত, সেটি হয়ত প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'বাঁশি' কবিতার সেই 'কিনু গোয়ালার গলিতে'।—"গলিটার কোণে কোণে জমে ওঠে পচে ওঠে আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি, মাছের কানকা, মরা বেড়ালের ছানা—ছাইপাঁশ আরো কত কী যে।"

আমি আসছিলুম বেলগাছিয়ার দিক থেকে ধর্মতলার ট্রামে। নামব ঠিক সেই কিনু গোয়ালার গলির মুখে। আমি যাচ্ছি ঠাকুর-দর্শনে। যাচ্ছি তীর্থমন্দিরে। আমি সদ্যস্নাত।

কিন্তু সমস্ত পথটা নিজেকে শাসাতে শাসাতে আসছিলুম। খবরদার, এলিয়ে গদ্গদ হসনে যেন। চাটুবাক্য একটিও না। হাত কচ্‌লাবিনে। প্রসাদভিক্ষু হতে চাসনে—খবরদার। যদি তুই লুলিত কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হয়ে কুঁকড়িয়ে থাকিস তবে মরেছিস। যাঁকে দর্শন করতে যাচ্ছিস তিনি কেবল কবি-সম্রাটই নন, তিনি বিষয়ী, বস্তুতান্ত্রিক, বাস্তববাদী, পুরনো জমিদার, বিরাট একটি প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা, পৃথিবীজোড়া তাঁর অনুরক্তের সংখ্যা, গান্ধীজী তাঁকে বলেন গুরুদেব! তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির দ্বারা তোর মতন আধ পয়সার লেখককে চিনে নিতে তাঁর আধ মিনিটও সময় লাগবে না। মনে রাখিস আজ তুই গিয়ে প্রথম ঢুকছিস উজ্জীবন্ত এক পশুরাজ কেশরীর গুহায়। খুব সাবধান।

সোজা গলির ভিতর দিয়ে এসে বড় উঠান পেরিয়ে বাঁ-হাতি বেঁকে ছোট সিঁড়িটি ধরলুম। কেউ কোথাও নেই, নিষেধ করছে না কেউ, চারিদিক জনবিরল। কবির দ্বিতীয় চিঠি আমার সঙ্গেই আছে। তিনি লিখেছেন, বাধা পেলেও চলে এসো। আমি উপরে উঠে এলুম। কিন্তু এই অট্টালিকার হাওয়ায় মহাকবির সুগন্ধ ছড়ানো ছিল। সুতরাং মৌমাছি ঠিকই জানে ফুলটি কোথায় ফুটে রয়েছে। একসময় করিডর পেরিয়ে নগ্নপদে যে ছোট ঘরটির দরজায় এসে দাঁড়ালুম দেখি সেই ঘরে কবি একটি ডেকচেয়ারে বসে কাছেই খোলা জানলার বাইরে আলোকোজ্জ্বল অনন্ত নীলিমার দিকে চোখ মেলে রয়েছেন—যেন দুটি কালো বিবাগী ভ্রমর নিভৃত নীল পদ্ম লাগি সাম্প্রতের সকল আবরণ ছিন্ন করে শূন্যের মধ্যে

হারিয়ে গেছে!

আমার পদসঞ্চার ছিল লঘু ও নিঃশব্দ। আগে থেকে আমার ভাবা ছিল, যদি দেখি তিনি ধ্যানস্তিমিতনেত্র, আমি ফিরে আসব। কিন্তু মানুষের সঞ্চার ঘটলে বায়ুতরঙ্গে তার কম্পন আসে। কবি আমার দিকে চোখ ফেরালেন। শান্ত দুই চোখ যেন দুটি পদ্মকোরক! আমি দু'পা এগিয়ে হাসিমুখে দুই হাত ওঁর দুই পায়ে বুলিয়ে মাথায় ঠেকালুম। ওরই মধ্যে দেখে নিলুম নধর পা দুখানি টকটকে ফর্সা, পায়ের গোছ মোটা ও নিটোল, সুন্দর নখগুলি অনেকটা যেন গঙ্গাবর্ণ। কার কাছে কবে যেন শুনেছিলুম, ডাঃ রাম অধিকারী মহাশয় ওঁর দুই পায়ে মোলায়েমভাবে হাত বুলিয়ে কবির কাছে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালুম। কিন্তু ওইটুকুর মধ্যেই আবার দেখে নিলুম কবির পক্ক কেশরাশি বাবরির মতো পিছন দিকে ওলটানো, দুই পাশে চুলের ঝালর নেমেছে। এখন ওঁর তিয়াত্তর বছর বয়স। পরনে খদ্দরের লম্বা গৈরিক জোব্বা। হাতের আঙ্গুলগুলো বড় বড়—কনক চাঁপার মতো মোটা থেকে সরু হয়ে এসেছে।

বসো। কবির কণ্ঠস্বরে যেন যোগতন্দ্রাভঙ্গের আভাস পেলুম।

আমি একটি নিচু চৌকিতে বসলুম, যেখানে বসলে ওঁর মাথাটি উঁচুতে দেখা যায়। কবি প্রথম প্রশ্ন করলেন, তোমার বয়স কত?

গলাটা পরিষ্কার করে বললুম, আটাশ বছর!

কবির চোখে-মুখে যেন অস্পষ্ট কৌতুকের আভা খেলে গেল। আমি একটু নার্ভাস বোধ করলুম। উনি মধুর মৃদু কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তুমি কি সন্ন্যাস নেবার জন্য গৈরিক বসন ধরেছিলে?

তৎক্ষণাৎ বললুম, আজ্ঞে না, ওটা শখের গেরুয়া ছিল। পাহাড়-পর্বতে গেরুয়া ময়লা হলে ঠিক বোঝা যায় না। বরং একটু খাতিরও জোটে।

কবি নিজের মুখখানায় হাত বুলিয়ে বললেন, তোমার দুঃসাহস ত কম নয়!

দুঃসাহস! মুহূর্তের মধ্যে ভয়ে আমার পেট-ব্যথা করে উঠল!

কবি বললেন, তুমি নিজের জীবনকথা লিখেছ, এদেশে এটি দুঃসাহসের কথা বইকি। তোমার বইটির শেষ দিকে ওই "রানী" মেয়েটি কে? ওর পরিচয়টি কিরূপ?

এবার আমি জোর পেয়ে শ্রীমতী সাবিত্রীর পারিবারিক পরিচয় আগাগোড়া বলে গেলুম। ওই সঙ্গেই ধরিয়ে দিলুম, তিনি আপনার কাব্যের বিশেষ অনু-

রাগিণী। তাঁর কথা আমি অকপটেই বলেছি।

প্রসঙ্গত বলি, কবির এই অতি মূল্যবান কৌতূহলটুকু তৎকালে আমি আমার ভ্রমণকাহিনী গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করেছিলুম।

এবার কবি বললেন, নিজের জীবনের সত্য ঘটনাকে প্রকাশ করার মধ্যে কিছু দুঃসাহস থাকে। সে তোমার আছে।

আমার জবাব মুখে-মুখেই ছিল। বললুম, বইটি লেখার সময় আমার মনেই হয়নি, আমি সাহসের পরিচয় দিচ্ছি। সহজেই আমি লিখেছি।

বোধ হয় আমার সম্বন্ধে কবির সামান্য ঔৎসুক্য ছিল। সেই কারণে তাঁর এক-একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছিলুম। সেগুলি ব্যক্তিগত।

কবির সঙ্গে এই আমার প্রথম মুখোমুখি, মাত্র হাত তিনেকের ব্যবধান। সেজন্য আমার প্রচুর আড়ষ্টতা, হৃৎকম্পন, বেফাঁস কিছু বলে ফেলার ভয়, কথায়-কথায় থতিয়ে যাওয়া—এগুলির আশঙ্কা ছিল মনে।

কবি একসময় বললেন, তুমি হাঁটতে জানো। হাঁটতে হাঁটতেই তুমি জীবনকে দেখতে পাও। তোমার মন চলমান। বদ্ধ জলায় তুমি বাঁধা থাকতে চাও না।

তাঁর প্রত্যেকটি উক্তি যেন আমার পক্ষে রোমাঞ্চ শিহরণের মতো। কিন্তু এইটুকুর মধ্যেই আমার একটু সাহস বেড়েছিল। মুখ ফুটে একসময় বললুম, আপনার নিজের বিরাট জীবন সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে! কিন্তু আপনার হাত দিয়ে আপনার মন দিয়ে সেই পৃথিবীকে আমরা ত দেখিনি! তবে কি 'জীবন স্মৃতি' বইটি নিয়েই আমরা চুপ করে যাব?

কবি তাঁর শ্বেতশ্মশ্রুতে একবার হাত বুলোলেন। তাঁর দুই কপোলে কি আমি চকিত হাসির আভা দেখলুম? না, এখন আর আমার মনে নেই। উনি বললেন, ও বইখানা বিশেষ কালের বিশেষ কয়েক ব্যক্তির ছবি। তুমি ঠিক ধরেছো। ওটা আমার আত্মজীবনী নয়।

কবিসন্দর্শনে আসবার আগে আমি স্থির করে এসেছিলুম, এই বিশাল বিশ্ব-জোড়া ব্যক্তিত্বকে পনেরো মিনিটের বেশি আমি আটকিয়ে রাখব না। তবু ওরই মধ্যে একবারটি বললুম, তবে কি 'রবীন্দ্রজীবনী'ই আপনার জীবন? ওর বাইরে কিছু কি নেই?

এই প্রশ্নটিতে কবি যে এমন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবেন, এটি তখন ঠিক বুঝতে পারিনি। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, 'পড়ো না, ও বই তুমি পড়ো না। ওতে জীবন নেই, আছে বিবরণ। আমি প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র, এবং মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথের পুত্র, আর এখানে-ওখানে কিছু হাততালি পাবার খবর,—এই কি আমার পরিচয় ?···না, ও বই পড়ো না !'

'যদি আর অন্তত পঞ্চাশ বছর বাঁচি'—কবি বলে যাচ্ছিলেন—'তাহলে নিজের হাতে নিজের জীবনী লিখে রেখে যাব ! তুমি ছাড়া তোমার জীবনকথা অন্যে কেমন করে জানবে ? জীবনের কোন্ অংশ তোমার বিচারে শ্রেষ্ঠ, কত দুর্লভ মুহূর্তের ভাবাবেগ, কত ঘটনার ব্যঞ্জনা তোমার হৃদয়ে দ্বন্দ্বের দোলা আনে, তোমার সত্তার মূল ধরে টানে কত উপলব্ধি,—তুমি ছাড়া এ সংবাদ অন্য কে জানবে ?'

স্তব্ধ বিস্ময়ে ওঁর সুন্দর মুখশ্রীর দিকে চেয়ে সেদিন আমি আত্মজীবনী রচনার স্বপ্ন দেখেছিলুম !

মহাকবি বলে যাচ্ছিলেন যেন "ফোয়ারার রন্ধ্র হতে উন্মুখর ঊর্ধ্বস্রোতে—"। তিনি বলছিলেন, 'কাব্যে যেমন—তার জন্মের মূলে বেদনাবোধ, সেইখান থেকে তার উৎপত্তি। জীবন প্রস্ফুটিত হচ্ছে শুধু শুষ্ক ঘটনায় নয়। তার প্রকাশের পিছনে লুকিয়ে থাকে আঘাত, আনন্দ, অপমান, সংঘাত—দুঃখ বেদনা উল্লাস—সব নিয়েই জীবন। সে তার পাওনা পায় ঝড়ে-তুফানে, ভূমিকম্পে, বিপর্যয়ে—সে-জীবন থেকে অশ্রু ঝরে, রক্তমোক্ষণ ঘটে। তোমাকে ভাগ্যবান বলব তুমি যদি সেই রণক্ষেত্র দেখে থাকো, সেই দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম তার দুঃসহ পীড়নের চিহ্ন যদি তোমার মধ্যে রেখে যায় !—কবির কণ্ঠস্বর যেন অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল।

কথাপ্রসঙ্গে কবিকে জানালুম, আপনার কাব্য, আর সাহিত্য নিয়ে আমরা ক'জন কাশীতে বসে প্রায়ই চর্চা করি। অহল্যাবাঈ ঘাটের শেষ বুরুজটির ওপর আমাদের মজলিস বসে সন্ধ্যাবেলায়। আমাদের মধ্য-মণি হলেন সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়। আপনার কাব্য ও সাহিত্যের এত বড় গুণগ্রাহী বাঙ্গলায় কোথাও দেখিনে !

কবি প্রসন্নমুখে বললেন, তাঁর কথা আমি শুনেছি।

সেদিন ওঁর মুখের বিভিন্ন আলাপ শুনতে শুনতে যখন আমার ভিতরের এপার-ওপার আনন্দের জোয়ারে স্ফীত হয়ে উঠেছে, তখন একসময় উনি বললেন, তুমি শান্তিনিকেতনে চল, তোমার ভাল লাগবে।

ওই আমন্ত্রণ পেয়ে সেদিন আমার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হর্ষ দেখা দিয়েছিল। কবির অতিথি হবো এবং তাঁর বাণী শুনব কাছে বসে,—সুতরাং এই আমন্ত্রণ সেদিন যেন আমাকে সর্বোচ্চ গৌরব এনে দিয়েছিল ! ওঁর কাছে ওঁর কবিতা আমি আবৃত্তি করে শোনাবার সুযোগ পাবো, এ আমার দুর্লভ সৌভাগ্য।

এমন সময় হঠাৎ বাইরের থেকে কণ্ঠস্বর এলো—কাকা ?

বলতে বলতে এসে ঢুকলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। বললেন, কাকা, এখনই কাগজে দেখলুম, হায়দরাবাদের নিজাম তোমার জন্য এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন—!

কবি রক্তিম উদ্দীপ্ত মুখে একবারটি আমাকে লক্ষ্য করলেন। বুঝলুম, আমি নিতান্ত অপয়া নই! উনি তখনই ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে চেয়ে বললেন, ভাল করেছেন নিজাম, এটি সুসংবাদ।

কবি উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, এসো—

অবনীন্দ্রনাথকে পিছনে রেখে কবি এগিয়ে চললেন। আমি তাঁর পিছু পিছু যেন ক্ষুদ্র এক মানবক নিচে নেমে এলুম। ওঁর জন্য সামনেই মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। মোটরের কাছেই অপেক্ষা করছিলেন একটি সুশ্রী ও কৃষ্ণবরণা তরুণী, তাঁর নাম অমিতা সেন। ডাকনাম খুকু। কবি গাড়িতে উঠে আমার জন্য জায়গা রেখে বাঁদিকে সরে বসলেন। খুকু হাত বাড়িয়ে কবির পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, আপনি ভাববেন না, আমি দু'একদিনের মধ্যে যাচ্ছি।

সেই নাটকীয় মুহূর্ত আমার পক্ষে অবিস্মরণীয়। কবি নিঃসঙ্গ যাচ্ছেন শান্তিনিকেতনে। আমি সঙ্গে থাকলে আলাপচারীর সুবিধা। কিন্তু সেদিন এই হতভাগ্য লেখকের পকেটে ছিল আনা আষ্টেক-দশ পয়সা মাত্র। আমার ঘাড়ে ভূত চাপলো। বললুম, আপনি গিয়ে সুস্থ হয়ে বসুন, আমি শিগগিরি গিয়ে আবার আপনার পায়ের ধুলো নেবো।

কবি প্রসন্ন মুখে সম্মতি জানালেন। তাঁর গাড়ি বেরিয়ে গেল।

শ্রীমতী অমিতা সেনের রবীন্দ্র সংগীত তৎকালে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এই অনন্য গায়িকার অকাল মৃত্যু ঘটে তাঁর গৌরবের কালে।

যাই হোক কবির সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের বহু মূল্যবান বিবরণটি মোটামুটি-ভাবে তৎকালে 'শ্রীহর্ষ' নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের এক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তার ফলে সর্বজনপ্রিয় রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রদ্ধেয় প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছুটে গিয়েছিলেন মহাকবির কাছে—আপনি কখন কোন্ মেজাজে কাকে কী বলেছেন তাই ছাপা হয়ে গেল কাগজে! আমার সব পরিশ্রম পণ্ড হতে বসল!

প্রভাতবাবুকে কবি কি প্রকার সান্ত্বনা দিয়েছিলেন আমার জানার কথা নয়। তবে 'রবীন্দ্রজীবনী'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় প্রথমেই "জনৈক তরুণ লেখক"— এইভাবে প্রভাতবাবু সেই সাক্ষাৎকারটির উল্লেখ করে রেখেছেন।

এই সূত্রেই বলি, পরবর্তীকালে মহাকবির কাছে আনাগোনায় আমার সব

আড়ষ্টতা ঘুচে গিয়েছিল। সেগুলি আমার নানা সময়ের লেখায় সবিস্তারে বর্ণনা করেছি।

কবির সঙ্গে আলাপচারীর কথা নিয়ে যখন বন্ধুবর সুধীন্দ্র নিয়োগীর সঙ্গে তোলাপাড়া করছিলুম তখন একদিন বিকালে হঠাৎ সাধনা এসে হাজির। বিনা নোটিশে বিনা কারণে—এ যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানি! কিন্তু আমাদের সেদিন ওঠবার সময় হয়েছিল। সুধীন্দ্র যাচ্ছে ট্যুইশনিতে, আমার যাবার কথা কলেজ স্ট্রীটের দিকে।

নমস্কার বিনিময়ের পর সাধনা মুখোমুখি বসল। কিন্তু সুধীন্দ্র নিয়ম-বাঁধা লোক। তার এ বাড়ির সবাই গেছেন বিয়েবাড়িতে। সে ট্যুইশনি সেরে ফিরে এসে নিমন্ত্রণে যাবে। বেরোবার সময় সে বলে গেল, চাকরটা রইল, যদি চা খেতে ইচ্ছে হয় ওকে বলবেন।

সুধীন চলে যাবার পর আমি বললুম, তোমাদের কাজকর্মে একটু ভাঁটা পড়েছে দেখতে পাচ্ছি। আমি ভাবছিলুম তুমি দেশে ফিরে গেছ!

দেশে! সাধনা বলল, দেশে এখন ফিরব না, মহারাজ। আমি যে পালিয়ে এসেছিলুম একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে! গান্ধীজীর জীবনী পড়োনি? কেন তিনি শবরমতী আশ্রম ছেড়ে এসেছিলেন?

আচ্ছা, সাধনা—আমি বললুম, তোমার চলতি নামটি বদলিয়ে এই নামটি নিলে কেন?

সাধনা বলল, আমাদের গ্রামে এই নামেই সবাই আমাকে জানে। তা ছাড়া আমি নিজের মধ্যেই যেন এ নামটা খুঁজে পাই।

প্রসঙ্গত বলি, আমার 'জলকল্লোল' গ্রন্থে সাধনাকে 'সাধু'—এই নামে উল্লেখ করেছি। সাধনার মধ্যে আমি একটি দুর্লভ সাধুতা সততা ও চরিত্রবত্তা দেখে-ছিলুম। ওর স্বভাব-স্বাতন্ত্র্য ওকে সকলের থেকে যেন পৃথক করে রেখেছিল। সাধনা মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে জানে। একসময়ে আমি বললুম, তোমার জীবনধর্মই তোমার বিপ্লবধর্ম। আচ্ছা একটা কথা ঠিক করে বলো ত? প্রতিজ্ঞার কথা বলছ! তোমার চোদ্দ বছর বয়সে এমন কোন্ প্রতিজ্ঞা তোমাকে পেয়ে বসেছিল?

সাধনা নত মুখে কতক্ষণ চুপ করে রইল। পরে মুখ তুলে একটু হেসে বলল, এর জবাব সুভাষবাবু দিতে পারেন।

সুভাষবাবু? তাঁর সঙ্গে তোমার যোগ কিসের?

তিনি আমার প্রথম মন্ত্রগুরু।—সাধনা বলল, উনি গিয়েছিলেন আমাদের

দেশে কেশবগঞ্জের হাটে বক্তৃতা করতে। ওঁর কথার ফিনকি আমার মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেই সাংঘাতিক আগুনে আমি যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলুম। উনি ছিলেন স্টীমারে। আমি সেই স্টীমারে উঠে ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমার মাথায় হাত রেখে সুভাষবাবু বললেন, তুমি ত এখন খুব ছোট! আরেকটু বড় হয়ে কলকাতায় গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। তোমায় কিছু কাজ দিতে পারব।

মহারাজ, সেদিন যেন আমার প্রথম জন্ম ঘটল! অত লোক স্টীমারে, চারদিকে হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু সকলের মধ্যে আমি একা! একা আমি আর আমার জীবনবিধাতা—দুই মুখোমুখি।

তারপর?

সাধনা হাসতে হাসতেই বলল, শুধু আমাকে পেয়ে বসল তাঁর ওই কথাটা—আমি ছোট! কিন্তু কতখানি ছোট? কার চেয়ে ছোট? কে আমার চেয়ে বড়? চোদ্দ বছরে আমার দিদির বিয়ে হয়নি? ছোট খুড়ীর বাচ্চা হয়নি চোদ্দ বছরে? মহারাজ, সেই রাত্তিরেই আমি ছোট একটা পুঁটলি সঙ্গে নিয়ে পালালুম গ্রাম ছেড়ে চুপি চুপি। কেন চাইব পেছন দিকে? না, আমার পথ সোজা! স্বাধীনতার যুদ্ধে আমি ঝাঁপ দেবো। পৃথিবী আমাকে ডাকছে, ডাকছে যেন একটা নতুন জীবন। নৌকার মাঝি ছিল আমাদের চেনা। সে আমাকে নৌকোয় তুলে নিল। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল তখন নদী পার হলুম। মহারাজ, পথে নামলে তবেই ত পথ চিনবে! আমি যেন নতুন পথ আবিষ্কার করতে করতে যাচ্ছি! কে যেন সব দেখিয়ে দিচ্ছে! কে যেন সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে পথ চিনিয়ে! বোধ হয় ঘণ্টা দুই অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে রেল স্টেশনে এলুম। সেই প্রথম দেখলুম রেল স্টেশন। গাড়ি এলো অনেক রাত্তিরে। লুকিয়ে উঠলুম সেই গাড়িতে।

আমি চুপ করে সাধনার দিকে চেয়ে ছিলুম—তারপর?

সকালে নামলুম শিয়ালদায়—বলতে বলতে হঠাৎ হেসে উঠল সাধনা—এবার কিন্তু আমাকে চোর-ছ্যাচড় বলো না, মহারাজ। মেয়েই হোক আর ছেলেই হোক, যদি বাঁচা-মরার সঙ্কট দেখা দেয়—সে বোকা হলেও তার বুদ্ধি খোলে! প্রথম এসেছি কলকাতায়,—আমি যেন চারদিকে হারিয়ে যাচ্ছিলুম। টিকিট চাইল, আমি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললুম, সেজমামাকে খুঁজছি, দেখতে পাচ্ছিনে! ওটাই হল প্রথম কিস্তি, ওতেই মাত। তখন পুঁটলি সঙ্গে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরছি। ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে। স্টেশন থেকে বেরোতে সাহস নেই। অনেকক্ষণ

সন্ধান করে প্লাটফরমেই পেয়ে গেলুম এক ইংরেজি হোটেল 'কেল্‌নার'। তখন একটু সাহস বেড়েছে। ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস-পড়া করে স্নানের জায়গা দেখলুম। মহারাজ, কল্ ঘোরালে জল পড়ে, বোতাম টিপলে আলো জ্বলে,—এ কি আগে দেখেছি? ওই হোটেলে সেই প্রথম দেখলুম পাঁউরুটি!

আমি খুব হাসছিলুম। 'অ্যালিস ইন্ ওয়ান্ডারল্যাণ্ড!'

শোনো মহারাজ, হেসো না। ওরা আনল ব্রেকফাস্ট, সেই প্রথম দেখলুম পাঁচ আঙ্গুলের মতন কাঁটা আর চাম্‌চে। দুধ, কর্নফ্লেক, চিনি, দুটো ডিম ভাজা, দু'চাক্‌লা রুটি আর মাখন,—দু মিনিটে শেষ। আমরা যে মাছ ভাত খাই,—সে সব কই? সাহেবটা উঠে এসে বলল, আর কিছু চাই?—শোন কথা! আমি বললুম, মাছের ঝোল ভাত কই? নেই ওসব?

তখন বেশ বেলা হয়েছে। প্রায় আধঘণ্টা আমাকে বসিয়ে রাখলো সাহেবটা। তারপর এলো গরম ভাত, ডাল, তিন-চারখানা মাছের দাগা দিয়ে ঝোল, চাট্‌নি দই—এই সব। সাহেবটা দূর থেকে আমার খাওয়া দেখছিল।

ঘণ্টা তিনেক ছিলুম স্টেশনে। একটা লোককে প্রায়ই দেখছিলুম আমাকে ফিরে ফিরে দেখে যাচ্ছে। উঁকি মারছে দরজার কাছে। খুব হাসি-হাসি মুখ। আঁচিয়ে এসে লোকটাকে ডাকলুম। তক্ষুনি লোকটা কাছে এল,—যেন বড়ই বাধ্য! আমি বললুম, দেখুন, কলকাতায় প্রথম এসেছি, কিছু চিনিনে। সুভাষ বসুর বাড়িটা আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন?

পারিনে? একশ বার পারি। অমন ডাকসাইটে লোক, কে না চেনে ওঁর বাড়ি?—লোকটা বলল, এই যে হোটেলের বিলটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই দিচ্ছি। আড়াইটে টাকা বই ত নয়! তুমি কিচ্ছু ভেবো না খুকু।

মহারাজ, এখন ভাবতে লজ্জা করে। পরনে আমার খাটো একখানা ধুতি, খালি পা, এলোমেলো মাথার চুল। লোকটা মাঝপথেই আমাকে একজোড়া চটি কিনে দিল। কিন্তু এ চেহারায় কি যাওয়া যায় সুভাষ বসুর কাছে? লোকটা বলল, এ আর এমন কি? সব আছে হাতের কাছে। এ যে কলকাতা! আজব দেশ। শাড়ি, জামা, গয়না,—শুধু হুকুমের অপেক্ষা, বুঝলে খুকু? এসো, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

লোকটা একবর্ণও মিথ্যে বলেনি, মহারাজ। ট্রাম রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক গলিতে যে বাড়ির দোতলায় গিয়ে উঠলুম, সে বাড়ির গিন্নি আমাকে আদর ক'রে কাছে টেনে নিল। চারিদিকে থই থই করছে বড় মানুষের জিনিসপত্তর। গিন্নীকে সবাই বলে মাসী! পালঙ্ক, আলমারি, বড় আয়না, পুতুলের দেরাজ,

কত রকমের আসবাবপত্র আর প্রসাধন সজ্জা,—সব দেখিয়ে মাসী আদর জানিয়ে বলল, খুকু এ ঘর তোমার। আমি তোমাকে নিজের হাতে সাজাবো। যত শাড়ি আর গয়না দেখছ, সব তুমি পরবে!

ওদিকে সেই লোকটা—সেই মনোহরবাবু নাকি টেলিফোন করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, সুভাষবাবু গেছেন মফঃস্বলে, সেখান থেকে যাবেন পাটনায়। ফিরতে এখন দিন পনেরো! মহারাজ, ভেবে দেখো সেদিনের কথা। আমার অন্য কোনও উপায় নেই। বেরিয়েছি দুঃসাহসিক অভিযানে। যেন মায়ামৃগের পেছনে ছুটেছি। কোথায় তখন যাব এই নিরাপদ আনন্দের আশ্রয় ছেড়ে? তবে কিনা দিন পনেরো, তার পরেই ত সুভাষ বোস! এই কটা দিন দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। এদিকে মাসির কী ভালবাসা! আমার মতন 'কচি মেয়েকে' প্রায় কোলে তুলে নিয়ে মাসী ভোগবিলাসের মধ্যে ডুবিয়ে দিল। সে কী খাওয়ার ঘটা! আমার স্বাস্থ্য ফিরে গেল! পনেরো দিন দূরের কথা, এক মাস কেটে চলল।

ও বাড়িতে শুধু মেয়েছেলে থাকে, মহারাজ। কিন্তু দোতলায় শুধু মাসী আর আমি। একদিন মাসী বলল, আজ এক বন্ধু আসবে তোমার সঙ্গে গল্প করতে, তুমি তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলো, কেমন খুকু? দেখবে কেমন চমৎকার মানুষ!

মাসীর কথায় সেদিন খুব উৎসাহ আমার। সারাদিন কাটল, সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল, সেই বন্ধু এল অনেক রাত্তিরে। ও হরি, ও যে পুরুষ-ছেলে! চেহারাটা বেশ ভাল, গায়ে সিল্কের পান্‌জাবির ওপর শাল। লোকটা টলছে, কী যেন খেয়েছে! কাছে এসে হেসে বলল, সারারাত—বুঝলে, সারারাত তোমার সঙ্গে গল্প করব। এই নাও পঁচিশটে টাকা রাখো। হ্যাঁ, হাত পেতে আমি টাকা নিলুম। বেশ মজা লাগল লোকটার চলন-ধরণ দেখে। বললুম, ও ঘরে গিয়ে মাসির কাছে একটু বসুন, আমি সেজেগুজে আসছি। লোকটা খুশী হয়ে বাইরে গেল। ঘরের আলোটা আমি নিবিয়ে দিলুম।

বুঝলে মহারাজ, তিন মিনিট! তিন মিনিটের মধ্যেই মাসির দেওয়া পুতুলের ব্যাগে ভরে নিলুম খানতিনেক শাড়ি, জামা, গামছা, তেল-সাবান-মাজন। মাসি আমার 'ফিগার' তৈরির জন্য স্কিপিংয়ের দড়ি কিনে দিয়েছিল। সেই দড়ি দিয়ে কোমরে ব্যাগটা বেঁধে বারান্দায় এলুম। শীতের রাত, সরু গলিতে কেউ নেই দূরে-কাছে। বারান্দার রেলিংয়ে উঠে রেন-পাইপ ধরে সড়সড় করে নেমে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়লুম। ব্যাগটা খুলে নিলুম, পায়ে চটি পরলুম। তারপর

মোড়ের মাথায় মিষ্টির দোকানের ধারে এসে একখানা রিকৃশা নিলুম। এখন আমি সব চিনি, সব জানি। এক মাসে আমার বয়স বেড়েছে দশ বছর। এখন আমি যেন ইস্পাতের ফলা। রাত এগারোটায় মেডিকেল কলেজের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে এসে ঢুকলুম। ওখানেই মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম একখানা বেঞ্চে। মহারাজ, আমার চেয়ে কঠিন মেয়ে সেদিন কলকাতায় আর কেউ ছিল না! পরদিন সকালে একজন নার্স আমার দিকে তাকাল। ওর ধারণা, আমি ছেলেমানুষ! আমার বিশ্বাস, আমি ওর ঠাকুমা! যাই হোক, স্নান করলুম ওখানেই। তারপর তৈরি হয়ে ব্যাগটা নিয়ে বেরোলুম পথে। হাতে প্রায় পঁচিশ টাকা। ভাবনা আছে কিছু? দোকানে খেয়েদেয়ে যখন হাঁটতে হাঁটতে সুভাষবাবুর বাড়িতে এসে পৌঁছলুম তখন সাড়ে নটা।

সেই সুভাষবাবু, সেই সুন্দর মুখ। আমি যেন গুরুদর্শন করে ধন্য হলুম। উনি মিষ্ট কণ্ঠে বললেন, সকলের আগে তোমার পক্ষে কিছুকাল পড়াশুনো করা দরকার, বুঝেছ?

আমি গ্রামের স্কুলে নাইন্ ক্লাসে পড়েছি। লেখাপড়ায় মন্দ ছিলুম না। সুভাষবাবু টেলিফোনে সেণ্ট মার্গারেটের সঙ্গে কথা বললেন। ওরাই আমার থাকার ব্যবস্থা করবে। খরচপত্রের ভাবনা কিছু নেই। আমি ফার্স্ট ক্লাসে ভর্তি হলুম। মহারাজ, পাস করে বেরোবার পর আসল জীবন আরম্ভ। বছর তিনেকের মধ্যেই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলুম। সেটাও ওই ১৯২৯। আমার বয়স তখন সতেরো পেরিয়ে যাচ্ছে!

শ্রীমতী সাধনার এই চমকপ্রদ কাহিনীকে কেন্দ্র করে আমি 'ঘুমভাঙ্গার রাত' নাম দিয়ে 'ভারতবর্ষ'-এ একটি ছোট উপন্যাস প্রকাশ করেছিলুম। শুধু উপন্যাসই নয়, পরবর্তীকালে দু'একটি ছোট গল্পও লিখেছিলুম। এ মেয়ের জীবনের কয়েকটি ছোট ছোট নাটকীয় ঘটনা আমাকে খুবই প্রভাবিত করে। এর কথা পরে আবার আসবে।

অতি প্রত্যুষে গড়ের মাঠের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছিলুম তক্তাঘাটের দিকে। তখনও তেমন অন্ধকার কাটেনি। পৌষ সংক্রান্তি সমাগত। আমি যাচ্ছিলুম গঙ্গাসাগরে। ১৯৩৪এর ১২ জানুয়ারী।

আমার কাঁধে একখানা কম্বল, গায়ে পাঞ্জাবির ওপর হাফ-সোয়েটার, হাতে অ্যালুমিনিয়মের একটা ঘটি। খালি পা। আমি যাচ্ছিলুম তীর্থস্থানে। শ্রীমতী সাবিত্রী চিঠি দিয়েছেন কাশী থেকে। ওঁরা সাগরে পৌঁছবেন ১৩ তারিখে।

ভারত সেবাশ্রমের কর্মীরা ওঁদের সঙ্গে করে আনছেন। আমার যাওয়া চাই। সাবিত্রীর নির্দেশ অমান্য করতে পারিনে।

হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ যাত্রীর অধিকাংশই অবাঙ্গালী। তারা পথে পথে খায়, রাস্তাঘাটে ঘুমোয়, ওলাউঠোয় মরে। সেই বিপুল সংখ্যক ইতর সাধারণের ভিতর দিয়ে পেরিয়ে হোরমিলার কোম্পানির ছোট একটি মালবাহী স্টীমারের ভিতরে জায়গা পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। সুতরাং তারই সঙ্গে লোহার কাছি দিয়ে বাঁধা বড় ভেলাটার উপরে গিয়ে উঠলুম। ভাবলুম নদীমাতৃক বাঙ্গলার প্রাকৃতিক শোভাও দেখব, এবং ওই সঙ্গে শীতের রোদ পোহানোও চলবে। তীর্থযাত্রায় সাধারণত আমি কৃচ্ছ্রসাধন করি, সুতরাং আহারাদির কথা ওঠে না।

সকাল আটটার পর স্টীমার ছেড়েছে এবং আমাদের ভেলাটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এটার নাম নাকি গাধাবোট। 'গাধা' শব্দটা কেন এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এটি ঠাউরিয়ে নিচ্ছিলুম। শীতের রৌদ্র, বাতাস শীতল, মাথার উপর মহাশূন্য। কিন্তু স্টীমারের বড় বড় সুদর্শন চক্র দু'খানা যতই সাংঘাতিক আওয়াজ করে জল কাটছে, আমাদের গাধা বোটখানা ততই ধেই ধেই করে নাচছিল। এটা ঠিক নৃত্যশিল্পীর নাচন নয়। কেউ আছড়িয়ে গামছা কাচলে সেটাকে গামছার নাচন বলা চলে না! আমরা কয়েকজন মূঢ় ও হতভাগ্য যাত্রী প্রাণভয়ে কেবল নিজেদের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা পাচ্ছিলুম। প্রাকৃতিক শোভাদর্শন সেদিন মাথায় উঠেছিল। আমি সাঁতার জানিনে, সুতরাং ছিট্‌কিয়ে জলের মধ্যে পড়লে একেবারে ঘটি-বাটি! অনেকবারের মতো এবারেও মৃত্যু আমার সঙ্গ নিয়েছে। জলের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে আমার দিকে সে চোখ টিপছে! আমি সর্বহারাদের মধ্যে বসেছিলুম।

দুপুরের একটা সময়ে মাঝে মাঝে হাওয়ার ঝলকে মূল স্টীমারের দিক থেকে খাঁটি ঘিয়ে ভাজা পুরির সুগন্ধ পাচ্ছিলুম! ছি, তুমি না কপিলের মন্দির দর্শনে যাচ্ছ? আগে ধুলোপায়ে দর্শন, পরে ভোজন। মা গৃধ—লোভ করিও না! অতএব অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে গুছিয়ে বসলুম।

অবেলার দিকে পাংশুবর্ণ মেঘ দুর্ভাবনার কারণ ঘটাচ্ছিল। কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমস্ত আকাশ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে এল এবং সন্ধ্যারাত্রেই বৃষ্টি নামল। এ বৃষ্টি নাকি ফসলের পক্ষে ভাল। পশ্চিমে একে বলে 'হুইট-রেন্'। আপাতত এই ঠাণ্ডায় আমাদের পক্ষে এ বৃষ্টি কষ্টদায়ক। আমাদের মাথা বাঁচাবার উপায় ছিল না। বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসের প্রবলতার ফলে যেন সর্বাঙ্গে চাবুক পড়ছিল। অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিলুম চারিদিকে ধু ধু করছে দুরন্ত উত্তাল জলের লাফা-

লাফি। আমি আমার ভারসাম্য বাঁচিয়ে এবার কম্বলের পাট খুলে মুড়ি দিলুম। এবার কম্বলটি বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল। ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির ঝাপট থামবার লক্ষণ দেখছিনে।

কিন্তু মাঝরাত্রের ঘনীভূত দুর্যোগের কালে স্টীমারের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সারেঙ-এর বোধ হয় টনক নড়ে। তিনি 'নেটিভ জন্তুদের' নিরাপত্তার জন্য লোহার পোল্ খাটিয়ে তেরপল টাঙ্গাবার ব্যবস্থা করলেন। আমরা ততক্ষণে রসগোল্লার মতো সপসপ করছিলুম। এর ওপর আবার তিনি পাগলাঘণ্টা বাজালেন—সেটি নতুন ঝড়ের সঙ্কেত। আমি হেঁটমুণ্ডে কম্বলের মধ্যে বসে রইলুম। যা হয় তাই হোক। শুধু মাঝে মাঝে ঝড়ের বেগের গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনছিলুম।

কিন্তু কিচ্ছু হয়নি আমাদের। পরদিনের প্রভাত ছিল কিছু বিষণ্ণ, তারপর ধীরে ধীরে রোদ দেখা দিল। এবার আমরা বিস্তীর্ণ সাগরের 'সগর' নামক এক দ্বীপের ধারে এলুম শত শত নৌকার ভিড়ের মাঝখানে। একটি নৌকায় নেমে আমি তীরভূমিতে এসে পৌছলুম। বলা বাহুল্য, কাদা পায়ে প্রথমেই গেলুম কপিল মুনি মন্দির। ভিতরে মুনির বিগ্রহ।

জলযোগ সেরে ভারত সেবাশ্রম কেন্দ্রটি দেখে আমি গিয়ে দাঁড়ালুম একস্থলে যেখানে কাকদ্বীপের যাত্রীরা নামছে নৌকা থেকে। আমার উৎসুক চক্ষু এক সময় শ্রীমতী সাবিত্রীদের নৌকা ঠিকই খুঁজে বার করল। কাছাকাছি গিয়ে আমি হাত তুলে দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম। উনি দূরের থেকে আমাকে নমস্কার জানালেন। এ পর্বটি আমি আগেই 'জলকল্লোল' গ্রন্থে প্রকাশ করেছি, সুতরাং এখানে সংক্ষেপেই বলব।

ভারত সেবাশ্রমের ক্যাম্পাসটি বড়, সেখানে ডাক্তার ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থাদি সহ সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধার আয়োজন করা ছিল। ওদের ভিতরে গিয়ে আমার ভিজা কম্বলখানা আগেই রৌদ্রে মেলে দিলুম। অনেকগুলি চালাঘরের জটলার মধ্যে মেয়েদের ব্যবস্থা ছিল পৃথক। সাবিত্রীদের দলে চার-পাঁচজন মহিলা ছিলেন। একসময় তিনি একজন স্বামীজীকে সঙ্গে নিয়ে আমার সামনে এলেন এবং হাসিমুখে বললেন, এঁর কথাই আপনাকে বলে রেখেছিলুম স্বামীজি, ইনিই আমার গুরুভাই!

গুরুভাই! নতুন সংজ্ঞা বটে। আমি সকৌতুকে হেসে আলাপ করলুম। স্বামীজী বললেন, আপনি এই ক্যাম্পেই থাকুন, আমরা সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ব্যস্তসমস্তভাবে স্বামীজী তাঁর সহকর্মীদের নির্দেশ দিয়ে অন্যত্র চলে যাবার পর এবার আমরা দুজন একা। হাসিমুখে বললুম, কপিল মুনি নয়, দেবীদর্শন

ঘটবে, তাই ছুটে এসেছি!

আসতে কষ্ট হয়েছিল?—তাঁর রুদ্ধশ্বাসের পিছনে ভাবাবেগ দেখছিলুম।

তিলমাত্র না!—আমার কণ্ঠস্বরে ছিল যেন আনন্দসাগরের তরঙ্গ।

হাসিমুখে সাবিত্রী বললেন, তুমি এসেছ, তাই না আমার গঙ্গাসাগর! শোন, এবার আমি আর শাসনের ভয় করিনে! সঙ্গে যাদের এনেছি তারা আমার খুব বাধ্য। দেড় বছর পরে এবার তুমি আর আমি কাছাকাছি এসেছি। এই দেখো তোমার সেই রুদ্রাক্ষের মালা, আমি সোনার চেন্ দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছি।

অদূরে অন্য এক স্বামীজী আসছিলেন। সাবিত্রী বললেন, শুনুন স্বামীজী, এঁর শরীর তেমন ভাল নেই। এঁর স্নানের জন্য গরম জল দেবেন।

স্বামীজী বললেন, কিচ্ছু ভাববেন না, ওঁর সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টেনে সাবিত্রী তখনকার মতো বিদায় নিলেন।

সেদিন মধ্যাহ্নকালে সাবিত্রী আমাদের ভোজের আয়োজন করেছিলেন। আমি গুরুভাই, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, গলায় আমার উপবীতগুচ্ছ এবং আমি অতিথি। আমার জন্য এল গালিচার আসন ও মিষ্টান্নের পাত্র। পানীয় জল এল তামার ঘটিতে। কয়েকজন আশ্রমিক সাধু ও ব্রহ্মচারী এপাশে ওপাশে বসলেন। সাবিত্রী আমার পাতায় প্রথম গরম ভাত এবং তারপরে অনেকটা সুগন্ধ গাওয়া ঘি নিজের হাতে ভাতের ওপর ঢেলে দিলেন। হিমালয়ে একটি বিশেষ দিনের ভোজনপর্বে ঘৃতের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্বের কথা তিনি জানতেন। অতঃপর আলুসিদ্ধ, সোনামুগের ডাল, পোরের ভাজা, বাঁধাকপির ছক্কা, কড়াইশুঁটির ডালনা, আচার, দই এবং আমার অতি প্রিয় কাশীর প্রসিদ্ধ খোয়াক্ষীরের নাড়ু। ওরই মধ্যে দেখছিলুম সাবিত্রীকে। অল্প ঘোমটার নিচে তাঁর রাঙ্গা মুখ। ওঁর মাথার চুলের ঝুলনটা কাটা—যাকে বলে বব-করা। কেমন যেন একটা অনাদি-অনন্তকালের বেদনা আমার মধ্যে কুণ্ডলী পাকাচ্ছিল। আবার বুকের মধ্যে সেদিন এক বিশ্বজোড়া গঙ্গাসাগর থই থই করে উঠছিল। আমি মুখ তুলতে পারিনি। এই পরম শুচিস্মিতার দুই চক্ষুতারকার নিবিড় মদিরতার মধ্যে আমার সেই ছোটবেলাকার হরিমোহনদের বাড়ির অন্নপূর্ণা প্রতিমাকে দেখতে পাচ্ছিলুম! আমার প্রাপ্য আমি পেয়ে গেছি। দেবীদর্শনই আমার কাম্য ছিল। আমার তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটি হারিকেন ল্যাম্প হাতে ঝুলিয়ে সাবিত্রী আমার ছোট চালাটির মধ্যে এলেন। হাসিমুখে বললেন, আমি এর মধ্যে দু'বার এসেছি, তুমি অকাতরে ঘুমোচ্ছিলে!

উনি বসলেন আমার কাছাকাছি। বললুম, আজ তোমাকে দেখে অপরিসীম তৃপ্তি পেয়েছি, তাই বোধহয় ঘুমটা ছিল গভীর। শোন সাবিত্রী, তুমি আমার জীবনে প্রথম অধ্যাত্মচিন্তার স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে দিয়েছ, তোমাকে প্রণাম করতে আমার একটুও সঙ্কোচ নেই।

সাবিত্রী আমার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিলেন। তারপর নতমুখে নম্রকণ্ঠে বললেন, বাইরে তুমি আর নেই! আমার ভেতরেই তুমি আমার পরম গুরুর মতনই মিলিয়ে রয়েছ! তুমিই আমার পুজো জপতপ—সব। তোমাকে ছাড়া আমার অস্তিত্বই নেই।

দুজনেই আমরা চুপ করে রইলুম। বোধ হয় দুজনের ভিতরেই তখন সমুদ্র মন্থন চলেছে। এক সময় একটু ধরা গলায় সাবিত্রী বলে উঠলেন, কী দরকার ছিল আমার গঙ্গাসাগর আসবার? তুমি আসবে এই আশাতেই ত! কেউ মানবে না, স্বীকার করবে না, বুঝতেও চাইবে না! কিন্তু তুমি আর আমি দুজনে যে এ পৃথিবীর নই, আমরা যে হিমালয়ের সন্তান—একথা কে বিশ্বাস করবে? এবার তুমি জেনে যেও, এই দেড় বছরে আমি সম্পূর্ণ বদলিয়ে গেছি। এখন আমিই আমার অভিভাবক। তোমার কাছে আসতে আমি আর ভয় পাইনে।

ঘণ্টাখানেক সাবিত্রী কাছে বসেছিলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কত কথা জমিয়ে রেখেছিলুম তোমাকে বলব বলে। কিন্তু তোমাকে দেখে সব ভুলে গেছি। তুমি এখানে অন্তত দিন দুই থাকো, কেমন? কাল আবার ঠিক এমনি সময় আসব। অনেকক্ষণ থাকব তোমার কাছে। অবিশ্যি কাল সকাল-দুপুরে আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে।

আলোটা রেখে সাবিত্রী চলে গেলেন। আলো সামনে থাকলেও যেন সব আলো নিবে গেল!

রাত্রের দিকে আমি যখন সাধুভাইদের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে গল্পগুজব করছি, এমন সময় মোটা একখানা গঙ্গাবর্ণ তসরের থান পরে সাবিত্রী তাঁদের ক্যাম্পের দিক থেকে এদিকে এলেন। গলায় তাঁর সেই চেন্-বাঁধানো রুদ্রাক্ষের মালা। তিনি এগিয়ে এসে একটি ধূপ জ্বালিয়ে নিয়ে আমার চালার দিকে গেলেন। তাঁর মুখে-চোখে একটি ভাবগম্ভীর ছায়া দেখে মনে হল, তিনি রাত্রির জপ সেরে এসেছেন।

সেই রাত্রে আহারাদির পর চালার মধ্যে এসে একটু অবাক হয়েছিলুম। বোধ করি সাবিত্রীর অনুরোধেই সাধুভাইরা আমার জন্য সুন্দর শয্যার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আমার নিজের কম্বলটি গুকিয়ে পাট করা রয়েছে পায়ের দিকে।

মাথার বালিশের পাশে রয়েছে একটি রক্তগোলাপের গুচ্ছ। বাইরে তখন সমুদ্রের তোলপাড় চলছিল।

আমার চারিদিকে যেন একটি মোহাবেশ রচিত হচ্ছিল। কি জানি কেন, আমার ভিতর থেকে প্রতিবাদ মাথা তুলছিল। না, এর মধ্যে রয়েছে এক ললিত লাবণ্যের স্পর্শ, এ আমার জন্য নয়। আমার মন দুর্বল, কিন্তু আমার নৈতিক দায়িত্ব আমাকে ভিতর থেকেই ক্ষণে ক্ষণে শাসন করে উঠছিল। দুপুরবেলায় নানা আলোচনার মধ্যে সাবিত্রী তাঁর সেই আগেকার প্রিয় কবিতাটাই মৃদুগলায় আমাকে শুনিয়ে গিয়েছিলেন, 'মোর মরণে তোমার হবে জয়/মোর জীবনে তোমার পরিচয়/মোর দুঃখ যে রাঙ্গা শতদল, আজ ঘিরিল তোমার পদতল—'

সেই রাত্রির সুখের শয্যায় অতিশয় অস্বস্তির সঙ্গে আমার বিনিদ্র প্রহরগুলি কেটেছিল। ভোরবেলায় স্নানাদি সেরে সাবিত্রী এসে দাঁড়াবার আগেই আমি কম্বল ও ঘটিটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সাধু ভাইদের সঙ্গে মিনিট দুই কথাবার্তা বলে জনারণ্যের ভিতর দিয়ে চলে গেলুম।

জানি এটি ন্যায়সঙ্গত হল না, সাবিত্রীকে বলে আসাই উচিত ছিল। কিন্তু আমি নিজের দিকে চেয়ে ভয় পেয়েছিলুম, নিজেকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। আমি হনহনিয়ে ভিড়ের ভিতর দিয়ে কোথায় যে যাচ্ছিলুম, নিজেও তা জানিনে।

তবু যত ভাবছি, মনে হচ্ছে এই ভাল! পূজার ফুল পূজার জন্যই থাক্। এই নিবিড় আনন্দ, এই কল্যাণকুশল স্পর্শ, এই রোমাঞ্চকর রস-কল্পনা—এ চিরদিন আমার মনে স্বপ্নিল একটা অনুপ্রেরণার মতো হয়ে থাক। আমি চলে যেতে চাই দেহ থেকে দেহাতীতে, জীবন থেকে মহাজীবনে—যেখানে অন্ধকারে, দুর্যোগে, দুর্দশায়, দুর্ভাগ্যে ও বিচ্ছেদের ব্যথায় আমি থাকব চিরদিন যক্ষবিরহীর মতো, এবং মহীয়সী সাবিত্রী বাস করবেন তাঁর অলকায়—আমার সকল নাগালের বাইরে। হ্যাঁ, সেই ভাল।

বেলা দেড়টা দুটোর সময় একখানা স্টীমার যাচ্ছিল ডায়মণ্ড হারবারের দিকে। আমি সেখানায় উঠে নিরিবিলিতে জায়গা নিলুম। এখানা যাত্রীবাহী, তাই বসবার সুবিধা। আমার মন পরিতৃপ্ত, তাই সেদিন অপরাহ্ন কালের মধুর রৌদ্রে, নীলোজ্জ্বল আকাশে আর দূর-দিগন্তের হরিৎ রেখায় সর্বত্র আমি সাবিত্রীর আসন পেতে-পেতে যাচ্ছিলুম।

ডায়মণ্ড হারবারে নামলুম, তখন রাত। সেখানে মোটর বাস পেয়ে ধর্মতলার কাছে এসে নামলুম মধ্যরাত্রের অনেক পরে। আবার সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে যখন টালাপাড়ায় গিয়ে পৌঁছলুম, তখন রাত তিনটে।

পরদিন ১৫ জানুয়ারী। দুপুরবেলায় সেদিন প্রচণ্ড ভূমিকম্পে উত্তর বিহার ও উত্তরবঙ্গের একটা অংশ ছারখার হয়ে গিয়েছিল। সেই ভূমিকম্প ঐতিহাসিক। আমি ছিলুম টালিগঞ্জের ট্রামে। ট্রামখানা কাৎ হয়ে পড়ার ফলে আমাকে লাফিয়ে নেমে পড়তে হয়েছিল!

মাসখানেক পরে শ্রীমতী সাবিত্রীর চিঠি পেয়েছিলুম। তিনি লিখেছিলেন, বড় আনন্দে তোমার সঙ্গে কেটেছিল একটি দিন। তুমি আমাকে না জানিয়ে চলে গিয়ে ভালই করেছিলে! আমার আচরণে হয়ত সামান্য অস্থিরতা তোমার চোখে পড়েছিল। আমি জানি তুমি ক্ষমা করবে। গঙ্গাসাগরেও ভীষণ ভূমিকম্প হয়েছিল। তোমার সেই চালাঘর মড়মড় করে ভেঙ্গে পড়ে! আমরা বাঘের ডাক শুনতে পেয়েছিলুম। শুনলুম তিন-চারশ' নৌকো সমুদ্রে অদৃশ্য হয়ে যায়। সমুদ্রের ঢেউ সুন্দরবনকে তোলপাড় করে। তোমার চিঠি পেলে আবার চিঠি দেবো। ইতি—

ফাল্গুনের শেষ দিকে এবার বাসস্থান বদলিয়ে পাশের বাড়িতে উঠে এসেছি। এতকাল ধরে কেরোসিন তেল জ্বালিয়ে সকল কাজ করতে হয়েছে। তার আগে ছিল রেড়ির তেল আর মোমবাতির যুগ। জীবনে এবার এই প্রথম ইলেকট্রিক আলো! প্রতি সন্ধ্যা থেকে সমস্ত দোতলা বাড়িটা যেন হেসে উঠছে! নতুন আলোয় নতুন প্রাণ এল। বাড়ির মধ্যেই আমরা পরস্পরকে নতুন করে চিনতে লাগলুম। পুরনো যুগ হারিয়ে গেল, নতুন যুগের উদ্বোধন ঘটল। বাড়িতে এল রান্নার ঠাকুর, রাতদিনের চাকর ও ঠিকা-ঝি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রে 'রাধারাণী'র উল্লেখ করে তাকে অমরত্ব দান করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু রাধারাণীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে আসার পর থেকেই আমার মনে একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। কেননা তখনকার দিনে কতকগুলি শব্দ কানে উঠলে আমার মন অতিশয় বিরূপ ও ব্যথিত হয়ে উঠত। যেমন বেশ্যা, বারনারী, বারবনিতা, গণিকা, বারাঙ্গনা, রূপোপজীবিনী, কুলটা, ভ্রষ্টা, অসতী—ইত্যাদি। এ শব্দগুলি সবই কিন্তু পুরুষের সৃষ্টি। পুরুষ-সমাজপতিরা তাদের কথায়, বক্তৃতায়, সংবাদে, সাহিত্যে, কাব্যে—যখন এই শব্দগুলি দরকার মতো ব্যবহার করে তখন পুরুষশাসিত সমাজের মেয়েরা চুপ করে শোনে। কেন চুপ করে থাকে প্রশ্ন সেইখানে। উপরিউক্ত শব্দগুলির একটিও মেয়েদের সৃষ্টি নয়, বলাই বাহুল্য। কিন্তু কেন তারা চুপ করে থাকে, কেন ওই ধরনের আলোচনায় যোগ দেয় না, কেন পতিতা নারীদের জীবন তারা বিশ্লেষণ করতে চায় না—এটি মেয়েরা নিজেরাই জানে। পুরুষের আধিপত্যের বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে তৎকালে কোনও মেয়ের এমন সাহস ছিল না যে, তারা মুখ খোলে!

মেয়েদের কপালে সুখ্যাতির তিলক অথবা কলঙ্কের দাগ চিহ্নিত করে দেওয়া একমাত্র পুরুষেরই অধিকার ছিল। তখনকার কাব্য বা সাহিত্যেও এই মূলনীতি পাকা হয়ে থাকত। সেই কারণে একদা রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা, বউ ঠাকুরাণীর হাট, চোখের বালি, ঘরে বাইরে' প্রভৃতি কাব্য ও গ্রন্থ ঝড় তুলেছিল রক্ষণশীল পুরুষ সমাজে, কিন্তু মেয়েরা রবীন্দ্রনাথের এই বইগুলি পড়ে আনন্দ পেয়েছিল। অঙ্গনা মানে মেয়ে এবং তাকে হতে হবে সতী মেয়ে! সে গৃহের গণ্ডির মধ্যে থাকে তাই সে গৃহাঙ্গনা। কিন্তু গণ্ডীর বাইরে গেলেই তার নাম বরাঙ্গনা থেকে হল বারাঙ্গনা। এর পিছনের আইডিয়াটা হল, পুরুষের 'সেন্স অফ পজেশন' এবং সম্পত্তিবাদ। পুরুষ কখনও মেয়েকে বিশ্বাস করেনি এবং একা বাইরে যেতে দেয়নি, পাছে তার ওই 'সেন্স অফ পজেশনে' আঘাত পড়ে, পাছে তার আপন ঔরসজাত 'পুত্র সন্তান' পিতার সম্পত্তি না পায়, পাছে 'ক্ষেত্রজ' অন্য কেউ পায়! এই কারণে মেয়েদেরকে ঘরের মধ্যে পুরে রেখে তাদের ওপর 'দেবীত্ব' আরোপ করা হত। কিন্তু দেবী হওয়া সত্ত্বেও মেয়েরা সম্পত্তি লাভ করত না—সে মেয়ে জননী, জায়া, কন্যা, ভগিনী যেই হোক না কেন। তাদের জন্য থাকত শুধু 'খোরপোষে'র ব্যবস্থা। নিঃসন্তান মেয়েদেরকে বলা হত 'অবীরা'।

কিন্তু বারবনিতাদের কথা ছিল স্বতন্ত্র। এরাও দেশেরই মেয়ে,—এদের কেউ আকাশ থেকে পড়েনি! এরা পুরুষেরই সৃষ্টি, আবার পুরুষের চোখে ঘৃণ্য! কলকাতার প্রথম পত্তনকালে এদেরকেই সৃষ্টি করেছিল যারা, তারা রাজা, মহারাজা, জমিদার, জড়োয়া জহরৎ ব্যবসায়ী, জাহাজের মালিক, পাটোয়ারী, বৃটিশের প্রথম আমলের যোগানদার এবং তখনকার বিভিন্ন অভিজাত শ্রেণী। এই বারবনিতাদের গর্ভে এসেছিল হাজার হাজার সন্তান। তারা ভিন্ন পরিচয় নিয়ে কালক্রমে বিবাহসূত্রে নানা সমাজে মিলিয়ে গেছে।

পরবর্তীকালে পতিতাদের মধ্যে বহু মেয়ে এসেছিল ভদ্র ও স্বল্পবিত্ত সমাজ থেকে। তারা তাদের পারিবারিক পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করত, এবং নিজেদের প্রকৃত নাম-ধাম বদলিয়ে রাখত শোভন সুরুচির দায়ে। ওদের মধ্যে বহু মেয়ের ইতিহাস হল উৎপীড়নের, অপযশ রটনার, অভাব-অনটনের, কঠোর শাসনের, অরক্ষণীয় অবস্থার, দুরারোগ্য ব্যাধির, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার, পদস্খলনের বা গৃহ-বিতাড়নের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ অভিভাবকরা ওদেরকে তাড়িয়েছে। মা কেঁদেছে, ভাই-বোন, আত্মীয়-পরিজন কেঁদেছে,—কিন্তু পুরুষের কঠিন নির্দেশের ফলে নিরুদ্দিষ্ট জীবনের মধ্যে তাদেরকে চলে যেতে হয়েছে। ওদের মধ্যে বহু মেয়ে সুশ্রী ও শিক্ষাসম্পন্ন, বহু মেয়ে সম্ভ্রান্ত সমাজের। পিতার কন্যাদায়, স্বামীর সন্দেহ, শাশুড়ির অনাচার, সতীনের দুর্ব্যবহার, অন্যায়ের আস্ফালন—প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতে আহত প্রত্যাহত হয়ে মেয়ে বা বাড়ির বউ সঙ্গোপনে বৃহৎ মুক্তির দিকে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। এর মধ্যে অর্থনীতিক সমস্যাও কাজ করেছে অনেক। স্বল্পশিক্ষিত বেকার স্বামী বা সহোদর, সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি, পিতা বা শ্বশুরের পুঁজির অভাব, উপার্জনের সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতা —এসবগুলি একত্র করলে দেখা যেত ঘরের মধ্যে মেয়েদের ভাগেই উচ্ছিষ্ট অন্নের পরিমাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে গেছে। বলা বাহুল্য, দেশের চারিদিকে জীবনের এই ভয়াবহ পঙ্গুতার মধ্যেও এই দুঃসহ অর্থনীতিক দুর্গতি সকল পারিবারিক সম্পর্ককেই যুগের পর যুগ ধরে নিয়ন্ত্রিত করে চলত। কিন্তু এর প্রধান আঘাত পড়ত পুরুষশাসিত মেয়েদের জীবনে। প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে মেয়েদের কপালে জুটত নিগ্রহ, কৃচ্ছ্রতা, অসম্মান এবং অনাচার। এগুলির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাদের অনেকে বেরিয়ে পড়ত যেদিকে দু'চোখ যায়। মহাষ্টমীতে, গ্রহণস্নানে, পাল-পার্বণে ভিড়ের ভিতর দিয়ে বহু মেয়ের নিখোঁজ হয়ে যাবার ইতিবৃত্ত তৎকালে অনেকেই শুনত।

আরেকটু বলি। কলকাতা বা মফঃস্বলের শ্রেষ্ঠ নাগরিক, সমাজের নামজাদা অভিভাবক, জমিদার বংশের শাখা-প্রশাখা,—এঁদের ভিতর থেকে কত রূপ-লাবণ্যময়ী নিরুপায় নারী 'বেরিয়ে' এসেছে। বন্দিনী অবস্থা থেকে মেয়েরা কেউ মুক্তি নিলে তৎকালে বলা হত 'বেরিয়ে' গেছে। খাঁচার দরজা খুলে সে পালিয়েছে, শিকল ছিঁড়ে বেরিয়েছে, শাসনবাঁধন অস্বীকার করেছে। শাস্ত্রে নাকি বলেছে বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী, প্রৌঢ়ত্বে পুত্র, বার্ধক্যে পৌত্র, এদের দ্বারা রক্ষণা-বেক্ষণের বাইরে মেয়েদের স্বাধীন সত্তা নেই। মেয়েরা হবে পরাশ্রিতা, পরান্ন-ভোজিনী, পরপদানুগতা ও পরার্থ-সেবিকা,—এই তাদের একমাত্র পরিচয়। ওদের নাম হবে তখন সতীসাধ্বী গৃহলক্ষ্মী! ওরা কদন্ন খাক্, রোগে ভুগুক, সুতিকায় বা যক্ষ্মায় মরুক, অমানুষ স্বামীর অনাচারে নিগৃহীত হোক,—কিন্তু ওরা গৃহলক্ষ্মী। সংসারে ওদের একমাত্র দাবি হল 'খোরপোষ'। অর্থাৎ ভাত আর কাপড়। অর্থ বা সম্পদ থেকে ওরা বঞ্চিত। অনাহারে বা অনাচারে ওদের যখন অকালমৃত্যু ঘটে, তখন ওদের মাথায় সিঁদুর মাখিয়ে ফুলের তোড়ায় সাজিয়ে চিতায় তোলা হয়। তখন সবাই বলে, আহা পুণ্যবতী। অর্থাৎ বহু পুণ্যের ফলে এই অপমৃত্যু!

মেয়েদের এই প্রকার দুর্দশার একটি কাহিনীকে অবলম্বন করে একদা একটি ছোট উপন্যাস লিখে নাম দিয়েছিলুম, 'দেবীর দেশের মেয়ে'। এটিকে সিনেমা চিত্রে রূপান্তরিত করার জন্যে ১৯৩৪-এর এক সময়ে সুধীর বসু নামক এক উৎসাহী ভদ্রলোক এটি কিনে নেন্।

এই সময়ে একটি তরুণ বালক প্রায়ই আমার খোঁজে আসত। কিন্তু আমি তৎকালে সর্বদাই ব্যস্তবাগীশ। একদিন দুপুরে ছেলেটিকে বাইরের ঘরে বসালুম। ছেলেটি লাজুক, অমায়িক এবং মিষ্টভাষী। বয়স চোদ্দ-পনেরো হবে। সে আসে ভবানীপুর থেকে। এসে এসে ফিরে যায়। তার এই অধ্যবসায় দেখে আমি অবাক হয়েছিলুম। কিন্তু আরও অবাক করল একটি বিষয়ে। সে আমার কোন কোনও বই থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মুখস্থ বলে যেতে লাগল। এ ধরনের স্মরণশক্তি সচরাচর চোখে পড়ে না। বয়সে সে আমার চেয়ে অনেক ছোট কিন্তু সেই থেকে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল। পরবর্তীকালে এই তরুণ সুকুমার বালক একজন সুলেখক হয়ে ওঠে। তার নাম সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

আরেকদিন আসে একটি নবীন যুবক। তাকে দেখে আমি থমকিয়ে গিয়েছিলুম। এমন রূপবান, স্বাস্থ্যবান, প্রিয়দর্শন ও লাজুক যুবক বোধ হয় এর আগে দেখিনি। ঠোঁট দুটি সুন্দরী নারীর মতো রাঙ্গাটে, দাঁতগুলি ঠিক মুক্তো এবং বড় বড় কচি নধর চোখ। পুরুষের এই সুন্দর শ্রী ও স্বাস্থ্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। পরিচয়

দিল সে আমাদের বন্ধু পবিত্র গাঙ্গুলীর সম্পর্কে ভাগ্নে এবং তার নাম অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়। সে থাকে এই কাছেই এক বস্তিতে একটি কাঁচাপাকা বাড়িতে। কিন্তু তার কথাবার্তার মধ্যেই জানাল ভাগ্যের ভয়াবহ বিদ্রূপ তার সঙ্গেই রয়েছে! পড়াশুনো তাকে বন্ধ রাখতে হয়েছে কারণ তার জীবন-মরণ সমস্যা দেখা দিয়েছে।

আমি আঁতকিয়ে উঠলুম,—কেন?

এই লাজুক ও বিনীতস্বভাব যুবকটি যখন জানাল, সে যক্ষ্মা রোগে ভুগছে, আমি শুনে পাথর হয়ে গেলুম! সে শুনেছে কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় কোন স্টেটের ট্রাস্টির চেয়ারম্যান এবং এই স্টেটের খরচে দার্জিলিংয়ের লুইস জুবিলি স্যানাটোরিয়মে দুটি বেড নেওয়া আছে। আমি যদি সুরেনবাবুকে এ বিষয় একটু বলি। ওখানে চিকিৎসা, ঔষধ-পত্র ইত্যাদির সুবিধা আছে।

আমি সেইদিনেই বিকালে আলিপুরে সুরেনবাবুর বাড়িতে হাজির হয়েছিলুম। অমিয়জীবনের এই সুন্দর রূপ, স্বাস্থ্য, যৌবনশ্রী—এর জন্য সেদিন আমি অনেক দূর যেতে পারতুম! সুরেনবাবু ছিলেন আমার খুবই শ্রদ্ধেয় বন্ধু। তিনি সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন। দার্জিলিংয়ে থাকাকালীন বহুদিন অবধি অমিয়র বাঁচবার আশা ছিল না। লুইস জুবিলি স্যানাটোরিয়মের রেকর্ডে সেগুলি আজও আছে আশা করি। এর অনুপূর্ব আমি লিখেছি 'দেবতাত্মা হিমালয়' গ্রন্থে। তখন কথায় কথায় না ছিল এক্স-রে, না স্ট্রেপটোমাইসিন পেনিসিলিন, না বা ডাঃ সেলম্যান ওয়াকস্-ম্যানের অ্যান্টিবায়োটিক কোনও ওষুধ। যক্ষ্মারোগ মানে তখন অবধারিত মৃত্যু। কিন্তু এই নিশ্চিত মৃত্যুর থেকে একদা বেঁচে উঠেছিল অমিয়জীবন। পরবর্তী বহু বছর পরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের কালে অমিয়কে নানা লেখাপড়ার কাজ দিয়ে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

এমনি একটা সময় আমার নামে একটি খুব হাল্‌কা পার্সেল এল। হাতে নিয়ে দেখি, বিহারের পুসা ইন্‌স্টিট্যুট থেকে পাঠিয়েছেন রমলা দেবী। খুলে দেখি একটি ছোট সাবানের বাক্সর মধ্যে কয়েকটি রক্তনীল বর্ণের গোলাপ ফুল। এখনও বাক্সের মধ্যে কিছু মুখচোরা গন্ধ রয়েছে। ফুলগুলির তলায় পাট-করা একখানা চিঠি। চিঠির ভিতরকার সেই একই সম্ভাষণ এবং প্রায় একই ভাষা আমার মনে ক্লান্তি এনেছিল। তবু প্রাপ্তি স্বীকার করে একটি পোস্টকার্ড পাঠিয়ে দিলুম। এ মহিলা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেন, এই ভেবে আমি আড়ষ্ট হচ্ছিলুম।

এরই মধ্যে একদিন এক সৌম্যকান্তি ও পরিণত বয়স্ক ভদ্রলোক এসে হাসিমুখে যখন বললেন তাঁর নাম হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি তাঁকে সাদরে ঘরে বসিয়ে

ক্ষমা চেয়ে জানালুম, আপনার চিঠির জবাব দিতে পারিনি, সেজন্য আমি খুবই লজ্জিত। ভদ্রলোক আমার সাহিত্য ও ভ্রাম্যমান জীবনের নানা খবর রাখেন। এক সময় তিনি কাজের কথায় এলেন। হেমবাবু বর্তমানে নদীয়ার মহারাজার বাড়িতেই থাকেন অনেকটা অভিভাবকের মতো, এবং তাঁদেরই নির্দেশে উনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তাঁদের আমন্ত্রণ যদি গ্রহণ করি এবং এখনই যদি একবারটি সেখানে যাই তবে সকলে খুশী হন। হেমবাবু গাড়ি এনেছেন।

তখন বেলা তিনটে। আমি রাজি হলুম এবং ভিতরে গিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে এলুম। গাড়ির ড্রাইভারের সাজসজ্জা রাজবাড়িরই উপযুক্ত।

আধ ঘণ্টার মধ্যে যে-অঞ্চলে এলুম, সেটি আমার খুবই পরিচিত পল্লী। ঝাউতলার ঠিক মোড়ে কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর বাড়ির একেবারে মুখোমুখি। গেটের ভিতর দিয়ে বাগান পেরিয়ে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল পর্চ-এর নিচে। বাড়িটি একতলা বটে তবে বিশাল অট্টালিকা। প্রথমে দেখলুম একটি সুশ্রী কিশোর বালক, মুখখানি যেন হাসির মাধুর্যে ভরা। ছেলেটির নাম সৌরীশ অথবা সৌরেশ। ওরই পিতা মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় মহাশয় কিছুকাল আগে অকালে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর স্ত্রী মহারানী জ্যোতির্ময়ী দেবী এই ছেলেটিকে নিয়ে এই বাড়িতেই থাকেন। আমাকে ওই ছেলেটির কাছে গল্প-গুজবে বসিয়ে হেমবাবু অন্দরমহলে গেলেন এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মহারানী এসে দাঁড়ালেন চিকের আড়ালে। এবার মধ্যস্থ হয়ে হেমবাবু বললেন, মহারানী একখানি উপন্যাস লিখেছেন সম্প্রতি, আপনি যদি সেখানি একটু দেখেশুনে দেন।

সবিনয়ে আমি বললুম, এ ধরনের কাজ আমি ত কখনও করিনি, তবে পাণ্ডুলিপিটি হাতে পেলে অবশ্যই পড়ে দেখতে পারি।

মহারানীর হাতেই ছিল দুখানা মোটা ও কালো রংয়ের এক্‌সারসাইজ খাতা। হেমবাবু সেই দুখানা খাতা এনে আমার সামনে রাখলেন। আমি তার পাতা উল্‌টিয়ে পড়তে বসে গেলুম। আমি কয়েকবারই সম্পাদকতা করেছি, সুতরাং লেখার ধরন পরীক্ষা করার অভিজ্ঞতা আমার কিছু আছে। ঘণ্টাখানেক খুঁটিয়ে পড়ে আমি হেমবাবুকে বললুম, মহারানী উপন্যাস রচনায় অভ্যস্ত নন, সেই কারণেই লেখাটা ঠিক জমে ওঠেনি! মাতৃস্নেহ হল এ গল্পের মূল ভিত্তি। তা হোক। যে কোনও বিষয়বস্তু নিয়েই লেখা চলে। কিন্তু প্রকাশের ভঙ্গি বা রচনার দক্ষতাই প্রধান কথা। এই বইটিতে তার একটু অভাব রয়েছে।

হেমবাবু আবার অন্দরমহলে গেলেন এবং মিনিট দশেক পরে ফিরে এসে বললেন, মহারানী খুশী হন যদি আপনি বইটি সংশোধন করেন, কিংবা আরেকটু

গুছিয়ে এটিকে তৈরি করে দেন। ওঁর খুব ইচ্ছে যদি আপনি এখানে নিয়মিত এসে কাজ করেন ; আমাদের গাড়ি যাতায়াত করবে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে খাতা দু'খানা নাড়াচাড়া করে ভাবতে বসলুম। কাজটি বিনা পারিশ্রমিকের নয়, এবং রাজা-রাজড়ার বাড়িতে তার পরিমাণও কম নয়! আমি রাজী হয়ে গেলুম এবং সপ্তাহে দুই তিনবার আসা-যাওয়া করতে লাগলুম। কাজটি শেষ করে দিতে আমার বহুদিন লেগেছিল। অন্যের গল্প নিজের মনে বসাতে সময় লাগে বইকি। কিন্তু ছুটোছুটিতে সাহিত্য হয় না। অবশেষে মহারানী বিশ্বাস করে খাতা দুখানা আমার হাতে একদিন ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমার বিবেচনা ছিল এই, বইটি ছাপা হবে সম্ভ্রান্ত সমাজের এক মহিলার নামে। সুতরাং এই বইয়ের প্রত্যেকটি শব্দ ও বাক্য আমাকে অত্যন্ত সতর্কভাবে বসাতে হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ওই গ্রন্থের বিষয়বস্তু, প্রতিপাদ্য বা পরিণতির সঙ্গে আমার মনের কোনও যোগ ছিল না। কিন্তু মহারানী আমার কাজে খুশী হয়েছিলেন। ওইখানেই আমার সঙ্গে ওঁদের প্রায় দেড় বছরের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। মহারানীকে আমি কোনদিন সুস্পষ্টভাবে চোখেও দেখিনি। শুনেছি অন্যদিকে তিনি রাজা কমলারঞ্জনের ভগ্নি।

এর অল্প কয়েক বছরের মধ্যে চন্দননগরে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের এক অধি-বেশন বসে। রবীন্দ্রনাথ তখন ওখানকার গঙ্গার ঘাটে এক সুন্দর নৌকায় বসবাস করছিলেন। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যকার, পণ্ডিত ও অ্যাটর্নি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। ওই অধিবেশনে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী প্রমুখ কয়েকজন লেখিকা ও বহু লেখক যোগদান করেছিলেন। আমার পাশেই বসেছিল ভবানী মুখোপাধ্যায়। যাই হোক, এই সম্মেলনে সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য বিশিষ্ট কয়েক ব্যক্তি গঙ্গাতীর থেকে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসেন। কবি এসে একটি মনোজ্ঞ ও স্মরণীয় ভাষণ দান করেন। সম্মেলনের সেইটিই ছিল সকলের বড় সাফল্য। ওই একই দিনে মণ্ডপের পিছন দিকে একটি পৃথক মহিলাসভা বসে, এবং শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী তার সভানেত্রী হিসাবে আমাকে সামান্য কিছু বলার জন্য আমন্ত্রণ করেন। কী বলেছিলুম আমি, এখন আর মনে নেই। কিন্তু তার জন্য আজও আমি অনুতপ্ত এই কারণে যে, সাহিত্যের রক্ষণশীলতার আলোচনায় শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবীর সঙ্গে আমার একটি বিতর্ক বেধে ওঠে।

অতঃপর ওই সম্মেলনের সভাপতি দত্ত মহাশয় তাঁর ভাষণে তৎকালীন তরুণ সাহিত্যকে অতি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করছিলেন, এবং সেই সূত্রে এই

অবজ্ঞাত সাহিত্যকে 'যৌনপ্রবৃত্তির চণ্ড চংক্রমণ'—এই আখ্যা দেন। তিনি বলেন, সাহিত্যের এই চরম দুর্গতির কালে আশার কথা এই, কোথাও কোথাও মহৎ সাহিত্যও সৃষ্টি হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি তাঁর পরম কল্যাণীয়া নদীয়ার মহারানী জ্যোতির্ময়ী দেবী লিখিত 'মাতৃস্নেহ' (?) উপন্যাসটির উল্লেখ করে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন!

ভবানী আমার গায়ে চিমটি কেটে কুল-কুলিয়ে হাসছিল। সে সবই জানতো। তবে মহারানী তাঁর বইয়ের নামটি ঠিক কী দিয়েছিলেন, এটি আমি ভুলে গেছি।

কিন্তু ওই সম্মেলনের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবার সুযোগ আমি ছাড়িনি। অবেলার দিকে সভা যখন বেশ সরগরম, তারই এক ফাঁকে পিছলিয়ে বেরিয়ে আমি সোজা চলে গিয়েছিলুম গঙ্গার ধারে কবির বজরার কাছে। খবর দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কবি তাঁর অনুমতি পাঠিয়ে দিলেন। আমি নৌকায় উঠে এলুম। ভিতরে কবি একা, একখানা চেয়ারে বসে রয়েছেন। পাশের টিপাইতে কিছু কাগজপত্র রাখা। তখন নব বসন্ত সমাগমে গঙ্গার উপর দিয়ে মৃদুমন্দ সমীরণ বয়ে চলেছে। আমি মাথা নিচু করে ভিতরে ঢুকে নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। বললুম, আপনার আজকের ভাষণটি শুধু সম্মেলনকেই নয়, সমস্ত বাঙালী সমাজকে অনুপ্রাণিত করবে। আমরা যেন গঙ্গায় অবগাহন স্নান করলুম!

কবি প্রসন্ন মুখে একবার তাকালেন। তারপর তাঁরই ভাষণটির সূত্র ধরে বললেন, জীবনের গতি আছে বলেই সাহিত্যের গতিকে দেখতে পাই। মানুষের মন বসে থাকে না। সে এগিয়ে চলে বলেই নিজের খাদ্য খুঁজে পায়!

আমি স্থির হয়ে বসে ছিলুম শতরঞ্চির উপর। আমার সামনে রয়েছে গৌরীশৃঙ্গের চূড়া! সমস্ত আত্মাভিমান ভুলে যেতে হয়, এই বিরাট পুরুষের পায়ের কাছে এসে বসলে—নিজেকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে হতে থাকে।

সেই অল্পকালটুকুর মধ্যে কবি রাজনীতি, সমাজজীবন এবং সাহিত্যের অন্যান্য আলোচনার কথা তুললেন। মিনিট পনেরো বড় জোর। কিন্তু ওই কথাবার্তার মধ্যেও তিনি সর্বাধুনিক সাহিত্যের কথা ভোলেননি। সেই সময়ে তারাশঙ্করের নব প্রকাশিত একখানি ছোট গল্পের বইয়ের খুব নাম হয়েছিল। বইখানি তাঁর হাতে এসেছিল, এবং তিনি গল্পগুলির খুবই প্রশংসা করে এক সময়ে বললেন, তুমি দেখে নিয়ো, এই নতুন লেখক একদিন অনেকের মাথা ছাড়িয়ে উঠবে!

কবির ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয়নি!

সেই রাত্রেই আমি তারাশঙ্করকে কবির কথাগুলি জানিয়ে দিয়েছিলুম।

এমনি একটা কোন্ সময়ে রজনী মুখার্জির সঙ্গে আমার আলাপ হয় এবং সেই আলাপ ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। রাজনীতি বিষয়ে রজনীর পড়াশুনো এবং পাণ্ডিত্য যথেষ্ট। সে তখন রাজনীতিক কর্মী, অতিশয় মিষ্টভাষী এবং অমায়িক। সে বিবাহ করেছে শ্রীমতী আরতিকে—যে মেয়েটি জেলে যাবার আগে বিচারককে কঠিন বাক্য শুনিয়েছিল! আমার ভাগ্নি বুলির বন্ধু হিসাবে আমিও শ্রীমতী আরতির 'ছোট মামা'। রজনী ও আরতি—দুইজনে মিলে ওদের নতুন ঘরকন্না পেতেছে।

ওদের বাসাবাড়িতে সেদিন আমার ডাক পড়েছিল।

ভিতরে গিয়ে ঢুকতেই রজনী হাসিমুখে এগিয়ে এল এবং সামনের ঘরে যে মহিলারা কথাবার্তা বলছিলেন তাঁদের ভিতর থেকে শ্রীমতী আরতি উঠে এসে বলল, আসুন ছোট মামা, এঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।

ঘরের মধ্যে শান্ত ও স্থির হয়ে বসে রয়েছেন এক বৃদ্ধা। তাঁর সেই আভিজাত্য-পূর্ণ এবং সম্ভ্রমসূচক ব্যক্তিত্ব একটি মুহূর্তেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর মাথায় ঘোমটা নেই। মাথার সামনের অংশ কতকটা কেশবিরল। তিনি বিধবা। তাঁর পাশে রয়েছেন এক পরিণত যৌবনা মহিলা। তাঁর পরনে সরুপাড় ধুতি দেখে বুঝলুম, তিনিও বিধবা। গায়ে তাঁর রেশমী চাদর। তাঁর বড় বড় চোখে যেন মোলায়েম স্নেহের শান্ত মাধুর্য। সেদিকে তাকালে যেন মুখ ফিরনো যায় না! আমি রজনীর পাশে গিয়ে মেঝের শতরঞ্চিতে বসলুম।

আরতি প্রথম পরিচয় করালো বৃদ্ধার সঙ্গে। বলল, উনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায়ের ছোট মেয়ে শরৎকুমারী দেবী—

আমার সর্বাঙ্গে সচকিত রোমাঞ্চের চমক লাগল। তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে আমি বৃদ্ধার পায়ের ধুলো নিলুম। বললুম, আজ আমার পরম সৌভাগ্য, আপনার দর্শন পেলুম—

শরৎকুমারী হাসিমুখে যখন আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন তখন আমি স্বয়ং সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের স্পর্শই যেন অনুভব করে ভাবাপ্লুত হয়েছিলুম। ওঁর মুখশ্রীতে বিদ্যাসাগরের ছবিটি যেন মূর্ত।

আরতি আমার সঙ্গে দ্বিতীয় মহিলার পরিচয় করিয়ে বলল, এঁর ভাই আপনার খুব পরিচিত। মানে, আমাদের ক্ষিতীশ মামা—ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগরের পৌত্রী মোতিমালার ছেলে হলেন ক্ষিতীশ মামা—আর ইনি তাঁরই সহোদরা ভগ্নি হাসি দেবী।

নমস্কার বিনিময়ের পর মৃদুমধুর কণ্ঠে হাসি দেবী বললেন, আমি না হাসলে আমার নামের সঙ্গে মেলে না!

সবাই আমরা হেসে উঠলুম।

অতঃপর পারস্পরিক সম্পর্কের হিসাবনিকাশের অঙ্ক নিয়ে আলোচনা উঠল। সর্বাগ্রে বুঝি নৃসিংহরাম, তারপর ভুবনেশ্বর, তারপর রামজয়, তারপর বুঝি ঠাকুরদাস। ঠাকুরদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। অর্থাৎ অনায়াসে আড়াইশ' বছর পিছিয়ে গিয়ে মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে আশ্রয় নেওয়া চলে। আমার মাথায় ততক্ষণে বংশানুক্রমিকতার জটিলতা ঢুকে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা কুমুদিনীর পৌত্র ঝাড়গ্রাম রাজ-কলেজের অধ্যাপক সুধাকর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার সম্প্রতিকালের বন্ধু। তিনিই এই 'বংশ লতিকা' আমার কাছে পাঠিয়ে দেন।

রজনী ও আরতির আন্তরিক আতিথেয়তা সেদিন খুবই আনন্দদায়ক ছিল। কিন্তু সব ছাড়িয়ে শরৎকুমারী দেবীর দর্শনলাভের সেই দিনটি আমার মনে উজ্জ্বল ও পুণ্যময় হয়ে রয়েছে। এজন্য বন্ধুবর রজনী ও শ্রীমতী আরতির কাছে আমার কৃতজ্ঞতা থেকে গেছে।

এই প্রসঙ্গেই রজনীর সম্পর্কে আরও দু'একটা কথা বলা চলে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার হাস্যকর পরিণতির পর বাঙালীর মন সাম্যবাদ সম্বন্ধে কিছু সচেতন হয়ে ওঠে। সেই সময় যাঁরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও মনোযোগ সহকারে পড়াশুনো করছিলেন তাঁদের মধ্যে এই প্রিয়দর্শন ও তরুণবয়স্ক রজনী অন্যতম। রজনীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অনেককেই সেদিন আকৃষ্ট করেছিল। পৃথিবীর নানা দেশে তখন সমাজবাদ, সাম্যবাদ, শ্রমিকবিপ্লব এবং ধনতন্ত্রবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে চলেছে, সেগুলি আমাদের দেশে আসা একপ্রকার নিষিদ্ধ ছিল, পাছে সেগুলি জনমনকে প্রভাবিত করে তোলে এবং ব্রিটিশ ভারতের পক্ষে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। ধনতন্ত্রী এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ তখন এই ধরনের সাহিত্যের ঘোরতর শত্রু। কিন্তু ওরই মধ্যে নানান ফিকির এবং সঙ্গোপনে যে সমস্ত নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাদি বোম্বাই বা কলকাতায় এসে পৌঁছত তারই কিছু কিছু রজনীর হাতে আসত। ওই সকল সাহিত্যের ভিতর দিয়েই জানা যেত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নতুন চিন্তার ধারা, সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা, সোভিয়েট জনজীবনের প্রগতিশীল চিত্র ও তাদের বিপুল নির্মাণসজ্জা, জার্মানিতে নবাগত হিটলারের অন্ধ জাতীয়তার আত্মাভিমান, বিলাতে সাম্যবাদী নেতা সাপুরজি শাকলাৎওয়ালা ও রজনী পামী দত্তর অগ্নিক্ষরা ভাষণ প্রভৃতি। সেদিনকার

প্রচণ্ড ইংরেজ শাসনে যখন বাঙ্গলার চিত্ত উৎপীড়িত এবং নির্যাতিত সেই সময় এই সকল সাহিত্য যেন বহির্বিশ্বের জানালা খুলে দিত! রজনী সেই সময় বোঝাতো কংগ্রেসের প্রকৃত স্বরূপ কি প্রকার, গান্ধীজীর আন্দোলনের প্রকৃতি, দেশের স্বাধীনতার মূল ভিত্তি অর্থনীতি কিনা, চাষী ও মজতুর শ্রেণীর কল্যাণ ভিন্ন দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় কিনা, সামাজিক পরগাছা কাদের বলে, ইত্যাদি নানাবিধ আলোচনার ভিতর দিয়ে তার পাণ্ডিত্য ও দূরদর্শিতার পরিচয় প্রকাশ করত।

এই বিষয়গুলি তখনকার কালে ছিল আন্‌কোরা নতুন এবং এগুলি নিয়ে কেউ জনসমক্ষে বক্তৃতা করতে সাহস পেত না। যতদূর আমার মনে পড়ে এ নিয়ে রজনী ও আরতি তৎকালে বোধ হয় একটি 'স্টাডি সার্কেল' তৈরি করে এবং তারা উভয়েই—বিশেষ করে রজনী—শ্রমিকদলের নেতা বলে পরিচিত হয়।

পরবর্তীকালে রজনীর রাজনীতিক পরিচয় অনেক বড় হয়ে ওঠে এবং সে এম এন রায় মহাশয়ের সহকারীরূপে 'র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট' নামক একটি সংস্থার পরিচালক হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে এম. এন. রায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা হয়। এঁর বিদ্যাবত্তা, রাজনীতিক দূরদৃষ্টি, সমাজ জীবনের বিশ্লেষণ, বহুমুখী চিন্তাধারা—এগুলি লক্ষ্য করে আমি অভিভূত হই। এঁর জীবনও রোমাঞ্চকর দুঃসাহসে পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থের তৃতীয় পর্বে এঁর সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

১৯৩৪-এর ডিসেম্বরে পাটনা থেকে হীরালাল দাশগুপ্ত মহাশয় চিঠি দিলেন তাঁর অনুপম লিপিদক্ষতায়। —"সামনে বড়দিন। জ্যোৎস্না রাত। 'কাহুডাকের' জঙ্গলে তুমি! 'শিঙার কোঠির' দিক থেকে কী যেন আওয়াজ! নবী আকৃতার বলল, 'খাঁ-সাব' নিক্‌লা হুয়া! দুটো ডবল ব্যারেল গান্‌, একটা রাইফেল। হলদিছাপরায় বুনো হাঁসের পেছনে ছোটা। চিঠি পেয়েই চলে এসো।—দাদু।"

চিঠিতে নাচের ছন্দ আমাকে নাচিয়ে তুলল। আগামীকাল রাত সাড়ে আটটায় দেরাদুন এক্সপ্রেস ধরব—কারণ আমি এবার পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দিরটি দেখে গয়া-জাহানাবাদ হয়ে পাটনায় পৌঁছব।

চিঠি পেয়ে যখন প্রস্তুত হচ্ছি, তখন দুপুরের দিকে দুজন অপরিচিতা মহিলা দেখা করতে এলেন। ওঁদের মধ্যে একজন কিছু বর্ষীয়সী। ওঁরা বললেন, আমরা বাদুড়বাগানের শ্যামমোহিনী দেবীর শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে আসছি।

প্রসিদ্ধ সমাজসেবিকা শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনীর সঙ্গে আমার একদিন মাত্র আলাপ হয়েছিল। আমি ওঁদের অভ্যর্থনা করে বসালুম। বললুম, ওখানে আমার জানা এক মহিলা আছেন তাঁর নাম নীলিমা চট্টোপাধ্যায়।

বর্ষীয়সী মহিলা বললেন, ইনিই সেই!

হাসমুখে নীলিমা দেবী নমস্কার জানালেন। বললেন, আপনার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। অনেক দিন ধরে চিঠি দিয়ে আপনাকে ব্যস্ত করেছি। আপনার সাহায্য না পেলে কলকাতায় আমি দাঁড়াতেই পারতুম না। সরোজ মিত্র মশায়দের ওখান থেকে কিছুদিন আগে কাজ ছেড়ে এখন আমি শ্যামমোহিনী দেবীর ওখানে আছি।

হাসিমুখে আমি বললুম, পাঁচ বছর ধরে চিঠিপত্রেই আমাদের আলাপ হচ্ছিল। আপনাকে চোখে দেখছি আজ প্রথম!

নীলিমা বললেন, ইনি হিরণ্ময়ী দেবী। এঁকে আমি মাসিমা বলি।

আপনার স্বামী কেমন আছেন এখন?—নীলিমাকে প্রশ্ন করলুম।

ভাল নেই। আমি সেই জন্যই আপনার কাছে এসেছি।

বলুন, আমি কি করতে পারি?

নীলিমার হয়ে হিরণ্ময়ী দেবী বললেন, ওর স্বামী একেই ত পক্ষাঘাতে পঙ্গু, তার ওপর রোজ জ্বর আসছে! সেখানে দেখবার এখন কেউ নেই, চাকরটাও

জবাব দিয়ে গেছে। নীলিমার পক্ষে রাঁচি ফিরে যাওয়া খুবই দরকার।

বললুম, কিন্তু কলকাতার রোজগার ছেড়ে উনি যাবেন কেমন করে?

এবার নীলিমা দেবী কথা বললেন—আপনাকে সেই কথাই বলতে এসেছি। ওঁর কথা মনে রেখেই রাঁচির গার্ল স্কুলে আমি দরখাস্ত করেছিলুম। খবর পেলুম সেখানে আমার চাকরি হয়েছে। সেই জন্যই আমি রাঁচিতে ফিরে যেতে চাই।

এ ত খুব ভাল কথা—সুসংবাদ।—আমি বললুম, বাস্তবিক, আপনার স্বামীর এই অবস্থা—বাইরে আপনার থাকাই চলে না। এখনই আপনার চলে যাওয়া উচিত।

হিরণ্ময়ী বললেন, আপনাকে একটি অনুরোধ করার জন্যই নীলিমা আমাকে সঙ্গে এনেছে। আপনার জানা কেউ একজন যদি ওঁকে রাঁচিতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসে—নীলিমা তা হলে যাতায়াতের রাহাখরচ দিতে পারে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম। পরে বললুম, দেখুন, আমার জানা এমন কেউ নেই যাকে আমি অনুরোধ করতে পারব। রাঁচিতে গেলে এক-আধবার গাড়ি বদলাতে হয়। তা ছাড়া আসছে কাল আমি যাচ্ছি পরেশনাথ হয়ে গয়া। আমি কাকেই বা বলব, কেই বা রাজী হবে। তা ছাড়া আমার সময়ও কম।

নীলিমা দেবী সবিনয়ে বললেন, আপনি যদি আমাকে দয়া করে রাঁচিতে নামিয়ে দিয়ে যান তা হলে আমার খুবই উপকার হয়।

তাঁর এই প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ আমার নিজের কাছে বিশেষ-বিশেষ তারিখ অতিশয় মূল্যবান। সুতরাং তিনজনে বসে পরবর্তী প্রত্যেকটি তারিখ মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত স্থির হল আজই রাত্রে তা হলে আমাদের গাড়ি ধরতে হয়। বেশ মনে পড়ছে সেটি ২২ ডিসেম্বর। নীলিমা দেবী তখনই রাজী হয়ে গেলেন। গাড়ি রাত সাড়ে আটটায়। উনি নিজে হাজারিবাগ রোডের টিকিট করে হাওড়া স্টেশনে ৭নং প্লাটফরমের মুখে আটটার সময় অপেক্ষা করবেন। আমি ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছবো।

আমাকে নানাভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে ওঁরা এক সময় বিদায় নিলেন। সেদিন দুপুরে স্বপ্নেও ভাবিনি, এই মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে দু'একটি অভাবনীয় সঙ্কটের মধ্যে পড়তে হবে।

আমি সম্পূর্ণভাবে সেদিনও সামাজিক জীব হয়ে উঠতে পারিনি, সেটি আমার প্রকৃতিগত ত্রুটি। অনেক কর্তব্যের ডাক থাকে অনেক দিক থেকে, কিন্তু আমি সর্বত্র সাড়া দিতে পারিনে। আমার ভ্রমণই আমার জীবন, সেখানে তিলমাত্র বাধা পেলে আমি দুঃখিত হই। শ্রীমতী নীলিমা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেদিন

থার্ড ক্লাস কামরায় উঠে ওঁর সুখ-সুবিধার দিকে আমাকে মনঃসংযোগ করতে হচ্ছিল, এজন্য আমি ঈষৎ ক্ষুব্ধ। কারণ ভ্রমণকালে আমি অন্য মন এবং ভিন্ন চেতনায় বাস করি।

মহিলা কুণ্ঠিত হয়ে এক কোণে বসেছেন। আমি বসেছিলুম মুখোমুখি। ওঁর বয়স কম, বোধ করি সেই কারণেই আড়ষ্টতা কিছু বেশি। এক সময় সহাস্যে আমি বললুম, সেই 'বিজলী'র আমল থেকে আপনার সঙ্গে আমার পত্রালাপ হয়ে আসছে —প্রায় পাঁচ বছর হতে চলল। দেখা-শোনা এই প্রথম। আপনার তিন-চারটে লেখাও বোধ হয় 'বিজলী'তে ছাপা হয়েছিল।

আমার কথাবার্তা শুনে উনি যেন একটু সহজ হলেন। বললেন, আমি ঠিক লেখিকা নই। শখ করে আপনাদের কাছে লেখা পাঠাতুম। ছাপা হতে পারে এটা কখনও ভাবিনি।

আমরা দুজনেই হাসলুম। বর্ধমান ছেড়ে গাড়ি চলল আসানসোলের দিকে। এবার উনি বললেন, একদিন আপনার চিঠিতে সাহস পেয়েই আমি কলকাতায় এসেছিলুম। আপনার কথাতেই সরোজ মিত্র আর হরিদাসবাবু আমাকে কাজ দেন। সেই দুঃসময়ের কথা আমি ভুলিনি।

আমি বললুম, যাই হোক, সে অবস্থা এখন আপনার বোধ হয় কেটে গেছে। আপাতত আপনার স্বামী সুস্থ হয়ে উঠুন এইটি কাম্য। আপনি গার্ল স্কুলে কাজ পেয়েছেন, এটিও খুব আনন্দের কথা। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি আহারাদি সেরে এসেছেন ত?

ও নিয়ে আপনি কিছু ভাববেন না।

আমি চুপ করে গেলুম। সে রাত্রে প্রচুর শীত পড়েছিল। যখন আসানসোল পার হল, আমি আমার দুটি কম্বলের থেকে একটি ওঁকে গছালুম। বললুম, তা হোক, আমার গায়ে লংকোট রয়েছে। আপনি কম্বল ঢাকা দিয়ে বসুন।

ওঁকে অপেক্ষাকৃত আরামের মধ্যে বসিয়ে আমি চুপ করে গেলুম। ওঁর সঙ্গে শুধু রয়েছে একটি আংটাওলা টিনের বাক্স। আমারও প্রায় তাই। একটি ছোট সুটকেস ও দুখানা কম্বল। এসব আমরা হাতে হাতেই নিতে পারব।

রাত নিশুতি হয়েছে। আমরা ধানবাদ ছেড়ে যখন গোমো পার হয়ে গেলুম, তখন রাত দেড়টা বেজে গেছে। এ গাড়ি 'ইস্রি'তে দাঁড়ায় না, সুতরাং আমরা হাজারিবাগ রোডে নামব। এক সময় নীলিমা দেবীকে আমি সজাগ করলুম। যখন গাড়ি এসে স্টেশনে দাঁড়াল, রাত তখন আড়াইটে।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে দেখি চারিদিক ঘুটঘুটি অন্ধকার। শুক্লপক্ষের

চিহ্নমাত্র নেই। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে সেই কনকনে ঠাণ্ডায়। আকাশ ঘন অন্ধকার, কোনোদিকে কিছু দেখা যায় না। স্টেশনে বিন্দুমাত্র আলো বা লোকজন নেই। আমরা কম্বল ও সুটকেস নিয়ে সেই অন্ধকারে খুঁজতে খুঁজতে ওয়েটিং রুম খুঁজে বার করলুম। ভিতরটায় কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। ঘরখানা ঝুপসি। ঠাউরিয়ে দেখি, স্তূপাকার কী যেন সব মালপত্র। কিন্তু আমরা ছিলুম ক্লান্ত ও শীতার্ত, এবং ঘুমে আমার নিজের চোখ জড়িয়ে আসছিল। সুতরাং আকাশের আলোর আভাসটুকুতে ঘরের দরজার কাছেই যেটুকু খালি জায়গা দেখা যাচ্ছিল, সেইটুকুতেই আমি ও নীলিমা দেবী কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়লুম। দু' মিনিটের মধ্যেই আমি নিদ্রায় তলিয়ে গেলুম।

যখন হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গলো, চমকিয়ে উঠলুম। সামনে তিন-চারজন পোশাক-পরা আরদালি। হাততিনেক দূরে দু'জন খাস ইংরেজ অফিসার বিছানায় বসে চা-পান করছেন। আমার মাথার কাছে দশ-বারোটা বন্দুক ও রাইফেল দাঁড় করানো। বড় বড় কয়েকটা কাঠের পেটি, তার পাশে পাশে শিকারীর নানাবিধ পোশাকপত্র। গত রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকারে এসব কোনও কিছুই দেখতে পাইনি। এদিকে ফিরে দেখি, ওখানে নীলিমা দেবীর চিহ্নমাত্র নেই! তিনি তাঁর বাক্সটি ও কম্বলখানা আমার পাশে রেখে যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য! ঘুমের ঘোরে আচমকা উঠে সামনে দুজন ইংরেজ আর অতগুলো বন্দুক দেখে আমি একেবারে হতভম্ব।

সাহেব দুজন হাসিমুখে বললেন, গুড মর্নিং! আপনার ইচ্ছে হলে আরেকটু ঘুমিয়ে নিতে পারেন। আমরা ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে পড়ব।

মৃদুহাস্যে আমিও শুভ প্রভাত জানিয়ে বললুম, আপনারা কি শিকারে বেরিয়েছেন?

হ্যাঁ, উনি এখানকার পুলিসের ইন্স্পেক্টর জেনারেল। আমি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার সঙ্গের লেডি বাইরে গেছেন। এখন সকাল সাড়ে সাতটা।

ওঁদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি উঠে কম্বল দুখানা পাট করে স্যুটকেস দুটোর ওপর গুছিয়ে রেখে বেরিয়ে এলুম। ভাবছিলুম বাঙ্গালীর অগ্নিবিপ্লবের উগ্রতা সম্প্রতি কমে এসেছে! কিন্তু দু'তিনজন বিপ্লবী যুবক গত রাত্রে এঘরে নিঃশব্দে ঢুকে কী না করতে পারত। আর কিছু না হোক, পাঁচ-সাতটা বন্দুক পাচার ক'রে হাজারিবাগ বা চাতরার জঙ্গলে গা ঢাকা দিতে পারত!

প্লাটফরমের প্রান্তে জলের কলে মুখ ধুয়ে চায়ের দোকানের কাছে এসে দেখি,

নীলিমা দেবী অপেক্ষা করে রয়েছেন। কিন্তু আজ সকালে দুজনের আর কোনও গাম্ভীর্য রইল না। পরস্পরকে দেখে আমরা সকৌতুক উল্লাসে হেসে অস্থির হলুম। সন্দেহ নেই, অন্ধকার রাত্রে ঘুমের ঘোরে আমরা বোকা বনে গিয়েছিলুম।

সাহেবরা বিদায় নেবার পর ওদের ওই ওয়েটিং রুমটি আমরা দখল করলুম এবং ওখানেই স্নানাহার সেরে যখন বেরোলুম তখন বেলা এগারোটা। এখান থেকে 'ইস্রি' বা 'উশ্রী' পর্যন্ত মোটর বাস পাওয়া যাবে। উশ্রী আমার চেনা জায়গা। ওখানকার জঙ্গলে উশ্রী জলপ্রপাতটি খুব চিত্তাকর্ষক দৃশ্য। যাই হোক উশ্রীতে পৌঁছে অনেক চেষ্টায় একখানা টাঙ্গা পাওয়া গেল। আমরা নিমিয়াঘাটের পাশ কাটিয়ে যখন পরেশনাথ পাহাড়ের ঠিক নিচে এসে এক জঙ্গলের ধারে নামলুম, দেখলুম খানিকটা পথ হেঁটে গেলে জৈনদের দুটি মস্ত ধর্মশালা। একটি তার শ্বেতাম্বরী অন্যটি দিগম্বরী। বেলা তখন প্রায় চারটে। চারদিক নিঝুম। আজ আকাশ পরিষ্কার। গাড়িখানা ছেড়ে দিয়ে আমরা হাঁটতে হাঁটতে এসে ধর্মশালার ভিতরে ঢুকলুম। কিন্তু প্রথমেই একটি লোকের কাছে বাধা পেলুম এবং তর্ক বাধল। ওরা আশ্রয় দিতে নারাজ। যাই হোক আমরা সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী, এ কথাটি কর্তৃপক্ষকে উত্তমরূপে বুঝিয়ে তবে বাইরের ফটকের পাশে একটি ঘরে আশ্রয় পেলুম। কর্তাদের একজন জানালেন, এখন কাছাকাছি কোথাও খাবার কিনতে পাওয়া যায় না সম্প্রতি। এদিককার জঙ্গলে-জঙ্গলে জানোয়ারের উৎপাত বেড়েছে। নরখাদক বাঘের উপদ্রবে নাকি সবাই আতঙ্কিত। আমরা থাকি সেই ভিতর দিকে। আপনাদের আসা উচিত হয়নি!—আমরা যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর ধমক খেলুম।

লোকটা আমাদের তাড়াতে পারলে বাঁচে! কিন্তু আমরা টাঙ্গা ছেড়ে দিয়েছি, এখন যাব কোথা? শেষ পর্যন্ত নীলিমা দেবীর অনুরোধে ওরা দুটি টাকার বিনিময়ে একটি হারিকেন ল্যাম্প, রুটি-তরকারি-রাবড়ি এবং পানীয় জল দিতে রাজি হ'ল। কাল সকালে পাহাড়ে উঠে পরেশনাথ দর্শন ক'রে আমরা চলে যাব। প্রণামী দিয়ে যাব বইকি।

লোকটার কথা শোনার পর থেকে একটু গা ছমছম করছিল। তবু ফটকের বাইরে এসে এদিক ওদিক দু'পা ঘুরে দেখছিলুম। চারিদিকে ঘন বন, সামনে মস্ত এক বৃক্ষ। জনমানব কেউ কোনও দিকে নেই। নিঝুম বনস্থলীর দিকে এই আসন্ন সন্ধ্যায় তাকালে দুর্ভাবনা আসে। আমরা ভিতরে চলে এলুম। এবার একটা লোক এসে ভাঙ্গা পুরনো ফটকটা বন্ধ করে সোজা ভিতর দিকের পথ ধরে চলে গেল। যাবার সময় বলল, বাহারমে মৎ খাড়া হো। ভিতরে রহো!

সন্ধ্যা তখন সমাগত। ঘরের ভিতরটা সম্পূর্ণ শূন্য, একটিও আসবাবপত্র নেই। মেঝেটা কনকনে ঠাণ্ডা। চারিদিকের জনশূন্যতার মধ্যে এই ন্যাড়া ঘরখানায় রাতটা কেমন করে কাটিয়ে পালাবো এই কথা যখন ভাবছি, তখন ভিতর দিকের দীর্ঘলম্বিত পথ ধরে দুটো লোক এসে শালপাতায় আহার্যসামগ্রী, একটি ছোট জলের বালতি ও তার সঙ্গে একটা টিনের ঘটি রাখল। অন্যজন হারিকেনটি দিল। ওদের কাজ ওখানেই শেষ। নীলিমা দেবী সেগুলি গুছিয়ে ভিতরে এনে রাখলেন। লোক দুটো আবার চলে গেল।

সন্ধ্যার পরে পরিষ্কার জোৎস্না দেখা দিয়েছিল। ঘরের দরজাটা খুলে রেখে হারিকেন ল্যাম্পটা সামনে বসিয়ে আমরা গল্প করছিলুম। নীলিমা দেবী পাটনা ও রাঁচির মেয়ে। ১৯২৭-এ উনি প্রাইভেটে বি-এ পাস করেন। বিবাহের পর একটি বাচ্চা হয়ে মারা যায়। কিন্তু কলকাতার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বর্ণনায় উনি হেসে খুন হচ্ছিলেন। এক সময় উনি বললেন, এবার খেয়ে নিন্—

অতঃপর মিনিট পনেরোর মধ্যে আহারাদি সেরে বাইরের বারান্দায় বালতির জলে আঁচিয়ে আমরা ঘরে এলুম। উনি দরজাটা বন্ধ করে কাঠের হুড়কোটা লাগিয়ে দিলেন। ঠাণ্ডা পড়েছে প্রচুর। ওঁর গায়ে গরম চাদর, আমার লংকোট। কম্বল মাত্র দু'খানা। একখানা ওঁকে দিলুম। আধখানা উনি পাতবেন, বাকি আধখানা গায়ে দেবেন। আমারও তাই। ওইভাবে আমরা রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা করে নিয়ে যখন ঘরের এধারে ওধারে কুণ্ডলী পাকিয়ে মেঝের উপর পড়েছি, তখন কেরোসিনের অভাবে আলোটা ধীরে ধীরে কমে এল। জৈনরা একটু হিসেবী সন্দেহ নেই।

বোধ হয় রাত তখন এগারোটা। ঘরের বাইরে পৃথিবী তখন নিঃসাড়। ঠাণ্ডায় কুঁকড়িয়ে কম্বলের ভিতরে আমার ঘুম আসছিল। এমন সময় ওধার থেকে নীলিমা চাপা গলায় ডাকলেন, শুনছেন?

ধড়মড়িয়ে উঠলুম। উনি বললেন, বাইরে কিসের আওয়াজ হল!

আমি উঠে সমস্ত দরজা ও জানলা পরীক্ষা করলুম। সবগুলো বন্ধ, কিন্তু সবগুলোই পুরনো, একেবারে ঝাঁঝরা। ওগুলোর ফাটলের ভিতর দিয়ে বাইরের চাঁদের আলো দেখা যায়। জানলার গরাদগুলো এমন ক্ষয়ে গেছে যে, ধাক্কা দিলেই ভেঙ্গে পড়ে। দরজাটায় হুড়কো আছে, কিন্তু খিল নেই।

হঠাৎ একটা বড় আওয়াজে আঁতকিয়ে উঠলুম। মুহূর্তেই আমার হৃৎকম্প দেখা দিল। সরে এসে মহিলাকে চুপি চুপি শুধু বললুম, বাঘ! খুব সম্ভব!

বাঘের প্রকৃতি সম্বন্ধে সেদিনও আমি অনভিজ্ঞ। নরখাদকরা যে জঙ্গলের

আড়ালে লুকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শিকারের গতিবিধি নিরীক্ষণ করে, এটা তখনও জানতুম না। এখন মনে হচ্ছে সন্ধ্যার ঠিক আগে ফটকের বাইরে ঘোরা-ফেরা করা আমাদের পক্ষে ভাল হয়নি। লোকটা ঠিকই বলেছিল। নীলিমা দেবী ভয়ে কাঠ হয়ে অন্ধকার কোণে বসেছিলেন। দ্বিতীয়বার ঝপাৎ করে ঝাপটার মতো একটা শব্দ হলো জানলার ঠিক নিচে! ঠিক তার পরে বন্ধ জানলায় যখন দু'একবার আঁচড় পড়ল, তখন আমরা সাহস হারালুম। বাঘ আক্রমণশীল হয়, যখন সে নরখাদক হয়ে ওঠে। পুরনো জানলাটা ভাঙতে ওর এক সেকেণ্ডও লাগবে না। তবে? তবে কি আমার জননীর আশীর্বাদ সব মিথ্যে? তিনি যে বলেছেন, তিনি জীবিত থাকতে আমার পায়ে কুশাঙ্কুরও ফুটবে না! আমি মহিলার কাছে এসে হেঁট হয়ে দেখি, তিনি কম্বলে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন এবং চাপা জড়িত কণ্ঠে বললেন, ওঁর সঙ্গে আর দেখা হল না!

অপরাধ আমারই। ওঁকে আগে রাঁচিতে পৌঁছিয়ে দেওয়া আমার উচিত ছিল। কেন এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন হলুম? কেন আমার এই সর্বনাশা আত্মপরতা? ধিক আমার জীবনে। আগে ওঁকে স্বামীর কাছে দিয়ে এলে আমার অরণ্যযাত্রা একটুও কি ক্ষুণ্ণ হত?

ফটকের দিকে হুড়মুড় করে একটা আওয়াজ হতেই আমি থরথরিয়ে কেঁপে উঠলুম। অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে জানলা-দরজাগুলো দেখছিলুম। এমন সময় সহসা বাইরের বারান্দায় জলসুদ্ধ বালতিটা ঝন-ঝনাৎ করে উঁচু থেকে আছড়িয়ে পড়ল নিচে শানের উঠানের ওপর। তখন আমি বেপরোয়ার মতো এগিয়ে প্রাণপণে ঘরের দরজা ভিতর থেকে ঠেলে ধরলুম। না, আর উপায় নেই। এবার নিশ্চিত মৃত্যু!

অন্ধকারে পলকের মধ্যে লক্ষ্য করলুম, কম্বল-মুড়িসুদ্ধ হুমড়ি খেয়ে মুখ গুঁজড়িয়ে নীলিমা দেবী দেওয়ালের কোণে পড়ে ক্ষীণস্বরে গোঁ গোঁ করছেন। মনে হচ্ছে আতঙ্কে তার দাঁতি লেগে গেছে। কিন্তু তাঁরই মাথার কাছের জানলায় যখন পুনরায় আঁচড়ের আওয়াজ পেলুম তখন আর স্থির থাকতে পারলুম না। দরজাটা ছেড়ে ওঁর ওই মুখের আওয়াজটা বন্ধ করার জন্য এগিয়ে গিয়ে কম্বলসুদ্ধ ওঁকে পাশ ফিরিয়ে শোওয়ালুম এবং আমার পকেটের ছুরিখানার বাঁট ওঁর দাঁতের দুই পাটির মাঝখানে একটু প্রবেশ করালুম—যাতে ওঁর মুখের ওই শব্দটা কমে। না, উনি একেবারেই অচেতন। আমি ঠকঠক করে কাঁপছিলুম উত্তেজনায় আর আতঙ্কে। ওঁর মতো আমিও যেন হতচেতন অবস্থায় যন্ত্রবৎ এগুলো করে যাচ্ছিলুম এবং উৎকণ্ঠিত আতঙ্ক ও প্রাণভয়ে ভীত হয়ে নিশ্চুপ প্রেতের মতো আমি নড়বড়

করছিলুম। নীলিমা দেবীর গোঁ গোঁ শব্দটা সম্পূর্ণ থামেনি, তবে পাশ ফিরিয়ে শোওয়ানোতে আওয়াজ কিছু কমেছিল। ভদ্রমহিলার গলা টিপে ওই আওয়াজটা বন্ধ করার জন্য আমার হাত নিসপিস করছিল। এবার আমি তাঁর মুখ থেকে ছুরিখানা সরিয়ে নিয়ে অন্য পাশ ফিরিয়ে দিলুম। তারপর উঠে এসে আবার দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ালুম। বোধ হয় আকাশের চাঁদ ততক্ষণে অনেকটা ঘুরেছে। তিনটে বন্ধ জানলার ফাটলগুলো দিয়ে তার আলো ঠিকরিয়ে ভিতরে আসছে।

সমস্ত রাত্রির সেই আত্মরক্ষার প্রাণপণ সংগ্রাম আমার কাছে এখন যেন উপকথার মতো। সে কি নরখাদক বাঘ? সে কি কোনও অরণ্যবাসী অতিকায় নরাসুর, নাকি সে একটা ভালুক? কিন্তু ভালুকের ত ল্যাজের ঝাপট নেই? তার ত কোনও 'গ্রাউলিং' নেই। অথচ নিজের চোখে সে-জন্তুকে আমি দেখিনি সেই রাত্রে!

রাত চারটের পর সমস্ত আওয়াজ থামল। প্রবল উত্তেজনা ও আতঙ্কের পর আমার অপরিসীম ক্লান্তি আর অবসাদ আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দিল না। ওই দরজা চেপেই বসে হেলান দিয়ে চোখ বুজলুম। এর মধ্যে কখন নীলিমা দেবীর জ্ঞান ফিরেছে এবং কখন তিনি অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছেন আমি জানিনে।

হঠাৎ আমার হাত ধরে সকালবেলা হিঁচড়িয়ে টান পড়াতে আমি চমকিয়ে জেগে উঠলুম। নীলিমা দেবী উত্তেজিত হয়ে বললেন, সরে যান্, সরে যান্—আপনার কানের পাশে মস্ত কাঁকড়া বিছে—

সরে এলুম। চেয়ে দেখি ঘন কালোবর্ণ ইঞ্চি ছয়েক লম্বা একটা কাঁকড়া বিছা আমার কানের পাশে দেওয়ালে আমারই মতো রাত থেকে ঘুমোচ্ছিল! মহিলা বললেন, পালিয়ে যাবে—শিগগির মারুন, ওই জুতোটা দিয়ে ঠুকে মারুন। কালো কাঁকড়া বিছে কামড়ালে কেউ বাঁচে না!

উনি যত চঞ্চল, আমি ততই স্থির। ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে সাতটা। উনি এর মধ্যে জানলাগুলি খুলেছেন। বাইরে বেশ রোদ উঠেছে। সুন্দর প্রভাতকাল!

মারলেন না বিছেটাকে?

হাসিমুখে বললুম, ওটা বোধ হয় ঘুমোচ্ছে, থাক্ না ঘুমিয়ে?

আমার বড্ড ভয় করে। ওটাকে মারুন আপনি।

না—আমি বললুম, যেটাকে সহজেই মারতে পারি, সেটার প্রাণ নষ্ট নাই করলুম! এটা জৈন ধর্মশালা!

চার হাজার ফুট উঁচুতে পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দির। আমি একাই গেলুম। বিগ্রহদর্শন শেষ করে যখন ফিরে এলুম তখন সাড়ে এগারোটা। নীলিমা দেবী এর মধ্যে স্নানাদি সেরে পরিচ্ছদ বদলিয়ে মাথায় সিঁদুর দিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। গত কালকের মতো তিনি ভিতরে গিয়ে আহারাদির কথাও পাকা করে এসেছেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। সন্ধ্যার আগে ওঁকে রাঁচিতে পৌঁছিয়ে আমি রামগড়ে ফিরে রাঁচি রোড স্টেশনে গাড়ি ধরব। এযাত্রায় আমার খুব শিক্ষা হল।

নীলিমা দেবী বললেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার খুবই বিপদে কাটল। আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় আমার চিরকাল মনে থাকবে। আমি সঙ্কোচ আর লজ্জা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

আমি হেসে বললুম, আমি নিজেই খুব অনুতপ্ত যে আপনাকে আগে রাঁচিতে রেখে আসিনি! আমারই ক্ষমা চাওয়া উচিত। আপনার স্বামী কেমন থাকেন এবং স্কুলের কাজ আপনার কেমন লাগে—এসব চিঠিতে জানলে আমি খুশী হব।

আহারাদি সেরে আমরা এক সময়ে বেরিয়ে পড়লুম।

আর নয়, এবার কিছুকালের জন্য সরে যেতে চাই সামাজিক জীবনের বাইরে। যেতে চাইছি একটা বন্য জীবনে—সেটা দুর্বার বা বর্বর হলে ক্ষতি নেই। এবার থেকে আমি অরণ্যে-অরণ্যে! বাঘের দাঁত, ভালুকের থাবা, হরিণ-শম্বরের দৌড়, বন্য কুকুরের চক্রান্ত—ওদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখব অরণ্যের গহন রহস্যকে। পরবর্তী সাত বছর কাল অবধি জঙ্গলের নেশায় যখন-তখন হীরালাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে আমার বনজঙ্গলে কেটেছে। তিনি তাঁর 'মায়ামৃগ' বইটি আমার নামে উৎসর্গ করেন। ওই কালের মধ্যেই আমি আমার 'অরণ্যপথ' বইটিতে লিখি, হে অরণ্য, এবার থেকে তুমি কথা বলো আমার কানে কানে!

আমার অরণ্য ভ্রমণের প্রথম কাহিনী 'হে অরণ্য, কথা কও'—এটি প্রকাশ করি সেই বছরের 'দোল সংখ্যা' আনন্দবাজার পত্রিকায়।

[ প্রথম পর্ব শেষ খণ্ড সমাপ্ত ]